শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

৫০টি প্রেমের গল্প

পারুল

৫০টি প্রেমের গল্প

৫০টি প্রেমের গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পারুল

আমি যখন থাকব না,
তখনও তো মুন্নিকে একাই হাঁটতে হবে।

সূচি

তিন নম্বর বেঞ্চ

পাত্রী

গঞ্জের মানুষ

রাজা ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর দিনটা শেষ হয়ে গেল। একটা একা শিরীষ গাছ। সিকি মাইল লম্বা ছায়া ফেলেছিল। সেই ছায়াটাকে গিলে ফেলল আঁধার রাতের বিশাল পাখির ছায়া। ফকিরচাঁদের সাত ঘড়া মোহর আর বিস্তর সোনাদানা, হিরে-জহরত সব ওই ঢিবির ভেতরে পোঁতা আছে। আর আছে ফকিরচাঁদের আস্ত বসতবাড়িটা। ঢিবির ওপাশ দিয়ে রেললাইন, এপাশ দিয়ে রাস্তা। পাথরকুচি ছড়ানো, গাছগাছালির ছায়ায় ভরা। এখন একটু অন্ধকার মতো হয়ে এসেছে, শীতের থম-ধরা বিকেলে একটু ধোঁয়াটে মতো চারধার। রাস্তার পাথরকুচিতে চটি ঘষটানোর শব্দ উঠছে। রবারের হাওয়াই চটি, এ পর্যন্ত সাতবার ছিঁড়েছে। তবু ফেলে দেয়নি নদিয়াকুমার।

তো এই সন্ধের ঝোঁকে আলো-আঁধারে নদিয়া যায় না, না নদিয়ার বউ যায় তা ঠাহর করা মুশকিল। ভেলুরামের চোখে ছানি আসছে। নাতি খেলারাম বীরপাড়া গেছে তাগাদায়। সে এখনো ফেরেনি দেখে চৌপথীতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে এল ভেলু। বীরপাড়ায় একটা বাস এসে ছেড়ে গেল। এ গাড়িতেও আসেনি। আরও খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে হত। নাতিটার জন্য বড্ড চিন্তাভাবনা তার। কিন্তু ভেলুরাম দোকান ছেড়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা পায় না। তার ছেলে শোভারাম চোর-চোট্টা-বদমাশ হয়ে গেছে। এক নম্বরের হেক্কোড়। নেশাভাঙ আর আউরাত নিয়ে কারবার করে। বহুকাল আগে শোভারামের বউ পালিয়ে গেছে। ভেলু কেবল নাতিটাকে রেখে শোভারামকেও ঘরের বার করেছে। কিন্তু ছেলে মহা হেক্কোড়, দুনিয়ায় কাউকে ভয় খায় না। দরকার পড়লেই এসে ভেলুর দোকানে হামলা করে মালকড়ি ঝেঁকে নিয়ে যায়। তাই চৌপথী থেকে পা চালিয়ে ফিরছিল ভেলু। রবারের চটির আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল।

নদিয়া যায়, না নদিয়ার বউ যায়? মুশকিল হল, নদিয়ার বউ আজকাল মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে, পিরান গায়ে দেয়, চুলও ছেঁটে ফেলেছে। কে বলবে মেয়েমানুষ? হাতে চুড়ি-বালা, সিঁথের সিঁদুর কিছু নেই। রাতবিরেতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা হয়েছে যে, সে পুরুষমানুষ, আর কালীসাধক। অবশ্য কালীর ভরও হয় তার ওপর। শুধু ভেলু কেন, গঞ্জের সবাই নদিয়ার বউকে ভয় পায়। নদিয়া নিজেও।

ভেলু শেষবেলার আকাশের খয়াটে আলোটুকুও চোখে সহ্য করতে পারে না। চোখে হাত আড়াল দিয়ে দেখে বুকে ভয়ে ভয়ে বলে—কে, নদিয়া নাকি?

হয়। নদিয়া উত্তর দিল।

কোন বাগে যাচ্ছ?

বাজারের দিকেই।

চলো, একসঙ্গে যাই।

চলো।

দুজনে একসঙ্গে হাঁটে। ভেলুরামের নাগরা জুতোর ঠনাঠন শব্দ হচ্ছে, ফ্যাসফ্যাস করছে নদিয়ার চটি। ভারি দুঃখী মানুষ এই নদিয়া। বউ যদি পুরুষছেলে হয়ে যায় তো পুরুষমানুষের দুঃখ ঝুড়িভরা। কিন্তু ওই সাতজায়গায় ডিম-সুতোর বাঁধনঅলা হাওয়াই চটি দেখে যদি কেউ নদিয়ার দুঃখ বোঝবার চেষ্টা করে তো সে আহাম্মক। নদিয়ার দুঃখ ওই চটি-জুতোয় নয় মোটেই। দু-দুটো মদ্দ হালুইকর নদিয়ার শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভান্ডারে দু-বেলা খাটে। গঞ্জে বলতে গেলে ওই একটাই মিষ্টির দোকান। আরও কয়েকটা নদিয়ার ভাত মারবার জন্য গজিয়েছে বটে, তবু নদিয়ার বিক্রিবাটাই সবচেয়ে বেশি। দোষের মধ্যে লোকটা কৃপণ। জামাটা জুতোটা কিনবে না, পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোবে না। চটি ছিঁড়লে সেলাই করে পরবে। বউ কী সাধে পুরুষ সাজে!

যে-যার নিজের জ্বালায় মরে। নদিয়া যেতে যেতে কাঁদুনি গাইতে লাগল—সামনের অমাবস্যায় আমার বাড়িতে মোচ্ছব লাগবে, বুঝেছ? আমার বউ নিজের হাতে পাঁঠা কাটবে। শুনেছ কখনো মেয়েছেলে পাঁঠা কাটে?

দেহাতি ভেলুরামের তিন পুরুষের বাস এই গঞ্জে। সে পুরো বাঙালি হয়ে গেছে, তবু মাঝে মাঝে অভ্যাস রাখার জন্য সে দু-চারটে হিন্দি কথা ভেজাল দিয়ে নির্ভুল বাংলা বলে। যেমন এখন বলল—নদিয়া ভাই, আউরাত তোমার কোথায়? ও তো ব্যাটাছেলে হয়ে গেছে। সোচো মৎ।

তুমি তো বলবেই। আমি মরি স্বখাত সলিলে, তোমরা মাগনার মজা দেখছ।

ভেলুরাম নাগরার শব্দে যথেষ্ট পৌরুষ ফুটিয়ে বলল—ও মেয়েছেলেকে সোজা রাখতে হলে চার জুতি লাগাতে হয়।

বলে থেমে গিয়ে নিজের একখানা পা তুলে পায়ের নাগরা নদিয়াকুমারকে দেখিয়ে বলল—এইসন জুতি চাই। কিন্তু তুমি জুতি লাগাবে কী, তোমার তো একজোড়া ভালো জুতিই নেই। ওইরকম কুত্তার কানের মতো লটরপটর হাওয়াই চটি দিয়ে কী জুতো মারা যায়!

রাখো রাখো! নদিয়া ধমকে ওঠে—শোভারামের মা যখন নোড়া তুলে তাড়া করেছিল তখন তো বাপু ন্যাজ দেখিয়েছিলে, বুড়ো ভাম কোথাকার!

ভেলুরাম খুব হাসে। শোভারামের মা এখন আর বেঁচে নেই। নোড়া নিয়ে তাড়া করার এই সুখস্মৃতিতে ভারি আহ্লাদ আসে মনে। এত আহ্লাদ যে চোখে জল এসে যায় ভেলুরামের।

আনাচে-কানাচে শোভারাম কুকুর-বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করে। এমন অবস্থা ছিল না যখন মা গন্ধেশ্বরী জীবিত ছিল। তখনও বাপটা খড়মটা হুড়কোটা দিয়ে পেটাত বটে, কিন্তু তবু সংসারের বার করতে সাহস পেত না। মা গন্ধেশ্বরীকে ভূত-প্রেত পর্যন্ত ভয় পেত, কাবুলিওয়ালা কী দারোগা পুলিশকেও গ্রাহ্য করত না গন্ধেশ্বরী। ভেলুরাম তো সেই তুলনায় ছারপোকা। সেই গন্ধেশ্বরী ছিল শোভারামের সহায়। তখন শোভারামের মনখানা সব সময়ে এই গান গাইত—লুট পড়েছে, লুটের বাহার, লুটে নে রে তোরা। তাই বটে। বাপ ভেলুরামের পাইকারি মশলাপাতি, মনোহারি জিনিস, পাট, তামাকপাতা, তেলের বীজ ইত্যাদির কারবার থেকে সে মনের আনন্দে লুট করত। বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে শিখেছিল ইস্কুলের প্রথম দিকটায়। ক্লাস থ্রিতে উঠলে লেখাপড়া সাঙ্গ হল। মাস্টাররা মারে বলে মা গন্ধেশ্বরী ইস্কুল থেকে ছাড়ান করাল। বাপের সঙ্গে কিছুদিন কারবার বোঝবার চেষ্টায় লেগেছিল। ভালো লাগত না। বাপটা পারেও বটে। দু-পয়সা চার পয়সার হিসেব নিয়ে পর্যন্ত মাথা গরম করত। শোভারামের এসব পোষায় না। বয়সকালে বউকে গাওনা করে দেহাত থেকে আনাল মা। কিন্তু সে বউয়েরও কী বা ছিল! শোভারাম ইতিমধ্যে বখাটেদের সঙ্গে ভিড়ে বিস্তর মেয়েমানুষের স্বাদ সংগ্রহ করেছে। দেহাতি মেয়ে বড্ড নোনতা। ভারি ঝাঁঝ তাদের হাবেভাবে। সেটা অপছন্দ ছিল না শোভারামের। কিন্তু বউয়েরও তো পছন্দ বলে কিছু আছে!

শোভারাম নেশার ঘোরে পড়ে গেছে, গাঁজা ভাং তো আছেই, বোতলের নেশাও ধরে ফেলেছে কবে। মেয়েমানুষটা টিকটিক করত। খেলারাম হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে দাঙ্গাহাঙ্গামার উপক্রম। মা গন্ধেশ্বরী তখনও সহায়। ছেলের বউয়ের তেজ দেখে উদুখলের কোঁতকাটা দিয়ে আচ্ছাসে ঝেড়ে দিল। সেই পেটা না দেখে শোভারাম মুগ্ধ। মায়ের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়েছিল সেদিন। বছরখানেকের খেলারামকে ফেলে বউ ভেগে গেল ছ-মাস পর। বাপ ভেলু অবশ্য বরাবরই শোভার বিপক্ষে। তক্কে তক্কে ছিল, কবে গন্ধেশ্বরী মরে। সেই ইচ্ছে পূরণ করে শোভারামকে জগৎসংসারে একেবারে দিগদারির দরিয়ায় ছেড়ে, গেল বছর মা গন্ধেশ্বরী সধবা মরল। গন্ধেশ্বরীর শ্রাদ্ধের দিন পার হতে না হতেই ভেলুরাম মহা হাঙ্গামা বাধায়। শোভারাম কিছু প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু বাপ ভেলুরাম মহকুমায় গিয়ে এস ডি ও সাহেবের কাছে পর্যন্ত ছেলের বিরুদ্ধে দরবার করে। লজ্জায়-ঘেন্নায় শোভারাম গৃহত্যাগ করে।

কিন্তু ঘর ছাড়লেই কী! তিরপাইয়ের বস্তিতে জগনের ঘরে একরকম আদরেই আছে শোভারাম। কিন্তু সে আদরে মালকড়ি আসে না। নেশা-ভাং আর কাঁহাতক ভিক্ষেসিক্ষে করে চলে! কাজবাজ বলতে কিছু নেই, রোজগারপাতি ঢুঢু, চুরি-চামারিও বড়ো সহজ নয়। মহকুমার সদরে গিয়ে অনেক ঘুরঘুর করেছে সে, কেউ কাজ দেয় না। তিন-চার বাড়িতে চাকর খেটেছিল, চুরি করে মারধর খেয়ে পালিয়ে এসেছে, পুলিশেও খোঁজখবর করছে। বড়ো অব্যবস্থা চারদিকে। চুরির লাইনে পাকাপাকিভাবে ঢুকে পড়ার বাসনা ছিল। কিন্তু নেশা-ভাং করে শরীরে আর রস নেই, হাতটাত কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে, মাথা গুলিয়ে যায়। মদনা চোরকে দেখে বুঝেছে যে চুরিও বড়ো সহজ কাজ নয়। সংযম চাই, ত্যাগ চাই, আত্মবিশ্বাস আর বুদ্ধি চাই। মদনা রোজ সকালে ব্যায়াম করে, ঘোড়ার মতো ছোলা খায়, নেশাটেশাও বুঝেসমঝে করে। তা ছাড়া সে নানান মন্ত্র জানে। ভূতপ্রেত তাড়ানোর মন্ত্র, কুকুরের মুখবন্ধন, ঘুমপাড়ানি মন্ত্র। মদনা যে আজ বড়ো চোর হয়েছে সেও মাগনা নয়। যে-দিকেই বড়ো হতে চাও কিছু গুণ থাকাই লাগবে। শোভারামের কিছু নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত ফের ভেলুরামের গদিতেই তাকে মাঝে মাঝে চড়াও হতে হয়। কাকুতি-মিনতিতে আজকাল কাজ হয় না, চোখ রাঙালেও না। ভেলুরাম তার ধাত বুঝে গেছে। খেলারামও বাপকে দূরদূর করে। একটা বিলিতি কুত্তা রেখেছে, সেইটেকে লেলিয়ে দেয়। তবু দু-পাঁচ টাকা ওই বাপ কী ছেলেই ছুড়ে দেয় শোভারামকে আজও। সেই অপমানের পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে আসে শোভারাম। চোখে জল আসে। তারই বাপ, তারই ছেলে, পয়সাও হক্কের, তবু ভিক্ষে করে আনতে হয়।

আজও গদির চারধারে ঘুরঘুর করে বাতাস শুঁকছিল শোভারাম। মশলাপাতির একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এখানে। বাজারের পেছন সারির দোকান আর গুদামের জায়গাটা খুব নির্জন। খেলারামের কুকুরটা কাঠের দোতলার বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাচ্ছে। শোভারাম মুখ তুলে কুকুরটাকে দেখল। ভীষণ কুকুর। বলল —কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!

গদিতে খেলা বা ভেলু কেউ নেই। শুধু বুড়ো কর্মচারী বসে হিসেবের লাল খাতা খুলে শক্ত যোগ অঙ্ক কষছে। দু-চারজন খদ্দের মশা তাড়াচ্ছে। আর খেলারামের মাস্টার শ্রীপতি কর্মকার বসে আছে উদাসভাবে। শ্রীপতিমাস্টার লোকটি বড়ো ভালো। সারাদিন বসে কী যেন ভাবে। লোকে বলে, গঞ্জে শ্রীপতির মতো এত লেখাপড়া জানা লোক আর নেই। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যে জীবনে কিছু হয় না, ওই শ্রীপতি মাস্টারই তার প্রমাণ। মাইনর স্কুলে সামান্য বেতনের মাস্টারি করে, আর গোমুখ্যু ভেলুরামের নাতি, গজমুখ্যু শোভারামের ছেলে আকাটমুখ্যু খেলারামকে রোজ সন্ধেবেলা দু-ঘণ্টা পড়িয়ে মাসকাবারে বুঝি পঞ্চাশ টাকা পায়। আর ওই দু-ঘণ্টায় ভেলুরাম গদিতে বসে না হোক শতখানেক টাকা নাফা রোজ ঘরে তুলছে।

রাম রাম মাস্টারজি। বলে শোভারাম গদির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাবখানা এমন যে তারই গদি, রোজই সে এখানে যাতায়াত করে। কর্মচারীটা একবার মুখ গম্ভীর করে তাকাল। হাতের কাছেই ক্যাশবাক্স, কিন্তু ওতে কিছু নেই, শোভা জানে। থাকলেও ক্যাশবাক্স তালা-দেওয়া, আসল মালকড়ি লম্বা গেঁজের মধ্যে ভেলুরামের কোমরে প্যাঁচানো থাকে।

শ্রীপতি মাস্টার চিনতে পারল না, অন্যমনস্ক মানুষ। চুলগুলো সব উলোঝুলো, গায়ে ইস্তিরি ছাড়া জামা, ময়লা ধুতি। উদাস চোখে বলল—কোন হ্যায় আপ?

শ্রীপতি দারুণ হিন্দি বলে। প্রথম দিন খেলারামকে পড়াতে এসে সে বড়ো বিপদে ফেলেছিল ভেলুরামকে। খটাখট উর্দু মেশানো চোস্ত হিন্দিতে কথা বলে যাচ্ছে, ভেলু হাঁ করে চেয়ে আছে, কিছু বুঝতে পারছে না। তিন পুরুষ বাংলা দেশে থেকে আর বাঙালির সঙ্গে কারবার করে করে হিন্দি-মিন্দি ভুলে গেছে কবে! উত্তরপ্রদেশে সেই কবে দেশ ছিল। মা গন্ধেশ্বরী কিছু কিছু বলতে পারত। খেলারাম এখন ইস্কুলে হিন্দি শেখে।

শ্রীপতির হিন্দি শুনে ভয় পেয়ে শোভারাম বলে—আমি খেলারামের বাপ মাস্টারজি। আমার কথা ভুলে গেলেন আপনি?

ও। বলে বিরসমুখে বসে থাকে শ্রীপতি। গঞ্জে থেকে তার জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এমনকী সে যে এত ভালো হিন্দি জানে সেটুকু পর্যন্ত অভ্যেস রাখতে পারছে না, এমন লোকই নেই যার সঙ্গে দুটো হিন্দি বলবে। আর যা সব জ্ঞান আছে তার, সেগুলো তো গেলই চর্চার অভাবে। গবেট খেলারাম এমনই ছাত্র যে বাঁ বলতে ডান বোঝে। পড়তে বসে দশবার উঠে গিয়ে দোকানদারি করে আসছে। প্রতি ক্লাসে একবার দু-বার ঠেক খেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এরপরের চড়াই ঠেলে পার করা খুবই মুশকিল। তবু তার দাদু ভেলুরামের বড়ো ইচ্ছে যে খেলারাম বি কম পাস করে হিসেবের ব্যাপারটায় পাকা হয়ে আসুক। তাই শ্রীপতি মাঝে মাঝে ঠেস দিয়ে বলে, বুদ্ধি কম হলে কী আর বি কম হওয়া যায়?

শোভারাম খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করে—একা বসে আছেন, খেলাটা গেল কোথায়?

শ্রীপতি মুখটাকে খাট্টা করে বলে—কোথায় আর যাবে, বাকি বকেয়ার তাগাদায় বীরপাড়া না কোথায় গেছে শুনছি। আমার আটটা পর্যন্ত টাইম, ততক্ষণ বসে উঠে যাব।

সে তো ঠিক কথা। বলে শোভারাম বাপগিরি ফলিয়ে বলে—খেলারামটা লেখাপড়ায় কেমন মাস্টারজি?

শ্রীপতি বলে—কিছু হবে না।

শোভারাম শুনে খুশিই হয়। বলে—আমিও তাই বলি। ঝুটমুট ওর পিছনে পয়সা গচ্চা যাচ্ছে।

বলতে বলতে শোভারাম চারদিকে নজর করছে। হাতের কাছে সরাবার মতো কিছু নেই। শোভা তাই হাতের কাছে ক্যাশবাক্সটায় একটু তেরে কেটে তাক বাজায় অন্যমনে। বয়স কম হল না তার। পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। খেলারামেরও না হোক বাইশ-চব্বিশ হবে। এত বয়স পর্যন্ত এই গদিতেই কেটেছে তার। কাঠের দোতলার ওপর সে জন্মেছিল বিন্দি ধাইয়ের হাতে। এই বাজারের ধুলোয় পড়ে বড়ো হয়েছে। ভিতরবাগে একটা উঠোন আছে, সেখানে মা গন্ধেশ্বরী আচার রোদে দিত, পাঁপড় শুকিয়ে নিত। কিন্তু এখন সে এই গদিতে বাইরের লোক। বাপ যে এত অনাত্মীয় হতে পারে কে জানত!

সন্ধে পার হয়ে গেল। ইটখোলার দিক থেকে পশ্চিমা গানের আওয়াজ আসছে। সাঁঝবাজারে কিছু লোক নদীর মাছ কিনতে এসে বকবক করছে। তা ছাড়া বাজারটা এখন বেশ চুপচাপ। শীতটা সদ্য এসেছে, এবার জোর শীত পড়বে মনে হয়। গায়ের মোটা সুতির চাদরটা খুলে আবার ভালো করে জড়ায় শোভারাম। এইসব গায়ের বস্ত্র দিয়ে শীত আটকানোয় সে বিশ্বাসী নয়। শীত ঝেড়ে ফেলতে এক নম্বরির চাপানোর মতো আর কী আছে! না হয় একটা ছিলিম বোমভোলানাথ বলে টেনে বসে থাকো, মা গন্ধেশ্বরীর হাতে ঠেঙা খেয়ে চোর বেড়াল যেমন লাফিয়ে পালাত, শীতও তেমনি পালাবে।

বাপ ভেলুরামের নাগরা জুতোর শব্দ আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। সেটা শুনতে পেয়েই উঠে পড়ল শোভারাম। টালুমালু অসহায় চোখে চারদিকে আর একবার তাকায়। কিছুই হাতাবার নেই। পাথরপোতার এক ব্যাপারি বাংলা সাবান কিনতে এসে বসে ঢুলছিল। জুতো জোড়া ছেড়ে রেখেছে বেঞ্চির সামনে। বেশ জুতো—ঝাঁ চকচকে নতুন, না হোক ত্রিশ টাকা জোড়া হবে।

শোভারাম নিজের টায়ারের চটি আর পায়ে দিল না। দেখি না-দেখি না ভাব করে ব্যাপারির জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল। একটা কাঠের বড়ো মুখখোলা বাক্সে বিস্তর নোনতা বিস্কুটভরা প্লাস্টিকের প্যাকেট। যাওয়ার সময়ে হাতছিপ্পু করে দু-প্যাকেট তুলে চাদরের তলায় ভরে ফেলল। সেইসঙ্গে এক মুঠো তেজপাতা আর একগোলা বাংলা সাবানও। যা পাওয়া যায়।

বাপ ভেলুরামের সঙ্গে মুখোমুখিই পড়ে যেত শোভা। কিন্তু একটুর জন্য বেঁচে গেল। ভেলু এখন সবজিবাজারের কাছে দাঁড়িয়ে নদিয়ার সঙ্গে কথা বলছে। জবুথবু কয়েকজন সবজিওয়ালা টেমি জ্বেলে নিঝুম বসে আছে আলু কপি বেগুন সাজিয়ে। ব্যাবসা মানেই হচ্ছে বসে থাকা। তাই শোভারাম মানুষের ব্যাবসা করা দু-চোক্ষে দেখতে পারে না। নতুন জুতোজোড়া বেশ টাইট মারছে। কয়েক কদম হাঁটলেই ফোসকা পড়ে যাবে। শোভারাম খুঁড়িয়ে মেছোবাজারের দিকে অন্ধকারে সরে যায়।

চটিজোড়া এই নিয়ে আটবার ছিঁড়ল। বাজারের ও-প্রান্তে দোকান, এখনও বেশ খানিকটা দূর। নদিয়া ডানপায়ের চটিটা খুলে সবজিওয়ালার টেমির আলোয় দেখল। নতুন করে ছেঁড়েনি, রবারের নলি দুটো যেখানে ডিমসুতোয় বাঁধা ছিল সেই বাঁধনটাই ছিঁড়েছে। সুতোওয়ালারা আজকাল চোরের হদ্দ, এমন সব পচা সুতো ছেড়েছে বাজারে যে বাতাসের ভর সয় না। চটিটা আলোয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নদিয়া। না:, গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে আদ্দেক। আর এক জোড়া না কিনলেই নয়। জুতো-চটির যা দাম হয়েছে আজকাল। চটিটা ছেঁড়ায় ফের নিজেকে ভারি দুঃখী মানুষ বলে মনে হয় নদিয়ার। এ গঞ্জে তার মতো দুঃখী আর কে?

চামার সীতারামের দোকানটা সবজিবাজারের শেষে। দোকান না বলে সেটাকে গর্ত বলাই ভালো। একধারে লোহার আড়ত, অন্য ধারে ভুসিমালের দোকান। তার মাঝখানে বারান্দার নীচের দিকে একটা গর্ত মতো জায়গায় সীতারাম মুচির দোকান ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো। ছোটো চৌখুপিটার মধ্যে চারধারে কেবল জুতো আর জুতো। সবই পুরোনো জুতো। সামনের দিকে বাহার করার জন্য আবার জুতোর সারি ঝুলিয়ে রেখেছে সীতুয়া। তার বউ নেই, বালবাচ্চার কথাও ওঠে না। আছে কেবল পুরোনো জুতো। সেই জুতোর মধ্যেই সে দিনরাত শোয়-বসে, সেখানেই রান্না করে খায়। পেল্লায় বুড়ো হয়ে গেছে সীতুয়া, তবু এখনও গর্তের ভেতর থেকে শকুনের মতো তাকিয়ে খদ্দেরদের দেখে নেয়।

ছেঁড়া চটিটা নিয়ে দোকানের মধ্যে কুঁজো হয়ে মুখ বাড়াতে গিয়ে কপালে ঝুলন্ত কার না কার পুরোনো জুতোর একটা ধাক্কা খেল নদিয়া। এমন কপালে জুতোই মারতে হয়। ইচ্ছে করেই নদিয়া কপাল দিয়ে আর একবার ধাক্কা মারে ঝুলন্ত জুতোয়।

সীতুয়া ছেনির মতো যন্ত্র দিয়ে চামড়া কাটছে। কাঠের একটা ক্ষয়া টুকরোয় খসখস করে দু-চারবার ঘষে নিচ্ছে ছেনিটা। মুখ তুলতেই নদিয়া বলে—দ্যাখ বাবা, চটিটার একটা বন্দোবস্ত করতে পারিস কিনা।

নদিয়াকুমার ভালো খদ্দের নয়, সীতারাম জানে। তাই গম্ভীরভাবে হাতের কাজ শেষ করে একবার খইনির থুক ফেলে হাওয়াইটা হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে—এ তো ভিখমাঙ্গাদের চটি, আপনি কোথায় পেলেন এটা?

নদিয়া রেগে গিয়ে বলে—বড্ড বকিস বলেই চিরকাল এমন রয়ে গেলি সীতুয়া। দে দুটো সুতোর টান মেরে।

সীতারাম মাথা নেড়ে বলে—ফুটো হবে কোথায়? বিলকুল পচে গেছে রবার। ফিকে ফেলে দেন। নতুন কিনে নেন একজোড়া।

নদিয়া পকেটে হাত দিয়ে দেখল। জানা কথা পয়সা নেই। পকেটে থাকেও না কোনোদিন। খরচের ভয়ে নদিয়া পয়সা নিয়ে বেরোয় না। মিনতি করে বলল—দে বাবা সারিয়ে, দোকানে গিয়ে পাঁচটা পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সীতুয়া তার যন্ত্র দিয়ে চটির রবার ফুঁড়ে সুতোয় টান দিয়ে বলল—দেখবেন নদিয়াবাবু, জুতো মাথায় লেগে যাবে। অত ঝুঁকবেন না।

লাগবে কী, লেগেছে। নদিয়া বিরস মুখে বলে।

সীতুয়া মোষের শিঙের ফুটোয় যন্ত্রটা ঢুকিয়ে বের করে এনে ভুসভুসে রবার ফুটো করতে করতে বলে—বাবুলোকেরা মাথা নীচু করতে জানে না তো, তাই ওই সব জুতো তাঁদের কপালে লাগে।

এঃ, ব্যাটা ফিলজফার। বলে নদিয়া।

তারপর চটি পরে ফটাফট কাপ্তানের মতো হাঁটে।

দিনটাই খারাপ। খড়-কাটাই কলের সামনে নদিয়ার বউ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা আগে সহ্য হত না। আজকাল সয়ে গেছে। বউয়ের চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। মাথায় টেরিকাটা পুরুষমানুষের চুল, পরনে পাঞ্জাবি-ধুতি, পায়ে চপ্পল, বাঁহাতে ঘড়ি। দাড়িগোঁফ নেই বলে খুবই ডেঁপো ছোকরার মতো দেখতে লাগে। চেহারাটা মন্দ ছিল না মেয়েমানুষ থাকার কালে। বুকটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চেপে বেঁধে রাখে, তাই এখন আর মেয়েমানুষির চিহ্ন কিছু বোঝা যায় না।

বউকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নদিয়া। মুখটা অন্য ধারে ঘুরিয়ে নেয়। সেই ঘটনার পর বছর ঘুরে গেছে। একদিন মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখছিল নদিয়া। সময় খারাপ পড়লে মানুষ স্বপ্নটাও ভালো দেখে না। তো এই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই একটা লাথি খেয়ে জেগে উঠে বসে হাঁ করে রইল। তার বউ মন্দাকিনী তার নাম ধরে ডাকছে—ওঠ, ওঠ রে নদিয়া! নদিয়ার মুখের মধ্যে একটা মশা ঢুকে পিনপিন করছিল, সেটাকে গিলে ফেলে নদিয়া ফের হাঁ করে থাকে। দেখে, বউ মন্দাকিনী মস্ত কাঁচি দিয়ে চুল সব মুড়িয়ে কেটে ফেলেছে, ঘরের মেঝেময় মস্ত মস্ত লম্বা সাপের মতো চুলের গুচ্ছি পড়ে আছে। নদিয়া ধুতি পরেছে মালকোঁচা মেরে, গায়ে গেঞ্জি। তাকে জেগে উঠতে দেখে হাতের কাঁচিটা নেড়ে বলল—খবরদার, আজ থেকে আর আমাকে মেয়েমানুষ ভাববি না। মা কালী স্বপ্ন দিয়েছে, আজ থেকে আমি তাঁর সাধক। নদিয়া তেড়ে উঠে বউয়ের চুলের মুঠি ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু সে আর ধরা হল না। চুল পাবে কোথায় ধরার মতো? তা ছাড়া বড়ো কাঁচিটা এমনধারা ঘোরাচ্ছিল যে খুব কাছে যেতে নদিয়ার সাহস হয়নি। সেই থেকে তার বউ মন্দাকিনী পুরুষমানুষ মেরে গেল। বাড়িতে থাকে, নদিয়ার পয়সাতেই খায় পরে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। পড়শিরা ডাক্তার কবিরাজ করতে বলেছিল। সে অনেক খরচের ব্যাপার, তবু নদিয়া শশধর হোমিয়োপ্যাথকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু ওষুধ খাবে কে? সেই বড়ো কাঁচিটা অস্ত্র হিসেবে সবসময়ে কাছে কাছে রাখে মন্দাকিনী। কাছে যেতে গেলেই সেইটে তুলে তাড়া করে। এখন ওই যে খড়-কাটাই কলটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখনো ওর কোমরে পাঞ্জাবির আড়ালে কাঁচিটা গোঁজা আছে, নদিয়া জানে।

ব্যাটাছেলে মন্দাকিনীর দিকে যতদূর সম্ভব না তাকিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল নদিয়া। সময়টা খারাপ পড়েছে। সীতুয়া চামার পাঁচটা পয়সার খয়রাতিতে ফেলে দিল। এখন এই হাওয়াইটা যদি ফেলে দিতেই হয়, আর নতুন একজোড়া কিনতেই হয়, তো এ পাঁচটা পয়সা না হক খরচা হল।

এই নদিয়া! বউ ডাকল।

নদিয়া এক পলক তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল তবু। মন্দাকিনী ফের হেঁকে বলল—শুনে যা বলছি, নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

মেয়েমানুষের স্বভাব যাবে কোথায়! ঝগড়ার ভয় দেখাচ্ছে। তবু নদিয়া কান পাততে উৎসাহ পায় না। ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর নাকি মায়ের মন্দির তুলে দিতে হবে, মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়েছে। প্রায়ই হয়। এসব কথা কানে তোলে কোন আহাম্মক!

মন্দাকিনী পেছন থেকে এসে পিরান টেনে ধরল, ঘন ঘন শ্বাস ফেলে বলল—তোরটা খাবে কে শুনি! ছেলে নেই, পুলে নেই, নিব্বংশ হারামজাদা, কবে থেকে মায়ের মন্দিরের জন্য দশ হাজার টাকা চেয়ে রেখেছি! রক্তবমি হয়ে মরবি যে।

ফস করে নদিয়ার মাথায় বুদ্ধি আসে। বাঁই করে ঘুরে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে—ছেলেপুলে নেই তো কী! হবে।

হবে? ভারি অবাক হয় মন্দাকিনী। কাঁচির জন্যই বুঝি কোমরে হাত চালিয়ে দেয়।

আলবাত হবে। সদরে মেয়ে দেখে এসেছি। বৈশাখে বিয়ে করব। দেখিস তখন হয় কি না হয়! তোর মতো বাঁজা কিনা সবাই!

এত অবাক হয় মন্দাকিনী যে আর বলার নয়। কাঁচিটা টেনে বার করতে পর্যন্ত পারে না। তার মুঠি আলগা হয়ে নদিয়ার পিরানের কোণটা খসে যায়। আর নদিয়া চটি ফটফটিয়ে হাঁটে।

না, নদিয়ার মতো দুঃখী আর নেই। দোকানে এসে ভেলুর অপদার্থ ছেলে শোভারাম চায়ের ভাঁড় হাতে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখেই নিজের দুঃখের ব্যাপকতা বুঝতে পারে নদিয়া। ওই যে চায়ের ভাঁড়, ওর দাম কখনো উশুল হবে না। গঞ্জের একনম্বর হেক্কোড় হল ওই শোভারাম। খাবে, খাতায়ও লেখাবে, কিন্তু কোনোদিন দাম শুধবে না। বেশি কিছু বলাও যায় না, কবে রাতবিরেতে এসে দলবল নিয়ে চড়াও হয়।

বাবাকেলে পুরোনো তুষের চাদরটা গা থেকে খুলে সযত্নে ভাঁজ করে রাখল নদিয়া। পা ধুয়ে এসে ছোট্ট চৌকির ওপর বিছানায় ক্যাশবাক্স নিয়ে বসল। টিকে ধরিয়ে পেতলের ধূপদানিতে ধোঁয়া করে অনেকক্ষণ গণেশবাবাকে প্রণাম ঠুকল। দুনিয়ার সব মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি হোক বাবা।

শীতে খদ্দের বেশি ভেড়ে না। দোকান ফাঁকাই।

নদিয়া ভারি দুঃখী মানুষ। ঠাকুর পেন্নাম ভালো করে শেষও হয়নি, শোভারামটা চটির খোঁটা দিল—ই কিগো, নদিয়াদা! তোমার চটির হালটা এরকম হল কবে? এ পরে বেড়াও নাকি? খবরদার রবারের চটি পোরো না, চোখ খারাপ হয়। আর ওই কুকুরে-খাওয়া চটি ভদ্রলোকে পরে?

শোভারামের পায়ে নতুন জুতো। নদিয়া আড়চোখে দেখে। বেশ বাহারি জুতো। চামড়ার ওপরে মাছের আঁশের মতো নকশা তোলা। রংটাও ভালো। নদিয়ারই সময় খারাপ পড়ে গেছে। শ্বাস ফেলে বলে—নতুন কিনলি বুঝি জুতো জোড়া?

শোভারাম বিস্তর রংঢং দেখিয়ে বলে—ঠিক কেনা নয় বটে! শোভারাম ভেবে-চিন্তেই বলে। কারণ, সে নিজের পয়সায় জুতো কিনেছে এটা নদিয়া বিশ্বাস নাও করতে পারে।

নদিয়া রসিকতা করে বলে— কিনিসনি! তবে কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পেলি? নাকি শেষ অবধি জুতো চুরি পর্যন্ত শুরু করেছিস।

অপমানটা হজম করে শোভারাম। কিন্তু লোক চরিয়েই সে খায়, খামোখা চটে লাভ কী! ভালোমানুষের মতো বলে—না গো নদিয়াদা, সেসব নয়। গেল হপ্তায় বৈরাগী মন্ডলের হয়ে সদরে একটা সাক্ষী দিয়ে এলাম। টায়ারের চটিটা ফেঁসে গিয়েছিল হোঁচট খেয়ে। তো বৈরাগী মন্ডল জুতো জোড়া কিনে দিল। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, মনে হচ্ছে এক সাইজ ছোটো কিনে ফেলেছি। বেদম টাইট হচ্ছে। দেখো তো, তোমার পায়ে লাগে কিনা—

বলে শোভা জুতো খুলে এগিয়ে দেয়। নদিয়া উদাস হয়ে বলে—লাগলেই কী! ওসব বাবুগিরি কী আমাদের পোষায়!

শোভারাম অভিমানভরে বলে—তুমি চিরকালটা একরকম রয়ে গেলে নদিয়াদা! তাই তো তোমার বউ ওরকম ধারা ব্যাটাছেলে হয়ে গেল। নাও তো, পরে দেখো! পায়ে লাগলে এমনিই দিয়ে দেব। ত্রিশ টাকায় কেনা, তা সে কত টাকা জলে যায়। পরে দেখো।

নদিয়া এবার একটু নড়ে। বলে—কত টাকা বললি?

শোভারাম হাসে, বলে—ত্রিশ টাকা। মূর্ছা যেয়ো না শুনে। ওর কমে আজকাল জুতো হয় না।

নদিয়া উঠে এল জুতো জোড়া পায়ে দিল। পাম্পশুর মতোই। কিন্তু ঠিক পাম্পশু নয়। বেশ নরম চামড়া। দু-চার পা হেঁটে দেখল নদিয়া। আরে বা! দিব্যি ফিট করেছে তো! এই শীতে পায়ে বড়ো কষ্ট। চামড়া ফেটে

হাঁ করে থাকে, ভেতরে ঘা, তাতে ধুলোময়লা ঢুকে নষ্ট হয়। তা ছাড়া পাথরকুচির রাস্তায়, অসমান জমিতে পা পড়লে হাওয়াই চটিতে কিছু আটকায় না, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। এই জুতোজোড়া পরেই নদিয়া টের পেল আরাম কাকে বলে। পায়ে গলিয়ে নিলেই পা দু-খানা ঘরবন্দি হয়ে গেল। ধুলোময়লা, পাথরকুচি কিংবা শীত কিছুই করতে পারবে না।

শোভারাম খুশি হয়ে বলে—বা: গো নদিয়াদা, জুতোজোড়া যেন তোমার জন্যই জন্মেছিল। আমাদের ছোটোলোকি পায়ে কী আর ওসব পোষায়! তুমিই রেখে দাও! আমি না হয় একজোড়া টায়ারের চটি কিনে নেব। বাজারের ওদিকে মহিন্দির টায়ারের চটির পাহাড় নিয়ে বসে আছে।

নদিয়া একটু দ্বিধা করে বলল—টায়ারের চটি কি সস্তা নাকি রে? হলে বরং আমিও একজোড়া—

আরে না না! শোভারাম মাথা নেড়ে বলে—সে বড়ো শক্ত জিনিস। তোমরা পায়ে দিলে ফোসকা পড়ে কেলেঙ্কারি হবে। কড়া আর জীবনে সারবে না। ওসব কুলিমজুরের জিনিস। তুমি এটাই রেখে দাও। যা হোক, দশ-বিশ টাকা দিয়ে দিয়ো, তোমার ধর্মে যা সয়।

সঙ্গে সঙ্গে নদিয়া জুতোজোড়া খুলে ফেলে বলে—ও বাবা, বলিস কী সব্বোনেশে কথা, ডাকাত কোথাকার! দশ-বিশ টাকা পায়ের পিছনে খরচ! আমি আট টাকার ধুতি পরি।

শোভারাম অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে নদিয়ার দিকে। তারপর খুব ধীরে বলে—তোমার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে নদিয়াদা। ফৌত হয়ে যাওয়ার আগে নিজের আত্মাটাকে একটু ঠাণ্ডা করো। খাও না, পরো না, ও কীরকম ধারা রুগি তুমি? দুনিয়ার কত কী আরামের জিনিস চমকাচ্ছে, তুমিই কেবল নিভে যাচ্ছ।

নদিয়া না না করে। আবার জুতোটা তার বড্ড ভালোও লেগে গেছে। ফের ছাড়া জুতো পায়ে পরে দেখে। বড়ো বাহার। আরামও কম কী! সেই কবে ছেলেবেলায় বাবা জুতো কিনে দিত, তখন পরেছে। নিজে রোজকার করতে নেমে আর বাবুগিরি হয়নি। বলল—দশ টাকা যে বড্ড বেজায় দাম চাইছিস রে!

দশ কী বলছ? বিশ টাকা না হয় পনেরোই দিয়ো। সেও মাগনাই হল প্রায়। নেহাত জুতোজোড়া আমার ছোটো হয়, আর তোমারও ফিট করে গেল। নইলে এখনও বাজার ঘুরলে বিশ-পঁচিশ টাকায় বেচতে পারি।

বারো টাকা দেব। ওই শেষ কথা। যা, ও মাসে নিবি।

হ্যা হ্যা করে হাসে শোভারাম। বলে—বারো? তার চেয়ে এমনিই নাও না! ভেলুরামের ব্যাটা অনেক টাকা দেখেছে, বুঝলে নদিয়াদা!

সবশেষে তেরো টাকায় রফা হল। তাতে অবশ্য শোভারামের এক তিলও ক্ষতি নেই। যত তাড়াতাড়ি মাল পাচার করা যায়। নইলে বাংলা সাবান কিনতে আসা দোকানদারটা বাজারময় হাল্লাচিল্লা ফেলে দেবে। নগদ তেরো টাকা নিয়ে শোভারাম অন্ধকারে সাঁত করে মিলিয়ে গেল।

নদিয়া জুতোজোড়া লুকিয়ে ফেলল চৌকির পাশের ছায়ায়। বলা যায় না, শোভারাম শালা চোরাই মাল যদি গছিয়ে থাকে তো ফ্যাসাদ হতে পারে। থাক একটু লুকোনো, নদিয়ার পায়ে দেখলে কেউ আর পরে সন্দেহ করতে পারবে না। দোকানের কর্মচারীটা ওদিকে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, সব শুনেছে কিনা কে জানে। নদিয়ার কোনো কাজই তো সহজপথে হয় না। সবই যেন কেমন রাহুগ্রস্ত। তার মতো দুঃখী ... নদিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আড়চোখে একবার জুতোজোড়া দেখে নেয়। মিটমিটিয়ে একটু হাসে। খুব দাঁও মারা গেছে। তবু তেরোটা টাকা...ভাবা যায় না। কর্মচারীটা আবার জুতো কেনার সাক্ষী থাকল না তো!

দুটো গেঁয়ো লোক এই সময়ে উত্তেজিতভাবে এসে দোকানে ঢুকল। রাজভোগ শিঙাড়া আর চায়ের অর্ডার দিয়ে খুব গরম স্বরে কথা বলতে লাগল। দু-জনের একজনের জুতো চুরি গেছে ভেলুরামের গদি থেকে। তাই নিয়ে আলোচনা। যার জুতো চুরি গেছে তারে পায়ে শোভারামের নোংরা টায়ারের চটিটা। কান খাড়া করে শুনছিল নদিয়া। যা ভেবেছিল তাই।

নদিয়ার মতো দুঃখী কমই আছে দুনিয়ায়। সে একটা শ্বাস ফেলে আড়চোখে জুতোজোড়া দেখে নিল। আছে।

শ্রীপতি সাড়ে সাতটায় উঠতে যাচ্ছিল, এ সময়ে দেখে, অন্ধকার ফুঁড়ে গরিলাটা গদিতে উঠে আসছে। বাইশ-তেইশ বছরের আই জোয়ান চেহারা, যেমন মাথায় উঁচু তেমনি পেল্লায় শরীর। এই হল তার ছাত্র খেলারাম।

চেহারা পেল্লায় হলে কী হবে, ইঁদুর যেমন বেড়ালকে ডরায়। তেমনি মাস্টারজিকে ভয় খায় খেলা। মাস্টারজি সটাং ফটাং ইংরিজি বোলি ছাড়ে, কষাকষ হিন্দি বলে, খেলা তার কিছু বোঝে না।

গরিলাটাকে দেখে ভারি বিরক্ত হয় শ্রীপতি। ঘড়ি দেখে বলে—মাই টাইম ইজ আপ খেলারাম। গুড নাইট।

গরিলাটা ভ্যাবলার মতো মুখ করে বলে—আজ্ঞে।

শ্রীপতি সন্দেহবশত বলে—কী বললাম বল তো।

খেলারাম গলার কম্ফর্টারটা খুলে ফেলে অসহায়ভাবে দাদুর দিকে তাকায়। ভেলুরাম গদির ওপর বসে ছানিপড়া চোখে নাতির দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলে—বল।

খেলারাম ঘামতে থাকে।

শ্রীপতি আনমনে বলে—কিছু হবে না।

গরিলাটার বাবা একটু আগে চোখের সামনে দিয়ে একজোড়া জুতো চুরি করে পালিয়ে গেল। একই তো রক্ত। মাথা নেড়ে শ্রীপতি বাজারের মধ্যে শীতের কুয়াশায় নেমে গেল। তার ভেতরে কত বিদ্যে গিজগিজ করছে, কাউকে দেওয়ার নেই।

আসতে আসতেই শুনল, দাদু ভেলুরাম নাতি খেলারামকে খুব ডাঁটছে—কোথায় সারাটা দিন লেগেছিলি চুহা কোথাকার! বীরপাড়া থেকে আসতে এত দেরি হয়! পঞ্চাশ টাকার মাস্টার বসে বসে চলে গেল! জুতোচোরের ব্যাটা!

বাজারটা এখন নিঝুম কুয়াশায় মাখা একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নাও উঠেছে। বাতাসে একটু আঁশটে গন্ধ পায় শ্রীপতি মেছোবাজার পেরোবার সময়ে। তখনও কিছু লোক নদীর টাটকা মাছ নিয়ে বেচবার জন্য বসে আছে কুপি জ্বালিয়ে। এইসব লোক শেলি-কীটস পড়েনি, শেকসপিয়রের নামও জানে না। ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রবি ঠাকুর কী বস্তু তা জানা নেই। আশ্চর্য, তবু বেশ বেঁচেবর্তে আছে। তবে কী ওসবই জীবনের বাহুল্য শৌখিনতা মাত্র। না হলেও চলে? সত্য বটে, একবার একজন অধ্যাপক শ্রীপতিকে বলেছিলেন—ইনফর্মেশন মানেই কিন্তু জ্ঞান নয়। যে লোকটা টকাটক নানা ইনফর্মেশন দিতে পারে তাকেই জ্ঞানী মনে কোরো না, যার উপলব্ধি নেই, দর্শন নেই, সে বিদ্যের বোঝা বয় বলদের মতো।

উপলব্ধির ব্যাপারটায় একটু কোথায় খাঁকতি আছে শ্রীপতির, এটা সে নিজেও টের পায়। এই যে গঞ্জের পরিবেশ, ওই ম্লান একটু কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না, কিংবা ফটিকচাঁদের ঢিবিতে একা শিরীষের যে সৌন্দর্য এসব থেকে সে কোনো মানসাঙ্ক কষতে পারে না। বাইরের জগৎটা থেকে সে রস আহরণ করতে পারে না বটে মৌমাছির মতো তবে সে বইয়ের জগতের তালেবর লোক। বিস্তর পড়াশোনা তার। তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ জন্মায়নি এখানে। লোকে তাকে ভয়ও খায়। তবু কী একটা খাঁকতি থেকেই যাচ্ছে। সে কী ওই উপলব্ধি বা দর্শনের?

বাজার পার হয়ে নিরিবিলি ফাঁকা জায়গা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, একটু উপলব্ধির ব্যায়াম করা দরকার। সে জেদ ধরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মতো চারধারের জ্যোৎস্নামাখা শীতার্ত প্রকৃতি থেকে সেই উপলব্ধির গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল।

হচ্ছে না। মনের পর্দায় কিছুই ভেসে ওঠে না যে!

পাঁচ-সাতটা লোক হাল্লা-চিল্লা করতে করতে কাছে এসে পড়ল। সব ক-টা মাতাল। শ্রীপতি কিছু বোঝবার আগেই দলটা থেকে খেলারামের বাপ দৌড়ে এসে পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলতে লাগল—রাম রাম

মাস্টারজি, আমার খেলারামকে জুতো চুরির ব্যাপারটা বলবেন না। বাপকে তাহলে নীচু-নজরে দেখবে খেলারাম। অনেক পড়িলিখিঅলা ব্যাটা আমার, আমি মুখ্যুর ঢিবি—

আহা, ছাড়ো ছাড়ো! বলে শ্রীপতি পা টেনে পিছিয়ে আসে।

বাতাস দূষিত করে মদের গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে শোভারাম বলে—এভাবে বাঁচা যায় মাস্টারজি? আমার বাপকে আর খেলারামকে একটু বলবেন, আমি সাফ-সুতেরো হয়ে গেছি। ভালো লোকের মতো থাকব, যদি আমাকে ফিরিয়ে নেয়।

নাকে রুমাল চেপে শ্রীপতি ঘাড় নাড়ল। পৃথিবীটা বড়োই পচা। দুর্গন্ধময়। এই পৃথিবী থেকে উপলব্ধি বা দর্শনের কিছু ছেঁকে নেওয়ার নেই। পুথিপত্রের মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর জগৎ।

লোকগুলো কোদাল গাঁইতি নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে শোভারাম হাতজোড় করে বলল—আশীর্বাদ করবেন মাস্টারজি। ফটিকচাঁদের ঢিবি খুঁড়তে যাচ্ছি আমরা, যেন কিছু পাই।

গম্ভীরভাবে শ্রীপতি বলে—হুঁ।

আজ পর্যন্ত বিস্তর হাঘরে ফটিকচাঁদের ঢিবিতে খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। সকলেরই আশা, সাতঘড়া মোহর আর বিস্তর হিরে-জহরত একদিন ওখান থেকে বেরোবেই। পেল্লায় ঢিবি, খুঁড়ে শেষ হয় না। আজ পর্যন্ত সাপ-ব্যাং আর ইট-পাথর ছাড়া কিছুই বেরোয়নি। তবু অভাব পড়লেই কিছু লোক গিয়ে ঢিবিটা খুঁড়তে লেগে যায়।

নদিয়াকুমার তার দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ফিরছিল নতুন জুতোজোড়া পুরোনো খবরের কাগজে জড়িয়ে র‍্যাপারের তলায় বগলসাই করে নিয়ে। পায়ের পুরোনো হাওয়াই চটাস-পটাস শব্দ করে বোধ হয় নদিয়াকেই গালমন্দ করছিল। করবেই। সময় খারাপ পড়লে সবাই করে ওরকম।

খুব একটা সাদাটে ভাব চারদিকে। কুয়াশায় জ্যোৎস্নায় যেন দুধে মুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। পাকা মর্তমানের মতো চাঁদ ঝুলছে আকাশে। পায়ের ফাটা জায়গাগুলোয় শীত সেঁধোচ্ছে। বাবাকেলে তুষের চাদরটায় মাথামুখ ঢেকে হাঁটছিল নদিয়াকুমার। চৌপথীর কাছে বাড়ি, মাঝপথে ফটিকচাঁদের ঢিপিতে কারা যেন গোপনে কী সব করছে। দু-চারটে ছায়া ছায়া লোকজন দেখা গেল। নদিয়া কদমের জোর বাড়ায়। কোমরের গেঁজেতে বিক্রিবাটার টাকা রয়েছে। দিনকাল ভালো নয়। কপালটাও খারাপ যাচ্ছে। কেবল মাঝে মাঝে নতুন জুতো জোড়ার কথা ভেবে এত দুঃখেও ফুকফাক করে সুখের হাসি হেসে ফেলছে নদিয়া। বেশ হয়েছে জুতোজোড়া। দিন দশ বাদ দিয়ে পরবে। চোরাই জুতো এর মধ্যে যদি খোঁজখবর হয় তো গেল তেরোটা টাকা। দামটা বেশিই পড়ে গেল। তবু জুতো একজোড়া দরকার। ভেলুরাম বলছিল বটে, বউকে জুতোতে হলেও তো একজোড়া জুতো লাগে। ছেঁড়া হাওয়াই চটি দিয়ে কী আর জুতোনো যায়?

বাড়ির দরজায় পৌঁছে ভয়ে আঁতকে ওঠে নদিয়াকুমার। কে একটা মেয়েছেলে ঘোমটা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের জবা গাছটার তলায়। মেয়েছেলে, নাকি ভূত-প্রেত? তার বাড়িতে আবার মেয়েছেলে কে আসবে?

নদিয়া বলল—রাম রাম, কে?

আমি।

নদিয়া ফের আঁতকে উঠে বলে—কে আমি?

আহা। বলে মেয়েছেলেটা এগিয়ে আসে তার কাছে। মুখে জ্যোৎস্না পড়েছে, ঊর্ধ্বমুখে তার পানে তাকাতেই ঘোমটা খসে গেল। পুরুষমানুষের মতো চুলওলা মাথাটা বেরিয়ে পড়ল।

'আঁ, আঁ' করে ওঠে নদিয়াকুমার। এ যে মন্দাকিনী!

তোমার এই সাজ? ভারি অবাক হয় নদিয়া।

মন্দাকিনী জ্যোৎস্নায় চোখের বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলে—কেন, আমি মেয়েমানুষ সাজলে তোমার খুব অসুবিধে হয় বুঝি! সদরের কোন ডাইনিকে পছন্দ করে এসেছ, তাকে বৈশাখে ঘরে এনে ঘটস্থাপনা করবে—তাতে বুঝি ছাই দিলাম। ঝ্যাঁটা মারি—

এইসব বলতে বলতে মন্দাকিনী প্রায় নদিয়ার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে আর কী টেনে-হেঁচড়ে। কিন্তু তাতে নদিয়া কিছু মনে করে না। কপালটা কী তবে ফিরল! নতুন জুতো! বউ!

গহিন রাতে মন্দাকিনী শান্ত হয়ে কাঁদতে বসল। তার আগে পর্যন্ত বিস্তর বাসন আছড়ে, বিছানা ছুড়ে, জামাকাপড় ফেলে রাগ দেখিয়েছে। নদিয়া খুব আহ্লাদের সঙ্গে দেখেছে। বছরটাক আগে তো এরকমই ছিল মন্দাকিনী। এইরকমই অশান্তি করত।

মন্দাকিনী কাঁদছে দেখে নদিয়া বলে—কাঁদো কেন? ঝাল তো অনেক ঝাড়লে। আমি বড়ো দুঃখী লোক, কেঁদো না।

মন্দাকিনী জলভরা চোখে কটাক্ষ হেনে বলে—আমি এখন চুল পাব কোথায়! কত লম্বা চুল ছিল আমার! তুমি কী এখন আর আমাকে ভালোবাসবে চুল ছাড়া!

দুর মাগি! নদিয়া আদর করে বলে—চুলে কী যায়-আসে!

ভোররাত পর্যন্ত সাত মাতালে ঢিবি খুঁড়ে পেল্লায় হাঁ করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কার কোদাল যেন ঠং করে লাগল পেতলের কলসি বা ঘড়ার গায়ে। দ্বিগুণ উদ্যমে সবাই খুঁড়তে লাগে আরও। হ্যাঁ, সকলের কোদালেই ঠনাঠন ধাতুখন্ডের আওয়াজ বেরোচ্ছে। জয় মা কালী। জয় মা দুর্গা। জয় দুর্গতিনাশিনী!

সাত মাতালের বুকের ভেতর জ্যোৎস্নার ভাসাভাসি। সাত মাতাল এলোপাতাড়ি কোদাল, গাঁইতি আর শাবল চালিয়ে যেতে লাগল। ভোর হতে আর দেরি নেই। শোভারাম আর তার স্যাঙাতদের রাতও বুঝি কেটে গেল।

বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে। অল্প অল্প মাটি সরে, আর বস্তুটা বেরোয়। কী এটা? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। তবে কড়া বা কলসি নয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বড়ো জিনিস। ফটিকচাঁদের বসতবাড়িটা নাকি?

খোঁড়াখুঁড়ি চলতেই থাকে। হাতে ফোসকা, গায়ে এই শীতেও সপসপে ঘাম। কেউ জিরোতে চাইছে না। নেশা কেটে গিয়ে অন্যরকম নেশা ধরে গেছে।

ভোরের আবছা আলোয় অবশেষে বস্তুটা দেখা গেল স্পষ্ট। সাত মাতাল চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে—একটা কবেকার পুরোনো রেলের মালগাড়ির পাঁজর আধখানা জেগে আছে মাটির ওপর; কবে বুঝি ডিরেইলড হয়ে পড়েছিল এখানে। জংধরা লোহা হলদে রং ধরেছে।

কেউ কোনো কথা বলল না। হেদিয়ে পড়েছে।

খুব ভোরে খেলারামকে তুলে পড়তে বসিয়েছে ভেলুরাম।

খেলা দুলেদুলে ইংরিজি পড়ছে।

গদির পাশ দিয়ে হা-ক্লান্ত, মাটিমাখা সাত মাতাল ফিরে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন শোভারাম, একটু দাঁড়িয়ে খেলারামের ইংরিজি পড়া শুনল। খুব জোর পড়ছে খেলা! ব্যাটা বোধ হয় ভদ্রলোক হবে একটা!

ভেবে এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে একটু হেসে ফেলল শোভারাম।

খবরের কাগজ

বলা হয় ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয় বলা হয়। বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয়। হয়েও শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাতে লাভ হয় না। শুধু জানা যায়, হয় যান্ত্রিক গোলযোগে নয়তো কারও অসাবধানতায় দুর্ঘটনা হয়েছিল। তাতে একটা মরা মানুষও বাঁচে না, একটা কাটা ঠ্যাংও জোড়া লাগে না। তবে মৃতের আত্মীয়স্বজনরা কেউ কেউ হয়তো ফাঁকতালে ক্ষতিপূরণবাবদ কিছু টাকা পেয়ে যায়।

যেমন পেয়েছিল গৌরী।

বন্যা কেন হল? ঝড় কেন হল? ক্যানসারের ওষুধ কবে বেরোবে? মহামারী কেন? আগুন কী করে লাগল? ছাদ কেন ধসে পড়ল? ভূমিকম্প কেন ঘটছে? খুন হল কেন? এইসব ভাবতে ভাবতে প্রত্যেকদিন শ্যামাচরণ একটু একটু বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে খবরের কাগজ তার বগলে। যখনই ফাঁক পায় তখনই খুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে।

নদীর ধারে বটতলায় সুশীতল গন্ধবণিক দোকান নিয়েছে। সেখানে গিয়ে বসলে নতুন ছাঁচবেড়ার গন্ধ নাকে আসে। মিষ্টি গন্ধটি। নদীর পাড়ে গায়ে গায়ে বাঁশ পুঁতে মাটি ফেলে কাঁচা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কাঠের পাটাতনের ঘাটে নৌকো এসে লাগে। বড়ো নৌকো, ছোটো নৌকো। মাল্লারা নৌকো ঘাটে বেঁধে উঠে আসে। মানুষজন মাল খালাস করে। আবার বোঝাইও হয়। ছোটো নৌকোয় দূর গ্রামগঞ্জের যাত্রীরা গিয়ে ওঠে। কারও মাথায় খোলা ছাতা। নদীর জলের আঁশটে গন্ধ আসে। হু হু বাতাসও।

সুশীতলের দোকানে বসে খবরের কাগজটা ভালো করে পড়া যায় না। বাতাসের চোটে বড়ো বড়ো পাতা ওলটপালট খায়। তা ছাড়া আছে কিছু বেহায়া লোক, খবরের কাগজ দেখলেই যারা হাত বাড়িয়ে বলে—কাগজটা একটু দেবেন, দেখব?

খবরের কাগজে শ্যামাচরণ যে কী খোঁজে তা সে নিজেও ভালো করে জানে না। কিন্তু প্রতিদিন আগাপাশতলা কাগজটা সে যখন খুঁটিয়ে পড়ে তখন তার মনটা যেন কিছু একটা খোঁজে।

গন্ধবণিকের দোকানে সাত গাঁয়ের লোক আসে। তাদের কেউ বা শ্যামাচরণের চেনা, কেউ আধচেনা, কেউ একেবারেই অচেনা। গঞ্জের বাজারে সকলের ট্যাঁকের টিকি বাঁধা। আলু সুপুরি ধান পাট যার যা আছে সব নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসে। ঘাটে খুব জটলা হয়। তারপর মানুষজন একটু দম নিতে ঘাটের দোকানে দোকানে গিয়ে বসে, চা খায়, গল্পসল্প করে, কাজ কারবারের খবর আদান-প্রদান হয়।

ঘাটের ধারে বসে থাকতে শ্যামাচরণের বেশ লাগে। এই বসে থাকতে থাকতেই কত লোকের সঙ্গে চেনা-জানা হয়ে যায়। কত নতুন নতুন খবর শোনে, অচেনা জায়গার বিবরণ পেয়ে যায়, নতুন সব চরিত্রকে জানা হয়। গন্ধবণিকের পো খাতিরও করে খুব। শ্যামাচরণ যে একসময়ে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ছিল তা বেশ মনে রেখেছে সুশীতল।

তবে সেসব কথা শ্যামাচরণ নিজেই ভুলে যায়। তার জীবনটা হল বসতি উঠে-যাওয়া গাঁয়ের মতো। সেখানে এককালে অনেক লোক গমগম করে বাস করত, এখন সব বাস-বসত তুলে নিয়ে গেছে। ফাঁকা।

গৌরী হল শ্যামাচরণের বড়ো মেয়ে। প্রথম পক্ষের। আরও দুটো ছেলে-মেয়ে আছে তার। তারা দ্বিতীয় পক্ষের। রেবন্ত হল তার একমাত্র ছেলে, ফরাশডাঙা কলেজের লেকচারার। ছেলে সেখানে বউ নিয়ে থাকে, কালেভদ্রে আসে, মাসান্তে পঁচাত্তরটা টাকা পাঠিয়ে খালাস। ছোটো মেয়ে পার্বতী তার স্বামীর সঙ্গে নবাবগঞ্জে থাকে। চিঠিটাও লেখে না।

বড়ো মেয়ে গৌরীরই যা একটু টান ছিল বাপের ওপর বরাবর। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন-তখন চলে আসত বাপকে দেখতে। বরকে লুকিয়ে টাকা পাঠাত বাবাকে। তিন সন্তানের মধ্যে গৌরীর ওপরে শ্যামাচরণের টান ছিল সবচেয়ে বেশি।

গৌরীর বর সোমনাথ ছিল পুলিশের এ এস আই। ছেলে হিসেবে ভালোই। অতি সুপুরুষ, সাহসী, সৎ। প্রাণে দয়ামায়া ছিল, ভক্তি ছিল। খড়গপুর লাইনে এক রাত্রে গাড়ি লাইন ছেড়ে মাঠে নেমে গেল। ছ-খানা বগি উলটে বিশজন মানুষ দলা পাকিয়ে একশা। সেই দলা-পাকানো মানুষের মধ্যে একজন ছিল সোমনাথ।

কিন্তু সোমনাথই কী? শ্যামাচরণের এই সন্দেহটা আজও যায়নি। সে ট্রেনে সোমনাথ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার লাশ শেষ পর্যন্ত কেউ শনাক্ত করতে পারেনি। একটা ভাঙাচোরা থ্যাঁতলানো লাশ তাদের হাতে সৎকারের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু সেই লাশটার নাকের বাঁপাশে কোনো আঁচিল ছিল না। অথচ সোমনাথ হলে আঁচিলটা থাকার কথা।

গৌরীকে কথাটা ভেঙে কোনোদিনই বলেনি শ্যামাচরণ। বলে দিলে গৌরী হয়তো খুব আশায় আবার বুক বাঁধবে। আসলে সে লাশটা না হোক, সেই দুর্ঘটনায় দলা-পাকানো অন্য লাশগুলোর মধ্যে একটা না একটা সোমনাথের হবেই। কারণ, বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই ফিরে আসত এতদিন। মরেই গেছে, তাই তার আঁচিলটার কথা শ্যামাচরণ তোলেনি।

গৌরী কিছু টাকা পেয়ে গেল। থোক কয়েক হাজার টাকা। সেই টাকা পেয়ে সোজা বাপের বাড়িতে উঠল এসে। সেই বছরই শ্যামাচরণের চাকরির এক্সটেনশন শেষ হয়ে গেল। নদীর ধারে এই বড়ো গঞ্জে চাকরির শেষ পাঁচ-ছ বছর কেটেছে, তাই এখানেই ছোটো মতো একটা বাড়ি সস্তায় পেয়ে কিনে ফেলেছিল সে। শেষজীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাবে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঠিক শ্যামাচরণের অবসরের জীবন শুরুর মুখে পাহাড়প্রমাণ ঝঞ্ঝাট বুকে করে গৌরী এল।

শ্যামাচরণের স্ত্রী গৌরীকে খুব ভালো চোখে দেখে না। দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে গৌরী বাপের ঘাড়ে ভর করেছে দেখে শ্যামাচরণের স্ত্রী ক্ষমা বড়ো মনমরা হয়ে গেল। সেই থেকে সংসারে শান্তি নেই। সৎমাকে ভয় খাওয়ার মেয়ে তো আর গৌরী নয়। সে পাঁচ কথা শোনাতে জানে। ক্ষমারও গলায় তেজ আছে।

তাই শ্যামাচরণ শোক ভুলে এখন বাড়ির বাইরেই থাকে বেশি। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে, নাতি-নাতনি নিয়ে কেটে যায়। আর জীবনের বড়ো সময়টা কাটে কী যেন একটা খুঁজে।

আজকাল অশান্তির ভয় তার পরিপূর্ণ হয়েছে। গৌরীর বয়স বেশি নয়। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বড়োজোর। চেহারাটা এখনও ঢলঢলে। এক নজরে তেইশ-চব্বিশের বেশি মনে হয় না। একে বয়সটা খুব নিরাপদ নয়, তার ওপরে সৎমায়ের সঙ্গে ঝগড়া। দুইয়ে মিলিয়ে মেয়েটার মধ্যে একটা খারাপ রোগ চেপেছে। রাজ্যের ছেলে-ছোকরাকে টলায়। তাদের মধ্যে একজন আছে কাদাপাড়ার ভুসির পাইকার বিনয় হালদারের মেজো ছেলে। ডানহাতে ঘড়ি বেঁধে মোটরবাইক হাঁকিয়ে যখন আসে, গৌরীর সঙ্গে হি-হি হো-হো আড্ডা মারে, ক্যারিয়ারে চাপিয়ে নিয়ে যায় এধার-ওধার। গঞ্জে ঢিঢি।

শ্যামাচরণ আজকাল নিজের সঙ্গেই কথা বলে বেশি, যখন কথা বলার আর লোক পায় না। বুড়ো মানুষের কথা শোনবার জন্য কেই-বা কাজ-কারবার ফেলে বসে থাকবে?

গঞ্জের ঘাটটা সেদিক দিয়ে বড়ো ভালো। নদীতে স্রোত আছে, জীবনটাও এখানে বেশ বয়ে যায়। কিন্তু গড়ায় না, থেমে থাকে না।

গোবিন্দনগর থেকে বেগুনের চাষি মফিজুল মাল গস্ত করতে এসেছে। চা খেতে খেতে বলল—এবার একদম জল হল না। পোকায় পোকায় সাড়ে সর্বনাশ।

'সাড়ে সর্বনাশ' কথাটা মফিজুলের নিজের। সর্বনাশের ওপর আরও কিছু বোঝায়।

সে জলের জন্য নয়। তুমিও যেমন, বাসন্তীর মাস্টারমশাই হরিপদ বলে—এ হল কেমিক্যাল সারের গুণ। যত সার তত পোকার উৎপাত। আবার পোকা মারতে ওষুধ কেনো। এসব হচ্ছে বড়ো ব্যাবসাদারদের কৌশল বুঝলে! সার দিয়ে পোকা জন্মাচ্ছে, আর সেই পোকা মারতে বিষও কেনা করাচ্ছে। দু-মুখো লাভ!

মফিজুল শ্যামাচরণের দিকে চেয়ে বলে—হাকিম সাহেব, কী বলেন?

শ্যামাচরণ কী আর বলবে? জগৎসংসারের খবর এখন আর সে তেমন রাখে না। যে যা বলে তাই হক কথা বলে মনে হয়। এমনকী আজকাল ভূতের গল্প শুনে 'হুঁ' দেয়, মনটা ওই একরকম ধারা হয়ে গেছে। সেই লাশটার মুখে আঁচিল ছিল না—একথাটা আজকাল বড়ো মনে পড়ে।

শ্যামাচরণ বসে চাষি সঙ্গীদের কথা শোনে, দু-চারটে কথা নিজেও বলে। বাদবাকি সময় খবরের কাগজ দেখে। তার বড়ো মনে হয়, কাগজে কী একটা খবর যেন বেরোবার কথা। মনে মনে সে কতকাল ধরে সেই খবরটার জন্য অপেক্ষা করছে। খবরটা বেরোচ্ছে না।

গন্ধবণিকের দোকান থেকে ভরদুপুরে ফিরছিল শ্যামাচরণ। চৌপথীতে কদমতলায় একপাল কেষ্ট দাঁড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করছে। তারা শ্যামাচরণকে দেখে গলাখাঁকারি দেয়। একটা বদমাশ ছেলে আওয়াজ দিল—গঙ্গারামকে পাত্র পেলে?

বিনয় হালদারের ছেলের নাম গঙ্গাপ্রসাদ। শ্যামাচরণ মাথাটা নামিয়ে জায়গাটা পার হয়ে যায়।

বাজারের মুখে বুড়ো নীলমণি দাসের সঙ্গে দেখা। নীলমণি লোকটা খুব আদর্শবাদী, স্বদেশি করত, একবার এম এল এ-ও হয়েছিল, শ্যামাচরণ হাকিম থাকবার সময় থেকে ভাব।

নীলমণি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—শ্যামা যে! কোনদিকে?

বাড়িই যাই।

সে যাবে। বাড়ি পালাবে না, কথা আছে।

শ্যামাচরণ কথা শুনতে উৎসাহ পায় না আজকাল। ভালো কথা তো কেউ বলে না। তাই নিরাসক্ত গলায় বলে—কীসের কথা?

নীলমণি গলা নামিয়ে বলে—আজও ওদের দেখলাম। ভটভটিয়ায় জোড়া বেঁধে কুঠিঘাটের দিকে যাচ্ছে। এই একটু আগে। ওদের যে কারও পরোয়া নেই দেখায়।

ওরা বলতে কারা তা শ্যামাচরণ জানে। তাই উদাসভাবে নীল আকাশের দিকে চেয়ে বলে—তা তো দেখছই। আমার আর কী করার আছে বলো? চাও তো বলো, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি একদিন।

আরে রাম রাম। তুমি ঝুলবে কেন? কিন্তু বিহিতের কথা ভেবেছ কিছু?

আমার মাথায় আজকাল কিছু আসে না।

আমি বিয়ের কথাও ভেবে দেখেছি, বুঝলে? কিন্তু তোমার মেয়ে তো বয়সেও ছোঁড়াটার চেয়ে বড়ো। তা ছাড়া হালদারমশাই তো খেপে আগুন হয়ে আছেই।

শ্যামাচরণ শ্বাস ফেলে বলে—সবই অদৃষ্ট। অকালে জামাইটা যে কেন—

বলেই শ্যামাচরণ ফের চমকে ওঠে। মনে পড়ে, লাশের মুখে সেই আঁচিলটা ছিল না। কথাটা আজও বলা হয়নি গৌরীকে। না বলাটা ঠিক হচ্ছে না।

কবে মরে-টরে যাবে শ্যামাচরণ, একটা সত্য কথা তার সঙ্গেই হাপিস হয়ে যাবে তাহলে।

নীলমণি কথা বলতে বলতে খানিক এগিয়ে দিল। সাবধানে রেললাইন পার হয়ে শ্যামাচরণ বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে। বগলে ভাঁজ-করা খবরের কাগজটা, বেশ কী একটা বলি বলি করে। কিন্তু কোনোদিনই বলে না, দুপুরে খাওয়ার পর আজ আবার খবরের কাগজটা তন্নতন্ন করে খুঁজবে শ্যামাচরণ। খবরটা থাকার কথা।

বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া সারতে বেলা চলে গেল। মেয়েটা এখনও বাড়ি ফেরেনি। নাতি-নাতনি দুটো স্কুল থেকে আসবে এখন। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে শ্যামাচরণ। বউ ক্ষমা এঁটোকাঁটা সেরে বিছানার একপাশে বসে বলে—আর তো মুখ দেখানো যাচ্ছে না।

ক্ষমার বয়স হয়েছে, সাধ-আহ্লাদ বড়ো একটা করেনি জীবনে। সংসারে জান বেটে দিচ্ছে বিয়ের পর থেকে। আজকাল শ্যামাচরণের বড়ো মায়া হয়।

ঘড়ি দেখে শ্যামাচরণ উঠে বসে বলে—হরিদ্বার যাবে?

যাহোক কোথাও চলো চলে যাই। তোমার আদরের মেয়ে সুখে থাক।

কে দেখবে ওকে?

আহা! দেখার ভাবনা! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে ওর। জামাই মরে গিয়েও তো কত টাকা হাতে এসেছে।

তা বটে। বলেই ফের সেই লাশের ভাঙাচোরা বিকৃত মুখ মনে পড়ে। আঁচিলটা ছিল না সেই মুখে। তবে কী—?

অনেক রাতে গৌরী পাশ ফিরতে গিয়ে জেগে ওঠে। কে যেন চাপাস্বরে ডাকল।

কে?

শ্যামাচরণ জানলার বাইরে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে। চাপাগলায় বলল—আমি তোর বাবা। শোন।

—বাবা! অবাক হয়ে বিছানা ছেড়ে গৌরী উঠে আসে, ওমা, তুমি বাইরে কেন? কী হয়েছে?

শ্যামাচরণের মুখ-চোখ জ্যোৎস্নায় অন্যরকম দেখায়। চোখের বসা কোল বাটির মতো, তাতে টুপটুপে ভরা অন্ধকার। চোখের তারা থেকে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করে।

শ্যামাচরণ বলে—তার মুখে সেই আঁচিলটা ছিল না।

কে? কার কথা বলছ?

শ্যামাচরণ বলে, বহুকাল ধরে চেপে-রাখা গোপন কথাটা বুক থেকে বেরিয়ে যায়।

গৌরী জানালার শিকটা চেপে ধরে। তারপর আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যায়।

পরদিন শ্যামাচরণ আবার গন্ধবণিকের দোকানে গিয়ে বসে। বিশাল নদীর ওপর ফুরফুর করে নীল আকাশ। নৌকো আসে, নৌকো যায়। ব্যাপারীদের হট্টরোল ওঠে চারধারে।

শ্যামাচরণ খবরের কাগজ খুলে তন্নতন্ন করে খবরটা খোঁজে। পায় না। ব্যাপারীরা এসে গল্প রাঙিয়ে তোলে। হাওয়া দেয়। চায়ের গন্ধের সঙ্গে নদীর আঁশটে গন্ধ গুলিয়ে ওঠে।

আজ সারাদিন গৌরী বেরোয়নি। কারও সঙ্গে দেখা করেনি। কথা বলেনি। সারাদিন শুধু ঘরে শুয়ে কেঁদেছে।

দুপুরে বাড়ি ফিরে শ্যামাচরণ একই খবর পেল। গৌরী নিজের ঘরে শুয়ে কাঁদছে।

শ্যামাচরণ কাউকে কিছু বলল না। ক্ষমা প্রশ্ন করে করে হাঁপিয়ে যায়।

খেয়ে উঠে শ্যামাচরণ খবরের কাগজটা গৌরীর ঘরের জানালা গলিয়ে ভেতরে ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বলে—সব খবর তো কাগজেই থাকে। রোজ দেখিস তো।

গৌরী প্রথমে কথা বলে না। কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে উঠে চোখ মুছে খবরের কাগজটা পড়তে থাকে। কেন পড়ে তা বুঝতে পারে না। জগৎটা সম্পর্কে আবার তার ভীষণ আগ্রহ জেগেছে।

শ্যামাচরণ বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ক্ষমাকে বলে—কাল থেকে একটা ইংরিজি খবরের কাগজও দিতে বোলো তো কাগজের ছেলেটাকে। কত খবর থাকে। একটা কাগজে সব পাওয়া যায় না।

উকিলের চিঠি

ও মিছরি, তোর নামে একটা উকিলের চিঠি এসেছে দেখগে যা। এই বলে মিছরির দাদা ঋতীশ টিয়ার ঝাঁক তাড়াতে খেতের মধ্যে নেমে গেল।

গোসাবা থেকে দুই নৌকো বোঝাই লোক এসেছে অসময়ে। লাট এলাকার ভেতর বাগে কোনো বিষয়কর্মে যাবে সব। এই অবেলায় তাদের জন্য খিচুড়ি চাপাতে বড়ো কাঠের উনুনটা ধরাতে বসেছিল মিছরি। কেঁপে উঠল। তার ভরন্ত যৌবন বয়স। মনটা সব সময়ে অন্যধারে থাকে, শরীরটা এই এখানে। আজকাল শরীরটা ভার লাগে তার। মনে হয়, ডানা নেই মানুষের।

উকিলের চিঠি শুনে যে উনুন ফেলে দৌড়োবে তার জো নেই। বাবা গুলিপাকানো চোখে দেখছে উঠোনের মাঝখানে চাটাইতে বসে। বড়ো অতিথিপরায়ণ লোক। মানুষজন এলে তার হাঁকডাকের সীমা থাকে না। তা ছাড়া দাদু, ঠাকুমা, মা, কাকা-জ্যাঠারা সব রয়েছে চারধারে। তাদের চোখ ভেতর-বার সব দেখতে পায়। উটকো লোকেদের মধ্যে কিছু বিপ্রবর্ণের লোক রয়েছে, তারা অন্যদের হাতে খাবে না। সে একটা বাঁচোয়া, রান্নাটা করতে হবে না তাদের। চাল-ডাল ওরাই ধুয়ে নিচ্ছে পুকুরে। বাঁকে করে দু-বালতি জল নিয়ে গেছে কামলারা। উনুনটা ধাঁধিয়ে উঠতেই মিছরি সরে গিয়ে আমগাছতলায় দাঁড়াল।

কালও বড্ড ঝড়-জল গেছে। ওই দক্ষিণধার থেকে ফৌজের মতো ঘোড়সওয়ার ঝড় আসে মাঠ কাঁপিয়ে। মেঘ দৌড়োয়, ডিমের মতো বড়ো বড়ো ফোঁটা চটাসফটাস ফাটে চারধারে। আজ সকালে দশ ঝুড়ি পাকা জাম, গুটিদশেক কচি তাল কুড়িয়ে আনা হয়েছে খেত থেকে। ঘরের চালের খড় জায়গায় জায়গায় ওলট-পালট। মাটির দেওয়াল জল টেনে ডোস হয়ে আছে, এখন চড়া রোদে শুকোচ্ছে সব। আমতলায় দাঁড়িয়ে মিছরি দেখে, ঋতীশ দাদা টিয়ার ঝাঁক উড়িয়ে দিল। ট্যাঁ ট্যাঁ ডাক ছেড়ে সবুজ পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। মনে হয়, মানুষের ডানা নেই।

যারা এসেছে তারা সব কেমনধারা লোক যেন! রোগা রোগা ভীতু ভীতু চেহারা, পেটে সব খোঁদল খোঁদল উপোসি ভাব। জুল জুল করে চারধারে চায় আর লজ্জায় আপনা থেকেই চোখ নামিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক এসে উনুনটায় দুটো মোটা কাঠ ঢুকিয়ে দিল, ফুলঝুরির মতো ছিটকে পড়ল আগুনের ফুলকি। একটা কাঠ টেনে আধপোড়া একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল লোকটা। এই গরমেও গায়ের ময়লা ঘেমো তেলচিটে গেঞ্জিটা খুলছে না, বুকের পাঁজর দেখা যাবে বলে বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে। তাকে দেখে হাসি পেল মিছরির।

সেই লোকটা চারধারে চেয়ে মিছরিকে দেখে কয়েক কদম বোকা পায়ে হেঁটে এসে বলল—আনাজপাতি কিছু পাওয়া যায় না?

খেত ভরতি আনাজ। অভাব কীসের? মিছরি বলল—এক্ষুনি এসে পড়বে। খেতে লোক নেমে গেছে আনাজ আনতে।

একটু হলুদ লাগবে, আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা। যদি হয় তো ফোড়নের জন্য একটু জিরে আর মেথি।

যদি হয়! যদি আবার হবে কী! খিচুড়ি রাঁধতে এসব তো লাগেই, সে কী আর গেরস্তরা জানে না! মা সব কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে।

লোকটার দিকে চেয়ে মিছরি বলল—সব দেওয়া হচ্ছে। ডাল-চালটা ধুয়ে আসুক।

লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকাল। খুব সংকোচের গলায় বলল—বেলা হয়েছে।

সেকথার মধ্যে একটা খিদের গন্ধ লুকিয়ে আছে। শত চেষ্টা করেও লোকটা খিদের ভাবটা লুকোতে পারছে না। গেঞ্জিতে ঢাকা হলেও ওর পাঁজরা দেখা যায়। কারা এরা? কোত্থেকে এল, কোথায়ই বা যাচ্ছে? ছোটো বোন চিনি যদিও মিছরির পিঠোপিঠি নয় তবু বোনে বোনে ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্ক। ফ্রকপরা চিনি তিনটে ব্যাং লাফ দিয়ে মশলার বারকোশ নিয়ে এসে ঠক করে উনুনের সামনে উঠোনে রেখে ঝুপসি চুল কপাল থেকে সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এই যে মশলা দিয়ে গেলাম কিন্তু। দেখো সব, নইলে চড়াই খেয়ে যাবে।

রোগা লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বারকোশটা নীচু হয়ে দেখল।

বলল—উরে ব্বাস, গরমমশলা ইস্তক। বা:, বা:, এ না হলে গেরস্ত।

চিনি দুটো নাচুনি পাক খেয়ে মিছরির ধারে এসে জিভ ভ্যাঙাল, বলল—যা দিদি, তোর নামে উকিলের চিঠি এসেছে। বড্ড মোকদ্দমায় পড়ে গেছিস ভাই। চিঠিটা ভিজিয়ে একটু জল খাস শোয়ার সময়, মিষ্টি লাগবে।

বলে নীচু ডালের একটা পাকা আম দু-বার লাফ দিয়ে পেড়ে ফেলল চিনি। শিঙে দিয়ে চুষতে চুষতে যেদিকে মন চায় চলে গেল।

উকিলের চিঠি বলে সবাই খ্যাপায়। আর মোকদ্দমাও বটে। এমন মোকদ্দমায় কেউ কখনো পড়েনি বুঝি।

ধীর পায়ে লাজুক মুখে মিছরি ঘরে আসে। এমনিতে কোনো লাজলজ্জার বালাই নেই। বাপের বাড়িতে হেসেখেলে সময় যায়। কিন্তু ওই চিঠি যেদিন আসে সেদিন যত লজ্জা। বরের চিঠিই যেন বর হয়ে আসে।

মিছরির বর উকিল।

ছোটোকাকা প্রায় সমানবয়সি। দাদা ঋতীশের চেয়েও ছ-মাসের ছোটো। আগে তাকে নাম ধরেই 'শ্যামা' বলে ডাকত মিছরি, নিজের বিয়ের সময় থেকে 'ছোটো কাকা' বলে ডাকে।

ছোটোকাকা মিছরির নাকের ডগায় দু-বার নীলচে খামখানা নাচিয়ে ফের সরিয়ে নিয়ে বলল—রোজ যে আমার কাপড় কাচতে খিটখিট করিস, আর করবি?

অন্য সময় হলে মিছরি বলত—করব, যাও যা খুশি করোগে।

এখন তা বলল না। একটু হেসে বলল—কাপড় কাচতে খিটখিট করব কেন, তোমার নস্যির রুমাল বাবু, ও কাচতে বড়ো ঘেন্না হয়।

ইঃ, ঘেন্না। যা তাহলে, চিঠি খুলে পড়ে সবাইকে শোনাব।

আচ্ছা, আচ্ছা, কাচব।

আর কী কী করবি সব বল এই বেলা। বউদি রান্না করে মরে, তুই একেবারে এগোস না, পাড়া বেড়াস। আর হবে সেরকম?

না।

দুপুরে আমার নাক ডাকলে আর চিমটি কাটবি?

মাইরি না।

মনে থাকে যেন! বলে ছোটোকাকা চিঠিটা শুঁকে বলল—এঃ, আবার সুগন্ধি মাখিয়েছে!

বলে কাকা চিঠিটা ফেলে দিল সামনে। পাখির মতো উড়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে মিছরি এক দৌড়ে বাগানে।

কত কষ্ট করে এতদূর মানুষ আসে, চিঠি আসে। রেলগাড়িতে ক্যানিং, তারপর লঞ্চে গোসাবা, তারপর নৌকোয় বিজয়নগরের ঘাট, তারপর হাঁটাপথ। কত দূর যে! কত যে ভীষণ দূর!

খামের ওপর একধারে বেগনে কালিতে রবার স্ট্যাম্প মারা। কালি জেবড়ে গেছে, তবু পড়া যায়—ফ্রম বসন্ত মিদ্দার, বি এ, এল এল বি অ্যাডভোকেট। আর বাংলায় মিছরির নাম-ঠিকানা লেখা অন্যধারে। রবার স্ট্যাম্পের জায়গায় বুঝি এক ফোঁটা গোলাপগন্ধী আতর ফেলেছিল, সুবাস বুক ভরে নিয়ে বড়ো যত্নে, যেন ব্যথা না লাগে এমনভাবে খামের মুখ ছিঁড়ল মিছরি। এ সময়টায় তাড়াতাড়ি করতে নেই। অনেক সময় নিয়ে, নরম হাতে, নরম চোখে সব করতে হয়। মা ডাকছে—ও মিছরি, আনাজ তুলতে বেলা গেল। লোকগুলোকে তাড়া দে, বিপিনটা কী আবার গ্যাঁজা টানতে বসে নাকি দেখ।

বড়ো বিরক্তি। লোকগুলোর সত্যি খিদে পেয়েছে। আকাশমুখো চেয়ে উঠোনে হাভাতের মতো বসে আছে সব। তাদের মধ্যে যারা একটু মাতব্বর তারা বাবুর সঙ্গে এক চাটাইতে বসে কথাবার্তা বলছে। রান্নার লোকটা বিশাল কড়া চাপিয়ে আধ সেরটাক তেল ঢেলে দিল।

মিছরি খেতে নেমে গিয়ে কুহুস্বরে ডাক দিল—বিপিনদা, তোমার হল? রান্না যে চেপে গেছে। অড়হর গাছের একটা সারির ওপাশ থেকে বিপিন বলে—বিশটা মদ্দ খাবে, কম তো লাগবে না। হুট বলতে হয়ে যায় নাকি! যাচ্ছি, বলো গে হয়ে এল।

মিছরি চিঠিটা খোলে। নীল, রুলটানা প্যাডের কাগজ। কাগজের ওপরে আবার বসন্ত মিদ্দার এবং তার ওকালতির কথা ছাপানো আছে। নিজের নাম ছাপা দেখতে লোকটা বড়ো ভালোবাসে।

হুট করে চিঠি পড়তে নেই। একটু থামো, চারদিক দেখো, খানিক অন্যমনে ভাবো, তারপর একটু একটু করে পড়ো, গেঁয়ো মানুষ যেমন করে বিস্কুট খায়, যত্নে ছোট্ট ছোট্ট কামড়ে।

চিঠি হাতে তাই মিছরি একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের মাঠে একটা ছোট্ট ডোবায় কে একজন কাদামাখা পা ধুতে নেমেছিল। জলে নাড়া পড়তেই কিলবিলিয়ে একশো জোঁক বেরিয়ে আসে। মিছরি দেখতে পায়, লোকটা মাঠে বসে পায়ের জোঁক ছাড়াচ্ছে। খেতের উঁচু মাটির দেওয়ালের ওপর কোন কায়দায় একটা গোরু উঠে পড়েছে কে জানে! এইবার বাগানের মধ্যে হড়াস করে নেমে আসবে।

নামুকগে। কত খাবে। বাগানভর্তি সবজি আর সবজি। অঢেল, অফুরন্ত। বিশ বিঘের খেত। খাক।

উকিল লিখেছে—হৃদয়াভ্যন্তরস্থিতেষু প্রাণপ্রতিমা আমার...। মাইরি, পারেও লোকটা শক্ত কথা লিখতে। লিখবে না! কত লেখাপড়া করেছে।

হু হু করে বুক চুপসে একটা শ্বাস বেরিয়ে যায় মিছরির। লোকটা কত লেখাপড়া করেছে তবু রোজগার নেই কপালে! এ কেমন লক্ষ্মীছাড়া কপাল তাদের!

উকিল লিখেছে—ঘুমিয়া জাগিয়া কত যে তোমাকে খুঁজি! একটু থমকে যায় মিছরি। কথাটা কী! ঘুমিয়া? ঘুমিয়া মানে তো কিছু হয় না। বোধ হয় তাড়াহুড়োয় ঘুমাইয়া লিখতে গিয়ে অমনটা হয়েছে। হোকগে, ওসব তো কত ভুল হয় মানুষের। ধরতে আছে?

ছ্যাঁক করে ফোড়ন পড়ল তেলে। হিং ভাজার গন্ধ। রান্নার লোকটা বুঝি কাকে বলল—এর মধ্যে একটু ঘি হলে আর কথা ছিল না।

জ্যাঠা বোধ হয় সান্ত্বনা দিয়ে বলল—হবে হবে। তা মিছরি, পাথরবাটিতে একটু ঘি দিয়ে যা দিকিনি!

মিছরি আর মিছরি! ও ছাড়া বুঝি কারও মুখে কথা নেই! মিছরি নড়ল না। চিঠি থেকে চোখ তুলে উদাসভাবে আকাশ দেখল। আবার একটা টিয়ার ঝাঁক আসছে গাং পেরিয়ে। আসুক।

ছোটোকাকার এক বন্ধু ছিল, ত্রম্বক। মিছরির বিয়ের আগে খুব আসত এ বাড়িতে। বিয়ের পর আর আসে না। কেন বলো তো! মিছরি উদাস চেয়ে থাকে। কোনোদিন মনের কথা কিছু বলেনি তাকে ত্রম্বক। কিন্তু খুব ঘন ঘন তার নাম ধরে ডাকত। সিগারেট ধরাতে দশবার আগুন চাইত।

কেন যে মনে পড়ল!

উকিল লিখেছে—ত্রিশ টাকার মধ্যে কলিকাতায় ঘর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজিয়াছি। মাঝে মাঝে ভাবি, বনগাঁ চলিয়া যাইব। সেখানে প্র্যাকটিসের সুবিধা হইতে পারে। বাসাও সস্তা।

তাই যদি যেতে হয় তো যাও। আমি আর পারি না। বিয়ের পর এক বছর চার মাস হল ঠিক ঠিক। আর কী পারা যায়, বলো উকিলবাবু। তোমার পাষাণ হৃদয়, তার ওপর পুরুষমানুষ, লাফঝাঁপ করে তোমাদের সময় কেটে যায়। আর আমি মেয়েমানুষ, লঙ্কাগাছে জল ঢেলে কী বেলা কাটে আমার, বলো? চোখের নোনাজলে নোনাগাং-এ জোয়ার ফেলে দিই রোজ। উকিলবাবু, পায়ে পড়ি...

খিচুড়িতে আলু, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, পটল সব ঢেলে দিয়ে রোগা বামুনটা আমগাছের তলায় জিরেন নিচ্ছে। গলার ময়লা মোটা পইতেটা বেরিয়ে গেঞ্জির ওপর ঝুলে আছে। বড্ড রোগা, ঘামে ভিজে গেছে তবু গেঞ্জি খোলেনি পাঁজর দেখা যাওয়ার লজ্জায়। বিড়ি ধরিয়ে ছোটোকাকাকে বলল—বউ আর ছেলেপিলেদের সোনারপুর ইস্টিশানে বসিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তারা সব ক-দিন ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাবে। ঠিক করেছি বাদার যেখানে পাব জমি দখল করে ঘর তুলে ফেলব আর চাষ ফেলে দেব। মশাই, কোনোখানে একটু ঠাঁই পেলুম না আমরা। বাঁচতে তো হবে, নাকি!

ছোটোকাকা বলে, কতদূর যাবেন? ওদিকে তো সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্ট আর নোনা জমি। বাঘেরও ভয় খুব। লোকটা বিড়ি টেনে হতাশ গলায় বলে, আসতে আসতে এতদূর এসে পড়েছি, আর একটু যেতেই হবে। বাঘেরও খিদে, আমাদেরও খিদে, দু-জনাকেই বেঁচে থাকতে হবে তো।

উকিলবাবু আর কী লেখে? লেখে—সোনামণি, আমার তিনকুলে কেহ নাই, নইলে তোমাকে বাপের বাড়ি পড়িয়া থাকিতে হইত না। যাহা হউক, লিখি যে আর কয়দিন ধৈর্য ধরো। কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু হইবেই। ওকালতিতে পসার জমিতে সময় লাগে।

বুঝি তো উকিলবাবু, বুঝি। তোমার যেদিন পসার হবে ততদিন আমি থাকব তো বেঁচে! যদি মরে যাই, তবে তোমার লক্ষ্মীমন্ত ঘরে আর কোনো না কোনো পেতনি এসে আমার জায়গায় ডেঁড়েমুশে সংসার করবে। বালা বাজিয়ে হাওয়া খাবে, মাছের মুড়ো চিবোবে, গাল ভরতি পান খেয়ে রুপোর বাটায় পিক ফেলবে। ততদিন কী বাঁচব উকিলবাবু?

বিপিন কলাপাতা কেটে উঠোনে ফেলছে। ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে দলটার মধ্যে। ঝপাঝপ পাতা টেনে বসে পড়ল সব। বাঁহাতে সকলের পাঁচ-ছটা করে কাঁচালঙ্কা, পাতে একথাবা নুন। খিচুড়ি এখনও নামেনি। সবাই কাঁচালঙ্কা কামড়াচ্ছে নুন মেখে। ঝালে শিস দিচ্ছে।

উকিলবাবু কী লেখে আর? লেখে—বন্ধুর বাসায় আর কতদিন থাকা যায়? ভালো দেখায় না। ধারও অনেক হইয়া গেল। লজ্জার মাথা খাইয়া লিখি, কিছু টাকা যদি পারো...

গরম খিচুড়ি মুখে দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে জিভের যন্ত্রণায়। একজন বুড়ো বলে—আস্তে খা। ফুঁইয়ে ফুঁইয়ে ঠাণ্ডা করে নে।

উঃ, যা রেঁধেছ না হরিচরণ, লাট বাড়ির বাস ছেড়েছে।

মিছরি আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা হেলে গেছে। গাছতলায় আর ছায়া নেই। রোদের বড়ো তেজ।

দলের মাতব্বর জিজ্ঞেস করে মিছরির বাবাকে—ওদিকে কী কোনো আশা নেই মশাই? অ্যাঁ! এত কষ্ট করে এতদূর এলাম।

মিছরি ঘরে চলে আসে। চোখ জ্বালা করছে। বুকটায় বড়ো কষ্ট।

পড়ন্ত বেলায় মিছরি তার উকিলকে চিঠি লিখতে বসে—আশা হারাইও না। পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে...।

লড়াই

পালান আমাদের খেতে কাজ করে।

সে ভালো লোক কী মন্দ লোক তা বোঝা খুব মুশকিল। তবে সে জানে খুব ভালো মাঞ্জা দিতে, মাছের এক নম্বর চার তৈরি করতে, কাঠমিস্ত্রির কাজও তার বেশ জানা, আর পারে গভীর ভাঙা গলায় গেঁয়ো গান গাইতে।

পালান গাছের নারকেল চুরি করে বেচে দিয়ে আসে। নিশুতরাতে পুকুরে জাল ফেলে মাছ তুলে নিয়ে যায়, খেতের ফসল চুরি করে। কিন্তু ধরা পড়লেই দোষ স্বীকার করে পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। অনেক কাজের কাজি বলে তার হাসিটা বড়ো নির্দোষ আর সরল বলে দাদু তাকে তাড়ায় না।

আমাদের দিশি কুকুরটার নাম ‘ঘেউ’। ভারি তেজি কুকুর। মেজোকাকা যখন বিয়ে করে কাকিমাকে ঘরে আনলেন—বেশিদিনের কথা নয়—তখন কাকিমার বড়োলোক বাপের বাড়ি থেকে যেমন হাজার রকমের দামি জিনিস দিয়েছিল তেমনি আবার দুটো প্রাণীও দিয়েছিল সঙ্গে। এক প্রাণী হল এক যুবতি ঝি, তার নাম অধরা, অন্য প্রাণীটি হল ঘেউ।

ঘেউয়ের রং সাদা, চেহারা বিশাল আর চোখ রক্তবর্ণ। সে আসবার পর থেকে এ বাড়িতে বাইরের লোক আসা প্রায় বন্ধ। ঘেউ ডাকে কম কিন্তু কামড়ায় বেশি। সে আসার পর থেকে এ বাড়িতে অন্য বাড়ির ছেলেরা আসে না, অন্যের কুকুর-গোরু আসা বন্ধ। হাঁসমুরগি পর্যন্ত ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

মেজোকাকিমা বড়ো সুন্দরী। হাঁটু পর্যন্ত এক ঢাল চুল, দুধে-আলতা গায়ের রং, রূপকথার রাজকন্যের মতো চেহারা। তিনি আস্তে হাঁটেন, কম কথা বলেন, দুটো বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে চারধার দেখেন। জেঠিমা, মা, বড়োকাকিমা যখন উদয়াস্ত সংসারের কাজ করছেন তখন মেজোকাকিমা শুয়ে-বসে বই পড়ে সময় কাটান। তাঁর ছাড়া কাপড় অধরা কেচে মেলে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়, আলতা পরিয়ে দেয়। সবাই গোপনে বলে, নতুন বউ কারও বশ মানবে না।

তা হোক, তবু মেজোকাকিমাকে আমাদের বড়ো পছন্দ। তাঁর কাছে জিনিস কেনার পয়সা চাইলেই পাই। শিশুদের তিনি বড়ো ভালোবাসেন। প্রায়ই মিষ্টি কিনে এনে আমাদের খাওয়ান।

আমার দাদুর অনেক পয়সা। লোকে তাকে বিরাট ধনী বলে জানে। কিন্তু বড়োলোকদের মতো চালচলন দাদুর নয়। যেটুকু সময় ওকালতি করেন সেটুকু বাদ দিলে অন্য সময়ে তার হেঁটো ধুতি, খালি গা—আর হাতে হয় দা, নয়তো কোদাল কিংবা বেড়া বাধবার বাঁখারির গোছা। দাদু কখনো বিশ্রাম করতে ভালোবাসেন না। বলেন, বিশ্রাম এক ধরনের মৃত্যু। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার ঘণ্টা ঘুমোবে। বাকি সময়টায় কাজ করবে।

পালান আর ঘেউ দাদুর ছায়া হয়ে ঘোরে। বাড়িতে ধোপা বা নাপিত এলে ঘেউ তাদের তাড়া করবেই। তখন দাদু বা পালান তাকে ধমক দিলে তবেই ক্ষান্ত হয়। অন্য কারও ধমককে সে গ্রাহ্য করে না, এমনকী

মেজোকাকিমা বা অধরার ধমককেও নয়। তাই মেজোকাকিমা একদিন রাগ করে অধরাকে বললেন, বাপের বাড়িতে থাকতে ঘেউ আমার কত বাধ্য ছিল। এখন বেয়াড়া হয়েছে। অধরা, ওকে এখন থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবি।

মেজোকাকা কাকিমাকে বড়ো ভয় পেতেন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে প্রায়ই চোখে চোখে তাকাতে পারতেন না। কাকিমা তাঁকে শিকল কেনার কথা বলতে কাকা খুব মজবুত বিলেতি শেকল কিনে এনে দিলেন। ঘেউ বাঁধা পড়ল।

দাদু এসব টেরও পাননি। পরদিন বাগানে গিয়ে গাছপালার পরিচর্যার সময়ে একটু অবাক হয়ে চারপাশ দেখে বললেন, কুকুরটা কই রে?

পালান বলে, বাঁধা আছে দেখেছি।

বাঁধা? কে বাঁধল?

ওই খোঁচড় ঝিটাই বোধ হয়।

দাদু ডাকলেন, ঘেউ! কোথায় রে তুই?

মেজোকাকার ঘরের পেছনের বারান্দা থেকে এখন ঘেউয়ের করুণ আর্তনাদ আর শেকলের ঠুনঠুন শব্দ ভেসে এল। আর কী ভীষণ যে দাপাদাপি করতে লাগল সে। মেজোকাকিমা কঠিন স্বরে ঘেউকে বললেন, বেত খাবে এরপর।

ঘেউ চুপ করল।

দাদু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমরা আলায়-বালায় ঘুরি, অতশত খেয়াল করি না। তবু টের পেলাম, বাড়ির হাওয়ায় একটা থমথমে ভূতুড়ে ভাব।

সেবার পুজোর কিছু আগে মেজোকাকিমার বাপের বাড়ি থেকে তত্ত্ব এল। সে তত্ত্ব দেখে লোকে তাজ্জব। বিশাল বিশাল পেতলের পরাতে থরে-বিথরে সাজানো সব জিনিস। খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড়, গয়নাগাটি পর্যন্ত। কম করে পনেরোজন লোক বয়ে এনেছে, সঙ্গে আবার বল্লমধারী পাঁচজন পাইক।

সে তত্ত্ব দেখতে বিস্তর লোক জমা হয়েছিল। ঘেউ বাঁধা আছে বলে লোকে তখন আসতে সাহস পায়।

জীবজন্তু বা পোকামাকড় মারা দাদু খুব অপছন্দ করতেন। এমনকী সাপ পর্যন্ত মারা নিষেধ ছিল। আমাদের বাড়িতে বহুকাল ধরে একজোড়া গোখরো ঘুরে বেড়ায়। বাস্তুসাপ বলে তাদের আমরা খুব একটা ভয় পেতাম না। তারা যেখানে-সেখানে বিড়ে পাকিয়ে পড়ে থাকে। কখনো রোদ পোহায়, হাততালি দিলে চলে যায় ধীরে-সুস্থে।

এই সাপ দুটোকে ভয় পেতেন কাকিমা। মাঝে মাঝে রাগারাগি করে বলতেন, সাপকে কোনো বিশ্বাস আছে? এক্ষুনি এদের মেরে ফেলা দরকার।

তাঁর সে-কথায় কেউ কান দেয়নি। এমনকী মেজোকাকাও না। সবাই বিশ্বাস করত, সাপ দুটো এ বাড়ির পরম মঙ্গল করছে।

মেজোকাকিমার বাপের বাড়ির তত্ত্ব এসেছিল ঠিক দুপুরবেলায়, পুরুষমানুষ কেউ তখন বাড়িতে নেই। তত্ত্ববাহক লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বাড়ির মেয়েরা মহাব্যস্ত।

সেই সময়ে মেজোকাকিমা পাইকদের ডেকে বললেন, দুটো গোখরো সাপ আছে ও বাড়িতে। একটু আগেও উঠোনের পশ্চিম ধারে তুলসীঝাড়ের তলাকার গর্তে ঢুকতে দেখেছি ওদের। ও দুটোকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলো।

পাইকরা মহাবাধ্যের লোক। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিসোঁটা আর বল্লম বাগিয়ে উঠে পড়ল।

এক পাইক তুলসীঝাড়ের তলাকার গর্তে শাবল চালিয়ে মুখ বড়ো করে ফেলল। ভেতর থেকে ফোঁসফোঁসানির শব্দ আসছিল। ঠিক সেই সময়ে দৃশ্যটা দেখে বারান্দা থেকে ঘেউ বুকফাটা চিৎকার করে

দাপাদাপি শুরু করল। তার দুই চোখ লাল, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে, শেকলটা প্রায় সে ছেঁড়ে আর কী!

মেজোকাকিমা একটা লম্বা বেত নিয়ে এসে সপাটে কয়েক ঘা বসালেন ঘেউয়ের পিঠে। ঘেউ সে মার গ্রাহ্য করল না। উলটে শেকল প্রায় ছিঁড়ে মেজোকাকিমাকে কামড়াতে গেল।

পুকুরে নেমে পানা পরিষ্কার করছিল পালান। ঘেউয়ের চিৎকারে কী যেন বুঝতে পেরে উঠে এসে দাঁড়াল। বিশাল কালো চেহারা তার, কালো কাঁধে তখনও সবুজ কচুরিপানা লেগে আছে।

অবাক হয়ে সে তুলসীঝাড়ের কাছে পাইকদের কান্ড দেখে হঠাৎ দু-হাত তুলে ধেয়ে আসতে আসতে বলল, সর্বনাশ। সর্বনাশ!

মেজোকাকিমা তখন রাগে আগুন। পাইকদের চেঁচিয়ে বললেন, এ লোকটা মহাচোর। এটাকে ঠাণ্ডা করো তো। তারপর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও বাড়ি থেকে।

পালান একবার ঘুরে তাকাল মেজোকাকিমার দিকে। মনে হল, এক রাগি দৈত্য তাকিয়ে আছে সুন্দর রাজকন্যার দিকে।

পরমুহূর্তেই পালান লকড়ির ঘরে গিয়ে একটা প্রকান্ড লাঠি হাতে বেরিয়ে লাফিয়ে উঠোনে নামল।

ততক্ষণে অবশ্য পাইকরা একটা গোখরো সাপকে বল্লমে বিঁধে মেরে ফেলেছে। উঠোনে সাপটাকে শুইয়ে তারা অবাক হয়ে সাপটার বিশাল দৈর্ঘ্য দেখছিল। দু-জন পাইক ওদিকে শাবল আর বল্লমের খোঁচায় দ্বিতীয় সাপটাকেও জখম করে ফেলেছে।

এ সময়ে পালানের লাঠি তাদের একজনের কাঁধে পড়তেই লোকটা 'বাপ' বলে উঠোনে গড়িয়ে পড়ে। অন্য পাইকরা মুহূর্তের মধ্যে সজাগ হয়ে যে-যার অস্ত্র হাতে নেয়।

তারপর উঠোন জুড়ে এক বিশাল লড়াই বেধে যায়। একদিকে পালান একা, অন্যদিকে পাঁচজন পাইক সমেত পনেরোজন জোয়ান।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভীতু মেয়ে কমললতা গিয়ে হঠাৎ খুব সাহস করে ঘেউয়ের গলার বকলশ থেকে শেকলের হুকটা খুলে দিল। ঘেউয়ের সাদা শরীরটা আলোর ঝলকানির মতো উঠোনে ছুটে গেল।

সারাপাড়া জুড়ে বিশাল হাঙ্গামার গোলমাল ছড়িয়ে গেল। ভিড়ে ভিড়াক্কার। আমরা ছোটোরা সেই ভিড়ের পেছনে পড়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু বিকট গালাগাল আর চেঁচানি শুনতে পাচ্ছিলাম।

সব লড়াই-ই একসময়ে থামে। এটাও থামল। দেখি, ভিড়ের ভেতর চ্যাংদোলা করে পালানকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছে কিছু পাড়ার লোক। তার পেটে বুকে বল্লমের ফুটো, মাথায় রক্তের টুপি পরে আছে। ঘেউ মাটিতে পড়ে করুণ আর্তনাদ করছিল। অনেক চেষ্টাতেও সে কোমর আলগা করে দাঁড়াতে পারছিল না।

মানুষ কীভাবে যুদ্ধ জিতবে তার কোনো নিয়ম নেই। অনেক সময় মানুষ যুদ্ধে জিতেও হারে, আবার কখনো হেরেও জিতে যায়।

এই ঘটনার দু-মাস বাদে দেখা যেত, পালান আবার খেতের কাজে নেমেছে। তবে আগের মতো অতটা দৌড়ঝাঁপ গাছবাওয়া পারে না। ধীরে-সুস্থে টুকটুক করে কাজ করে বেড়ায়, দাদুর সঙ্গে ছায়া হয়ে লেগে থাকে।

ঘেউও আগের মতো নেই। তার একটা ঠ্যাং সব সময় উঁচু হয়ে থাকে। তিন ঠ্যাঙে সে নেংচে নেংচে ঘোরে দাদুর সঙ্গে।

দাদু নির্বিকার। সেই হেঁটো ধুতি, খালি গা আর হাতে সব সময়ে গৃহকর্মের নানা সরঞ্জাম।

মেজোকাকিমা তখন ঘোমটা টেনে খুব লজ্জানত বউয়ের মতো নানা কাজকর্ম করে বেড়ায়। জেঠিমা, মা, কাকিমাদের সঙ্গে একসঙ্গেই খায়, গল্প করে, হাসেও।

এখন অধরার বড়ো কাজ বেড়েছে। সামনে অগ্রহায়ণে পালানের সঙ্গে তার বিয়ে, পালানকে সেই জন্যে দাদু একটি জমি দিয়েছেন ঘর বাঁধতে, তাতে অবসর সময়ে ঝুড়ি দিয়ে মাটি ফেলতে হয় অধরাকে। ভিত

করে তারপর বাঁশবাখারি টিন দিয়ে ঘর উঠবে। বড়ো খাটুনি। মেজোকাকিমা তাকে যখন-তখন ডাকলে সে একটু বিরক্ত হয়ে বলে, বাবা রে বাবা, সব সময়ে তোমাদের কাজে মাথা দিলেই চলবে! আমার নিজের বুঝি কাজ নেই?

বাঘ

এইখান দিয়ে একটু আগে একটা বাঘ হেঁটে গেছে। নরম মাটিতে এখনও টাটকা পায়ের দাগ। বাতাস শুঁকলে একটু বোটকা গন্ধও। বাঘটা শুধু যে বেড়াতে বেরিয়েছিল, এমন নয়। ফেরার পথে বাজারও করে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ বুড়ো হরিচরণের একটা বাছুরও নিয়ে গেছে মাঠ থেকে। তাই কাদামাটিতে বড়ো বড়ো রক্তের চাপ পড়ে আছে। জেলির মতো জমে গেছে। হ্যাট মাথায় কয়েকজন হাফপ্যান্ট-পরা শিকারি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝোপেঝাড়ে। বিটাররা নদীর ধারের জঙ্গলের ওপাশ থেকে টিন, ঘণ্টা আর যা পেয়েছে সব বাজাতে বাজাতে আসছে। একজন পাইপ মুখে শিকারি বন্দুকটা ধাঁ করে মাঝখানটায় ভেঙে কার্তুজ পরীক্ষা করে নিল, তারপর ফড়াক করে আবার সোজা করল বন্দুক। সবাই তৈরি।

বাঘটা সেবার বেরোয়নি। কিন্তু বহুকাল আগের দেখা এই দৃশ্যটা আজও ভুলতে পারে না জোনাকিকুমার।

বাঘটা বেরোয়নি বলেই কি আজও এইরকম অপেক্ষা করছে সে?

মাঝদুপুরে আজ বৃষ্টি নামল। তারপরই হঠাৎ থেমে গেল। আবার নামল, আবার থেমে গেল। বৃষ্টির সঙ্গে তাল রেখে জোনাকিকুমারও এক-একবার এক-একটা বাড়ির সদরে বা লবিতে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং এইভাবে সে ময়দানের কাছে একটা আঠারোতলা অফিস বিল্ডিংয়ে পৌঁছেছে সীতানাথের সঙ্গে দেখা করবে বলে। দেখা হল না। সীতানাথ তেরোতলায় বসে। শুনল সে আজ ফুটবল খেলা দেখতে গেছে। জোনাকি একটু হতাশ আর নি:সঙ্গ বোধ করে। সীতানাথকে পেলে কদমের মেস-এ গিয়ে তাস পেটানো যেত। হল না। কিন্তু তেরোতলা থেকে একঝলক ময়দান দেখে সে বড়ো অবাক হয়ে গেল। এ বাড়িতে সীতানাথের অফিস সদ্য উঠে এসেছে, এই প্রথম সীতানাথের অফিসে এসেছে জোনাকি। তেরোতলা থেকে ময়দান সে আর কখনো দেখেনি। কী আশ্চর্য সবুজ! বিশ্বাস হয় না। কলকাতা নয়, ঠিক বিলেত বলে মনে হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা পর্যন্ত চেনা বলে মনে হয় না। নীচে চৌরঙ্গির রাস্তা, টিকিঅলা ট্রাম যাচ্ছে, ভোঁতা ডবলডেকার গাড়ি—সবই অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। ছিমছাম এক ইউরোপের শহর যেন। ময়দান এত সুন্দর জানা ছিল না তো!

জোনাকি আবার লিফটে নেমে এল। আগাগোড়া বাড়িটা এয়ারকণ্ডিশন করা, ভেজা গায়ে শীত করছিল। বেরোবার মুখে দেখল, ফের বৃষ্টি নেমেছে। নামুক। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই। এ ব্যাপারটা সে আজকাল মাঝে মাঝে টের পায়। কোথাও যাওয়ার নেই। এত কম লোকের সঙ্গে তার চেনাশোনা।

বছর দুই আগে তার একজন সুন্দরী প্রেমিকা ছিল, তিতির। দু-বছর আগে তিতিরের কাছে যাওয়ার ছিল। তখন ভোরে ঘুম ভাঙতেই মনে হত—তিতির। অফিস ছুটি হলেই মনে হত—তিতির। ছুটির দিন কাছে এলেই মন বলত—তিতির। তখন যাওয়ায় জায়গা ছিল। দু-বছর আগে তিতিরের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই জোনাকির জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ বৃষ্টি পড়ছে। গাছপালা, মানুষজন, চাষ-আবাদ সবই দেখতে হয় বৃষ্টিকেই। শেষ বর্ষায় সে তাই বকেয়া কাজ মিটিয়ে দিচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে অফিসের মুখটায়। তার মধ্যে জোনাকিও। তার কোনো জায়গার কথা মনে পড়ছে না, বৃষ্টির পর যেখানে গিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটানো যায়। তাই সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। বিটাররা বাজনা বাজাচ্ছে, শিকারিরা বন্দুক হাতে তৈরি। বাঘটা কী বেরোবে?

তা জীবনে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। জোনাকিরও বেরিয়েছিল। যে মফসসল শহরে সে বাঘ দেখতে শহরতলি ছাড়িয়ে নদীর ধারের গাঁয়ে গিয়েছিল, সেই শহরের একটা ইস্কুল থেকে সে স্কুল ফাইনালে দশম স্থান অধিকার করে। পড়াশুনোয় অবশ্য বরাবরই ভালো ছিল সে, ফার্স্ট হত ক্লাসে। পরীক্ষাও ভালোই দিয়েছিল। কিন্তু তা বলে দশম? নিজেই সে বড়ো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ঘটনার পর সবাই জোনাকির দিকে তাকাল ভালো করে। দারুণ জিনিস আছে তো ছেলেটার মধ্যে।

আর সেইটেই ছিল জোনাকির অস্বস্তির কারণ। তার ভেতরে যে তেমন কিছু নেই, এটা সে হাড়ে হাড়ে টের পেত। মুশকিল হল, একবার দশম হয়ে গেলে পরে আর রেজাল্ট খারাপ করা যায় না, লোকে হাসবে। তাই জোনাকি খুব খেটে আই এস-সি দিল। ফার্স্ট ডিভিশনটাও হল না। তারপর থেকে সে হাঁফ ছেড়ে সাদামাটা হয়ে গেল। বি এস-সি-তে পিয়োর ম্যাথাম্যাটিকস-এ সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেল, এম এস-সি পড়ল না। চাকরি পেয়ে করতে লাগল।

সেই টেনথ হওয়ার কথা ভাবলে আজকাল ভারি লজ্জা করে। কেন যে সে টেনথ হতে গেল! ওই একবার টেনথ হওয়ার ফলে সবাই পরবর্তী জোনাকিকে দেখে দুঃখ করে। বলে—তোমার ব্রিলিয়ান্ট ক্যারিয়ার হওয়ার কথা ছিল হে জোনাকি, এ তুমি কী হলে? এরকম দুঃখ মাঝে মাঝে জোনাকিরও হয়।

কেউ কেউ বলে সায়েন্স না পড়ে আর্টস পড়লেই জোনাকি ভালো করত। কিন্তু তা জোনাকির মনে হয় না। সে তো সেই আই এস-সি পড়ার সময় থেকেই বিস্তর খোঁজখবর রাখত। ই ইজ ইকুয়াল টু এস সি স্কোয়ার, আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত ইকুয়েশন পর্যন্ত জানা ছিল তার। এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু মাস টাইমস দি স্পিড অব লাইট স্কোয়ারড। ক-জন জানত তা? বি এস-সি বই থেকে সে অঙ্ক কষত ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে। তবু পারা গেল না। আসলে বোধ হয় জীবনে ওই একটাই ভুল করেছিল সে, স্কুল ফাইনালে দশম হয়ে। সেটা না হলে আজ কারও দুঃখ থাকত না। তার নিজেরও না।

যে চোখ-বাঁধা ম্যাজিশিয়ান এতক্ষণ এলোপাতাড়ি তির ছুড়ছিল মাটিতে, সে এবার তার খেলা থামিয়েছে। বৃষ্টি ধরল না। না ধরলেও ক্ষতি ছিল না। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই।

বেরোবার মুখে একজন বয়স্ক লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছিল। বলল—এরকম বৃষ্টির কোনো মানে হয়? বলুন তো?

জোনাকির মনে হয় মুখটা চেনা চেনা। সে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটা তার দিকে চেয়ে একটা চেনা-হাসি দিয়ে বলে—সীতানাথকে খুঁজতে এসেছিলেন? ওর ভীষণ ফুটবলের নেশা।

জোনাকি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে বলে—আপনি কি ওর অফিসে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছেন আমাকে, মনে নেই বোধ হয়। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি, সীতানাথের কাছে মাঝে মাঝে পুরোনো অফিসে আসতেন। তখন থেকেই চিনি। আপনি তো জোনাকি সেনগুপ্ত, স্কুল ফাইনালে—

আজ্ঞে হ্যাঁ। জোনাকি তাড়াতাড়ি বলে লোকটাকে কথা শেষ করতে দেয় না।

সীতানাথকে তো পেলেন না, এখন কোনদিকে যাবেন?

ভাবছি। বলে জোনাকি।

ভাবাভাবির আর কী? চলুন আমার বাসায় চলুন।

জোনাকি অবাক, বলে—আপনার বাসায়? লোকটা অমায়িক হেসে বলে—বেশিদূর নয়। বেকবাগান। আমার ছেলেমেয়েরা কখনো স্ট্যাণ্ড করা ছাত্র দেখেনি। আপনাকে দেখলে খুব ইমপেটাস পাবে। চলুন না,

সবাই খুব খুশি হব আমরা।
হঠাৎ জোনাকি রাজি হয়ে গেল, বলল—চলুন।

২

তিতিরের মাথায় নানারকম রান্নার পোকা ঘুরে বেড়ায়। যেমন আজ সন্ধেবেলা তিতির একটা অদ্ভুত রান্না করল, ডিমের সঙ্গে বেগুন দিয়ে ওমলেট। তার নাম দিল—ডিমবেগ। পাতলা করে কাটা বেগুনেরচাক ফেটানো ডিমে ভিজিয়ে ডোবাতেলে ভাজা। মন্দ নয় খেতে, একটা চোখে দেখল তিতির। তেলটা বড্ড বেশি লাগে।

ভেবে একটু ভ্রূ কোঁচকায় তিতির। বেশি তেলের ব্যাপারটা তাকে খোঁচা দেয়। বাস্তবিক এই তেল-টেল নিয়ে ভাবতে তার একদম ভালো লাগে না। ভাবার অবশ্য দরকার নেই। তার সংসারে অভাবের ছিটেফোঁটাও নেই, বরং সবই অঢেল আছে। আসছেও। কিন্তু তবু বেশি তেল লাগার ব্যাপারটা তাকে তার বাপের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানে এখনও তার আত্মীয়রা তেল, চাল ইত্যাদির ব্যাপারে বড়ো সতর্ক। সেই মানসিকতা আজও একটু রয়ে গেছে তিতিরের।

ফেটানো ডিম আর বেগুনের চাক সরিয়ে রেখে রান্না করার লোক চিত্তর দিকে তিতির তাকাল। সে রান্না করছে বলে চিত্ত এতক্ষণ সরে দাঁড়িয়ে অন্য কাজ সেরে নিচ্ছিল।

তিতির বলল—খাওয়ার সময় ওগুলো ভেজে দিয়ো।

চিত্ত ঘাড় নাড়ে। তিতির চলে আসে।

কী বিশাল এই ফ্ল্যাটবাড়িটা! হাঁটলে যেন জায়গা ফুরোয় না। এক লাখের কাছাকাছি দাম পড়ল ফ্ল্যাটটার। তার ওপরে মেইনটেনেন্স চার্জও অনেক পড়ে যায় প্রতি মাসে। এসব নিয়ে ভাবার কিছু নেই। তবু হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়—কতগুলো টাকা!

এ দেয়াল-ও দেয়াল জুড়ে জানলা। খুলে দিলে ঘরটা বারান্দা হয়ে যায়। সাততলার ওপর থেকে নীচের দিকে তাকায় তিতির। এত ওপরে থেকে অভ্যেস নেই তো। মাথা ঘোরে। জানলাগুলোয় কেন যে ছাই গ্রিল দেয়নি ওরা! অমিতও অবশ্য গ্রিল লাগাতে রাজি নয়, বলে—গ্রিল দিলে খাঁচার মতো হয়ে যাবে। কিন্তু তিতিরের ভয় করে। আকাশটা যেন হাত বাড়িয়ে রয়েছে। একতলা পর্যন্ত বিশাল শূন্যের ব্যবধান যেন ক্রমাগত জানলা দিয়ে তাকে ডাকে—এসো, লাফিয়ে পড়ো।

তিতির সরে আসে। লাফিয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। তার জীবনে কোনো দুঃখ আছে?

অমিত দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফেরার সময়ে একটা মস্ত টেলিভিশন সেট নিয়ে এসেছে। সামনের ঘরে সেটা রাখা, ওপরে পুতুল, ফুলদানি। এখনও অবশ্য টেলিভিশনের পর্দা অন্ধকার। কলকাতায় টিভি চালু হলে তারা দেখবে সেই আশায় আগে থেকে এনে রেখেছে অমিত। বিদেশ থেকে আনা কত কী তাদের ঘরে!

তিতিরের মুখখানা ছিল সুন্দর। বয়সকালে শরীরটা দেখনসই হয়েছিল। তার জোরেই না অসম্ভব ভালো পাত্র জুটে গেল তার! তিতির আয়না দেখল না, কিন্তু টিভি সেটের সামনে একটা গদির হেলানো চেয়ারে বসে নিজের মুখখানার কথা, সৌন্দর্যের কথা ভাবতে লাগল।

দু-বছর হয়ে গেল, অমিত এখনও ছেলেপুলে চাইছে না। কিন্তু পুরুষমানুষের ছেলেপুলের ঝোঁক থাকেই। কবে বলবে—তিতির, এবার ছেলে দাও।

যতদিন তা না চায় অমিত, ততদিন তিতির বেশ আছে।

না, খুব ভালো অবশ্য নেইও তিতির। ওই যে শিকহীন গ্রিলহীন মস্ত জানলাগুলি, ওগুলোকেই ভীষণ ভয় তার। দিনেরবেলায় রোদভরা আকাশ, রাতে আকাশভরা জ্যোৎস্না বা অন্ধকার, নক্ষত্ররাশি, হাওয়া সব কেমন হুহু করে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। ঘরটা যেন বাহির হয়ে যায়। একা থাকে তিতির। ওপরের ফ্ল্যাটে বা পাশের ফ্ল্যাটে কোনো শব্দই হয় না, কারও গলার স্বর কানে আসে না, নীচের রাস্তাটাও নির্জন—সেখান থেকে এত ওপরে কোনো শব্দ উঠে আসে না। আর ওই গভীর নিস্তব্ধতায় ওই খোলা জানলা দিয়ে হাতির মতো ঢুকে আসে বাইরেটা। ভীষণ হুহু করে ঘরদোর। হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে সব উলটে-পালটে দেখে, এঘর-ওঘর খুঁজে বেড়ায়, বলে—'খুব সুখী তুমি তিতির।'

সুখীই তিতির। শুধু ওই খোলা জানলাগুলোই তাকে দুঃখ দেয়। আগে ছেলেপুলে হোক, তখন অমিতকে বলবে গ্রিল দিতে। ছোটোখোকা হামাগুড়ি দেবে, হাঁটতে শিখবে, ডিং মেরে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি দেবে—মাগো, তখন যদি পড়ে যায়? খোকার জন্য তখন ঠিকই গ্রিল দিতে রাজি হবে অমিত। কিন্তু এসব বাড়িতে গ্রিল দেওয়ার নিয়ম আছে কিনা কে জানে! হয়তো কোম্পানি থেকে বলে দেবে যে, গ্রিল-ট্রিল চলবে না, তাতে বাড়ির সৌন্দর্য থাকে না। তখন ওই বাইরের হাতিটা চিড়িয়াখানার হাতির মতো জানলার ওপাশে আটকে থেকে শুঁড় দুলিয়ে বলবে—খুব সুখী তুমি তিতির!

তিতির উত্তর দেবে—হ্যাঁ হাতিভাই, আমি খুব সুখী। তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যেয়ো।

বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসে না। না আসাই স্বাভাবিক। ওরা আসতে ভয় পায়। সংকোচ বোধ করে। বড্ড বড়োলোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যে তিতিরের। সবসুদ্ধ তিন বোন তারা। তিতির ছোটো। বড়ো দুই দিদির ভালোই বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তারা এখন সূর্যের পাশে মাটির পিদিম হয়ে গেছে।

এসব ভাবতে বুকে একটু দুঃখ আর একটু সুখ, দুটি ঢেউ ভাঙে।

টুং করে কলিং বেল-এ পিয়ানোর একটা রিডের শব্দ ওঠে। রোজ এরকম শব্দ। দরজায় একটা কাচের চৌখুপি আছে। সেইটি দিয়ে দরজা খোলার আগে দেখে নেয় তিতির। হ্যাঁ, অমিত।

অমিত ঘরে আসে। আগে আগে দরজার কাছেই সর্বাঙ্গ দিয়ে চেপে ধরত তিতিরকে। মুখের সর্বত্র চুমু খেয়ে নিত। আজকাল খায় না। অত কী? রোজ তো খাচ্ছেই অন্য সময়ে।

অমিত ঘরে ঢুকে বলে—আজও?

তিতির চমকে বলে—কী?

তুমি ম্লানমুখী।

তিতির লজ্জা পেয়ে বলে—না। জানো, আমি না ওই জানলাগুলোর কথা ভাবছিলাম। বড্ড ভীষণ ফাঁকা।

ওঃ! আমি ভাবি, বুঝি তিতির তার কোনো পুরোনো প্রেমিকের কথা ভাবছে।

তিতির রাগ করে বলে—ভাবছি তো! সে এসে ওই জানলা দিয়ে ডাকে। একদিন ঠিক ঝাঁপ দেব।

অমিত একটু বেঁটে, কালো, একটু মোটাও। ইদানীং মেদ কমানোর জন্য স্লিমিং কোর্স নিচ্ছে। অফিসের পর সেখানে যায়। আলু, মিষ্টি খায় না। কত খাবার বানায় তিতির। ও খায় না। কেবল একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করে। ওর বেহিসেবি হলে চলে না। কত কাজ ওর!

আজ একটা নতুন খাবার করলাম মাথা খাটিয়ে।

কী?

ডিমবেগ। খেতে বসে দেখবে, আগে বলব না, কী দিয়ে তৈরি হয়েছে!

অমিত হেসে বলে—তোমার সেই নিরামিষ ডিমের কারিটা যেন কী দিয়ে করেছিলে?

কেন খারাপ হয়েছিল? ডিমের বাইরের সাদাটা করেছিলাম ছানা দিয়ে, আর ডালসেদ্ধ দিয়ে কুসুম।

বেশ হয়েছিল। তবে কিনা ওসব বেশি খেলে আমার আবার না ফ্যাট বাড়ে।

তা বলে না খেয়ে শরীর দুর্বল করে ফেলবে নাকি? ওসব চলবে না। ঘরভরতি এত খাবার, খায় কে বলো তো?

৩

ভদ্রলোকের নাম শচীন দাশগুপ্ত। ছেলেমেয়েদের সামনে জোনাকিকে দাঁড় করিয়ে তিনি বলেন—এই ইনি স্কুল ফাইনালে—

জোনাকি লজ্জা পায় আজও। বাঘটা একবার বেরিয়েছিল, তারপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জোনাকিকে শচীনবাবু তাঁর ঘরের সবচেয়ে ভালো চেয়ারে বসালেন, এমনভাবে বসালেন যাতে মুখে ভালোভাবে আলো পড়ে। তাঁর চার-পাঁচজন ধেড়ে ধেড়ে ছেলেমেয়ে হাঁ করে দেখছিল, গিন্নিও এলেন। এক বুড়ো আত্মীয় কেউ এসেছেন, তিনি বাক্যহারা। স্ট্যাণ্ড করা ছেলে। ইয়ার্কি নয়।

কেবল জোনাকিই জানে—এটা কত বড়ো ইয়ার্কি। তবু খারাপ লাগে না। শচীনবাবুর বড়ো মেয়েটি যুবতী। সে বেশ চেয়ে থাকতে জানে। জোনাকির খারাপ লাগছিল না।

বুড়ো আত্মীয়টি জিজ্ঞেস করেন—কী করেন?

চাকরি।

আহা, চাকরি করেন কেন? ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরা এডুকেশন লাইনে থাকলে ছাত্ররা কত কী শিখতে পারে! বড়ো চাকরির লোভে কত ভালো ছেলে নিজেকে নষ্ট করে, দেশও বঞ্চিত হয়।

আমি বড়ো চাকরি করি না। সামান্য কেরানি।

সে কী? বলে শচীনবাবুর আত্মীয় চেয়ে থাকেন।

শচীনবাবু একটু মলম লাগানোর চেষ্টা করে বলেন—তাতে কী? উনি টেনথ হয়েছিলেন সেটা কী তা বলে মুছে গেছে? বোর্ডের খাতায় তো আর নামটা মুছে ফেলেনি। যাকে বলে দশজনের একজন।

তা বটে। বলে আত্মীয়টি নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন বোধ হয়।

জোনাকির লজ্জা করছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারল, শচীনবাবুর মেজোছেলে তার মায়ের কাছে পয়সা নিয়ে দোকানে গেল খাবার আনতে। শচীনবাবুর বড়োমেয়ে জোনাকিকে একটুও অপছন্দ করছে না। কেবল আত্মীয়টি উঠে বললেন—চলি। রাত হল। কেউ তাকে থাকতে বলল না।

কথাবার্তা তেমন কিছু হল না। কী করে হবে, এদের সঙ্গে যে মোটেই পরিচয় নেই। তা ছাড়া টেনথ হওয়া ছেলে। মুখ ফসকে বেশি কথা বলা ভালোও দেখাবে না। মিষ্টি খেয়ে উঠে পড়ল জোনাকি।

শচীনবাবু আর তাঁর স্ত্রী বললেন—আবার আসবেন। খুব ভালো লাগল।

শচীনবাবুর বড়োমেয়ে নিমি আলাদা করে বলল—আসবেন কিন্তু। আগে খবর দেবেন, আমার বন্ধুরাও আসবে দেখতে।

জোনাকির বড়ো লজ্জা করছিল। বাঘটা মোটে একবার—

বেরিয়ে এসে জোনাকি দেখল, এখনো মোটেই রাত হয়নি। বাড়ি গিয়ে কিছু করার নেই। বাবা সাতসকালে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মা বড়োমেয়ের বাচ্চার জন্য কাঁথা সেলাই করছে। সাঁঝ-ঘুমোনি ছোটোবোনটা বিবিধ ভারতী চালিয়ে শুয়ে আছে। বড্ড ছোটো বাসা।

ওই বাসায় তিতিরকে মানাত না। তার চেয়ে বরং শচীনবাবুর বড়োমেয়েকে বেশ মানায়। ভাবতেই হঠাৎ চমকে ওঠে জোনাকি। তাই তো! শচীনবাবুরা দাশগুপ্ত না! পালটি ঘর। তবে কী শচীনবাবু ভেবেচিন্তে প্ল্যানমাফিক জোনাকিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে? আশ্চর্য নয়। হয়তো অফিসের গেটে তাকে দেখেই শচীনবাবুর মাথায় কল্পনাটা খেলে থাকবে। কেরানি হোক আর যা-ই হোক, এক সময়ের টেনথ হওয়া ছেলে তো!

ভাবতেও জোনাকির লজ্জা করছিল। এ হয় না। ওই টেনথ হওয়ার জন্যই এক-সময়ে তিতিরও তাকে পছন্দ করেছিল। পরে ভুল বুঝতে পারে। বাঘটা একবারই—

খুব একটা সুন্দর রাস্তা দিয়ে এখন হাঁটছে জোনাকি। এসব রাস্তায় তো বড়ো একটা আসা হয় না। চারদিকে বিশাল বিশাল নির্জন সব অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠেছে, আরও কিছু বাড়ির কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। হুশ করে একটা দুটো মোটরগাড়ি চলে যায়। আর কোনো শব্দ নেই। কারা থাকে এখানে? শিকারি, না বাঘ?

বৃষ্টি এল। উপায় কী, জোনাকি দৌড়ে গিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় উঠে পড়ল। আসলে দরজাও ঠিক নয়, মস্ত গ্যারেজ ঘরের ফাঁকা জায়গা। দারোয়ান বসে বৃষ্টি দেখছে আর খইনির থুতু ফেলছে। তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। জোনাকি দাঁড়িয়ে অজস্র ঝিকিয়ে-ওঠা অস্ত্রের মতো বৃষ্টির ধার দেখে। কিছু করার নেই। তবে অপেক্ষা করতে তার মন্দ লাগে না। কোথাও তো যাওয়ার নেই। সেই দু-বছর আগে, যখন তিতির ছিল, তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। তিতিরই তো একটা জায়গা। কত সুন্দর সব দৃশ্য ছিল তিতিরের নানা ভঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে।

সেই ভীতু বাঘটা কেন কোনোদিনই বেরিয়ে এল না? কেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ওইভাবেই লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ওইভাবেই লুকিয়ে থেকে সে কী মরে গিয়েছিল একদিন? কেন গর্জন করে বেরিয়ে আসেনি? সত্য বটে শিকারিরা ছিল, তাদের হাতে ছিল কার্তুজ-ভরা রাইফেল। কিন্তু এও তো সত্য যে ছিল অবারিত মাঠ, বিশাল পৃথিবীর মুক্তিও! সে উত্তাল গতিতে বেরিয়ে ছুটে চলে যেতে পারত, সেই মুক্তির দিকে। শিকারির গুলি কী সব বাঘের গায়ে লাগে। লাগলেই বা কী, তবু তো বুঝতে পারত, তার মৃত্যুও কারও কারও প্রয়োজন! তাই অত শিকারির আনাগোনা, অত সতর্ক দৃষ্টি, অত ক্যানেস্তারা পেটানো। কত গুরুত্ব তার!

একটা গাড়ি কেমন চমৎকার সবুজ। কী বিশাল তার চ্যাপটা আর সবুজ দেহখানি। গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকল। একজন লোক নেমে চলে গেল লিফটের দিকে। ফিরেও তাকাল না। হতে পারত জোনাকিও ওরকম। যদি কেবলমাত্র দশম হওয়াটুকু বজায় রাখতে পারত সে। কেন পারেনি, তা আর একবার ভাববার চেষ্টা করল সে। ভেবে দেখল, পারেনি বলেই পারেনি। বড্ড বেশি সচেতন হয়ে গিয়েছিল নিজের সম্পর্কে। মফসসলের স্কুলে এক গরিবের ছেলের অতটা হওয়ার কথা নয় তো! বড্ড বেশি পড়ত, তাতেই মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। কিংবা কী যে হয়েছিল এতদিন পর তা আর মনে পড়ে না।

যদি হত তবে জোনাকিকুমার আজ এরকম একটা মস্ত ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতে পারত, গাড়ি চালাত। তার বউ হত তিতির বা ওরকমই কেউ। খুব সুন্দর। এই বৃষ্টি-বাদলার পৃথিবীতে কেবলই পথ ছেড়ে উঠে এসে পরের দরজায় দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে বৃষ্টি দেখতে হত না। বেশ সুখেই থাকত এক সফল জোনাকিকুমার। নিমির মতো হাঘরে মেয়েরা তাদের তুচ্ছ ঘর-সংসারে তাকে ডাক দেওয়ার সাহসই পেত না।

এত বৃষ্টি! ঝড়ের হাওয়ায় সমুদ্র থেকে উঠে আসে মেঘ। পরতে পরতে আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। রাস্তায় প্রতিহত জলকণা উঠে চারদিক ঝাপসা করে দেয়। চেনা পথ ধুয়ে যায় বৃষ্টিতে, ঘরে ফেরার দিকচিহ্ন উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝড়। আজও মনে হয়, এই দুর্যোগেও কোথাও যাওয়ার নেই জোনাকির। এই তো বেশ দাঁড়িয়ে আছে। কেটে যাচ্ছে আসলে খানিকটা সময়। জোনাকির সময়ের অভাব নেই। সে যদি সফল জোনাকি হত তো থাকত। কত ব্যস্ততা, কত টেলিফোন, কত নানাজনের ডাক। সেসব নেই জোনাকির। মস্ত বাড়ির তলায় নীচু গ্যারাজ-ঘরে এই কেমন ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়ছে। অনেকগুলো গাড়ি চলে এল গ্যারেজ-ঘরে। কত গাড়ি! দারোয়ান উঠে আলো নেভাচ্ছে। এরপর দরজা বন্ধ করবে। তার আগে হয়তো বা চলে যেতে বলবে জোনাকিকে। সে বড়ো অপমান। এ বাড়িতে তার ঘর নেই ঠিকই, কিন্তু তা বলে কোনো জায়গা থেকে কেউ চলে যেতে বললে আজও অপমান বোধ করে সে।

জোনাকি তাই বৃষ্টিতেই নেমে এল। কী প্রবল ধারা! গায়ে ছ্যাঁক করে শীতের ছোঁয়া লাগল প্রথমে। তার ফাঁকা মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা ডুগডুগ করে বেজে উঠল। লক্ষ আঙুল দিয়ে বৃষ্টি তাকে চিহ্নিত করে বলতে থাকে—ছি: ছি: ছি: ছি:!

কোথাও যাওয়ার নেই। তবু যাওয়া থেকেই যায় মানুষের। কেন যে যায়! থেমে পড়লেই তো হয় মাঝপথে! কেন কেবল যেতেই হবে?

রাস্তায় লোকজন নেই। একা জোনাকি হেঁটে চলেছে। চোখ অন্ধ ও শ্রবণ বধির করে দিয়ে অনন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে যেতে থাকে। পোশাক চুপসে যায়। কাঁপুনি উঠে আসে শরীরে। ভিজে ভিজে হাঁটে জোনাকি। চারদিকে মেঘ ডাকছে। একটা বজ্রপাতের শব্দ হয়। জোনাকি একবার বলে—জানো না তো, তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার মধ্যে কীরকম আনন্দ আছে!

কাকে বলে কে জানে!

৪

ওগো শোনো, কী ভীষণ ঝড় উঠল। তিতির ভয়ের গলায় বলে।

তাকে বুকে টেনে নিয়ে অমিত বলে—ঝড়! তাতে কী? এ বাড়িতে কোনো ভয় নেই তো তিতির!

বড্ড হাওয়ার শব্দ হচ্ছে যে!

এত ওপরে একটু বেশি হাওয়া তো লাগবেই। কিছু ভয় নেই। আমার তো ইচ্ছে করে এই ঝড়ের মধ্যে বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে পড়ি। খোলা হাওয়া আর বৃষ্টির জল আমাকে ধুয়ে-মুছে দিক।

আহা।

সত্যিই। খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি তো যেতে দেবে না।

ভেলা

বিশশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের এক সকালে আচমকা কোকিলের ডাক শোনা গেল।

ধরিত্রী তার দুশো তলার ওপরকার ফ্ল্যাটের ঘরদোর পরিষ্কার করছিল। তার হাতে একটা টর্চের মতো ছোটো যন্ত্র। সুইচ টিপলে যন্ত্র থেকে একটা অত্যন্ত ফিকে বেগুনি প্রায় অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসে। সেই রশ্মি চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেললেই ঘর পরিষ্কার হয়ে যায়, জীবাণু থাকে না। ঘর জীবাণুমুক্ত করার পর দেয়ালে একটা সুইচ টিপল ধরিত্রী। কোনো শব্দ হল না, কিন্তু ছাদের গায়ে লাগানো মৌচাকের মতো একটা যন্ত্র জীবন্ত হয়ে উঠল ঠিকই। দুশো তলার ওপরে বদ্ধ ফ্ল্যাটে কোনো ধুলোবালি নেই। তবু ওই যন্ত্রটা তার প্রবল বায়বীয় প্রশ্বাসে ঘরের যাবতীয় সূক্ষ্ম ধুলোময়লা টেনে নিতে লাগল।

এইসব ঘরের কাজ শেষ করে ধরিত্রী তাদের খাওয়ার ঘরে এল। খাওয়ার ঘরের উত্তরদিকে দুটো দরজা। একটা দরজা ধরিত্রী হাত দিয়ে ছোঁয়ামাত্র সরে গেল দেয়ালের মধ্যে। ওপাশে অবিরল একটা কনভেয়ার বেল্ট বয়ে যাচ্ছে। খুব ধীর তার গতি। তার ওপর থরে থরে খাবার সাজানো। যা-খুশি তুলে নেওয়া যায়। একরাশ ডিম চলে গেল, এক ঢিবি মাখন, কিছু আপেল—একটার পর একটা। ধরিত্রী খুব বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে রইল। অন্তহীন খাবার বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনোটাই তার ছুঁতে ইচ্ছে করল না। দরজাটা বন্ধ করে সে দ্বিতীয় দরজাটা খুলল। দরজার ওপাশে অগাধ শূন্যতা, দুশো তলার ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত একটা ভারী বাতাস থম মেরে আছে। ধরিত্রী একটু ঝুঁকে চারদিকে তাকাল। জলে যেমন নৌকো ভাসে তেমনি বাতাসে ইতস্তত কিছু ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই বাতাসি ভেলার খুব একটা কাছ দিয়েই ভেসে যাচ্ছিল, তাতে এক বুড়ো হালের মতো একটা যন্ত্রের হাতল ধরে বসে আছে। লোকটা একবার ধরিত্রীর দিকে উদাস চোখে তাকাল। ধরিত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

লোকটা হাতলটায় সামান্য চাপ দিতেই ভেলাটা মুখ ঘুরিয়ে ভেসে এল ধরিত্রীর দিকে। ব্যাটারিচালিত ভেলাটায় কোনো শব্দ নেই। নি:শব্দে স্থির হয়ে হালকা ধাতুর তৈরি সাদা গোল লাইফ বেল্টের মতো দেখতে যানটি দরজার গায়ে লেগে রইল।

বুড়ো লোকটা কথা বলল না, ধরিত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসল মাত্র। খুব নিরাবেগ হাসি।

ধরিত্রী বলল—আমার কিছু ফুল দরকার। আসল ফুল।

লোকটা মাথা নাড়াল। তারপর একটু ভারী গলায় বলল—কোন ঋতুর ফুল?

ধরিত্রী একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল—এটা তো বসন্তকাল।

লোকটা মাথা নাড়ল—হ্যাঁ।

তাহলে বসন্তের ফুল। কিন্তু আসল ফুল, সিন্থেটিক নয়।

লোকটা হাসল। মাথা নাড়ল। বলল—আমি আসল ফুল জানি। আমি তো উনিশশো পঁচাত্তরের লোক।

ধরিত্রী সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে বলল—তাই নাকি! তাহলে তো বেশ পুরোনো হয়েছেন।

হ্যাঁ। লোকটা মাথা নেড়ে বলে—আমার চারবার মৃত্যু হয়েছে। আমার হৃদযন্ত্র, চোখ, ফুসফুস আর লিভার সব ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা। মেডিক্যাল বোর্ড থেকে নোটিশ দিয়েছে, আমার ব্রেনটাও এবার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হবে। যদি সেটা করতে হয় তবে আমার সব শৈশবস্মৃতি চলে যাবে। আশি-নব্বই বছর আগেকার কোনো কিছুই মনে থাকবে না। এমনকী আমার আত্মপরিচয় পর্যন্ত পালটে যাবে। আমি নতুন মানুষ হয়ে যাব।

ধরিত্রী একটু দুঃখিত হল। লোকটা ভাবপ্রবণ, তাই পুরোনো কথা সব ধরে রাখতে চায়। বলল—উপায় কী বলুন।

লোকটা মাথা নাড়ল, বলল—না, উপায় নেই। কিন্তু তখন আর আসল ফুল কাকে বলে তা বুঝতেই পারব না হয়তো। একঘণ্টার মধ্যেই ফুল পেয়ে যাবেন।

লোকটা হাতলটা বুকের কাছে ধরে চাপ দিল। ভেলাটা উল্কার মতো ছিটকে বাতাসে মিলিয়ে গেল। ধরিত্রী ঝুঁকে লোকটার গতিপথ লক্ষ করতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না। দরজায় কোনো চৌকাঠ বা হাতল নেই যে ধরবে। ভারসাম্য হারিয়ে পিছলে দরজার বাইরে শূন্যতায় পড়ে গেল। কিন্তু ভয়ের কিছু ছিল না। এখানে ভারী কৃত্রিম বাতাসে আর কমিয়ে রাখা মাধ্যাকর্ষণে কেউ খুব জোরে পড়ে না। ধরিত্রীও পড়ল না। মাত্র তার ফ্ল্যাট থেকে দু-তলা পর্যন্ত নীচে ধীরে ধীরে পড়ে গিয়েছিল সে। একটা বাতাসি ভেলা ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিল। এ ভেলায় একজন যুবক রয়েছে। সে একটু হেসে বলল—কী হয়েছিল?

ধরিত্রী হেসে বলল—হঠাৎ।

যুবকটি মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

ভেলাগুলো চমৎকার লাইফ-বেল্টের মতো দেখতে হলেও মাঝখানটা ফাঁকা নয়, সেখানে একটা বাটির মতো আধার লাগানো। আর চমৎকার নরম কুশনের তৈরি বসবার জায়গা। ধরিত্রী বসল। ভেলাটা ধীরে ধীরে তার ফ্ল্যাটের দরজায় তুলে দিল তাকে। আর তখনই ধরিত্রী কোকিলের ডাক শুনতে পেল। একটা-দুটো কোকিল ডাকছে। ধরিত্রী আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য দেখা যাচ্ছে, আকাশের নীল প্রতিভাত। কিন্তু সবই দেখা যাচ্ছে একটা অতিস্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসের ডোম-এর ভেতর দিয়ে। শহরের সিকি মাইল উঁচুতে ফাইবার গ্লাসের ঢাকনিটা রয়েছে। তাই বাইরের আবহাওয়া কিছুতেই বোঝা যায় না। ঝড়-বৃষ্টি টের পাওয়া যায় না। অবশ্য তবু চাঁদ, সূর্য, তারা দেখা যায়। সবই পরিস্রুত হয়ে আসে। কোনো ক্ষতিকারক মহাজাগতিক রশ্মি এখানে প্রবেশ করতে পারে না, কোনো চৌম্বক ঝড় অলক্ষ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। সব বড়ো শহরই ওই ফাইবার গ্লাসের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা।

তবু শীত বসন্ত সবই টের পাওয়া যায়। একটা পরোক্ষ আবহনিয়ন্ত্রক যন্ত্র দিয়ে শহরের আবহাওয়া যথাসাধ্য প্রাকৃতিক রাখা হয়। এমনকী বর্ষায় কখনো কখনো বৃষ্টিপাতও করানো হয়ে থাকে।

কোকিলের ডাক শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল ধরিত্রী। ভেলা থেকে নামতে গিয়েও একটু থমকে রইল সে। একটা কোকিল উড়ে এসে ভেলার ওপর বসেছে। ধরিত্রী হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। কোকিলটা মুখ তুলে তাকে বধির করে দিয়ে ডাকতে লাগল। ধরিত্রী পাখিটার দিকে চেয়ে হাসে। পলিথিন আর কৃত্রিম পশম দিয়ে তৈরি এইসব পাখির পেটে যন্ত্র, বুকে ব্যাটারি, মুখে খুদে স্পিকার বসানো। রিমোট কন্ট্রোল বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে এইসব পাখিকে ওড়ানো হয়, ডাকানো হয়। কারণ, অধিকাংশ পাখির প্রজাতিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবু মানুষকে প্রাকৃতিক স্পর্শ থেকে বঞ্চিত না রাখার জন্যই এইসব ব্যবস্থা। নীচের দিকে তাকালে দেখা যায় চমৎকার রাস্তাঘাটের পাশে গাছের সারি। পার্কে সবুজ ঘাস। ওখানে যে কিছু আসল গাছ নেই তা নয়। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শহরের যে ভিত তৈরি করতে হয়েছে তাতে গাছ জন্মানো দুষ্কর। তাই শতকরা নব্বই ভাগ গাছই কৃত্রিম। রবার পলিথিন বা ফাইবার গ্লাসের তৈরি। ঘাসও কৃত্রিম। তবু এক যান্ত্রিক কৌশলে ওইসব কৃত্রিম গাছে চমৎকার সব কৃত্রিম মরশুমি ফুল হয়। ফল ফলে। হুবহু আসলের মতো। সেইসব ফুল গন্ধময়, ফল সুস্বাদু। শহরে বসন্তকাল এল।

ভেলা ছেড়ে ধরিত্রী উঠে এল ঘরে। দরজা বন্ধ করে চলে এল শোয়ার ঘর পার হয়ে তাদের বসবার ঘরে। সেখানে চল্লিশ বছর বয়স্ক বিপুল নামে ব্যক্তিটি বসে আছে। তার মাথায় একটা হেডফোনের মতো যন্ত্র লাগানো। না, যন্ত্রটা কানে লাগাতে হয় না। একটা স্প্রিংয়ে ছোট্ট একটা পিন লাগানো, সেটা ডান কানের ওপরে মাথায় আলতোভাবে স্পর্শ করে থাকে। আর ওই পিনটা পৃথিবীর যাবতীয় খবরের তরঙ্গ মাথার ভেতরে নি:শব্দে সঞ্চার করে দিতে থাকে। যন্ত্রটার আসল নাম ইনফর্মেশন পিন, সংক্ষেপে ইন পিন। খবরের কাগজ পড়ে বা রেডিয়ো শুনে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। চোখ এবং কানকে অন্য কাজে ব্যস্ত রেখেও নি:শব্দে এবং বিনা আয়াসে, প্রায় অজান্তে মস্তিষ্কের কোষে সব খবর জমা হয়ে যায়। ইন পিন হচ্ছে ইন্দ্রিয়মুক্তির যন্ত্র। চোখ-কানকে মুক্ত রেখেই সব জানা যায়।

ধরিত্রীকে দেখে বিপুল যন্ত্রটা খুলে রাখল।

ধরিত্রী মৃদু গলায় বলল—আমি কিন্তু আসল ফুল আনতে ভেলা পাঠিয়েছি।

বিপুল কিছু অন্যমনস্ক ছিল, বলল—আসল ফুল! কেন?

বা:, আজ যে পনেরোই ফেব্রুয়ারি। আজ যে আমাদের—

এইটুকু বলল ধরিত্রী, আর বলল না। বিপুল বুঝল। ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে রইল ধরিত্রীর দিকে। তার চোখে-মুখে সব সময়ে একটা নিস্তব্ধ উত্তেজিত ভাব। বিপুল ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলে—ধরিত্রী, ভেলাওয়ালাকে বলোনি তো আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী।

ভয়ার্ত ধরিত্রী বলল—না না। তাই কী বলতে পারি! তারপর ধরিত্রী একটু চুপ করে থেকে বলে—অবশ্য লোকটা আসল ফুল চাই শুনে একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু ভয় নেই, এ লোকটার উনিশশো পঁচাত্তর সালে জন্ম। শরীরে অনেকগুলো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। এ লোকটা সন্দেহ করলেও ক্ষতিকর কিছু বলে বেড়াবে না। ও তো মানুষের বিয়ে দেখেছে এককালে। ওর মা-বাবারও বিয়ে হয়েছিল। হয়তো ওর নিজেরও।

বিপুল উত্তর দিল না। উঠে জানলার কাছে এল। জানলা প্রায় সব সময়েই খোলা থাকে। একটা দূরবিন তুলে বিপুল নীচেটা দেখতে লাগল। পার্কে কিছু নগ্ন নারী-পুরুষ এখানে-সেখানে বসে আছে। কাছেই বাচ্চারা খেলছে। একটি রমণী কেবলমাত্র একজোড়া স্কেটিং জুতোর মতো জুতো পায়ে চলে যাচ্ছে। ফুটপাথ চলন্ত। রমণীটি তবু সেই চলন্ত ফুটপাথের ওপর দিয়ে আরও জোরে যাচ্ছে। জুতো জোড়া ইলেকট্রনিক শক্তিতে চলে। রমণীটি হাসছে, চিৎকার করে পথচারীদের কী যেন বলছে! কী বলছে তা অবশ্য বিপুল জানে। ও বলছে—শরীর নেবে? শরীর! পার্কের কাছে এক প্রৌঢ় সেই রমণীটিকে ধরে পার্কের মধ্যে নিয়ে গেল। বিপুল দূরবিন রেখে ঘরের মধ্যে সরে এল।

উনিশশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এই যৌন-বিপ্লবের শুরু। প্রাচীনপন্থীরা এই মুক্তমিলনে বাধা দিতে চেয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছিল লড়াই। বিবাহের সঙ্গে বিবাহহীনতার। তারপর একখানা রাষ্ট্রযন্ত্র বিশশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ নিষিদ্ধ করলেন। পবিত্র যৌন-বিপ্লব স্বীকৃতি পেল ইতিহাসে। শুধু তাই নয়, নর-নারীর দীর্ঘকালীন একসঙ্গে বসবাসও কার্যত নিষিদ্ধ। কোনোখানে নর বা নারীর মধ্যে দখলদারি প্রবৃত্তি দেখলে তাকে শাস্তিদানের আওতায় আনারও চেষ্টা চলছে।

বিপুল বলল—আমরা দশ বছর একসঙ্গে আছি, না ধরিত্রী?

হ্যাঁ।

বিপুল একটা ছোট্ট বোতাম টিপল। বসবার ঘর আর শোয়ার ঘরের মাঝখানের অস্বচ্ছ কাচের পাতলা দেয়ালটা নি:শব্দে মিলিয়ে গেল মেঝের মধ্যে। ফলে দুই ঘর মিলে একটা বিশাল হলঘরের সৃষ্টি হল। বিপুল পায়চারি করতে লাগল। একবার থেমে বসবার ঘরের দেয়ালে একটা চৌখুপির মধ্যে বসানো ট্যাপ থেকে এক পাত্র গরম সবুজ চা ভরে নিল পেয়ালায়। খানিকটা খেল, বাকিটা মেঝেয় ফেলে দিল। ধরিত্রী প্রশ্বাস-যন্ত্রটা চালু করে দিতেই মেঝের তরলটুকু মিলিয়ে গেল। পায়চারি করতে করতে বিপুল বলে—তুমি যখন খাওয়ার ঘরে গিয়েছিল তখন এনকোয়ারি কমিশন থেকে একটা ফোন এসেছিল। ওরা জানতে চাইছে,

আমার এই ফ্ল্যাটে একজন মহিলা দশ বছর যাবৎ বাস করছে কেন। এটা প্রচন্ড বেআইনি। উপরন্তু ওরা যে পবিত্র যৌন-বিপ্লবের মাধ্যমে যৌনমুক্তি এনেছে, সেই আদর্শ এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে। ওদের নির্দেশ, আমরা যেন অবিলম্বে ভিন্ন হয়ে যাই।

ধরিত্রীর মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে বলল—তুমি ওদের বলোনি তো যে তুমি যৌন-বিপ্লবকে যৌনদাঙ্গা বলে আড়ালে বলে বেড়াও!

বিপুল ভ্রূ কুঁচকে বলে—না। তবে ওরা হয়তো কিছু গন্ধ পেয়েছে। ওরা আরও লক্ষ করেছে যে, তুমি আর আমি সব সময়েই জামা-কাপড় পরে বেরোই। ওরা এটাকেও ভালো চোখে দেখছে না। সম্ভবত ওরা শিগগিরই আসবে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক জানতে।

ধরিত্রী চুপ করে রইল।

জানলায় টোকা পড়তেই দুজনে ভয়ংকর চমকে ওঠে। তাকায়। খোলা জানলার বাইরে সাদা গোল ভেলাটা ভাসছে। একগোছা রজনিগন্ধা বুকে করে সেই বুড়ো লোকটা দাঁড়িয়ে হাসছে। ওরা তাকাতেই লোকটা ভেলা থেকে জানলায় পা রেখে ঘরের মধ্যে নেমে এল। ধরিত্রীর হাতে ফুলের গোছা দিয়ে বলল—আসল ফুল।

ধরিত্রী ফুলগুলো বুকে চেপে রইল। তারপর উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকল বিপুলের দিকে। বিপুল চিন্তিতভাবে ফুলগুলো দেখছিল।

বুড়ো দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটু হেসে বলল—কোনো বিপদ?

বিপুল মাথা নেড়ে বলে—আমরা দশ বছর একসঙ্গে আছি। তাই এনকোয়ারি কমিশন আসবে।

খুব খারাপ।

বলে বুড়ো চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোল। তারপর বিপুল আর ধরিত্রীর ঘরদোর ঘুরে-ফিরে দেখল একটু। কোনো খাটপালঙ্ক নেই। চেয়ার-টেবিল বা আসবাবও নেই বললেই হয়। দেয়ালের গায়ে গায়ে কিছু বোতাম ছাড়া কোনো যন্ত্রপাতি দেখা যায় না। অবশ্য বোতাম টিপলেই প্যানেলের ভেতর থেকে সব রকম যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আসে। আসবাবপত্রও। বসবার ঘরের এক কোণে কিছু কৃত্রিম ফুল সাজিয়ে রাখা। সে ফুল বাসি হয় না, তাতে চিরস্থায়ী গন্ধ। এমনকী সেই ফুলের আশপাশে খুদে ব্যাটারিচালিত গোটাকয়েক মৌমাছি আর একটা ফরমায়েশি সাদা প্রজাপতি অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলো ফুলের সঙ্গেই পাওয়া যায়। ওইসব ফুলের কীটপতঙ্গের আয়ু দীর্ঘ। ব্যাটারি ফুরোলে আবার চার্জ করে নেওয়া যায়। বুড়ো এইসব দেখছিল। হঠাৎ বলল—আমি জানি আপনারা স্বামী-স্ত্রী।

বিপুল বলল—চুপ। বোলো না।

ধরিত্রী খুব জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—বলবেই তো। আমি তোমার স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী। দশ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী।

বাইরে একটা কোকিল ডাকল। যন্ত্রের কোকিল। বুড়ো দু-জনের দিকে তাকাল। তারপর দু-জনের মাঝখানের শূন্যতার দিকে চেয়ে বলল—আমার মাথাটা একশো বছরের পুরোনো। খুব ধোঁয়াটে। তবু বলি দশ বছর আগে বিয়ে বেআইনি ছিল। মন্ত্র নেই, পুরুত নেই, রেজিস্ট্রার নেই, তবে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল কীভাবে?

হয়নি। বিপুল বলে।

হয়েছিল। ধরিত্রী চেঁচিয়ে বলল—আমরা ফুলের মালাবদল করেছিলাম, আর তুমি কয়েকটা সংস্কৃত মন্ত্র বলেছিলে, যেগুলোর অর্থ আমি বুঝিনি। কিন্তু তবু সেটা বিয়েই।

ধরিত্রী!

বিতর্ক শুনে বুড়ো মাথা চুলকোয়। বিড়বিড় করে বলে—আমার হৃদযন্ত্র নতুন, ফুসফুস নতুন, কিন্তু মাথাটা পুরোনো। বড্ড ধোঁয়াটে। কিছু বুঝতে পারছি না। তবে এভাবেও বিয়ে হতে পারে। আগে হত।

এখন হয় না! বিপুল বলল।

ধরিত্রী কথা বলতে পারল না। কিন্তু ফুলগুলি বুকে চেপে রইল। বিপুল তার দিকে চেয়ে বলল—ধরিত্রী, আমাদের কিছুই লুকিয়ে রাখা যাবে না। তার চেয়ে তুমি চলে যাও।

বুড়ো মাথা চুলকোচ্ছিল। বিড়বিড় করে বলল—আরও হয়তো পাঁচশো বছর এরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। বার বার শরীরের যন্ত্র বদলে দেবে। আমি সব ভুলে যাব। অন্য মানুষ, ফের অন্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। ভীষণ মুশকিল।

বুড়োর কথা কেউ শুনছিল না। বিপুল চেয়ে আছে ধরিত্রীর দিকে, ধরিত্রী বিপুলের দিকে।

জানলার বাইরে একটা লাল রঙের ভেলা এসে থেমেছে। ভেলার গায়ে লেখা—'অনুসন্ধান'। ভেলা থেকে চারজন লোক জানলা টপকে ভেতরে এল। এনকোয়ারি কমিশন।

বুড়ো সেই চারজনকে দেখে সরে এল জানলার কাছে। একটু কষ্টে নিজের ছোটো সাদা ভেলাটায় চড়ে বসল। তারপর ভেসে যেতে লাগল। মাথাটা বড্ড ধোঁয়াটে। অনেক কালের কথা জমে পাথর হয়ে আছে। শিগগিরই এই মাথাটা তার থাকবে না। একদম অন্য রকম হয়ে যাবে। বুড়ো ভাবল—আমাকে কোথাও চলে যেতেই হবে। এরা আমাকে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবে, যতদিন এদের খুশি। কিন্তু মরাটাও যে ভয়ংকর দরকার তা এরা কবে বুঝবে?

সেই রাতে বুড়ো একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখল। তার বাবা রাস্তা সমান করার রোলার চালাত। ঘট-ঘটাং করে প্রচন্ড শব্দে সেই রোলারটা পুরোনো পৃথিবীর রাস্তাঘাট সমান করত। বুড়ো দেখল, সেই রোলারটায় সে আবার চড়েছে। প্রচন্ড শব্দে সে রোলারটা চলছে। সামনে শূন্য প্রান্তর, মাঝখানে অফুরান মুক্তির মতো রাস্তা। পেছনে তাড়া করে আসছে বাতাসি-ভেলা, রকেট, সন্ধানী আলো, মৃত্যুরশ্মি।বুড়ো ডাকল—বাবা! রোলার চালাতে চালাতে বাবা একবার পিছু ফিরে চেয়ে বললেন—ভয় নেই! আমরা ওদের ছড়িয়ে যাব।

বুড়ো একটু হাসল, তারপর নিশ্চিন্তে চোখ বুজল।

হাওয়া-বন্দুক

দিন যায়। থাকে কথা।

মণিকার দিন যায়। কিন্তু কীভাবে যায় কেউ কী তা জানে? তার সুখের ধারণাও খুব বড়ো নয়, দুঃখের ধারণাও নয় বড়ো। ছোটো সুখ, ছোটো দুঃখে দিন তার কেটে যেত। বুকের মধ্যে প্রজাপতির মতো উড়ন্ত একটুখানি সুখ, বা ছোট্ট কাঁটার মতো একটু দুঃখ—এ তো থাকবেই। নইলে বেঁচে যে আছে তা বুঝবে কেমন করে মণিকা! কিন্তু সুখ-দুঃখের সেই ছোটো ধারণা ভেঙে, দুয়ার খুলে বিশাল পুরুষের মতো অচেনা দুঃখ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন লুঠেরার মতো দাবি করে সর্বস্ব, তখন সেই দুঃখ আকাশ বা সমুদ্রের মতো ভুবন-ব্যাপ্ত বিশালতার ধারণা নিয়ে আসে। মণিকার দুর্বল মাথায় তা যেন ধরে না।

গড়ের মাঠে শীতের মেলায় তারা হেঁটেছিল দুজনে। তখন টুকুন ছিল না। সঞ্জয়ের সঙ্গে তখনও তার বিয়ে হয়নি। চুরি-করা দুর্লভ বিকেলে তারা ওইরকম বেরোতে পারত। সঞ্জয় অফিস থেকে বেরিয়ে আসত, মণিকা পালাত কলেজ থেকে। একদিন তেমনি তারা গিয়েছিল শীতের মেলায়। মেলায় ছিল রঙিন আলো, সজ্জিত মানুষের ভিড়—নাগরদোলা, লক্ষ্যভেদের দোকান। ছিল ধুলো, শীতের বাতাস আর ছিল রোমহর্ষ। বিষণ্ণতা কোথাও ছিল না।

লক্ষ্যভেদের দোকানে চক্রাকারে সাজানো বেলুন, ঝুলন্ত খেলনা, বল, দোকানি ডাকছে—

প্রতি শট পাঁচ পয়সা, আসুন, হাতের টিপ দেখে নিন।

সঞ্জয় দাঁড়ায়।

মণিকা, হাতের টিপ দেখি?

মণিকা—কী হবে ছাই! হাতের টিপ দেখে!

দেখিই না, যদি অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করতে পারি।

তাহলে কী হবে?

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে কী যেন পেয়েছিল!

দ্রৌপদীকে।

আমিও পাব মণিকাকে।

পেয়ে তো গেছই। সবাই জানে আমাদের বিয়ে হবে।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, মণিকা, তোমাকে বড়ো সহজে পেয়ে গেছি আমি। ঠিক। ডুয়েল লড়তে হয়নি, যুদ্ধ করতে হয়নি, মা-বাবা বাধা দেয়নি। কিন্তু এত সহজে কিছু কি পাওয়া ভালো?

মণিকা ভ্রূ কুঁচকে বলে, ভালো নয়, তবে তুমি কি চাও তোমার আমার মধ্যে বাধাবিঘ্ন আসুক?

না না, তা নয়।

তবে কি তুমি আমাকে মোটেই চাও না আমি সহজলভ্যা বলে?

তাও নয়। তোমাকে চাই। কিন্তু এত সহজে নয়। সহজে কিছু পেলে মনে হয় পাওয়াটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। জয়ের আনন্দই আলাদা।

মণিকা হাসল, বলল—তবে বরং আমি কিছুদিনের জন্য অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে যাই! কিংবা চলে যাই দু-বছরের জন্য দিল্লির মাসির বাড়িতে, বি এ পরীক্ষাটা না হয় ওখানেই দেব। নইলে চলো, ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকি। তুমি অনেক ঝামেলা-টামেলা করে আমাকে ফের বাঁচিয়ে তোলো। তাতে বেশ দুর্লভ হয়ে উঠি আমি।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বলে—না, না, অতটা করার কিছু নেই। বরং ওই টারগেটের দোকানে চলো। একটা বেলুন দেখিয়ে দাও। আমি ফাটাব।

ফাটালে কী হবে?

তোমায় জয় করা হবে।

না পারলে?

জয় করা হবে না।

তা হলে আমাদের বিয়েও হবে না?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল—না।

বাবা, তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সব কিছু সহজে পেতে ভালোবাসি।

সঞ্জয় তার হাতখানা ধরল। বলল—মণিকা।

উঁ।

ওই যে মাঝখানের হলুদ রঙের বেলুনটা, ওটাকে ফাটাব। তিন চান্সে।

যদি না পারো?

না পারলে—

কথা শেষ করে না সঞ্জয়।

না পারলে?

বিয়ে হবে না।

মণিকা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, শোনো।

কী?

তুমি ইয়ার্কি করছ?

না।

সিরিয়াস?

ভীষণ!

মণিকা শ্বাস ছেড়ে বলে—তুমি ভীষণ জেদি। পুরুষমানুষের জেদ থাকা ভালো, কিন্তু যার ওপর আমাদের মরণ-বাঁচন তা নিয়ে তোমার খেলা কেন?

সঞ্জয় কাতরস্বরে বলে—মণিকা, আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন থেকেই তোমার আমার ভাব। পাশাপাশি বাড়িতে বড়ো হয়েছি। বড়ো হতে হতেই জেনে গেছি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কত সহজ ব্যাপারটা বলো তো! কোনো রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই, প্রতিযোগিতা নেই। এ কেমন পাওয়া! আজকের দিনটা একটুক্ষণের জন্য এসো একটু দুর্লভ হই। কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তা খেলা করুক আমাদের সম্পর্কের মধ্যে।

মণিকার বড়ো অভিমান হয়েছিল মনে মনে। সে কি বাজিকরের দোকানের জিনিসের মতো হয়ে গেছে? সে কি লটারির পুরস্কার? তাদের এতদিনকার সম্পর্ক একটা হলুদ বেলুনের আয়ুর ওপর নির্ভর করবে

অবশেষে? ছোট্ট একটা দুঃখ কাঁটার মতো ফুটল বুকে। ছোট্ট কাঁটা, কিন্তু তার মুখে বড়ো বিষ, বড়ো জ্বালা। মণিকার চোখভরে জলও কি আসেনি? এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে সে সেই জলটুকু মুছেছিল গোপনে। বলল—শোনো, আমি লটারির প্রাইজ নই। আমি তোমাকে পেতে চেয়েছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। তোমাকে যে ভালোবাসি সে আমার পুজো। আমি কেন নিজেকে অত হালকা হতে দেব? তুমি চলো, ওই দোকানে যেয়ো না। ও খেলা ভালো নয়।

কিন্তু সঞ্জয় বড়ো জেদি, ওই জেদই তাকে পুরুষ করেছে! ওই জেদই মণিকাকে মুগ্ধ করেছে কত বার। সঞ্জয় মাথা নাড়ল। মুখে হাসি নিয়ে বলল—শোনো মণিকা, বেলুনটা আমি ঠিক ফাটাব।

এসব নিয়ে খেলা কোরো না। চলে এসো।

না, প্লিজ, তিনটে চান্স দাও।

মণিকা একটা শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে করে বলল, কিন্তু মনে রেখো, যদি না পারো এ বিয়ে হবে না।

আমিও তো তাই বলছি!

মণিকার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। গলা ধরে যায় আবেগে। সঞ্জয়ের কাছে তার অস্তিত্ব কি এতই পলকা! যদি ও না পারে তবে সে ওর কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে! এই সামান্য খেলায় সারাজীবনের এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে তারা? মণিকা ইচ্ছে করলে সঞ্জয়কে টেনে আনতে পারত জোর করে, কিংবা কেঁদেকেটে বায়না করে নিবৃত্ত করতে পারত, যেমন সে অন্য সময় করে। কিন্তু ওই সর্বনাশা মুহূর্তে হঠাৎ এক অহংকার-অভিমান-জেদ চেপে ধরল মণিকাকেও। তার জলভরা চোখ থেকে বিদ্যুৎ বর্ষিত হল। কান্নাটা চেপে রেখে সে বলল—বেশ।

দোকানি বন্দুক ভরে এগিয়ে দিল। সঞ্জয় বন্দুক তুলে একবার মণিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল—মাঝখানের ওই হলুদ বেলুনটা। বুঝলে, লক্ষ করো।

করছি। গম্ভীরভাবে বলে মণিকা।

সঞ্জয় কাঁধ পর্যন্ত বন্দুক তোলে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ্যস্থির করতে থাকে। মণিকার একবার ইচ্ছে হয় বন্দুকটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। সে তৃষিত চোখে চেয়ে দেখছিল, সঞ্জয়ের দীর্ঘকায়, সুন্দর দেহটি। ধারালো মুখ। অবিন্যস্ত চুল নেমে এসেছে কপালে। ওই পুরুষ, আবাল্য পরিচিত মানুষটি একটু ভুলের জন্য চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে জীবন থেকে! এ কী ছেলেমানুষি!

ট্রিগার টিপল সঞ্জয়। শব্দটা ছড়াক করে মণিকার বুকে এসে ধাক্কা মারল। নড়িয়ে দিল তার দুর্বল হৃৎপিন্ড। দেওয়াল ঘড়ির দোলকের মতো দুলতে থাকে। সঞ্জয় পারেনি। হ্যাঁ এবং না—এর ভেতরে, আলো আর অন্ধকারের ভেতরে, সুখ ও দুঃখের ভেতরে টিকটিক-টিকটিক করে যাওয়া-আসা করে তার বুকের দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম। সে শুধু ফিসফিস করে বলে—আর মাত্র দুটো চান্স। দেখো সাবধান।

সঞ্জয়ের মুখের হাসি মুছে গেছে। ভ্রূ কোঁচকানো। সে আবার বন্দুক নেয় দোকানির কাছ থেকে। তোলে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্যস্থির করে। কিন্তু মণিকা লক্ষ করে, ওর হাত কাঁপছে! বড়ো মায়া হয় মণিকার। সে বুঝল, এবারেও সঞ্জয় পারবে না, দু-চোখ ভরে আবার জল এল তার। ভাঙা কাচের ভেতর দিয়ে দেখলে যেমন অদ্ভুত দেখায় চারধারকে, তেমনি চোখের জলের ভেতর সে দেখতে পেল, রঙিন আলোর সুন্দর মেলাটি যেন ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। প্রতিবিম্বই বলে দিচ্ছে, এ পৃথিবীর সুখ ভঙ্গুর, জীবন কত অনিশ্চিত।

সঞ্জয়ের হাওয়া-বন্দুকের শব্দ এবারও কাঁপিয়ে দিল মণিকাকে। সেইসঙ্গে যেন কেঁপে উঠল পৃথিবী, ভেঙে পড়ার আগে আর্তনাদ করে উঠল সমস্ত ভুবন। দ্রুত দোল খেতে লাগল বুকের দোলকটি, যেন না খসে পড়ার আগে সে তার শেষদোলায় দুলছে। এবারও লাগেনি।

সঞ্জয়ের মুখে রক্ত এসে জমা হয়েছে। ফেটে পড়েছে ভয়ংকর মুখখানা। দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে উত্তেজনায়। তার ঠোঁট সাদা। দোকানি আবার বন্দুক ভরে এগিয়ে দেয়। নির্লিপ্ত গলায় বলে—এবার মারুন।

ঠিক লাগবে।

লাগবে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

দোকানদার তো ভেতরের কথা কিছু জানে না। সে তাই ভালোমানুষের মতো বলে—আসলে মনটা স্থির করাই হচ্ছে সত্যিকারের টিপ। চোখ আর হাত তো মনের গোলাম। মনটাকে স্থির করুন, ঠিক লাগবে।

সঞ্জয় বন্দুকটা শেষবারের মতো হাতে নিল। তারপর মণিকার দিকে ফিরে চাপা গলায় ডাকল, মণিকা।

উঁ!

যদি না লাগে, তবে?

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো জানোই।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলে—জানি, ঠিক। তাই একটা কথা বলে নিই যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক কবে থেকে শেষ হবে?

মণিকা ধীর গলায় বলল, আজ। এখন থেকে।

আমরা একসঙ্গে ফিরব না?

না।

তুমি একা ফিরবে?

হুঁ।

আজ থেকে অন্য মানুষ হয়ে যাবে? আমার মণিকা আর থাকবে না তুমি?

তুমিই তো ঠিক করেছ সেটা।

সঞ্জয় ম্লান হেসে বলল, হ্যাঁ। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল—মণিকা, এবারও যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক তো শেষ হয়ে যাবে। তবু তোমাকে বলে নিই, আমি তোমাকে খুব, খুব, খুব ভালোবাসতাম। আর কখনো কাউকে এত ভালোবাসতে পারব না।

মণিকা রুমাল তুলে দাঁতে কামড়ে ধরল, তবু কি পারে দমকা কান্নাটাকে আটকাতে? কোনোক্রমে কেবল অসহায় একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শোনো।

কী?

শেষচান্সটা থাক। মেরো না।

কেন?

আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভীষণ।

আমিও।

তবে ওটা থাক। সারাজীবনের জন্য বাকি থাক।

হেরে যাব মণিকা? পালাব?

তাতে কী? কেউ তো জানবে না?

সঞ্জয় দ্বিধায় পড়ল কি? বন্দুকটা রাখল, সিগারেট ধরাল। ভ্রূ কোঁচকাল, চোয়ালের পেশি দ্রুত ওঠানামা করল। সিগারেটটা গভীরভাবে টানল সে। ধোঁয়া ছেড়ে সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে মণিকার অস্পষ্ট মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, কেউ জানবে না? কিন্তু তুমি তো জানবে?

কী জানব?

আমি যে পালালাম।

আমি ভুলে যাব।

সঞ্জয় মৃদু হাসে। মাথা নাড়ে।—তা হয় না। আমাকে বুকের মধ্যে নিয়েও তুমি মনে মনে ঠিকই জানবে যে এ লোকটা কাপুরুষ। এ লোকটা শেষবার বন্দুক চালাতে ভয় পেয়েছিল। মণিকার চোখের জল গড়িয়ে নামল। দোকানদার অবাক হয়ে দেখছিল তাকে। সামান্য বেলুন-ফাটানো টারগেটের খেলায় কান্নাকাটির কী

আছে তা তো তার জানা ছিল না। রঙিন আলোর মেলায় আনন্দিত মানুষজন কেউই জানত না, মেলার মাঝখানে কী এক সর্বনাশা ঘটনা কত নি:শব্দে ঘটে যাচ্ছে! সঞ্জয় ধীরে বন্দুকটা তুলে নেয়। মণিকা মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

হাওয়া-বন্দুকটা ধীরে ধীরে কাঁধের কাছে তুলে নিচ্ছিল সঞ্জয়। দিন যায়, কথা থাকে। দোকানদার বলেছিল —হাত আর চোখ হচ্ছে মনের গোলাম। মন স্থির থাকলে লক্ষ্যভেদ হয়।

মণিকা ভাবে—তবে কি মনই স্থির ছিল না সঞ্জয়ের? মণিকার প্রতি তবে কী স্থির ছিল না সঞ্জয়ের মন? তাহলে কেন বন্দুকের খেলার ওই হেলাফেলা উদাসীনতা? মণিকা দাঁতে রুমাল ছিঁড়ে ফেলল টেনে। দু-হাত প্রাণপণে মুঠো করে তার চারধারে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের পৃথিবীকে দেখে নিল। নিষ্ঠুর, এবার চালাও ওই খেলনা-বন্দুক। ভেঙে পড়ুক মণিকার জগৎ-সংসার। সেই ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে আজ একা ঘরে ফিরে যাবে মণিকা।

চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুন। ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটা। ফাটবে, নাকি ফাটবে না? সঞ্জয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করে। নলের ওপর দিয়ে চেয়ে থাকে বেলুনটার দিকে। পৃথিবী সুতোয় দুলছে। ছিঁড়বে। এক্ষুনি ছিঁড়বে।

হাওয়া-বন্দুকের শব্দ শেষবারের মতো বেজে উঠল। সঞ্জয়ের স্খলিত হাত থেকে বন্দুকটা খসে যায়। মণিকা শিউরে ওঠে। ফিরে তাকায়।

চক্রের মাঝখানে হলুদ বেলুনটা নেই। ফেটে গেছে। নরম রবার ঝুলে আছে ন্যাকড়ার মতো। দোকানদার বলল, বা:, এই তো পেরেছেন!—

তারা দুজনে কেউই বিশ্বাস করেনি প্রথমে যে বেলুনটা সত্যিই ফেটেছে। বুঝতে সময় লাগে।

বিহ্বল গলায় সঞ্জয় ডাকে—মণিকা!

উঁ।

লেগেছে।

যা:।

সত্যিই। দেখো।

মণিকা কাঁদে। তারপর চোখের জল মুছে হাসে। মেলাটা কেমন রঙিন আলোয় ভরা। সজ্জিত মানুষেরা কেমন হেঁটে যাচ্ছে চারদিকে। অবিরল ঘুরে যাচ্ছে নাগরদোলা। বেলুনটা ফেটেছে—সেই আনন্দসংবাদ নিয়ে শীতের বাতাস চলে যায় দিগবিদিকে। চারধারকে ডেকে যেন সেই বাতাস বলতে থাকে—আনন্দিত হও, সুন্দর হও, সব ঠিক আছে।

তবু দিন যায়। কথা থাকে। বিয়ের পর চার বছর কেটে গেছে। তারা দুজন এখন তিনজন হয়েছে। টুকুন তিন বছরে পা দিল। সেই মেলায় পা দিল। সেই মেলার হাওয়া-বন্দুকের খেলা তাদের কি মনে পড়ে? পড়ে হয়তো, কিন্তু কেউ মুখে বলে না। সঞ্জয় সিগারেট খেত খুব। মণিকা কোনোদিন আটকাতে পারেনি। রাতবিরেতে উঠে কাশত। মণিকা ঘুম ভেঙে উঠে উদবেগের গলায় বলত—ইশ! কী কাশি হয়েছে তোমার। মাগো!

সঞ্জয় কাশতে কাশতে বলে—স্মোকারস কাফ। এ কিচ্ছু নয়, বলেই আবার সিগারেট ধরাত।

আবার সিগারেট ধরালে?

সিগারেটের ধোঁয়া না লাগলে ও কাশি কমবে না। সিগারেট থেকেই এই কাশি হয়। সিগারেট খেলেই আবার কমে যায়।

বিছানায় বসে খাচ্ছ, ঠিক একদিন মশারিতে আগুন লাগবে।

সঞ্জয় উদাস স্বরে বলে—লাগুক না।

লাগুক না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। শিগগির সিগারেট নেভাও।

সঞ্জয় হাসতে থাকে, সিগারেট সরিয়ে নিয়ে বলে—আগুন লাগলে কী হবে মণিকা! সংসারটা পুড়ে যাবে। এই তো? পৃথিবীতে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাক না পুড়ে।

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে—তুমি বড়ো পাষাণ, বুঝলে! বড়ো পাষাণ!

সঞ্জয় উত্তর দেয়—তুমি তো জানোই।

মুখে যাই বলুক মণিকা, মনে মনে জানে, একটুও নিষ্ঠুর নয় সঞ্জয়, একটুও পাষাণ নয়। বরং বেশি মায়ায় ভরা সঞ্জয়ের মন। তবু তারা সুখীই ছিল। সংসারে নানা সুখ-দুঃখ ছায়া ফেলে যায়। ছোটো ছোটো সুখ, ছোটো ছোটো দুঃখ। সে সুখ-দুঃখ কোন সংসারে নেই। সঞ্জয় মোটামুটি ভালো একটা চাকরি করে। তিন বছরের টুকুন সকাল আটটায় তার নার্সারি স্কুলে যায়। সারাদিন সংসারের গোছগাছ নিয়ে থাকে মণিকা। সে জানে তার স্বামী সঞ্জয় একটু উদাসীন, তা হোক, তবু স্ত্রৈণ পুরুষের চেয়ে অনেক ভালো।

সংসারের হাজার কাজের মধ্যে যখন অবসর পায় মণিকা, তখন দক্ষিণের জানালার ধারে আলোয় এসে বসে। টুকুনের জামার ছেঁড়া বোতাম সেলাই করে। বাপের বাড়িতে চিঠি লেখে, রেডিয়ো বাজিয়ে কখনো বা নিজেই গান গায় গুনগুন করে। সেইসব অন্যমনস্কতার সময়ে কখনো কখনো হঠাৎ মনে পড়ে দৃশ্যটা। চারধারে সেই রঙিন ভয়ংকর খেলাটা বেশ জেগে ওঠে। দূরাগত চিৎকার শুনতে পায়, এক দোকানদার ডেকে বলছে প্রতি শট পাঁচ পয়সা, আসুন হাতের টিপ দেখুন।

আর তখন, মণিকা যেন সত্যিই দেখতে পায়, সামনে চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুনের ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটি। সঞ্জয় হাওয়া-বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে মুমূর্ষু পৃথিবী ভেঙে পড়ার আগে কেঁপে উঠছে, মণিকার বুকে দেওয়াল ঘড়ির দোলক ধাক্কা দেয়, পড়তে থাকে।

রাতে আজকাল সঞ্জয় বড়ো বেশি কাশে। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে তার। মণিকা উঠে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে—জল খাও তো!

দাও।

কাল তুমি ডাক্তারের কাছে যেয়ো।

দুর দুর! ডাক্তাররা একটা না-একটা রোগ বের করেই, রোগ না থাকলেও। এ কাশি কিছু না। সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে।

খেয়ো না, পায়ে পড়ি।

আঃ, দাও না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া কমবে না।

রোজ তোমার এককথা। তুমি আগে ডাক্তার দেখাও তো!

ডাক্তাররা কিছু জানে না।

তুমি খুব জানো।

আমি ঠিক জানি। বরং একটা ওষুধ কিনে আনব।

মণিকা বিছানায় বসে সঞ্জয়ের চওড়া রোমশ বুকের ওপর হাত রাখে স্নেহে, এই পুরুষটিকে সে খুব চিনে গেছে। ভারী একগুঁয়ে, জেদি। তবু ভেতরে ভেতরে মেয়েদের মতোই নরম।

বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মণিকা বলে—নিজের ওপর তোমার একটুও নজর নেই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ওপরে আছ। এত ভালো নয়, বুঝলে? কাল থেকে সকালে আর দু-কাপ চা দেব না, দ্বিতীয় বারে চায়ের বদলে দুধ দেব।

ধুস!

ওসব বললে চলবে না। খেতে হবে, আর অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে। সারাটা দিন তো বাসাতেই থাকো না। ঠিক যেন পেয়িং গেস্ট!

সারাক্ষণ ঘরে থাকা যায়?

তাহলে আমি কী করে থাকি?

মেয়েরা পারে, সংসারে তাদের জান পোঁতা হয়ে থাকে।

তাই নাকি! আর তোমার জান কোথায় পোঁতা আছে শুনি! নতুন করে কারও প্রেমে পড়োনি তো?

সঞ্জয় হাসে, ইচ্ছে তো করে একটা হারেম বানিয়ে ফেলি কিন্তু এ বয়েসে কে আর ফিরে তাকাবে বলো?

ফিরে তাকাবার লোকের অভাব নেই। সেদিন মনুর বিয়েতে ওর যে একদল কলেজের বন্ধু এসেছিল তাদের মধ্যে একজন শ্যামলা মতো মেয়ে হাঁ করে তোমাকে খুব দেখছিল।

যা:! তোমার যত বানানো কথা।

সত্যি বলছি, মাইরি।

আমার গা ছুঁয়ে বলছ তো।

ও বাবা! বলে মণিকা হাত টেনে নেয়।

কী হল! হাতটা সরিয়ে নিলে কেন?

তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম যে।

সঞ্জয় হাসে, গা ছুঁয়ে বলতে সাহস হচ্ছে না, তার মানে মিথ্যে কথা বলছ।

না গো, সত্যিই মেয়েটা দেখছিল।

তবে গা ছুঁয়ে বলো।

না না। তোমাকে ছুঁয়ে আমি কখনো দিব্যি গালি না।

সঞ্জয় বলে—তাহলে বলি, তুমি যে বড়ো দর্জির দোকানে ব্লাউজ বানাতে দাও, সেখানকার সুন্দর মতো সেলসম্যানটি তোমার দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে—

যা:, বলবে না নোংরা কথা। বলে মণিকা।

আর সেদিন পাড়ার ছেলেরা যে চাঁদা চাইতে এসেছিল তাদের মধ্যে একজন কেন তোমার কাছে জল খেয়ে গেল জানো?

এই, এই, এমন মারব না; কেবল বানাচ্ছে, চুপ করো। ওসব শুনলেও পাপ।

তারা দুজনেই খুব হাসতে থাকে। কারণ তারা জানে ওসব কথা সত্যি নয়, কিংবা হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের ভালোবাসা গভীর, গভীর।

সকালে টুকুন দুলে দুলে পড়ছে—ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ, হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, থ্রি ব্যাগস ফুল।

মণিকা রান্নাঘরে ঝিকে বকছে, রোজ তোমার আসতে বেলা হয়ে যায়। এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে, ঝাঁটপাট হয়নি, সাতটা বেজে গেল, টুকুনের স্কুলের বাস আসবে এক্ষুনি, কখন কী হবে বলো তো?

ঝি উত্তর দেয়, কী করব বউদি, বড়োবাড়িতে বেশি মাইনে দেয়, তারা সহজে ছাড়তে চায় না। কেবল এটা করে যাও, ওটা করে যাও। তোমার বাড়ি সেরে আবার এক্ষুনি ও-বাড়ি দৌড়োতে হবে।

বেশি মাইনে যখন, তখন ও-বাড়ির কাজই ধরে রাখো, আমারটা ছেড়ে দাও। আমি অন্য লোক দেখে নিই, পইপই করে বলি আমার ছেলের সকালে ইশকুল, কর্তারও অফিস ন-টায়, একটু তাড়াতাড়ি এসো। তুমি কেবল বড়োলোকের বাড়ির বেশি মাইনের কাজ দেখাও।

[বাথরুম থেকে ক্রমান্বয়ে কাশির শব্দ আসে]

টুকুন একনাগাড়ে ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ পড়ে যাচ্ছে। মণিকা ডাক দিয়ে বলে, টুকুন, কেবল ওই কবিতাটা পড়লেই হবে? একটু অঙ্কবইটা দেখে নাও। কাল অঙ্কে ব্যাড পেয়েছ।

মণিকা—বাথরুম থেকে ক্ষীণগলায় সঞ্জয় ডাকে।

মণিকা উত্তর দেয়, কী বলছ?

একটু শুনে যাও।

দাঁড়াও, আমার হাতজোড়া, ডালে সম্বার দিচ্ছি।

এসো না।

উঃ, আমি যেতে পারব না। টুকুনের টিফিন বাক্স গোছানো হয়নি, জলের বোতলে জল ভরা হয়নি। এক্ষুনি বাস এসে পড়বে।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে, তারপর আবার শোনা যায় তার কাশির শব্দ। দম বন্ধ করা সেই কাশি; তারপরই ওয়াক তুলে বমি করার শব্দ হয়।

ওমা! কী হল! বলে মণিকা উঠে বাথরুমের দরজায় এসে ধাক্কা দেয়—এই, কী হয়েছে? এই—ভেতর থেকে উত্তর আসে না, কেবল বেসিনে জল পড়ে যাওয়ার শব্দ হতে থাকে।

দরজায় ধাক্কা দেয় মণিকা, এই, দরজাটা খোলো না। কী হয়েছে তোমার? বমি করছ কেন?

সঞ্জয় উত্তর দেয় না।

মণিকা দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দেয়—এই, কী হয়েছে? ওগো, দরজাটা খোলো না।

মণিকা চিৎকার করে ডাকে, সুধা, এই সুধা—

সুধা দৌড়ে আসে—কী হল গো বউদি?

দেখো, তোমার দাদাবাবু দরজা খুলছে না। কী জানি কী হল, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?

শরীর খারাপ ছিল?

হ্যাঁ, তুমি শিগগির বাড়িওয়ালাকে খবর দাও।

কিন্তু খবর দেওয়ার দরকার হয় না। ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়, দরজা খুলে দেয় সঞ্জয়। তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বিমূঢ় হয়ে যায়। অত বড়ো মানুষটাকে কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে। ঠোঁট সাদা, মুখে রক্তাভা, চোখের দৃষ্টি খানিকটা ঘোলাটে। একটা হাত বাড়িয়ে সঞ্জয় বলে—ধরো আমাকে।

মণিকা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে তার মানুষটাকে। কী মস্ত শরীর, মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক তার স্বামীর কী হল, কী হতে পারে মানুষটার?

কী হয়েছে তোমার, ওগো?

কী জানি, কাশি এলো খুব, কাশতে কাশতে বমি হয়ে গেল। আমাকে একটু শুইয়ে দাও।

...বাইরে বাসের হর্ন বাজে। টুকুন দৌড়ে আসে। মা, বাস এসে গেছে। টিফিন বাক্স আর জলের বোতল দাও।

দিচ্ছি, দিচ্ছি বাবা।

টুকুন বাবাকে জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে বাবা?

কিছু না।

শুয়ে আছ কেন? আজ তোমার ছুটি?

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে বলে—ছুটি! না, ছুটি নয়। তবে বোধ হয় এবার ছুটি হয়ে যাবে।

কেন বাবা?

মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয়ে যায় বিনা কারণে। বলে সঞ্জয় হাসে। বলে, তোমাকে খ্যাপালাম। কিছু হয়নি। তুমি ইশকুলে যাও।

যাই বাবা, টা টা।

টা টা।

বাইরে বাসের শব্দ হয়।

মণিকা গম্ভীরভাবে ঘরে আসে। হাতে দুধের কাপ। চামচে দিয়ে ভাসন্ত পিঁপড়ে তুলছে। কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দুধটা খেয়ে নাও।

খেতে ইচ্ছে করছে না। এখনও বমির ভাবটা আছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।

আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, সিগারেটের প্যাকেটটা দাও।
না, আর সিগারেট নয়।
দাও না, মুখটা টক-টক লাগছে। সিগারেট খেলে বমির ভাবটা কমবে।
মণিকা বলল, না, এত বাড়াবাড়ি আমি করতে দেব না।
ওঃ, বলে সঞ্জয় হতাশভাবে চেয়ে থাকে।
শোনো, তুমি টুকুনকে কী বলছিলে?
কী বলব?
কিছু বলোনি? আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি।
সঞ্জয় একটু হাসে—কী শুনেছ?
ওইটুকু ছেলেকে ওইসব কথা বলতে তোমার মায়া হল না?
ওকি বুঝেছে নাকি?
নাই বা বুঝল! তুমি বললে কেন? ছুটি মানে কী তা কি আমি বুঝি না?
কী মানে বলো তো?
বলব না। তুমিও জানো, আমিও জানি।
মণিকা, সিগারেট দাও।
না।
তাহলে আবার কাশি শুরু হবে।
হোক, সিগারেট কিছুতেই দেব না। আগে বলো কেন বলেছিলে ওই কথা।
এমনিই।

মণিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একটা দৃশ্য মনে পড়ে। মেলার দোকানে মণিকাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকে লক্ষ্যভেদের খেলা খেলছে সঞ্জয়। জীবনে মণিকা কোনোদিনই ঘটনাটা ভুলতে পারবে কী? পারবে না। মনে কেবলই সংশয় খোঁচা দেয়। যাকে ভালোবাসে মানুষ তাকে কী করে এক মুহূর্তের খেয়াল-খুশিতে হারজিতের খেলায় নামিয়ে আনতে পারে? তবে কি সঞ্জয় কোনোদিনই তেমন করে ভালোবাসেনি তাকে? সেইজন্যই কি এই সাজানো সুন্দর সুখের সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার বড়ো সাধ হয়েছে তার? ও টুকুনকে কেন বলল মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয় বিনা কারণে। ওই ছুটির জন্য বড়ো সাধ সঞ্জয়ের?

মণিকা বিছানার একধারে বসল। স্বামীর মাথাটা টেনে নিল বুকের ধার ঘেঁষে। চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে বলল, অমন কথা বলতে নেই, কখন স্বস্তির মুখে কথা পড়ে যায়। আর কখনো বোলো না।
আচ্ছা।
আমাকে ছুঁয়ে বলো, বলবে না।
সঞ্জয় হাসল, বলল, সিগারেট দাও না মণিকা।
না।
বাইরে বাড়িওয়ালার ছেলের ডাক শোনা যায়—বউদি।
মণিকা বলে—বোধ হয় পল্টু ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল।
মণিকা বলল—আসছি পল্টু। মণিকা গিয়ে দরজা খোলে। ডাক্তারবাবু ঘরে আসেন।
কী হয়েছে? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন।
সঞ্জয়ের কাশির দমকাটা আবার আসে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—কিছু না। স্মোকারস কাফ।
দেখি, আপনি ভালো করে শুন তো।

ডাক্তার সঞ্জয়কে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। মণিকাকে একটা টর্চ আনতে বলেন, টর্চ দিয়ে গলাটা দেখেন ভালো করে। গলার বাইরের দিকে কয়েকটা জায়গা একটু ফুলে আছে। সেগুলো হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে জিজ্ঞেস করেন—এগুলো কতদিন হল হয়েছে?

কী জানি! সঞ্জয় উত্তর দেয়।

ডাক্তারবাবুর মুখটা ক্রমে গম্ভীর হয়ে আসে। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে ওঠেন। মণিকা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘরে আসে।

ডাক্তারবাবু!

বলুন।

কীরকম দেখলেন?

তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। ওষুধগুলো দিন। দেখা যাক।

হঠাৎ এক অনিশ্চয়তা, এক ভয় চেপে ধরে মণিকার বুক। ভগবান, ডাক্তার কেন বুঝতে পারছে না?

কয়েকদিন কেটে যায়। ওষুধে তেমন কোনো কাজ হয় না। কাশিটা যেমনকে তেমন থেকে যায় সঞ্জয়ের। কিছু খেতে পারে না, ওয়াক তুলে বমি করে ফেলে। শরীরটা জীর্ণ দেখায়। মস্ত চুল ভরতি মাথাটা বালিশে ফেলে রেখে পায়ের দিকের জানলাটা দিয়ে উদাসভাবে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

মণিকা ডাকে—শুনছ?

উঁ।

একটু হাঁটাচলা করো। শুয়ে থাকো বলেই তোমার খিদে পায় না।

একটা সিগারেট দেবে মণিকা?

না।

পাষাণ, তুমি পাষাণ!

মণিকার চোখে জল আসে, বলে—কোনোদিন তো বারণ করিনি জোর করে। অসুখ হল কেন বলো। ভালো হও, তারপর খেয়ো।

যদি ভালো না হই?

ফের ওই কথা? তুমি বলেছিলে না যে আর বলবে না।

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে, চুপ করে থাকে। ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যায়। একদিন চিন্তিতমুখে ডাক্তার মণিকাকে আড়ালে ডেকে বলে—গলার ঘা-টা একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। বরং ডাক্তার বসুকে একবার দেখান।

আপনার কী মনে হয়?

কিছু বলা মুশকিল। দীর্ঘস্থায়ী কোনো ঘা দেখলে অন্যরকম একটা সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হয়তো তেমন কিছুই নয়। তবু দেখালে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু চলে গেলে মণিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তারের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে তার দেরি হয় না। ডাক্তাররা সহজে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন না, সুতরাং—

সুতরাং মণিকা বুঝতে পারে, এতকাল ছোটো সুখ, ছোটো দুঃখের সঙ্গেই ছিল তার ভাব-ভালোবাসা। এখন হঠাৎ সদর দুয়ার গেছে যে খুলে, অচেনা, বিশাল পুরুষের মতো এক বড়ো দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। লুবিয়ার মতো, মণিকার ছোটো মাথা তা বইতে পারে না। এ যে আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এ যেন সমুদ্রের মতো সীমাহীন, এ দুঃখ দাবি করে সর্বস্ব সমগ্র ভুবন কেড়ে নেয়।

দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে টুকুন। ভাত খেয়ে আলাদা বিছানায় ঘুমুচ্ছে। বড়ো ঘাম হয় ছেলেটার। একটামাত্র পাতলা জামা গায়ে, তবু জলধারায় ভেসে যাচ্ছে গলা বুক। কপালে মুক্তোবিন্দু, মণিকা নীচু হয়ে

টুকুনের মুখ দেখে। সবাই বলে ওর শরীরের গঠন আর চোখ দুখানা সঞ্জয়ের মতো। নিবিড় পিপাসায় দেখে মুখখানি; মণিকা ফিসফিস করে ডাকে।

টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

ওঠ টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

ওরে টুকুন, বেলা গেল। ওঠ।

টুকুনের উত্তর নেই। নি:সাড়ে ঘুমোয় সে। নিশ্চিন্তে।

টুকুন ওঠ রে, আয় দুজনে মিলে একটু কাঁদি। ডাক্তার বাসুর চেম্বারে ফোন করল মণিকা, পোস্টঅফিসে গিয়ে।

ডক্টর বাসুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

উনি দিল্লিতে আছেন।

কবে ফিরবেন?

কনফারেন্সে গেছেন। কাল কি পরশু ফেরার কথা।

আমার যে ভীষণ দরকার।

কী দরকার বলুন।

দয়া করে বলবেন, ডাক্তার বাসু কীসের স্পেশালিস্ট?

ওপাশে লোকটা বোধহয় একটু হাসল, বলল, ক্যান্সার।

আমি কাল আবার ফোন করব। কোন সময়ে আসার কথা?

সকালের ফ্লাইটে। তবে কিছু বলা যায় না, হয়তো আটকেও যেতে পারেন।

মণিকা সন্তর্পণে ফোনটি রেখে দেয়। বাসায় ফিরে গিয়ে দেখে সঞ্জয় শুয়ে আছে। উত্তর শিয়রে মাথা, পায়ের কাছে দক্ষিণের জানলা। শেষবেলার একটু রাঙা আলো এসে পড়ে আছে পাশে। সঞ্জয় চেয়ে আছে দক্ষিণের জানলা দিয়ে। অবিরল চেয়ে থাকে আজকাল। কথা বড়ো একটা বলে না। টুকুনকে আদর করে না, মণিকাকেও না।

শেষচান্স-এ হলুদ বেলুনটা না ফাটলে কোথায় থাকত মণিকা আর কোথায়ই বা সঞ্জয়। মণিকা সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে থাকে। পিপাসায় তার ঠোঁট নড়ে, তার দু-চোখ জলে ভেসে যায়। অচেনা পুরুষের মতো বড়ো দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ার খুলে। হাতে তার হাওয়া-বন্দুক, হলুদ বেলুনের মতো ঝুলে আছে। মণিকার হৃৎপিন্ড বিদীর্ণ হবে, ভেঙে যাবে বুক।

মণিকা শব্দ করে কেঁদে ওঠে। অবাক হয়ে সঞ্জয় চোখ ঘোরায়।

কী হয়েছে?

পাষাণ, তুমি পাষাণ!

সঞ্জয় বুঝতে পেরে মাথা নাড়ে, শ্বাস ফেলে বলে—কেঁদো না, আমাকে বরং এখন থেকে একটা করে সিগারেট দিয়ো রোজ।

মণিকা হঠাৎ মুখ তুলে বলে—সিগারেট আর সিগারেট! সংসারে সিগারেট ছাড়া তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই?

না—মাথা নাড়ল সঞ্জয়।

পাষাণ, তুমি পাষাণ।

মণিকা কাঁদে, সঞ্জয় চুপ করে দক্ষিণের জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে, টুকুন পাশের ঘরে ঘুমোয়।

অনেক কষ্টে ডাক্তার বাসুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারে মণিকা। সঞ্জয়কে নিয়ে একদিন হাজির হয় ছায়াচ্ছন্ন চেম্বারটায়। বাসু প্রবীণ ডাক্তার, বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ দুটি চোখ তুলে বললেন—কী হয়েছে? দেখি! বলে সঞ্জয়কে চেয়ারে বসালেন। আলো জ্বালালেন কয়েকটা, ঝুঁকে ওর মুখ দেখতে লাগলেন, ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকে মণিকা, হাওয়া-বন্দুক তুলেছে এক পাষাণ, দেয়ালঘড়ি পেণ্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে, বুকের ভেতরটা এক হলুদ বেলুন, দাঁতে চিবিয়ে আজও রুমাল ছিঁড়ল মণিকা।

ডাক্তার বাসু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু হয়নি।

মানে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

যা সন্দেহ করে এসেছেন আমার কাছে, তা নয়। আজকাল সকলেরই এক ক্যান্সারের বাতিক, স্মোক করেন?

করতাম।

টনসিলটা পাকা। ফ্যারিঞ্জাইটিস আছে, সব মিলিয়ে একটা আলসার তৈরি হয়েছে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি। সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিলেন।

সেরেও গেল সঞ্জয়।

একদিন বলল, শোনো মণিকা।

কী?

মনে আছে একবার মেলায় তোমাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকের খেলা খেলেছিলাম?

মনে আছে।

সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করো।

মণিকা হাসে—তুমি কি ভাবো, শেষচান্সে বেলুনটা না ফাটালে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম?

যেতে না?

পাগল।

কী করতে?

আমি বন্দুকটা নিয়ে বেলুনটা ফাটাতাম। না পারলে সেফটিপিন ফুটিয়ে আসতাম বেলুনটায়!

তুমি ডাকাত, বলে সঞ্জয় হাসে।

অলক্ষ্যে হাওয়া-বন্দুক নামিয়ে পরাজিত এক অচেনা পুরুষ ফিরে যায়। তার লক্ষ্যভেদ হল না। বিদীর্ণ হয়নি মণিকার হৃদয়। সব ঠিক আছে। কোনোদিন আবার সেই বন্দুকবাজ ফিরে আসবে। লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবে বার বার, একদিন লক্ষ্যভেদ করবেও সে। ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এই রঙিন মেলার আনন্দিত বাতাস বহে যাক এই কথা বলে—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

কথা

তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে টুপু।

এ কথা প্রায়ই টুপুকে বলার জন্য যায় কুশল। বলা হয় না। কী করে হবে? টুপু যে বড্ড ব্যস্ত।

কুশল কলকাতায় এসেছে চার বছর। একটা বেসরকারি এঞ্জিনিয়ারিং শেখানোর স্কুল থেকে সে লেদ মেশিনের কাজ শিখেছিল। তার বেশি আর কী করার ছিল তার? গাঁয়ে তার বাবা মারা গেছে, কিন্তু চাষবাসের জমি আর অল্প-স্বল্প কিছু জীবনবিমার টাকা পেয়েছিল। তাও ভাগীদার অনেক। বিধমা মা আছে, এক দাদা আর এক ভাই আছে, ছোটো একটা বোনও। দাদা চাষবাস দেখে, সেই থেকেই সংসার চলে। কুশল কলকাতায় এসেছিল ভাগ্যের অন্বেষণে। তেমন কিছু হয়নি তার। তবে মাথাটা পরিষ্কার বলে সে মেশিনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেয়। কিন্তু কাজ পাবে কোথায়? মূলধনও নেই যে ব্যাবসা করবে। সেই এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মালিক সুধীর ভদ্র তখন তাকে ডেকে বলে—তোমার তো বেশ পাকা মাথা, কাজ না পেলে আমার এখানেই শেখাতে লেগে যাও বাপু, হাতখরচ পাবে, থাকার জায়গাও দেব।

এক অনিচ্ছুক মামাবাড়িতে প্রায় জোর করে থাকত কুশল। তারা তাড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কুশল বড়ো মিষ্টভাষী আর সৎ চরিত্রের বলে একেবারে ঘাড়ধাক্কা দিতে পারছিল না। কিন্তু কুশলের বড়ো লজ্জা করত। থাকার জায়গা পেয়ে সে এবার উঠে এল হ্যারিসন রোডের স্কুলের বাড়িতেই।

তো এই কুশলের অবস্থা। একশো টাকার কাছাকাছি তার রোজগার। থাকার জায়গার ভাড়া লাগে না, নিজে রেঁধে খায়। কষ্টে তার চলে যায়। তবে কুশল সবসময়েই জীবনের আলোকিত দিকগুলোই দেখতে পায়। যেন জগৎ-সংসারকে দু-ভাগ করে একটা সৌভাগ্যের আলো আর দুর্ভাগ্যের অন্ধকার পাশাপাশি রয়েছে। অন্ধকারে যারা আছে তারা আলোর দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, আবার আলো থেকে অন্ধকারেও কাউকে কাউকে চলে আসতে হয়। কুশল তাই কখনো হাল ছাড়ে না। কিছু হবে, কিছু একটা হবে। হবেই।

তাই এই অন্ধকারের জীবনে ফুলগন্ধের মতো, জ্যোৎস্নার মতো একটাই আনন্দ আছে। সে হল টুপু।

তাদের গাঁয়ের পুরুতবাড়ির মেয়ে ছিল। বড়ো সুন্দর দেখতে। কত ছোট্ট ছিল। টুপু এখন কলকাতায় এসে খুব অন্যরকম হয়ে গেছে। খুব অল্প আয়াসেই টুপু তার দুর্ভাগ্য জয় করে আলোর দিকে চলে গেছে। সিনেমার অভিনেত্রী হিসেবে তার খুব নামডাক। তার অনেক ভক্ত, অনেক চাহিদা।

কুশলের তাতে কিছু যায়-আসে না। সে মাঝে মাঝে টুপুদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যায়। টুপুর মা আছে, বাবা আছে, একটা ভাইও আছে। তারা এখন সব বড়োলোকের মতো থাকে। ছোট্ট বাগান-ঘেরা তিনতলা বাড়ি, গেটে দারোয়ান, শিকলে বাঁধা কুকুর, হুট বলতে ঢোকা যায় না।

তবু কুশল ঠিকই ঢোকে। তার আটকায় না। ওরা যে তাকে অনাদর করে তা নয়, উপেক্ষাও করে না। আবার খুব একটা আদর-আপ্যায়নও নেই।

যেমন ওর বাবা বলে—ওঃ কুশল! কী খবর?

মা বলে—কী বাবা, কেমন! খবর সব ভালো?

তারপরই আর তেমন কথা-টথা হয় না।

কুশল দেখতে খুব সুন্দর নয়, আবার খারাপও নয়। সিনেমার নায়ক হিসেবে তাকে মানায় না ঠিকই, কিন্তু রাস্তায় ঘাটে দু-চারজন তার দিকে তাকিয়ে দেখে। মেশিন চালিয়ে তার চেহারা মেদহীন এবং পোক্ত। মুখশ্রীতে বুদ্ধি এবং অসম্ভব ভালোমানুষির ছাপ আছে। সুধীরবাবু টাকা-পয়সার বিষয়ে চোখ বুজে তাকে বিশ্বাস করেন।

টুপুর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়। বেশিরভাগ সময়েই তাকে বাইরে থাকতে হয়, নয়তো বাড়িতে ঘুমোয়, নয়তো বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইচই করে। তবু দেখা হলে সে-ই সবচেয়ে আন্তরিক ব্যবহার করে। বলে—কুশলদা, আজ বাড়িতে খেয়ে যেয়ো। তোমার দাদা কী করছে এখন? মা কেমন আছে? পুন্তিকে অনেককাল দেখি না। তার তো বিয়ের বয়স হল!

পুন্তি কুশলের ছোটোবোনের নাম। এসব টুপুর মুখে শুনতে বড়ো ভালো লাগে।

কুশল বড়ো লাজুক। টুপুর সুন্দর মুখখানার দিকে ভালো করে চাইতে পারে না। মাথা নত করে বলে—আমরা বড়ো গরিব হয়ে গেছি টুপু।

টুপু বলে—আহা, কী কথা। গরিব হওয়া কি অপরাধ নাকি! এই বলে সান্ত্বনা দেয় টুপু। কখনো বলে—তোমার যদি টাকার দরকার হয় তো নিয়ো কুশলদা, লজ্জা কোরো না।

না, না, টাকার দরকার নয় টুপু। এই মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাই শুধু। বেশ লাগে।

দেখে যেয়ো। আমাদেরও ভালো লাগে। তুমি যেন কী করো কুশলদা?

একটা এঞ্জিনিয়ারিং কনসার্নে ইনস্ট্রাক্টর।

ও বাবা, সে তো ভালো চাকরি! বলে টুপু ভ্রূ তোলে।

মিথ্যে কথা বা ফাঁপানো কথা কুশলের মুখে আসে না। তাই সে টুপুর ভুল ধারণা ভাঙার জন্য তাড়াতাড়ি বলে—না না, সে খুব ছোট্ট একটা কারিগরি স্কুল, আর ইন্সট্রাক্টর বলতে—

কিন্তু অত কথা শোনার সময় টুপুর প্রায়ই হয় না। হয়তো চাকর এসে খবর দেয় যে গাড়ি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। কিংবা ছুকরি একটা সেক্রেটারি এসে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আসল কথাটাই বলা হয় না।

অবশ্য কথাটা যে কী তা আজও ভালো জানে না কুশল। কেবল তার মন বলে—তোমার সঙ্গে আমার যে অনেক কথা ছিল টুপু!

২

একবছর আর তেমন অবসর পেল না কুশল। সুধীরবাবুর স্কুল থেকে একটা পুরোনো মেশিন কিস্তিবন্দিতে কিনে নিয়েছিল সে। হাওড়ায় একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে ব্যাবসা শুরু করেছিল। লাভালাভের দিকে তাকায়নি, ভূতের মতো খেটে সে সুধীরবাবুর টাকা শোধ করে দিল সময়ের আগেই। আরও একটা মেশিন কিনল। আরও একটা।

ব্যাবসা শুরু করলে বহুমানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। সেইরকম এক যোগাযোগে সে এক কালোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। কিছু টাকা লাগায় তার লোহার কারবারে, বেশ কিছু লাভ পেয়ে যায়। একবছরের মধ্যে তার গা থেকে হাঘরের ভাবটা ঝরে গেল।

টুপুর বাড়িতে একদিন মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে দেখা করতে গেল।

টুপুর বাবা ইতিমধ্যে মারা গেছেন। তার মা খুব বিষণ্ণ মুখে একটু খবরাখবর নিলেন।

বললেন—বাবা, আর তো দেখি খোঁজ নাও না!

সময় পাই না পিসি। বড্ড কাজ। অভাব দূর করার চেষ্টা বড়ো মারাত্মক, হাড়মজ্জা শুষে নেয়।

সে তো জানি বাবা। তবু বলি, অভাবই ভালো। প্রাচুর্য মানুষকে বড়ো অমানুষ করে দেয়।

কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু পরিষ্কার বুঝল না কুশল।

সুখে থেকো, সৎ থেকো। এই বলেন টুপুর মা।

টুপুর সঙ্গে দেখা হল না। সে ঘুমোচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত।

সেই কথাটা আজও টুপুকে বলা হয়নি। কী কথা তা অবশ্য সে নিজেও জানে না। হয়তো সে বলতে চায় —তুমি খুব সুন্দর টুপু। কিংবা—আমি তোমাকে ভালোবাসি টুপু।

বলেই বা কী হবে? এসব তো কত লোকেই টুপুকে বলে। তবু বলতে ইচ্ছে করে কুশলের।

লোহার ব্যাবসা খুব ভালো লাগছিল না তার। একই অংশীদারি তার পছন্দ নয়, তার ওপর আয় এক জায়গায় উঠে আটকে যায়। তাই সে মূলধন তুলে নিয়ে লিলুয়ায় নিজের মতো ছোট্ট ঢালাইয়ের কাজ শুরু করল। লোহার বড়ো টানাটানি বাজারে। মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। টাকাও আসে। তবু ঠিক খুশি হতে পারে না সে। একটা কাটিং মেশিন নিলামে কিনল। পাঁচরকম ব্যাবসার কাজে টাকা ঢালতে লাগল। বড়োভাই চাষবাস নিয়ে রইল বটে, কিন্তু ছোটোভাইকে আনিয়ে নেয় কুশল। দুই ভাই মিলে সাংঘাতিক খাটে।

টুপুর বাড়িতে যেতে সেদিন দেখা হয়ে গেল।

আরে কুশলদা, কেমন আছ? তোমাকে খুব অন্যরকম দেখাচ্ছে।

না না। দাড়ি কামিয়েছি তো, তাই।

তার চেয়ে কিছু বেশি। বলে টুপু হাসে—তোমার উন্নতি হচ্ছে বোধহয়। চেহারায় ছাপ পড়েছে।

কুশল বলে—তোমার চেহারা একটু খারাপ দেখছি টুপু। কী হয়েছে?

কী হবে? বড্ড ডায়েটিং করতে হয়! খাটুনিও তো খুব!

আজকাল তোমার ছবি বড়ো একটা দেখি না তো।

হচ্ছে। অনেক হচ্ছে। এই বলে টুপু খুব অস্থিরতা আর চঞ্চলতার সঙ্গে একটা সিগারেট ধরায়।

ভীষণ অবাক হয় কুশল। চেয়ে থাকে।

কিছু মনে কোরো না কুশলদা। নার্ভের জন্য খাই। আমার নার্ভ বড্ড সেনসিটিভ, ধোঁয়ায় একটু শান্তি থাকে।

বেশি খেয়ো না। দমের ক্ষতি হয়। খুব ভালো আর শান্ত গলায় কুশল বলে।

বেশি না। মাঝে মাঝে খাই, নেশা-টেশা নেই।

আসলে নেশাই। কুশল সেটা টের পায়।

টুপুর মা দেখা হতে অনেকক্ষণ অন্য কথা বলেন। তারপর বলেন—বাবা, পেটের মেয়ে, পন্ডিত বংশের সন্তান, বলতে নেই টুপু আজকাল মদও খায়। ভীষণ মাতলামি করে। কাউকে বোলো না।

অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে কুশল বলে—পিসি, খায় তো খাক। তুমি বেশি ঝগড়া-টগড়া কোরো না এ নিয়ে। ওর কাজের স্ট্রেন তো হয়, তাই খায়। ওকে রেস্টোরেটিভ বলে, মদ-খাওয়া নয়।

তুমি বাবা, সব কিছুর ভালো দেখো। আমি দেখি না। ছেলেটাও সিনেমার লাইনে ঢুকবে-ঢুকবে করছে। বারণ করি, শোনে না।

কুশল আবার ভেবে বলে—টুপুর বুঝি আর তেমন চাহিদা হচ্ছে না পিসি? আজকাল ওকে নিয়ে ছবি হয় না তো।

হয় না তো কী করবে! জীবনে ওঠা-পড়া আছেই। আমি বলি, এবার ভালো আর সৎ দেখে পাত্র খুঁজে বিয়ে করে ফেলুক। সিনেমার নটী সাজা ঢের হল। ওদের বামুন-পন্ডিতের বংশের রক্তে কি ওসব সয়!

ভাবতে ভাবতে কুশল চলে আসে।

স্কুলে থাকতে কবিতা পড়েছিল, সন্ন্যাসী উপগুপ্তর সঙ্গে বাসবদত্তার প্রেম হয়েছিল বুঝি! তো টুপুর সঙ্গে একদিন কি তার সেরকমই হবে?

হতেও পারে।

তিন বছরের মাথায় কুশল দেখল, তার অনেক টাকা। শুধু হয়েছে নয় আসছেও।

ঢালাইয়ের কারখানার জায়গা বদল হয়েছে। ছোট্ট কিন্তু বেশ ভালো একটা ফাউন্ড্রি খুলে ফেলেছে দুই ভাই। দেশের বাড়ি মস্ত বড়ো করে করেছে। পুকুর কাটা হয়েছে। চাষের জমিও কিনেছে অনেক। দাদা সেসব দেখাশোনা করছে। কাজের সুবিধের জন্য একটা গাড়ি কিনে ফেলেছে কুশল।

সেই গাড়িতে একদিন গেল টুপুর বাড়ি।

টুপু সব দেখে বলল—কুশলদা, তুমি সত্যিই উন্নতি করেছ।

আরে না, না। কোম্পানির গাড়ি।

ওই হল। কোম্পানি তো তোমারই।

কুশল লজ্জা পায়। বড়োলোকি দেখাতে সে তো আসে না। সে আসে টুপুকে একটা কথা বলবে বলে।

আজও বলা হয়নি।

৩

টুপু একজন প্রডিউসারকে বিয়ে করল, কুশল খবর পায় এক পত্রিকায়।

গিয়ে দেখে টুপুর মা খুব খুশি নয়।

বললেন—দোজবরে বাবা, আগের বউকে বিদেয় করেছে। তা টুপুকেই কি রাখবে? বড়ো ভয় করে। বড়োলোকি বিয়ে আমার একদম পছন্দ নয়। বিয়ে ওরা করে না। আসল বিয়ে হয় মধ্যবিত্ত পরিবারে।

পিসি বলেছিল অদ্ভুত।

ওরা হানিমুন করতে জাপান না কোথায় গিয়েছিল। ঠিক তিনমাস বাদে ফিরে এসেই টুপু তার বরকে ডিভোর্স করে।

খবর পেয়ে ছুটে গেল কুশল।

কী হল টুপু? বিয়ে ভেঙে দিলে?

দিলাম। ওর হৃদয় নেই।

আগে জানতে না?

জানতাম। তবু ঢুকে দেখলাম আছে কি না।

ঢুকতে গেলে কেন টুপু? শরীরটা খামোখা এঁটো করলে।

মুখ-ফসকা কথা। কুশল জিভ কাটল।

কিন্তু টুপু রাগ করল না। খুব অন্যমনস্ক হয়ে বলল—ঠিক বলেছ। এঁটো হয়ে এলাম। তবে অনেক টাকা পেয়েছি।

কুশল বলল—ভালো। টাকাগুলো রেখো। অসময়ে টাকা মানুষকে খুব দেখে।

টুপু এই প্রথম কাঁদল কুশলের সামনে।

বলল—টাকা আর নাম আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে কুশলদা। তুমি তো উন্নতি করেছ, আমি যদি কখনো রাস্তার ভিখিরি হয়ে যাই তো কিছু ভিক্ষে দিও।

ছি: টুপু, ওকথা বোলো না। টাকা রেখো। আর দরকার হলে নিয়ো আমার কাছ থেকে। লজ্জা কোরো না।

বড়ো লজ্জা কুশলদা। বড়ো লজ্জা।

আলোর পৃথিবী এগিয়ে আসছে।

কুশল বুঝতে পারে, সে নিজে সৌভাগ্যের আলোর চৌকাঠে পা রেখেছে, কিন্তু টুপুর সঙ্গে সেখানে দেখা হওয়ার নয়। কারণ টুপু আলোর জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে চলে আসছে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার জগতে, সে-ও সেই যাত্রাপথে অন্ধকারের চৌকাঠে পা রেখেছে, ঠিক এই সীমানায় তাদের এখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আজও বলতে পারল না কুশল। কিন্তু মন বলল—তোমার সঙ্গে আমার যে একটা খুব গোপন কথা আছে টুপু।

আজকাল কুশলের সময় বড়ো কম। কলকাতার ব্রাবোর্ন রোডে তার নতুন শো-রুম আর সেলস অফিস চালু হল। তার ওপর আবার জাপানি একটা কোম্পানির সঙ্গে কোলাবরেশনে চাষের যন্ত্র-লাঙল তৈরি করবে বলে সে গেল জাপান। ওই পথে দূর-প্রাচ্যের সব দেশ দেখে এল। কারখানা খোলার জায়গা পেল কলকাতার কাছেই। বড্ড পরিশ্রম গেল ক-দিন। বয়সও তো প্রায় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হয়ে গেল। এখন শরীর না হোক মনটা বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মা বিয়ের তাগাদা দেয়। কুশল রাজি হয় না। ছোটোবোনের বিয়ে দিল বড়োলোকের বাড়িতে। সেই বিয়েটা আসলে একটা অলিখিত চুক্তি। আত্মীয়তার সূত্রে যাদের পেল তারা সমাজের ওপরতলার ভালো সব যোগাযোগের মধ্যমণি। এই সব বুদ্ধি এখন মাথায় খুব খেলে কুশলের।

কিন্তু তবু ক্লান্তি তো ছাড়ে না। যোধপুরের প্রকান্ড বাড়িতে ফিরে যখন কখনো অবসর কাটায় তখন বড়ো একা আর ক্লান্ত লাগে। মেয়েলি স্পর্শ জীবনে বড়ো দরকার। মেয়েরা হল পুরুষের বিশ্রাম, একটু সৌন্দর্য, আশ্রয়।

কিন্তু বিয়ে করবে কী করে কুশল? সেই কথাটা যে আজও টুপুকে বলা হয়নি। তাই সে ছোটোভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। অনেকদিন ধরেই এক সরকারি হর্তাকর্তা তাঁর মেয়েকে কুশলের ঘরে দেওয়ার জন্য অস্থির। কুশল তাঁকে তাই বিমুখ করল না। নিজে বিয়ে না করে ভাইয়ের সঙ্গে দিয়ে দিল।

আজও বড়ো লাজুক কুশল, এখনও যতদূর সম্ভব সৎ ও সচ্চরিত্র। এখনও তার চেহারায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসম্ভব ভালোমানুষির ছাপ রয়ে গেছে।

খুব সকালবেলায় একদিন একটা পুরোনো গাড়িতে টুপু এসে তার বাড়ির সামনে নামল। খুবই কুণ্ঠিত আর লজ্জিত ভঙ্গিতে এল ভেতরে।

বলল—তুমি কি ভীষণ বড়োলোক হয়ে গেছ! কী করে হলে?

লজ্জিত কুশল বলে—শোনো টুপু, ওসব কথা বোলো না। মেয়েরা টাকাপয়সার কথা বললে আমার ভালো লাগে না।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে—আমার খবর জানো?

জানি টুপু, তুমি আজকাল একদম কন্ট্রাক্ট পাচ্ছ না। খবর নিয়ে জেনেছি, তুমি অনেক টাকা চাও বলে কেউ তোমাকে ছবিতে নেয় না! তার ওপর তুমি শুটিংয়েও যাও না ঠিকমতো।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে—আরও আছে। আমি নাকি নতুন নায়কদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছি। প্রায়ই নাকি ইউনিট থেকে তাদের কাউকে নিয়ে ইচ্ছেমতো চলে যাই ফুর্তি করতে। এসব শোনোনি?

শুনেছি।

বোগাস। এর কিছুই সত্যি নয় কুশলদা। এখন আমি ঘর থেকে মোটেই বেরোই না। অন্ধকারে বসে বসে কাঁদি।

কেন কাঁদো টুপু? তোমার দুঃখ কী?

বোঝো না। মানুষ যখন গুরুত্ব হারায়, যখন নিজের ধর্ম থেকে, ভিত থেকে নড়ে যায় তখন যে দুঃখ, তার তুলনা নেই।

বাজে কথা টুপু। তুমি গরিব বামুনের মেয়ে। তোমার ধর্ম বলো, ভিত বলো, গুরুত্ব বলো, তার কিছুই তো তুমি পাওনি। যা পেয়েছিলে, যে অর্থ, যশ ও গুরুত্ব, তা তোমার পাওনা জিনিস ছিল না। একটু ভেবে দেখো।

তবে কী আমার পাওনা ছিল?

কুশল ভেবে বলে—বোধহয় ভালোবাসার মানুষের জন্য কষ্ট করার তৃপ্তিই মানুষের সবচেয়ে বড়ো পাওনা।

ও বাবা, তুমি খুব কথা শিখেছ আজকাল। শিখবেই, বড়োলোক হয়েছ তো। বড়োলোকদের সবকথা বলবার অধিকার আছে।

কুশল যন্ত্রণায় কাতর স্বরে বলে—না টুপু। আমাকে বড়োলোক বোলো না। আমি চেষ্টা করেছি মাত্র। চেষ্টাই মানুষের জীবন। বিষয়ের পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন কি সবার হয়?

আমি অত বুঝি না কুশলদা। আমি বলতে এসেছি আমি একটা ছবি প্রোডিউস করব। টাকা দাও। শেষবার একটা চেষ্টা করে দেখি।

দেব। কুশল বিনা দ্বিধায় বলে।

৪

উপগুপ্ত আর বাসবদত্তার কবিতাটার শেষে যা ছিল, তাই বুঝি ঘনিয়ে আসে। ছবিটা একদম চলল না। কুশল জানত, তাই টাকাটাকে খরচের খাতায় ধরে রেখেছিল।

প্রেস শো-তে তার পাশেই বসে ছিল টুপু। বলল—চলবে না, না গো কুশলদা?

কুশল খুব দুঃখিত মনে মৃদুস্বরে বলে—বোধহয় না।

কেন কুশলদা? আমি তো আমার সর্বস্ব দিয়ে অভিনয় করেছি, গল্পটাও ভালো ছিল। সবই চেষ্টা করেছি।

কুশল তেমনি মৃদুস্বরে বলে—টুপু, কেন এত করলে? এর চেয়ে অনেক কম কষ্টে সুখী হওয়া যেত জীবনে।

বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে টুপু একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে এখন। একা একা। মা আর ভাই আলাদা থাকে। তাদের সঙ্গে বনিবনা হয় না টুপুর।

তার সেই অ্যাপার্টমেন্টে বিরাট পার্টি দিয়েছে টুপু তার জন্মদিনে। কুশলকেও নিমন্ত্রণ করেছে। কুশল সময় পায় না, তবু সময় করে গেল পার্টিতে।

গিয়ে দেখে, ফ্ল্যাটটা একদম ফাঁকা। রাশি রাশি খাবার সাজানো টেবিলে, ঘরদোরে প্রচুর আলো, সাজগোজ। তবু কেউ নেই। এমনকী একটা বুড়ি ঝি ছাড়া অন্য কাজের লোকও কেউ নেই। টুপু একটা সাদা

খোলের তাঁতের শাড়ি পরে এলোচুলে জানলার ধারে বসে বই পড়ছে। মুখটা ম্লান, কিন্তু প্রসাধনহীন বলে তার সেই কৈশোরের কমনীয়তাটুকু ফুটে আছে।

কুশল অবাক হয়ে বলে—কী হল, লোকজন সব কই?

টুপু বই বন্ধ করে হেসে উঠে আসে, বলে—লোকজন! তারা আবার কারা? কাউকে বলিনি তো! শুধু তোমাকে।

তাহলে এত আয়োজন দেখছি কেন?

টুপু অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে কুশলের মুখের দিকে। তারপর খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলে—শোনো, আমি জীবনে দেদার পার্টি দিয়েছি। পার্টির শেষে যখন সবাই চলে যায়, তখন এঁটো বাসন, শূন্য মদের বোতল, ভাঙা কাচ, দলিত সব পড়ে থাকে। ঘরটা বীভৎস লাগে। মনে হয় পরিত্যক্ত, ভূতুড়ে। তাই আজ কাউকে বলিনি।

আমাকে যে বললে!

তুমি! ওঃ, তোমার কথা আলাদা। আজ আমরা দুজনে পার্টি করব। আর আমাদের চারিদিকে শূন্য চেয়ার, ফাঁকা ঘর, আর নির্জনতা থাকবে। কুশলদা তোমার একার জন্যই আজ পঞ্চাশজনের আয়োজন। তুমি সব এঁটো করে, নষ্ট করে দাও! আমি দেখি।

পাগল! কুশল বলে।

আমি পুরুষকে লজ্জা পেতে বহুকাল ভুলে গেছি। কিন্তু জানো আবার আমার খুব ইচ্ছে করে লজ্জা করতে। আমাকে একটু লজ্জা দাও কুশলদা।

পাগল! কুশল হেলাভরে বলে।

শোনো, তুমি ভাবছ আমি মদ খেয়েছি। না গো, এই দেখো, শুঁকে দেখো মুখ। বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। এই বলে ছোট্ট সুন্দর মুখখানা হাঁ করে কাছে এগিয়ে আনে টুপু।

কুশল ওর মুখের বাতাস শুঁকল। কী সুন্দর গন্ধ! ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে।

টুপু শ্বাস ফেলে মুখ সরিয়ে নিয়ে বললে—আজ আমার জন্মদিন কুশলদা। তুমি আমাকে কী দেবে?

সোনার একটা গয়না এনেছে কুশল। কিন্তু সেটা বের করল না। একটু ভাবল। তারপর বলল—টুপু, বহুকাল হয় তোমাকে একটা কথা বলা চেষ্টা করছি। আজ তোমাকে সেই কথাটা বলি বরং। সেইটেই জন্মদিনের উপহার বলে নিয়ো।

কথা! বলে টুপু হাঁ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে—এতদিন বলোনি কেন?

সময় হয়নি। কথারও সময় আছে টুপু।

টুপু হেসে মাথা নীচু করে লজ্জায়। তারপর অল্প একটু শ্বাসকষ্টের সঙ্গে বলে—আজ বুঝি সময় হয়েছে?

হ্যাঁ। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এবার বলি। টুপু...

টুপু দু-হাতে কান চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে—পায়ে পড়ি, বোলো না, বোলো না তো! বললেই ফুরিয়ে যাবে।

বলব না? কুশল অবাক।

টুপু স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে হাসল, বলল—সারাজীবন ধরে ওই কথাটা একটু একটু করে বোলো। কথা দিয়ে নয়, অন্যরকম ভাবে।

পুরোনো চিঠি

নিশুত রাতে এসেছিল এক ডাকপিয়োন। দরজা খুলে দেখি ব্যাগভরতি চিঠি হাত ভরতি চিঠির ভারে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো-সুড়ো লোকটা। জ্যোৎস্নায় ভেজা তার দাড়ি, চাঁদের গুঁড়ো লেগে আছে তার উড়োখুড়ো পিঙ্গল চুলে, জ্যোৎস্নার রস টলটল করছে তার চোখভরে। উজাড় করে সে চিঠি ঢেলে দিল আমার দুই হাতের আঁজলায়। হাত উপচে চিঠির পর চিঠি গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়, সিঁড়িতে, ছিটকে পড়ল সিঁড়ির নীচেকার ঘাসে। ব্যস্ত হয়ে চিঠিগুলো কুড়িয়ে নিতে থাকি। খুলে পড়তে গিয়ে দেখি, এ সবই পুরোনো সব চিঠি, আদালতের সপিনা, জীবনবিমার প্রিমিয়ামের নোটিস, বিয়ের আগেকার প্রেমপত্র। সুসংবাদ-দুঃসংবাদে-ভরা এসব চিঠি তো আমি কবেই পেয়েছি, তবে কোথা থেকে আবার ঘুরে এল এগুলো? শুনতে পেলাম বুড়ো পিয়োনটা পাড়ার দরজায় দরজায় নিশুতরাতে কড়া নেড়ে ফিরছে, বিলি করছে পুরোনো সব চিঠি, দলিল, নোটিস।

ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম বিছানায়। স্বপ্ন। শিয়রের জানলা দিয়ে একটু শীতরাতের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে আমার ঘুমন্ত মেয়ে আর বউয়ের মুখে। একটু চেয়ে থাকলাম মুখ দুটোর দিকে।

মায়ের বুক ঘেঁষে কেমন নিবিড়ভাবে শুয়ে আছে মেয়েটা। জেগে উঠে আবার স্বপ্নে দেখা পিয়োনটার কথা মনে পড়ল। চিঠির ভারে নুয়ে পড়া পিয়োনটা বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলছে, আর বিলি করছে তামাদি সব কাগজ, ভুলে যাওয়া সব পুরোনো চিঠি। স্বপ্নটার মানে কী?

নি:সাড়ে বিছানা ছেড়ে উঠে আসি। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখি, আকাশে স্টিমারের আলোর মতো এক গোল চাঁদ। নির্জন জ্যোৎস্নায় চোরের মতো পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে বাতাস, জানালায় উঁকি দেয় লোভী বেড়ালের চোখ। রাস্তায় চৌকিদার লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটছে।

বুকের বাঁ-ধারে একটু ব্যথা টের পাই। মনটা বিষণ্ণ। জল খেলাম, একটা আস্ত সিগারেট শেষ করলাম, তবু আর শুতে ইচ্ছে করল না। মনের মধ্যে একটু ভয় ভয় ভাব। ঘড়ি দেখলাম। তিনটে। রাত ফুরোতে ঢের দেরি। অন্ধকারে একা ভূতের মতো বসে রইলাম। রাতটা অস্বস্তির সঙ্গে কেটে গেল।

সকালে মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরোই। আমার পাঁচবছরের মেয়ে মুন্নি কুকুর দেখে, বেড়াল দেখে, পাখি দেখে, থেমে থেমে হাঁটে। আমি মাঝে মাঝে এগিয়ে যাই, সে পেছনে পড়ে থাকে। তারপর দৌড়ে এসে আমাকে আবার ধরে। এত সকালে রাস্তায় লোক চলাচল থাকে না। ভারি নির্জন রাস্তা। ভোরের গন্ধটি কেমন সতেজ, আলোটি কেমন ছায়াময়। হাঁটতে হাঁটতে আমরা কথা বলি।

মুন্নি বলে—আমার হাত ছেড়ে দাও বাবা, আমি তো একাই হাঁটতে পারি।

ঠিক তো। বলে আমি হাত ছেড়ে দিই তার।

মুন্নি হাসে—তবে কেন আমার হাত ধরে থাকো রোজ? আমি কি হারিয়ে যাই?

না না। আমি তাড়াতাড়ি বলি—'তুমি তো হারাও না, আমিই হারিয়ে যাই মা, সেই ভয়ে হাত ধরে থাকি।'

তুমি কি ছোট্ট?

বলি—হুঁ।

আমার চেয়েও ছোট্ট?

তোমার চেয়েও।

কাল থেকে তো আমি ইশকুলে যাব, তখন কার সঙ্গে তুমি বেড়াবে?

একটু চমকে উঠি। ঠিক। মুন্নি কাল থেকে প্রথম ইশকুলে যাবে। কাল থেকে আমি কার সঙ্গে হাঁটব?

ম্লান হেসে বলি—একাই বেড়াব মা।

যদি হারিয়ে যাও?

'হারিয়ে যাব?' হঠাৎ আমাকে ঘিরে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। নিজেকেই প্রশ্ন করি 'হারিয়ে যাব?'

মুন্নি পিছিয়ে পড়ে। তার জুতোয় কাঁকর ঢুকেছে। জুতো খুলে কাঁকরটা বের করছে সে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াই। পিছু ফিরে দেখি, শূন্য রাস্তার মাঝখানে আমার শিশু মেয়ে একা। ঝাঁকড়া চুল মুখের ওপর ফেলে উবু হয়ে জুতো পরিষ্কার করছে। দৃশ্যটা থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

নিশুত রাতে এসেছিল এক ডাকপিয়োন। আমার সারাজীবনের সব স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। বোধহয় আমার আর কোনো চিঠি আসবে না। আমি যেন ঠিক মোহানার কাছে পৌঁছোনো এক নদী, যার স্রোতের আর কোনো চল নেই। সামনে মহাসমুদ্র।

আমি মুন্নির জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু আমার দিকে তার আর মনোযোগ নেই। সে কাককে ঢিল ছুঁড়ছে। আমি একটু হাসি, তারপর এগিয়ে যেতে থাকি। মুন্নি একা আসতে পারবে। আমি যখন থাকব না, তখনও তো মুন্নিকে একাই হাঁটতে হবে।

নীলুর দুঃখ

সক্কালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ। ধারেকাছে কোনো পেমেন্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর—মহা টিকরমবাজ লোক—সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল তখন হাসি-হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতার বাইরে থাকবে বলে বুঝি ওই প্রসন্নতা—ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনদিনের বাজার-খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারাবিকেল খচখচ করেছে। আজ সকালেই মশারির মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুলল মা—বাজার যাবি না, ও নীলু?

তখনই বোঝা গেল বুড়ো চাক্কি রেখে যায়নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রনোকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথড্রয়াল ফর্ম ফেরত দিয়েছে পোস্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিকরমবাজি। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটা মুদির দোকান দিয়েছিল—অনভিজ্ঞ লোক, তার ওপর দোকান ভেঙে খেত—ফলে দোকান গেল উঠে। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোস্ট অফিসে রাখে আর প্রতিসপ্তাহে খরচ তোলে। প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভজে না। মাসের শেষদিকে টাকা ফুরোলেই টিকরমবাজি শুরু হয়। প্রতিসপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে তার নাকি দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনো বুড়োর ওপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে আড়ে চায় মাসের শেষদিকটায়। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে বাবার একটা লুকোচুরির খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারির নাড়ুমামা, মামি, ছেলে, ছেলে-বউ—চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন—নীলু নিজে, মা, ছ-টা ভাই, দুটো ধুমসি বোন, বিধবা মাখনী পিসি, বাবার জ্যাঠাতো ভাই, আইবুড়ো নিবারণ কাকা—বিশ চাক্কির নীচে বাজার নামে?

রবিবার। বাজার নামিয়ে রেখে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। ক-দিন ধরেই পোগো ঘুরছে পেছন পেছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি। ছুরিগুলো তার মায়ের পুরোনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোকে বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে—কী পোগোবাবু, আজ ক-টা মার্ডার হল? পোগো হুসহাস করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজোবউদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল—পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায়, নীলু, খবর রাখো?

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল, কয়েকদিন যাবৎ সে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ করেছে পোগো নি:শব্দে আসছে পেছন পেছন। বাস-স্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনো ফিরে তাকালে পোগো ঊর্ধ্বমুখে আকাশ দেখে

আর বিড়বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে যাওয়ায় নীলুর মেজাজ ভালো ছিল না! নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিল পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না-দেখার ভান করে কিছুদূর গিয়েই নীলু টের পেল পোগো পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পোগো উলটোবাগে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু—শালা, বদের হাঁড়ি।

কাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগো। জিভ আর প্যালেটের কোনো দোষ আছে পোগোর, এখনও জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীরে তিন বছর বয়েসি মগজ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল—খুব ঠাবঢান, নীলু, বলে ডিট্টি খুব ঠাবঢান!

ফের! কষাব আরেকটা?

পোগো থতিয়ে যায়। শার্টের ভেতরে লুকোনো হাত ছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গিতে রেখে বলে—একডিন ফুটে ডাবি ঠালা।

নীলু আরেকবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড়বিড় করতে করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে পোগো। সাত-আটখানা ছুরি বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে ও নিজে মরে—সেই ভয়ে ও ঘুমোলে ওর মা এসে হাতড়ে হাতড়ে ছুরিগুলো সরিয়ে নেয়। মার্ডারের বড়ো শখ পোগোর। সারাদিন সে লোককে কত মার্ডারের গল্প করে। কলকাতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দু-হাত তুলে লাফায়। মার্ডারের গল্প যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তার সেই শখের ভোজালিটা দিনসাতেক আগে একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেওয়ার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল—ভয় নেই, ভালো করে ঢুয়ে ডিয়েটি।

কী ধুয়েছিস? জিজ্ঞেস করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুঝে নাও কী ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু—শালার শয়তানি বুদ্ধি দেখো। ধুয়ে দিয়েছি—কী ধুয়েছিস আব্বে পোগোর বাচ্চা?

সেই থেকেই বোধহয় নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিস্টে নীলু ছাড়া আরও অনেকের নাম আছে যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে ব্রিটিশকে খুঁজছে নীলু। কাল ব্রিটিশ জিতেছে। দুশো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল।

গলির মুখ আটকে খুদে প্যাণ্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত-জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধেবেলায়। পাড়ার মেয়ে-বউ, বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশন যখন জমজমাট, তখন বড়ো রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে ব্রিটিশ নামল। টলতে টলতে ঢুকল গলিতে, দু-বগলে বাংলার বোতল। সঙ্গে ছটকু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশনের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার জন্য দু-হাত ওপরে তুলে হাঁকাড় ছেড়েছিল ব্রিটিশ—ঈ-ঈ-ঈ-দ কা চাঁ-আ-আ-দ। বগল থেকে দুটো বোতল পড়ে গিয়ে ফট-ফটাস করে ভাঙল। হুড়দৌড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশনে। পাঁচ বছরের টুমিরানি তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে ‘কাঠবেড়ালি, কাঠবেড়ালি, পেয়ারা তুমি খাও...’ বলে দুলতে দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হাঁ করেছিল মাত্র। সেই সময়ে নীলু, জগু, জাপান এসে দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু ব্রিটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পেছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কত জিতেছিস? প্রথমে ব্রিটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল—আব্বে, পঞ্চা-আ-শ হা-জা-আ-র। জাপান আরও দু-বার হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু-হাজারে। সেটাও বিশ্বাস হল না কারও। পাড়ার বুকি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছে, ঈদ কা চাঁদ হট ফেবারিট ছিল। আরও কয়েকবার

ঝাঁকাড় খেয়ে সত্যি কথা বলল ব্রিটিশ—তিনশো মাইরি বলছি—বিশ্বাস করো। পকেট সার্চ করে শ-দুইয়ের মতো পাওয়া গিয়েছিল।

আজ সকালে তাই ব্রিটিশকে খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। ব্রিটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে ব্রিটিশের টেরিকটনের প্যান্টটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি। গতকাল নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে ব্রিটিশকে পাওয়া গেল না। ভি আই পি রোডের মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে, সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশিক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা ব্রিটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তারা এমন মানুষ দেখেনি যার পকেটে ফালতু দুশো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল। কে জানে রাতে আবার ওরা ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কি না! গিয়ে থাকলে ওরা এখনও বিছানা নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। ব্রিটিশের বাড়িতে আজকাল আর খায় না নীলু। ব্রিটিশের মা আর দাদার সন্দেহ ওকে নষ্ট করেছে নীলুই। নইলে নীলু গিয়ে ব্রিটিশকে টেনে তুলত বিছানা থেকে, বলত—না, হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাই না, আমার হক্কেরটা দিয়ে দে।

না:। আবার ভেবে দেখল নীলু। দুশো টাকামাত্র, দুশো টাকার আয়ু এ বাজারে কতক্ষণ? কাল যদি ওরা সেকেণ্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায় তবে ব্রিটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে, বিশ চাক্কি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কীভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

অমনি শোভন আর তার বউ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার। শোভন কাজ করে কাস্টমসে। তিনবারে তিনটে বিলিতি টেরিলিনের শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তায় একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন—যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে নীলু শোভন, বল্লরী আর ওদের দুটো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভালো করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিন স্টপ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল নটা বাজে। আজ ছুটির দিন, বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি। উনুনে আঁচ দিয়ে চা-ফা, লুচি-ফুচি হচ্ছে এখনও। দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরি বোধহয় হয়নি এখনও।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে। বাসটা দখল করে আছে দশ-বারো জন ছেলেছোকরা। পরনে শার্ট পায়জামা, কিংবা সরু প্যান্ট। বয়স ষোলোর এদিক ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলার আগের গলাখাঁকারির—খ্যা-অ্যা-অ্যা-র মতো শোনাচ্ছিল। লেডিজ সিটে দু-তিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। দু-চারজন ভদ্রলোক ঘাড় সটান করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে কথা বলছে। উলটোপালটা কথা, গানের কলি। কণ্ডাক্টর দুজন দু-দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাড়া চাইবার সাহস নেই!

তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে আর একজনকে ডেকে বলছে—পরমেশ, আমাদের ভাড়াটা দিলি না?

কত করে?

আমাদের হাফ-টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।

এই যে কণ্ডাক্টরদাদা, পাঁচ পয়সা টিকিট আছে তো! বারোখানা দিন।

পেছনের কণ্ডাক্টর রোগা, লম্বা, ফর্সা। না-কামানো কয়েক দিনের দাড়ি থুতনিতে জমে আছে। এবড়োখেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষণ্ণ দেখায়। সে তবু একটু হাসল ছোকরাদের কথায়।

অসহায় হাসিটি।
নীলু বসার জায়গা পায়নি। কণ্ডাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।
বাইরে কোথাও পরিবার-পরিকল্পনার হোর্ডিং দেখে জানালার পাশে বসা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল—লাল ত্রিভুজটা কী বল তো মাইরি!
ট্র্যাফিক সিগন্যাল বে, লাল দেখলে থেমে যাবি।
আর নিরোধ! নিরোধটা কী যেন!
রাজার টুপি...রাজার টুপি...
খ্যা-অ্যা-অ্যা-খ্যা-অ্যা-অ্যা...
খ্যা...
পরের স্টপে বাস আসতে তারা হেঁকে বলল—বেঁধে...লেডিজ...
নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল এবার। সবাই শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা-চোখে যুবা কণ্ডাক্টরের দিকে চেয়ে বলল—লাথি দিয়ে নামিয়ে নিতে পারেন না এসব এলিমেন্টকে!
কণ্ডাক্টর ম্লান মুখে হাসে।
ঝুঁকে নীলু দেখছিল ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশে টিটকিরি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। লাঠি ছোরা বোমা যা হোক অস্ত্র নিয়ে কয়েকটাকে খুন করে আসতে ইচ্ছে করে।
হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোগো। স্বপ্ন দেখছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পেছনে লাগে, মাঝে মধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতোই এক তীব্র মার্ডারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর মধ্যেও মাঝে মাঝে। এত তীব্র যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যান মন।
শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে চোখ কপালে তুলল—ওমা, আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলায়। অনেকদিন বাঁচবেন।
শোভনের বৈঠকখানাটা খুব ছিমছাম, সাজানো। বেতের সোফা, কাচের বুককেস, গ্রুণ্ডিগের রেডিয়োগ্রাম, কাচের টবে মানিপ্ল্যান্ট, দেয়ালে বিদেশি ছবিওলা ক্যালেণ্ডার, মেঝেয় কয়ের কার্পেট। মাঝখানে নীচু টেবিলের ওপর মাখনের মতো রঙের ঝকঝকে অ্যাশট্রেটার সৌন্দর্যও দেখবার মতন। মেঝেয়ে ইংরিজি ছড়ার বই খুলে বসেছিল শোভনের চার আর তিন বছর বয়েসের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরেজি কায়দায় থাকতেই ভালোবাসে শোভন। মিলিকে কিণ্ডারগার্টেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরিজি ছড়া মুখস্থ বলে।
নীলুকে দেখেই মিলি-জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল।
মিলি বলে—তুমি বলেছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়। এঁটো কী?
দুজনকে দু-কোলে তুলে নিয়ে ভারি একরকমের সুখবোধ করে নীলু। ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ।
মিলি-জুলি তার চুল, জামার কলার লন্ডভন্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে—তোমার হাঁড়ি চড়ে গেছে নাকি উনুনে!
এইবার চড়বে। বাজার এল এইমাত্র।
হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ। বাপ গেছে বারুইপুর। সকালেই বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! তোমার এ দুটো পুঁটলি নিয়ে দুপুরের আগেই চলে যেয়ো আমার গাড্ডায়, ঘুমে লিয়ো সবাই।
বল্লরী ঝেঁঝে ওঠে—কী যে সব অসভ্য কথা শিখছেন বাজে লোকদের কাছ থেকে। নেমন্তন্নের ওই ভাষা।
বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে—চলে যাস না নীলু, কথা আছে।

যেয়ো কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে—নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

বা:, আমার যে ডালের জল চড়ানো হয়ে গেছে। এত বেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ!

নীলু সেসব কথায় কান দেয় না। মিলি-জুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল। মেদবহুল শরীরে সেঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙা পায়জামা। গতবছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই। চারদিনের নোটিসে। এখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে এত নিশ্চিন্ত আর তৃপ্ত আর সুখী দেখাত না তাকে।

পাছে হিংসা হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নের ব্যাপার শুনে শোভন হাসে—আমিও যাব-যাব করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম। ভালোই হল।

এককাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে—বা:, মোটে এককাপ করলে! ছুটির দিনে এ সময়ে আমারও তো এককাপ পাওনা।

বল্লরী গম্ভীরভাবে বলে—বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এককাপ খেয়েছ।

মিষ্টি ঝগড়া করে দুজন। মিলি-জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর-করা গলার স্বর শোনে নীলু। সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

তারপরই হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—চলি রে। তোরা ঠিক সময়ে চলে যাস।

শুনুন শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বল্লরী তাকে থামায়।

কী কথা?

বলছিলুম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা! তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমাদের বাড়ির দেয়ালে রাজনীতির কথা লিখে যায়? তারা কারা? আপনাদেরই তো এলাকা এটা, আপনার জানার কথা!

কী লিখেছে?

সে অনেক কথা। ঢোকার সময়ে দেখেননি? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাইরেটা রং করালুম। দেখুন গিয়ে, কালো রং দিয়ে ছবি এঁকে লিখে কী করে গেছে শ্রী! তা ছাড়া রাতভর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি।

নীলু উদাসভাবে বলে—বারণ করে দিলেই পারো।

কে বারণ করবে? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরাল আর ইংরিজিতে আপনমনে গালাগাল দিতে লাগল—ভ্যাগাবণ্ডস, মিসফিটস, প্যারাসাইটস... আরও কত কী! সাহস নেই যে উঠে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।

তা তুমি ধমকালে না কেন? নীলু বলে উদাস ভাবটা বজায় রেখেই।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল—ধমকাইনি নাকি! শেষমেশ আমিই তো উঠলাম। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম—ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমোব না? আপনার বন্ধু তো আমার কান্ড দেখে অস্থির। পেছন থেকে আঁচল টেনে ফিসফিস করে বলছে—চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মতো চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে, হাতে কিছু চটি চটি বই, প্যামফ্লেট। আমার দিকে হাতজোড় করে বলল—বউদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই। এখন তো ঘুমের সময় না এদেশে। বললুম—আমার দেয়ালটা অমন নোংরা হয়ে গেল যে। একটা ছেলে বলল—কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেওয়ালটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট হল আগের চেয়ে। লোকে এখানে দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞানলাভ

করবে। আমি বুঝলুম খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানলা বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটি মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল—বউদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন? আমরা ছ-জন আছি!

নীলু চমকে উঠে বলে—খাওয়ালে নাকি?

বল্লরী মাথা হেলিয়ে বলল—খাওয়াব না কেন?

সে কী!

শোভন মাথা নেড়ে বলল—আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি। একদিন বিপদে পড়বে।

আহা, ভয়ের কী! এইটুকু-টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়েসি। মিষ্টি কথাবার্তা। তা ছাড়া এই শরতের হিমে সারারাত জেগে বাইরে থাকছে—ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম।

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে বলে—তার মানে তুমিও ওদের দলে।

আহা, আমি কি জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারো দল দেওয়ালে লেখে। আমি কী করে বুঝব!

তুমি ঠিকই বুঝেছ। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা কি আমি জানি না! সেদিন খবরের কাগজে বাবুলর কলেজে ইলেকশনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিমপ্যাথাইজার।

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলে—না, বিশ্বাস করুন। আমি দেখিওনি ওরা কী লিখেছে।

নীলু হাসে—কিন্তু চা তো খাইয়েছ!

হ্যাঁ। সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ-পেয়ালা চা করতে কতক্ষণ লাগে। ওরা কী খুশি হল! বলল—বউদি, দরকার পড়লে আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময়ে পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গেল। ওরা ভালো না?

নীলু শান্তভাবে একটু মুচকি হাসে—কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলছিলে যে! এ তো নালিশ নয়। প্রশংসা।

না, নালিশই। কারণ, আজ সকালে হঠাৎ গোটা দুই বড়ো বড়ো ছেলে এসে হাজির। বলল—আপনাদের দেওয়ালে ওসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব অ্যালাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থমথমে মুখ করে চলে গেল। আপনি ওই ছ-জনকে যদি চিনতে পারেন তবে বলবেন—ওরা যেন আমাদের দেওয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড়ো বিপদে পড়ে যাই। দু-দলের মাঝখানে থাকতে ভয় করে আমাদের। বলবেন যদি চিনতে পারেন।

শোভন মাথা নেড়ে বলে—তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আরেকটা বাসা দ্যাখ। এই দেয়ালের লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দূর গড়ায় কে জানে। এর পর বোমা কিংবা পেটো ছুঁড়ে দিয়ে যাবে জানালা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে। তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে—যদি সে ঘটনার সাক্ষীসাবুদ কেউ থেকে থাকে তবে এখানে থাকাটা বেশ রিস্কি এখন।

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল—বুঝলেন তো! আমাদের কোনো দলের ওপর রাগ নেই। রাতজাগা ছ-টা ছেলেকে চা খাইয়েছি—সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।

বেরিয়ে আসার সময়ে দেয়ালের লেখাটা নীলু একপলক দেখল। তেমন কিছু দেখার নেই। সারা কলকাতার দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নি:শব্দে।

কয়েকদিন আগে এক সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু দেখেছিল প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালের সামনে। পড়ছেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন—এইসব লেখা দেখেছ নীলু? কীরকম স্বার্থপরতার কথা। আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হত। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে—দেখেছ কীরকম উলটো শিক্ষা!

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন—হেসো না। রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন তার মানে বোঝো?

নীলু মাথা নেড়েছিল। না।

উনি বললেন—আমি এতদিনে সেটা বুঝেছি। রামকৃষ্ণদেব আমাদের দুটো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডের প্রতীক কামিনী, মার্ক্সের কাঞ্চন। ও-দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যভিচার আর স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার কী মনে হয়?

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল।

হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন—তবে এর মানে কী? অ্যাঁ! পড়ে দেখো, এসব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কি না।

তারপর থেকে যতবার সেই কথা মনে পড়েছে ততবার হেসেছে নীলু। একা একা।

বেলা বেড়ে গেছে। বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্টকাট ধরল। বড়ো রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে মিশেছে সেখানেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধন—নীলুর চতুর্থ ভাই। কলেজের শেষ-ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকোল। পথচলতি অচেনা মানুষের মতো দুজনে দুজনকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না যে তারা একমায়ের পেটে জন্মেছে, একই ছাদের নীচে একই বিছানায় শোয়। নীলু শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে যাচ্ছে, কেমন তার চরিত্র—কিছুই জানা নেই নীলুর। কেবল মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে, গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন।

এখন কেন জানে না, সাধনের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন, তুই কেমন আছিস? তোর জামাপ্যান্ট নিয়েছিস তো তুই? অনার্স ছাড়িসনি তো? এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু। ফিরে আসবে ভেবে ইতস্তত করছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল সাধন তার দিকেই চেয়ে আছে। একদৃষ্টে। হয়তো জিজ্ঞেস করতে চায়—দাদা, ভালো আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, তোর ঘাড়ের নলী দেখা যাচ্ছে রে। কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হল না শেষপর্যন্ত, না? ওরা বড়োলোক, তাই? তুই আলাদা বাসা করতে রাজি হলি না, তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে—কিন্তু আমরা—ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়ো, বাবার পর তুই কেমন আগলে আছিস আমাদের! আহা রে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি যা। আমার জন্য ভাবিস না—আমি রাতচরা—কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই!

কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে এরকম নি:শব্দ কথা বলল। তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়িতে কান্ড হয়ে গেল খুব। নাড়ুমামি কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোটোবোনটা। শোভনের দুই মেয়ে কান্ড করল আরও বেশি। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল—ঘুমোতে পারল না। সাধন ছাড়া অন্য ভাইয়েরা যে যার আগে খেয়ে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ের মতো হয়ে রইল রবিবারের দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুকু আর গায়ের ফর্সা রং রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামি, আর নীলুর দুই বোন। সাধন ঘরে ঢুকতেই নীলু বল্লরীর মুখখানা লক্ষ করল।

যা ভেবেছিল তা হল না। বল্লরী চিনতে পারল না সাধনকে। মুখ তুলে দেখল একটু, তারপর চালুনির ভেতর ছক্কাটাকে খটাখট পেড়ে দান ফেলল। সাধনও চিনল না।

একটু হতাশ হল নীলু। হয়তো রাতের সেই ছেলেটা সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এখনকার মানুষ পরস্পরের মুখ বড়ো তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নীলু গলা উঁচু করে বলল—তোমার মেয়ে দুটো বড়ো কান্ড করছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

আঃ, একটু রাখুন না বাবা, আমি প্রায় পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শো-তে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামি টিকিটে বাজে একটা বাংলা ছবি দেখল তারা। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে দূরে কোথাও পেটো ফাটবার আওয়াজ ওঠে। মাঝে মধ্যে গলির মুখে মুখে যুদ্ধের ব্যূহ তৈরি করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ওই দলে। কে জানে একদিন হয়তো তার নামে একটা শহীদ স্তম্ভ উইটিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে।

পাড়া আজ নিস্তব্ধ। তার মানে নীলুর ছোটোলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো ব্রিটিশ আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালোই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালোবাসার বিয়ে। বড়ো সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষপর্যন্ত মত করলেন না। এই বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে এসে অথৈ জলে পড়বে। বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভালো হত তা সে বুঝলই না। একা হলে ঘুরেফিরে কুসুমের কথা বড়ো মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আরও দু-দিন তার কিছু চাক্কি ঝাঁক যাবে। হাসিমুখেই মেনে নেবে নীলু। নয়তো রাগই করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে নীলুর দিকে আড়ে আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালোই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে—কুসুমকে—এই চিন্তায় সে কি মাঝে মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে?

একা থাকলে অনেক চিন্তার টুকরো ঝড়ে-ওড়া কুটোকাটার মতো মাথার ভেতরে চক্কর খায়।

বাড়ির ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নি:শব্দে পিছু নেয়। মনে মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে—পোগো, কী চাস?

পোগো দূর থেকে বলে—ঠালা, টোকে মার্ডার করব।

ক্লান্ত গলায় নীলু বলে—আয়, করে যা মার্ডার।

পোগো চুপ থাকে একটু, সতর্ক গলায় বলে—মারবি না বল!

বড়ো কষ্ট হয় নীলুর। ধীরে ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—মারব না। আয়, একটা সিগারেট খা।

পোগো খুশি হয়ে এগিয়ে আসে।

নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ির সিঁড়িতে বসে নীলু, পাশে পাগলা পোগো। সিগারেট ধরিয়ে নেয় দুজনে। তারপর—যা নীলু কখনো কাউকে বলতে পারে না—সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প—কুসুমের গল্প—অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে।

পোগো নিবিষ্ট মনে বোঝবার চেষ্টা করে।

চিহ্ন

অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছে জ্বলন্ত মোমবাতি।

হলুদ আলোয় যেন জলের মধ্যে জেগে আছে ইভার মুখ। মুখখানা এখন ভৌতিক। একটু নীচুতে আলো, শিখাটা হেলছে, দুলছে, কাঁপছে। ইভার মুখে সেই আলো। গালের গর্তে, চোখের গর্তে, কপালের ভাঁজে ছায়া। মুখখানা যেন বা এখন ইভার নয়। ইভা এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে। মাঝখানের পর্দা উড়ছে হাওয়ায়।

অমিত বলে—সাবধান। পর্দায় আগুন না লাগে!

ইভা কিছু বলল না। জলে ক্লান্ত সাঁতারু যেমন শ্লথ গতিতে ভেসে যায়, তেমনি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে চলে গেল।

অন্ধকারে চৌকিতে বসে আছে অমিত। তার কোল ঘেঁষে পাঁচ বছরের ছেলে টুবলু আর তিন বছরের মেয়ে অনিতা। যখনই কারেন্ট চলে যায় তখনই অমিত তার দুই ছেলে-মেয়েকে ডেকে নিয়ে বিছানায় বসে থাকে। বড্ড ভীতু অমিত। অন্ধকারে কোথায় কোন পোকামাকড় কামড়ায় কিংবা আসবাবপত্রে হোঁচট লাগে। কিংবা খোলা পড়ে-থাকা ব্লেড বা ইভার পেতে-রাখা অসাবধান বঁটিতে গিয়ে পড়ে। কিংবা এরকম আর কিছু হয় সেই ভয় তার। বুক ঘেঁষে ছেলে-মেয়েরা বসে আছে বুকের দুই পাঁজরে দুজনের মাথা। অমিত ঘামছে।

—একটা মোমবাতি এ-ঘরে দেবে না? অমিত চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

রান্নাঘর থেকে ইভার উত্তর আসে না! ইভা ওরকমই। আজকাল দু-তিনবার জিজ্ঞেস না করলে উত্তর দেয় না।

—কী গো? অমিত বলল।

ইভা আস্তে আস্তে বলে—মোমবাতি দিয়ে কী হবে? তোমরা তো বসেই থাকবে এখন!

অন্ধকারে কি ভালো লাগে?

না লাগলেও কিছু করার নেই। মোমবাতি একটাই ছিল।

ওঃ। অমিত সিগারেট ধরাল।

অনিতার মাথাটা বুক থেকে স্খলিত হয়ে কোলে নেমে এল। তার দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ হয়। ঘুমিয়ে পড়বে মেয়েটা।

অমিত নীচু হয়ে ডাকল—অনি, ও অনি!

উঁ! ক্ষীণ পাখি-গলায় সাড়া দেয় অনিতা।

এখন ঘুমোয় না মা, ভাত খেয়ে ঘুমোবে।

খাব না।

খাব না কী? খেতে হয়। গল্পটা শোনো।

ঘুম গলাতেই অনিতা বলে—বলো তাহলে।

এইটুকু বয়সেই কী টনটনে উচ্চারণ মেয়েটার। পরিষ্কার কথা বলে, এতটুকু শিশুসুলভ আধো-কথার জড়তা নেই। অমিত মাঝে-মাঝে ইভাকে বলে—আমরা ছেলেবয়সে এত পাকা কথা বলতে পারতামই না। এখনকার ছেলে-মেয়েরা কীরকম অল্প বয়েসেই পাকা হয়ে যায়।

ঘুমন্ত মেয়েটাকে টেনে বসায় অমিত। মাথাটা আবার পাঁজরে লাগে। অনেকক্ষণ চুপচাপ ব্যাপারটা লক্ষ করে টুবলু বলে—আমি ঘুমোই না। ঘুমোই, বাবা?

না তো। তুমি লক্ষ্মী ছেলে।

ছেলেটার জন্য কত মায়া অমিতের, ভারি ভীতু ছেলে, ঘরকুনো। এ-বয়সে যেমন দুরন্ত হয় বাচ্চারা, তেমন নয়। রোগা দুর্বল ন্যাতানো। স্টেশন রোড-এর এক বুড়ো হোমিওপ্যাথ গত বছরখানেক যাবৎ ওষুধ দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেটার তেমন বাড়ন নেই। খেতে চায় না, কখনো ওর তেষ্টা পায় না, খেলে না। ইভার ইচ্ছে একজন চাইল্ড স্পেশালিস্টকে দেখায়। সেটা হয়তো ধারকর্জ করে দেখাতেও পারত অমিত। কিন্তু তার কলেজের একজন কলিগ ছেলেকে স্পেশালিস্ট দিয়ে দেখানোর পর যে খাওয়ার চার্ট আর ওষুধ-বিষুধের ফিরিস্তি দিয়েছিল তাতে অমিত ভড়কে যায়। তাই গত একবছর যাবৎ ইভা বিস্তর অনুযোগ করা সত্ত্বেও অমিত গা করেনি। যাক গে, কৃষ্ণের জীব, টিকটিক করে বেঁচে থাক। বড়ো হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেবয়েসে অমিতও তো কত ভুগেছে, মাসেক ধরে রক্তআমাশা, চিকিৎসা-ফিকিৎসা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। গাঁদাল পাতা বাটা, থানকুনির ঝোল, পুরোনো আতপ চালের গলা ভাত, পাড়ার এল এম এফ ডাক্তারের দেওয়া ক্যাস্টর অয়েল ইমালশান, এই খেয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে আজও বেঁচে আছে। তার ছেলেটাই বা তাহলে বাঁচবে না কেন?

সিগারেটের আগুন ফুলকি ছড়াচ্ছে। অন্ধকারে হাতড়ে অ্যাশট্রেটা ঠাহর করে অমিত। সাবধানে ছাই ঝাড়ে। বলে—একদিন একটা টিয়াপাখি উড়ে এল খরগোশের বাড়িতে, বলল—খরগোশ ভাই, আমি তোমার কাছে থাকব। খরগোশ—থাকবে তো। কিন্তু ঘর কোথায়! আমার তো ছোট্ট একটু খুপরি! টিয়াপাখি বলে—আমার বাসা পড়ে ভেঙে গেছে, এখন আমার ডিম পাড়বার সময়, তাহলে উপায়? তখন খরগোশটার দয়া হল, একটা ছোট্ট খুপরি বানিয়ে দিল টিয়াপাখিটাকে। টিয়াপাখি থাকে, ডিম পাড়ে, তা দেয়, মনে ভারি আনন্দ, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবে। কত আদর করবে বাচ্চাকে, উড়তে শেখাবে, খেতে শেখাবে, শিকার করতে শেখাবে। খরগোশ একদিন খাবার আনতে বাইরে গেছে, এমন সময়ে এক মস্ত ইঁদুর এসে হাজির। বলল—এই টিয়াপাখি, দে তোর দুটো ডিম। টিয়া বলল, কেন দেব? ডিম ফুটে আমার বাচ্চা হবে, কত আদর করব, তোকে দেব কেন? ইঁদুর বলল—দিবি না তো? তবে রে—বলে দাঁত বের করে কামড়াতে গেল...অনি, ও অনি।

উঁ।

আবার ঘুমোচ্ছিস? বলে অমিত গলা ছেড়ে বলে—ইভা, ভাত হয়েছে? অনি ঘুমিয়ে পড়ছে যে।

বাবা, তারপর? জিজ্ঞেস করে টুবলু।

বলছি দাঁড়া। দ্যাখ না বোন ঘুমিয়ে পড়ছে। ও অনি!

হঠাৎ অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো আসে ইভা। কথা বলে না। নড়া ধরে হিঁচড়ে টেনে নেয় মেয়েটাকে। ছেলেটাকে টানতে হয় না। ভীতু ছেলে। অন্ধকারেই টের পায় মা-র মেজাজ ভালো নেই। সে রোগা পায়ে লাফ দিয়ে নামে চৌকি থেকে। মার পিছু-পিছু বাধ্য ছেলের মতো যায়।

দু-ঘরের মাঝখানে পর্দা উড়ছে। ওপাশেরটা আসলে ঘর নয়। রান্নাঘর। সেখানে মোমের আলোর আভা। অন্ধকারে বসে অমিত সেই মৃদু আভার দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটা খেতে চাইছে না। ইভা তার হাতের চুড়ির শব্দ তুলে দুটো চড় কষাল। মেয়েটা কাঁদছে। ইভা চাপা স্বরে মেয়েকে বকছে এবং মেয়েকে বকতে-

বকতেই বকার ঝাঁঝটা নিজের কপালের এবং ভাগ্যের প্রসঙ্গে বলে যাচ্ছে। অমিত চুপ করে বসে শোনে। ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে একটা লাথিতে মেয়েমানুষকে চুপ করায়।

লাথি যে কখনো মারেনি অমিত তা নয়। লাথি বা চড়চাপড় কয়েকবারই মেরে দেখেছে। লাভ হয় না। সদ্য-সদ্য একটু ফল হয় বটে কিন্তু ইভা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

অবিকল ছাগলের মতো একটা লোক গলা পরিষ্কার করছে কোথায় যেন। 'হ্যা-ক' 'হ্যা-ক' শব্দটা শুনলে নিজেরও যেন বমি তুলতে ইচ্ছা করে।

কান্না থামিয়ে ছেলে-মেয়েরা এখন খাচ্ছে। গুনগুন করে এখন আবার সোহাগের গলায় ওদের গল্প শোনাচ্ছে ইভা। ইভাকে নিয়েই দিনের অধিকাংশ সময় ভাবে অমিত। বিয়ে করে তারা সুখী না অসুখী তা ঠিক বুঝতে পারে না। কেউই বোধহয় পারে না। মেয়েমানুষ জাতটার মুখের সঙ্গে মিল নেই। যখন তারা খুবই সুখে আছে তখনও পুরোনো দুঃখের কথা তুলে খোঁটা দেবেই।

খেয়ে-দেয়ে ওরা এল। ইভা মশারি টাঙাল। ওরা গল্পের বাকি অর্ধেকটা না শুনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কারেন্ট এখনও আসেনি। পৃথিবীজোড়া অন্ধকার।

মোমবাতিটা মাঝখানে রেখে দু-ধারে নি:শব্দে খেতে বসে ইভা আর অমিত, সম্পর্কটা সহজ নেই যেন। একধারে ছেলে-মেয়েদের এঁটো থালা পড়ে আছে। তাতে ডাল-ঝোল মাখা কিছু ভাত। অমিত আড়চোখে চেয়ে দেখল। এখন দু-টাকা আশি কেজি যাচ্ছে চাল। তাদের রেশন কার্ড নেই। বলল—ভাত নষ্ট করো কেন!

কী করব? শেষ কয়েকটা গরাস খেল না।

কম করে নেবে। গুচ্ছের গেলাতে চাইলেই কি হয়? ওদের পেটে জায়গা কত?

দুটো ভাতই তো, আর কী ভালোমন্দ খায়! ঘি-মাখন মাছ-মাংস কি যায় ওদের পেটে?

গরিবের সন্তান, যা জোটে তাই খেয়ে বাঁচবে।

মুরোদ না থাকলেই ওসব কথা বলে লোকে।

চালের দাম জানো?

জানতে চাই না।

মেয়েমানুষটা ঝগড়া পাকিয়ে তুলছে। রোগা, দুর্বল, রক্তহীন। তবু গলা এতটুকু ক্ষীণ নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ইভার। বিয়ের সাত বছর ধরে প্রতিদিন অমিত যত অন্যায় করেছে, যত অবহেলা, যত অপমান সব হুবহু মুখস্থ বলে যায়। মেজাজ ভালো থাকলে মাঝে-মাঝে বলে—এরকম মেমারি নিয়ে লেখাপড়া করলে না ইভা, কেবল স্কুল ফাইনাল পাস করে বসে রইলে।

জ্বলন্ত মোমবাতির ওপর দিয়ে বাঘের চোখে ইভার দিকে চেয়ে থাকে অমিত। ইভাও চেয়ে থাকে বনবেড়ালের মতো। একটুও ভয় পায় না। ভেতরটা হতাশায় ভরে যায় অমিতের। কীরকম করলে কীভাবে তাকালে সেও একটু ভয় পাবে। একটু সমীহ করবে তাকে। অমিত আবার পাতের ওপর মুখ নামায়। লাল রুটিগুলো দেখে এবং ভাবতে থাকে সে হিপনোটিজম শিখবে। কিংবা আরও রাগি হয়ে যাবে! কিংবা একদিন কিছু না বলে-কয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

নিরুদ্দেশও একবার হয়েছিল অমিত এক-রাতের জন্য। পরদিন ফিরে দেখে ইভার কী করুণ অবস্থা। পাড়াসুদ্ধ মেয়ে-পুরুষে ঘর ভরতি, মাঝখানে পাথর হয়ে ইভা বসে, দু-চোখে অবিরল ধারা। তাকে দেখে সাতজন্মের হারানো ধন ফিরে পাওয়ার মতো উড়ে এসেছিল। তারপরই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই দৃশ্য মনে পড়লে আজও বুকে ব্যথা করে। ইভার ভালোবাসাও তো নিখাদ। অমিতও কি বাসে না? বাসে। ভীষণ। তেরাত্রি ইভাকে ছেড়ে থাকলে নিজেকে অনাথ বালকের মতো লাগে। সেইজন্যই ইভা বহুকাল বাপের বাড়ি যায় না। অমিতের জন্য।

চালওয়ালা দুঃখিত মুখখানি তুলল। ভ্রাম্যমাণ পুরুত কপালে চন্দনের আর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে গেছে, কানে গোঁজা বিল্বপত্র। শ্বাস ফেলে বলে—তিন টাকা দশ।

বলো কী? অমিত চমকায়। তার মাস মাইনে একশো আশি প্লাস কলেজ ডি-এ। রেশন কার্ড নেই।

করুণ একটু হাসে চালওয়ালা—আজ তো এই দর। কাল আবার কী হবে কে জানে।

গত সপ্তাহে দু-টাকা আশি করে নিয়েছি।

গত সপ্তাহে! সে তো বাবু গত সপ্তাহ। বলে পাল্লা তুলে বলে—কতটা দেব?

দশ কেজি নেওয়ার কথা বলে দিয়েছিল ইভা। কিন্তু সাহস পেল না অমিত। বলল—চার কেজি।

গত সপ্তাহে আপনাকে বলেছিলাম, কিছু বেশি করে রাখুন। এ সময়টায় দর চড়ে। চাল ওজন করতে-করতে চালওয়ালা বলে। তারপর বিড়বিড় করতে থাকে রাম...রাম...দুই...দুই...তিন...তিন...

ক-বছর আগেও চাল কিনলে একআঁজলা কি একমুঠো ফাউ দিত। এখন আঙুলের ডগায় গোনা-গুনতি দশ কি বারোটা চাল বাড়তি দিল।

ঘামে পিছলে নেমে এসেছিল চশমাটা। অমিত ঠেলে সেটা সেট করল। ইভাকে ধমক দিতে হবে। ছেলেমেয়েদের পাতে যেন আর ভাত নষ্ট না হয়। আর, এবার থেকে ইভা আর অমিতের মতো ওরাও রাতে রুটি খাবে। পেটে সহ্য হয় না বললে চলবে না। সকলের ছেলেমেয়ে রুটি খায় ওদের ছেলে-মেয়ে খাবে না কেন? খেতে-খেতে অভ্যাস হয়ে যাবে। ইভা হয়তো ঝগড়া করবে, তেড়ে আসবে, তবু বলতে ছাড়বে না অমিত।

বাজার আর চালের বোঝা দু-হাতে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে অমিত—ইভা কী বলবে এবং সে তার কী উত্তর দেবে তা ভাবতে-ভাবতে যায়। এবং মনে-মনে সে ঝগড়া করতে থাকে। প্রচন্ড ঝগড়া। রাগে ফেটে পড়ে। ইভাকে লাথি মারে, চুলের ঝুঁটি ধরে হিঁচড়ে টেনে বের করে দেয় ঘর থেকে। বলে—ইঃ, নবাবের মেয়ে!

কিন্তু সবই ঘটে মনে-মনে। একটু অন্যমনস্কভাবে সে রাস্তার দূরত্ব অতিক্রম করতে থাকে। আজকাল ইভার কথা ভাবলেই তার মাথা আগুন হয়ে ওঠে। মনে-মনে সে যে কত গাল দেয় ইভাকে। ভালোও কি বাসে না? বাসে। ভীষণ। এবং এই দুটি অনুভূতিই তাকে দু-ভাগে ভাগ করে খেয়ে নিচ্ছে।

ইভা রাগ করল না। মন দিয়ে অমিতের কাছে চালের দর, দেশের দুর্দিনের কথা শুনল। তারপর সংক্ষেপে বলে—দেখি।

হ্যাঁ। দ্যাখো। গাঁয়ে মাস্টারি করতাম, সে বরং ভালো ছিল। শহরে নতুন প্রফেসারি নিয়ে এসে ফেঁসে গেছি। চেনাজানা লোকও তেমন নেই যে টপ করে হাত ধরব, দোকানেও ধারবাকি আনার মতো চেনা হয়নি। বুঝলে?

ইভা বুঝেছে। মাথা নাড়ল। এবং একটু পরে এককাপ অপ্রত্যাশিত চা-ও করে দিল। ইকনমিক্স-এর সাহা বেঁটে এবং কালো, মুখখানা সবসময়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সহজেই উত্তেজিত হয় লোকটা, সহজেই আনন্দিত হয়। তার সঙ্গে মোটামুটি ভালোই ভাব হয়ে গেছে অমিতের। দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর দেখা হতেই লোকটা খুব উত্তেজিতভাবে বলল—এ হচ্ছে অঘোষিত দুর্ভিক্ষ। ফেমিন ইন ফুল ফর্ম।

তাহলে সেটা ওরা ডিক্লেয়ার করুক।

তাই করে? ইজ্জতের প্রশ্ন আছে না? আমি সেদিন ঠাট্টা করে একজন ছাত্রকে বোঝাচ্ছিলাম, ইনফ্লেশন কাকে বলে। বলছিলাম, এখন দেখছ বাবা পকেটে টাকা নিয়ে যায় আর থলি ভরে বাজার করে নিয়ে আসে। যখন দেখবে বাবা থলি ভরে নিয়ে যায় আর পকেট ভরে বাজার নিয়ে আসে তখনই বুঝবে ইনফ্লেশন। জার্মানিতে বিশ্বযুদ্ধের পর ওরকমই হয়েছিল। এখন দেখছি ঠাট্টা নয়। ব্যাপারটা দিন দিন তাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের তুলনায় টাকার ভ্যালু...

কিন্তু এও ঠিক, সকালে তিন টাকা-দশ কিলো দরে চাল কিনলেও অমিত টেরিকটনের হাওয়াই শার্ট পরে কলেজে এসেছে। পরনে জলপাইরঙা টেরিলিনের প্যান্ট, পায়ে বাটার জুতো, গাল কামানো। এখনও অধ্যাপকদের পরনে এরকমই পোশাক, কিংবা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি আর ভালো তাঁতের ধুতি। কিন্তু ক্লেশের চিহ্ন নেই।

একজন অধ্যাপক বলে—দক্ষিণ ভারত থেকে এক সন্ন্যাসী ডিক্লেয়ার করেছে সেভেনটি ফোর ইজ দি ব্ল্যাকেস্ট ইয়ার ইন দি হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড—

এ সবই হচ্ছে হাই-তোলা কথা। গায়ে লাগে না কারও। অধিকাংশ অধ্যাপকই অধ্যাপকসুলভ গম্ভীর, বিদ্যাভারাক্রান্ত চিন্তাশীল। দু-চারজন ছোকরা প্রফেসার একটু কথা চালাচালি করে হালকাভাবে। সামান্য একটু অস্বস্তিবোধ করে অমিত এখনও। দশ বছর স্কুলমাস্টারি করার পর হঠাৎ চাকরিটা পেয়েছে সে। অধ্যাপকদের মেলায় এখনও নিজেকে একটু ছোটো লাগে তার। যেন বা দয়ার পাত্র সকলের। কিন্তু তা নয়। এখানে কেউ কাউকে তেমন লক্ষ করেই না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাঁয়ে থেকে নোনা বাতাসে অমিত একটু কালো হয়ে গেছে, একটু গ্রাম্যও। তাই বোধ হয় সে একাই বসে-বসে সকালে শোনা অবিশ্বাস্য চালের কথা ভাবে। সেই মহার্ঘ ভাত এখনও তার পেটে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

কলকাতায় এসেই রেশন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে রেখেছিল। এখনও এনকোয়্যারি হয়নি। কবে যে হবে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের আশুতোষ মুরুব্বি গোছের লোক। পলিটিকস করে, নেতাদের সঙ্গে ভালোবাসা আছে। সে অভয় দিয়েছিল।

কলেজের পর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অমিত গেল তার কাছে।

একটু দেরি হতে পারে বুঝলে পেঁপেচোর! আশু বলে—রিসেন্টলি একগাদা ভুয়া কার্ড ধরা পড়েছে। এনকোয়্যারি না করে নতুন কার্ড ইস্যু করবে না।

তুমি তো জানোই ভাই, আমার লুকোছাপা কিছুই নেই। আমরা স্বামী-স্ত্রী আর দুটো মাইনর—

হয়ে যাবে। ভেবো না।

চালের দর আজ—

জানি, আমিও তো ভাত খাই।

আর দু-চারদিন খোলা বাজারে চাল কিনলে আমার থ্রম্বোসিস হয়ে যাবে।

আশু হাসল। বলল, তুমি তো তবু পেঁপেচোর। আমি যে কেন্নো।

আশু বোধহয় প্রফেসারিটাকে তেমন ভালো চোখে দেখে না। অমিত চাকরিটা পাওয়ার পর থেকেই আশু তাকে প্রফেসারের বদলে পেঁপেচোর বলে ডেকে আসছে। কেরানি হল গে কেন্নো।

দেখো ভাই। বলে অমিত।

আশু তাকে খাতির করল। ক্যান্টিনে নিয়ে ফুট স্যালাড খাওয়াল। কফিও খাওয়াতে-খাওয়াতে বলল—দুর্দিনের জন্য তৈরি হও। সারাদুনিয়ায় এবার ফলন কম। রাশিয়া, চিন সবাই ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছে।

পিওর ম্যাথেম্যাটিক্সের প্রফেসার অমিত এত খোঁজ রাখে না। তার বাড়িতে খবরের কাগজ নেই। উদ্বেগের সঙ্গে বলে—সে কী?

বলছি কী! কেবল ওই মার্কিন মুলুকেই যা ফলার ফলেছে। কিন্তু বাংলাদেশ ইস্যুতে আমেরিকার সঙ্গে বাম্বু হয়ে গেছে আমাদের।

দুনিয়ার মাটি কি শুকিয়ে যাচ্ছে আশু?

শুকোবে না? যুবতীও তো বুড়ি হয় ভাই।

যুবতী ও বুড়ির কথায় তৎক্ষণাৎ অমিতের ইভার কথা মনে পড়ে। বাস্তবিক যুবতী যে কী বুড়ি হয় তা অমিতের চেয়ে বেশি কে আর জানে! দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সেই গাঁয়ের কিশোরী মেয়েটি কত চট করে বুড়ি হয়ে গেল। ব্রোঞ্জের চুড়িগুলো এত ঢলঢল করে হাতে যে মনে হয় হঠাৎ বুঝি খসে পড়ে যাবে। হাতে-

টাতে শিরা-উপশিরা জেগে আছে। ভেজাল তেলের জন্যই কি না কে জানে, মাথার চুলও উঠে শেষ হয়ে এসেছে। মুখের ডৌল দেখে অমিতের চেয়েও বেশি বয়েসি মনে হয়।

কত লোকের কত থাকে, কিন্তু অমিতের ওই একটা বই মেয়েমানুষ নেই। রাগ সোহাগ সব ওই একজনের ওপর। যুবতী বলো যুবতী, বুড়ি বলো বুড়ি, ওই একটাই মেয়েমানুষ। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ অমিত মনে-মনে ঠিক করে, আজ ফিরে গিয়েই ছেলেমেয়ে দুটোকে শোওয়ার ঘরে কপাট আটকে রেখে রান্নাঘরে ইভাকে জাপটে ধরে হামলে আদর করবে। ভাবতে-ভাবতে তার শরীর চনমন করে ওঠে। সারাদিনের নানা ক্লীবত্ব ভেদ করে পৌরুষ জেগে ওঠে।

চাঁদ নয়, হেমা মালিনী। অনেক ওপরে ধর্মতলার মোড়ে বড়ো বাড়িটার গায়ে লটকানো হোর্ডিং। হোর্ডিং জুড়ে যেন চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার মতো ঝরে-ঝরে পড়ছে হেমা মালিনীর হাসি। অবিরল। এবং স্থির সেই হাসি। কে সি দাসের উলটো দিকে যেখানে ট্রাম লাইনের কাটাকুটি সেইখানে একটু মেটে জায়গায় কে যেন জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে রেখেছে। সেই ভেজা মাটির ওপর পড়ে আছে একটি যুবতী মেয়ে। ভিখিরি শ্রেণির। মাটির রঙেরই একখানা শাড়ি জড়ানো। কিন্তু সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়েনি। বুকে পাছায় কিছু মাংস এখনও আছে। একটি স্তন কাত হয়ে ঝুলে মাটি স্পর্শ করেছে। আশেপাশে অমিত গুনে দেখল ঠিক চারটে বাচ্চা। সবচেয়ে ছোটোটা বোধহয় বছর দুয়েকের। পুঁটো-পুঁটো সেইসব বাচ্চারা উদোম ন্যাংটো। সবাই মড়ার মতো শুয়ে আছে। চোখ বোজা, কেউ নড়ছে না। শ্বাস ফেলার ওঠানামা লক্ষ করা যায় না। তাদের চারধারে মেলা দুই নয়া তিন নয়া ছড়িয়ে আছে। তারা কুড়িয়ে নেয়নি। কেউ কুড়িয়ে নেয়নি। দয়ালু মানুষেরাই পয়সা ফেলে গেছে। আবার এও হতে পারে ওইসব ঝরে পড়েছে হেমা মালিনীর হাসি থেকেই। কে জানে! অমিত চোখ তুলে দেখল, ভুল নয়, দশমী পুজোর দিন দুর্গামূর্তির হাস্যময় মুখে যেমন কান্নার চোখ ফুটে ওঠে তেমনিই হেমা মালিনীর চিত্রার্পিত মুখে দেবীসুলভ কারুণ্য।

দুর্ভিক্ষ? অমিত চমকে ওঠে। বড়ো হওয়ার পর সে আর দুর্ভিক্ষের কথা ভাবেনি। ধারণা ছিল, দুর্ভিক্ষ এখন আর নয়। ভারতবর্ষে গম চাল না হলে আমেরিকায় হবে, থাইল্যাণ্ড, বার্মায়, অস্ট্রেলিয়ায় হবে। পৃথিবী থেকে মানুষ দুর্ভিক্ষ তাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন করে আবার বুক খামচে ধরছে একটা ভুলে যাওয়া ভয়।

পরমুহূর্তেই ভয়টা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে সে। ওই তো মেট্রোর আলো জ্বলছে। দপদপিয়ে উঠছে নানা বিজ্ঞাপনের নিয়ন সাইন। কত দামি-দামি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে দামাল, উত্তেজিত, আনন্দিত কলকাতা! ভিখিরির তুলনায় ভদ্রলোক বহুগুণ বেশি।

জায়গাটা পেরিয়ে যায় অমিত দুটি নয়া ছুড়ে দিয়ে। কুড়িয়ে নেবে তো! না কি মরে গেছে ওরা? আত্মহত্যা করেনি তো? না-না, তা করেনি ঠিক। ভিখিরিরা কতরকম অভিনয় করে তার কি শেষ আছে। এটাও একটা কায়দা।

একটু দোটানার মধ্যে থেকে ভারী মনে অমিত বাসস্টপে এসে দাঁড়ায়। বড্ড ভিড়। সে ঠিক এইসব ভিড়ে এখনও অভ্যস্ত নয়। দাঁড়িয়েই থাকে।

দুটো বাড়ন্ত যুবা কথা বলে বাসস্টপে। একজন বলে—কলকাতায় এই যে লোকে বাসে উঠতে পারে না, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে অফিস টাইমে, কিংবা ঝুলে-ঝুলে যায়; ঠিক সময়ে কোথাও পৌঁছোতে পারে না। এর জন্যই দেখিস একদিন বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে। দুমদাম ভদ্রলোকেরা প্যান্ট গুটিয়ে কাছা মেরে ইট পাটকেল ছুড়তে লাগবে বেমক্কা, ভাঙচুর করে সব উলটেপালটে দেবে একদিন।

অন্যজন হাসে।

অমিত হাসে না। তার মনে একটা ভয়ের প্রলেপ পড়ে। চারিদিকে কী যেন একটা ধনুকের টান-টান ছিলার মতো ছিঁড়বার অপেক্ষায় আছে। যেন এক্ষুনি ছিঁড়বে এবং হুড়মুড় করে পৃথিবীটা ভেঙে পড়বে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? নাকি পৃথিবীজোড়া খরা, দুর্ভিক্ষ? নাকি মহাপ্লাবন আবার? কিংবা ছুটে আসবে অন্য একটি গ্রহ পৃথিবীর দিকে যেরকম একটা গল্প সে পড়েছিল ইন্টারমিডিয়েটের ইংরেজি র‍্যাপিডে।

রাতে শোওয়ার পর নিজস্ব মেয়েমানুষটাকে হাঁটকায় অমিত, হাঁটকায় কিন্তু যা ভুলতে চায় ভুলতে পারে না। কিছুই ভুলতে পারে না। ইভা তার বুক থেকে অমিতের হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, সারাদিন কত খাটুনি যায় বোঝো না তো, ঘুমোতে দাও।

পাশ ফিরে শোয় ইভা।

একটামাত্র মেয়েমানুষ থাকার ওই একটি দোষ। সে দিলে দিল, না দিলে উপোস থাকো। অমিত এর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় ভেবে পেল না। লাথি মারবে? মেরে দেখেছে অমিত, লাভ হয় না। লাভ নেই। খুব রাগ হয় অমিতের, কিন্তু রাগ চেপে শুয়ে থাকে। কিন্তু তখন বুকে একটা চাপ-বাঁধা কষ্ট হতে পারে। পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে গেছে খরায়। বুড়িয়ে গেছে ফলনের পর ফলনে, এবার কালো এক দুর্ভিক্ষ এসে যাবে।

সে স্বপ্নে দেখতে পায়, কাত হয়ে শুয়ে-থাকা মরা মেয়েমানুষের স্তন ঝুলে সেই মরা মাটি ছুঁয়ে আছে। আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে সে। আকাশ থেকে পয়সা বৃষ্টি হচ্ছে। শুকনো পয়সা ঠন ঠন শব্দে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। কেউ কুড়িয়ে নিচ্ছে না।

তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাল ইভা। বলল—ফিরে শোও। বোবায় ধরেছে।

অমিত ফিরে শুল। আর তখন হঠাৎ দু-খানা হাতে তাকে কাছে টানল ইভা। চুমু খেল। বলল—এসো।

চালওয়ালার কপালে আজও ভ্রাম্যমাণ কোনো পুরুত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গেছে, কানে বিল্বপত্র। মুখ তুলে হাসল চালওয়ালা।

অমিত ফিসফিস করে জিগ্যেস করল—দর কী হে?

কমেছে। পুরো তিন। একটু নীচে দু-টাকা আশি। বলে চালওয়ালা পাল্লা হাতে নেয়—কত দেব?

কমেছে! কমেছে! ঠিক বিশ্বাস হয় না অমিতের।

দশ কেজি। বলে অমিত।

চালওয়ালা মায়া মমতা ভরে চেয়ে হাসে। বলে—এখন কমতির দিকে।

ভারি ফুর্তি লাগে অমিতের। না, না, বাজে কথা ওসব। পৃথিবীজুড়ে দুর্ভিক্ষ আসছে এ কখনো হয়? চালের দাম কমে যাবে ঠিক।

অমিত হাঁটে। দু-হাতে বোঝা। কিন্তু ভারী লাগে না। আজ ইভা বেশি চাল দেখে খুশি হবে। খুব খুশি হবে।

চারদিকে কতরকম চিহ্ন ছড়ানো, দুর্ভিক্ষের আবার প্রাচুর্যেরও। মানুষ কখন কোনটা দেখে ভয় পায় কোনটা দেখে খুশি হয় তার তো কিছু ঠিক নেই।

ইচ্ছে

দেশলাইয়ের কাঠির অর্ধেক ভেঙে দাঁত খুঁচিয়েছিল কখন। বিড়ি ধরাতে গিয়ে সাঁটুলাল দেখে খোলের মধ্যে সেই শিবরাত্রির সলতে আধখানা বারুদমুখো কাঠি দেমাক দেখিয়ে পড়ে আছে। আজ চৈত্রের হাওয়া ছেড়েছে খুব। কাল বৃষ্টি গেছে ক-ফোঁটা, কিন্তু আজই তেজাল রোদ আর খড়নাড়ার মতো শুকনো হাওয়া দিচ্ছে দ্যাখো। হাওয়ার থাবায় এক ঝটকায় কাঠির মিনমিনে আগুন নিবে যাবে। যদি তাই যায় তো আরও চার পো পথ বিন-বিড়িতে হাঁটো। তারপর হাজারির দোকানের আগুনেদড়িতে বিড়ি ধরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু অতক্ষণে বিড়ি ছাড়া হাঁটা যায়! মুখে থুথু আসবে, বুক আঁকুপাঁকু করবে, কী-নেই, কী-নেই মনে হবে।

সাঁটুলাল দেশলাইয়ের বাক্সটা নাড়ে। ভিতরে টুকাটুক শব্দ করে আধখানা কাঠি দেমাকভরে নড়েচড়ে। কাঠিটার মতলব বুঝতে পারে না সাঁটু। শালা কি বিড়ি ধরানোর ঠিক মুখে নিবে গিয়ে তাকে জব্দ করবে?

তার জীবনে পাপের অভাব নেই। ফর্দ করতে গেলে শেষ হওয়ার নয়। বেশি কথা কী, এই দেশলাইটাই তো গতপরশু বাবুদের উঠোনে পড়ে থাকতে দেখে হাতিয়ে নেয়। ঝি উনুন ধরাতে এসে ফেলে গিয়েছিল ভুলে। পরে এসে দেশলাই খুঁজে না পেয়ে বাপান্ত করছিল। তা সে সাঁটুর উদ্দেশ্যেই বলা, নাম ধরে না বললেও, শুনে সাঁটু ভেবেছিল—না:, কাল থেকে ভালো হয়ে যাব।

সাঁটু দেশলাইটা হাতে নিয়ে মাঠের মধ্যিখানে ঢিবিটার ওপর বসে থাকে। দাঁতে আটকানো বিড়ি। ধরায়নি। সাঁটু ভাবে, বাবুদের বাড়ির ঝি সরস্বতীর কি উচিত হয়েছে সাঁটুকে অমন বাপ-মা তুলে গাল দেওয়াটা? ছেলের মাথা খেতেও বলেছে। যত যাই হোক সরস্বতী তো সাঁটুরই বউ! আজ না সে পয়সাওয়ালা লোকের সঙ্গে বিয়ে বসেছে। তা সুখচন্দ্রের পয়সাই বা এমন কী। আটাকল খুলে ধরাকে সরা দেখছে। তারও আগের পক্ষের বউয়ের হ্যাপা সামলাতে হয়। সরস্বতী ভাবে সুখচন্দ্র তাকে চিরকাল মাথায় নিয়ে নাচবে। ফু:! লাথি দিল বলে। বেশিদিন নয়।

ছেলের মাথা খেতে বলা সরস্বতীর ঠিক হয়নি। ছেলে তো সাঁটুর একার নয়, তারও। কিন্তু রেগে গেলে সরস্বতীর আর সেসব খেয়াল থাকে না। রেগে গেলে সরস্বতী একেবারে দিগবসনা।

ঢিবির ওপর কয়েক জায়গায় ঘাস পুড়ে টাক পড়েছে। এখানে সেখানে আংরা পড়ে আছে, ছাই উড়ছে অল্পস্বল্প। ডাকাতে সাধুটা ক-দিন আগেও এখানে থানা গেড়ে ছিল।

আজকাল সাঁটুলালের খুব ইচ্ছে হয় কারও কাছে গিয়ে মনের দুঃখের কথা সব উজাড় করে বলে। তার দুঃখ ঝুড়িভরা। সাধুর খোঁজ পেয়ে একদিন সন্ধেবেলা চলেও এসেছিল সাঁটুলাল। সাধুটা নাকি ভীষণ তেজালো, শূল চিমটে কিংবা ধুনি থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে লোককে তাড়া করে। তা তেজালো সাধুই সবার পছন্দ। সাঁটুরও।

সন্ধেবেলা সাঁটু টিবিতে উঠে দেখল নেংটি-পরা জটাধারী ভয়ংকর সাধু বসে-বসে খাচ্ছে। কাছেপিঠে কেউ নেই, কেবল বেলপুকুরের মতিলাল একধারে চোরের মতো খোলা-ছাতা সমুখে ধরে বসে আছে। তামাকের কারবারে মতিলাল গতবার খুব মার খেয়েছে। সেই থেকে লটারির টিকিট কেনে; হাতে গুচ্ছের কবজ আর সাধুর খোঁজ পেলেই সেখানে গিয়ে খুঁটি গাড়ে।

সাঁটুলালকে দেখে মতিলাল হাতের ইশারায় ডেকে বলল—এখন কথাটথা বোলো না, বাবার ভোগ হচ্ছে। আর খুব সাবধান, বাবা কিন্তু হাতের কাছে যা পায় ছুড়ে মারে। আমার ছাতার আড়ালে সরে এসো বরং।

মতিলালের ছাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে সাঁটুলাল সাধুর খাওয়া দেখে চোখের পাতা ফেলতে পারে না। ভালো ঠাহর হচ্ছিল না অল্প আলোয়, তবু মনে হচ্ছিল যেন কীসের একটা বড়সড় ঠ্যাং চিবোচ্ছে।

মতিলাল ঠেলা দিয়ে বলল—দেখেছ কী! নিজের চোখে যা দেখলাম প্রত্যয় হয় না।

সাঁটু মতির কাছ ঘেঁষে বলল—কী দেখলে?

মতিলাল ফিসফিস করে বলে—সবটা দেখিনি। সন্ধের মুখে-মুখে এসে হাজির হয়ে দেখি বাবার সামনে একটা আধজ্যান্ত শেয়াল পড়ে আছে, মুখ দিয়ে ভকভক করে রক্ত বেরোচ্ছে, তখনও পাঁচজন ওঠানামা করছিল। ধুনি জ্বেলে সেই আধজ্যান্ত পশুকে আগুনে ভরে দিল মাইরি, কালীর দিব্যি। তারপর ওই দ্যাখো, কেমন তার করে খাচ্ছে।

সাঁটু শুয়োরের মাংস পর্যন্ত খেয়েছে, কিন্তু শেয়াল পর্যন্ত যেতে পারেনি। শুনে আর-একটু মতিলালের কাছে ঘেঁষে বসল। মতিলাল কানে-কানে বলল—স্বয়ং পিশাচসিদ্ধ মহাদেব। বুঝেছ? এমন মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া কত জন্মের ভাগ্যি।

শেয়াল খেয়ে সাধু ঘাসে হাত পুঁছে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। মতিলাল খুব সন্তর্পণে উঠে গিয়ে সাধুর পা দাবাতে লেগে যায়।

সাধুর শেয়াল খাওয়া দেখে সাঁটুর গা বিরোচ্ছিল। মতি হাতের ইশারায় ডাকলে সে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ধানাইপানাই বলতে শুরু করল—বাবা, আমি বড়ো পাপী। তা বাবা, দুঃখী লোকেরা পাপ না করেই বাঁচে কীসে বলো! তাই ভাবছি বাবা, তুমি যদি আশীর্বাদ করো তো কাল থেকে ভালো হয়ে যাব।

সাধু চিত হয়ে শুয়েছিল, কথা শুনে মুখটা ফিরিয়ে একবার তাকাল শুধু। ভারি ছুঁচলো নজরটা। সাঁটুর তো ছুঁচ ফোটানোর মতো যন্ত্রণা হয়েছিল।

সাধু কিন্তু গাল দিল না, একটু হেসে বলল—শালা নিমকহারাম পাঁচটা টাকা আর একটা জবাফুল নিয়ে আসিস কাল। এখন যা।

সাঁটু চারদিকে চেয়ে শেয়ালের নাড়িভুঁড়ি, ছাল আর পোড়া মাথাটা দেখে 'ওয়াক' তুলে সেই যে চলে এসেছিল আর যায়নি। যাবেই বা কোন মুখে? জবাফুলের জোগাড় ছিল, কিন্তু পাঁচটা টাকা?

সাধু চোত সংক্রান্তির স্নানে যাবে বলে তল্পি গুটিয়েছে, কিন্তু টিবির ওপরকার মাটিতে দাদের মতো পোড়া দাগ রয়ে গেছে। বাতাসে একটা পচাটে গন্ধও। শেয়াল খেলে লোকে পাগল হয় বলে শুনেছে সাঁটুলাল।

অর্ধেক কাঠিটা দেশলাইয়ের খোলের বারুদে ঠুকবে কি ঠুকবে না তা খানিক ভাবে সাঁটু। এ বাতাসে ধরবে না মনে হয়।

টিবি বেয়ে সাঁটুলাল নেমে আসে খানিক। এবার বাতাসে একটু আড়াল পড়েছে। 'জয় মা কালী' বলে সাঁটু কাঠিটা ঠুকে দিল খোলে। বিড়বিড়িয়ে উঠল আগুন। গেল! গেল! হুই রে! সাঁটু বিড়ি হাতের খাপের মধ্যে গুঁজে প্রাণপণে টানে।

জয় মা! ধরেছে। নিবেই গিয়েছিল আগুনটা, শুধু কাঠিটা লালচে হয়েছিল বলে ধরল।

ভারি খুশি মনে টিবির ওপর বসে সাঁটুলাল দূরের দিকে চেয়ে থাকে। বিড়িটা শেষ হয়ে এলে এটা থেকেই আরেকটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হাঁটা দেবে।

পাপ-তাপগুলো সবই যেমন-কে-তেমন থেকে গেল তার। কাউকে বলা হল না। মতিলালের পাপ-তাপ বোধহয় সাধু টেনে নিয়ে গেছে। সাঁটুলাল বিড়ি টানতে-টানতে ভাবল—না: শালা, কাল থেকে ভালো হয়ে যাব।

বড়োরাস্তা দিয়ে একটা বাস আসতে দেখে সাঁটু তাড়াতাড়ি উঠে হাঁটা ধরে।

হাত তুলতে বাসটা থেমেও গেল। কিন্তু কনডাক্টর নিত্যচরণ মুখ চেনে। উঠতে যেতেই, হাত দিয়ে দরজাটা আটক করে বলল—উঠছ যে, পয়সা আছে তো?

—আছে—আছে।

দোনামনা করে নিত্যচরণ দরজা ছাড়ল বটে, কিন্তু নাহক অপমান করে বলল—সিটে বোসো না, মেঝেয় বোসো।

তাতে সুবিধেই সাঁটুলালের। মেঝেয় বসলে তেমন নজরে পড়বে না। পয়সা মাপও হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া সিটে জায়গাও নেই। সে বসেই ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে নিত্যচরণের দিকে বাড়িয়ে দিল। যদি নেয় তো ভালো, না নিলে খুব দিক করবে।

তা নিত্যচরণ নিল। নেওয়ার-ই কথা। নিত্যচরণের দ্বিতীয়পক্ষ উলুবেড়ে থেকে চিঠি দিয়েছে আজ। বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে অত হাওয়ার মধ্যেও কী করে, কোন কায়দায় যেন, নিত্যচরণ বিড়িটা ধরিয়ে ফেলল। তারপর বুকপকেট থেকে ন্যাতানো পোস্টকার্ডটা বের করে জড়ানো অক্ষরের লেখা পড়তে থাকে একমনে। তার মুখে রাগ, বিরক্তি, বৈরাগ্য আর হাসি ফুটে উঠতে থাকে। চামেলি লিখেছে—

শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। তারপর লিখি যে, সুপারি সব পাড়া হইয়াছে। কিন্তু মুকুন্দ ঠাকুরপো এবং ভাশুরঠাকুর হিসাব দেয় নাই। এত ক-টা মোটে দিয়াছে। তুমি বৈশাখে এসে হিসাব চেয়ো। আমাকে দিনরাত্রি কথা শুনায়। কেন, আমি কী কেউ না? সতীনপো পর্যন্ত বলে 'তিন্নির মা', মা ডাকে না। কথা আরও কত আছে। বলে দুই বউতে সমান ভাগ। ভাগ বড়ো। আমার ভাগের খড় শ্যামলালকে বিক্রি করিয়াছি। পাঁচ টাকা এখনও বাকি আছে। তোমার টাকা পাইনি। কী করে সংসার চলে বলো? তিন্নির আমাশা হওয়ায় কত খরচ হয়েছে সে-খবর কেই বা রাখে? আমার কে আছে। হাটবারে মুকুন্দ ঠাকুরপোকে পাউডার আনিতে পয়সা দিয়াছিলাম। সে কী দোষের বলো। ঠাকুরপো আনে নাই পয়সা আমার হাতেও দেয় নাই, তিন্নির হাতে ফেরত দিয়া বলিয়াছে অত বিবি সাজতে হবে না, পাঁচজনে কুকথা বলে। সতীন চরিত্রের দোষের কথা বলে বেড়ায়। মা কালীর নামে দিব্যি কেটে লিখি যে, সে-কথা কেউ বলিতে পারিবে না। পোস্টকার্ডে আর জায়গা নাই। প্রাণনাথ রাখো শ্রীচরণে। চরণাশ্রিতা চামেলি।

শেষলাইনটা 'রাবণবধ' যাত্রা থেকে নেওয়া। নিত্যচরণ শ্বাস ফেলে পোস্টকার্ডটা আবার পকেটে ঢোকায়। বিড়ি নিবে গেছে। আবার ধরিয়ে নিল নিত্যচরণ।

সাঁটুলাল নিত্যচরণের মুখের ভাব দেখছিল একমনে। মোটে মাইলখানেক রাস্তা। দেখি-না, দেখি-না বলে কাটিয়ে দেবে। চিঠিটা আর একটু যদি লম্বা হত। লোকে যে, কেন লম্বা-লম্বা চিঠি লেখে না, তা বোঝে না সাঁটুলাল।

নিত্যচরণ অবশ্য পয়সা আদায় করল না শেষপর্যন্ত। নামবার সময় শুধু বলল—'এই চার-শো বিশ, বাস কি জল দিয়ে চালাই আমরা? তেল কিনতে পয়সা লাগে না'?

বাস তেলে চলে, না জলে চলে তা জেনে সাঁটুর হবেটা কী? সে নিজে যে কীসে চলে সেইটাই এক ধাঁধা। চলেও গেল এই বছর পঞ্চাশেক বয়স পর্যন্ত।

পথটা খুব পার হওয়া গেছে। চোত মাসের রোদে এ-পথটুকু কমতি হল, সে একটা উপরি লাভ।

সুখচন্দ্রের সঙ্গে আগে-আগে কথা বলত না সাঁটুলাল। এখন বলে। ভেবে দেখেছে, সুখচন্দ্রের দোষ কী? সরস্বতীকে তো, সে নিজে এসে ভাগায়নি। সরস্বতী নিজে থেকেই ভেগে গেল। বরং অন্য কারো চেয়ে, সুখচন্দ্রের সঙ্গে আছে সে বরং ভালো। লোকটা কাউকে বড়ো একটা দুঃখ দেয় না। ফুর্তিবাজ লোক। যা আয়

করে, তা খেয়ে-পরে ওড়ায়। বাজারের সেরা জিনিসটা আনবে। মরশুমের আমটা, কাঁঠালটা বেশি দাম দিয়ে হলেও কিনবে, ঘরে তার রেডিয়ো পর্যন্ত আছে। আগের পক্ষের বাঁজা বউ শেফালিকেও খারাপ রাখেনি। নিজের বাড়ি শেফালিকে ছেড়ে দিয়ে অন্য পাড়ায় সরস্বতীর জন্য আলাদা ঘর তুলেছে। দুই বাড়িতেই যাতায়াত।

অনেক ভেবেচিন্তে সাঁটুলাল দেখেছে, ব্যাপারটা খারাপ হয়নি। প্রথম প্রথম তার অভিমান হত বটে। কিন্তু এও তো ঠিক যে, তিন-তিনটে বাচ্চাসমেত সরস্বতী তার ঘাড়ে গন্ধমাদনের মতো চেপেছিল এতদিন। এই যে সে গতরাতে খাড়ুবেড়েতে যাত্রা শুনতে গিয়ে রাত ভোর করে তারপর বেলাভর ঘুমিয়ে নাড়ুগোপালের মতো হেলতে-দুলতে তিন প্রহর পার করে ফিরছে, সরস্বতী থাকলে হতে পারত এমনটা? মাগি গিয়ে এখন তার ঝাড়া হাত-পা। ওদিকে ছেলেপুলেগুলো দু-বেলা খেতে পায়, পরতে চায়। সরস্বতীর চেহারা আদতে কেমন তা, সাঁটুলালের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পাঁচ-সাত বছর পর থেকে কেউ বুঝতে পারত না। এখন সরস্বতী পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন চামড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাতপায়ের গোছ হয়েছে খুব। গায়ে রস হয়েছে। চোখে ঝলক খেলে। বেশ আছে।

গোঁজ মুখ করে ঘুরে বেড়াত সাঁটুলাল, একদিন সুখচন্দ্র ডেকে বলল—'সাঁটুভায়া, ভগবান আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে। তুমি আমি কি আলাদা? সরস্বতী এসে জুটল, ফেলি কী করে বলো?'

এমনি দু-চার কথা হতে-হতে, সাঁটুলাল ভাব করে ফেলল। তবে সরস্বতীর পুরোনো সব রাগ যায়নি। সুখচন্দ্র যতই মিতালি করুক, সরস্বতী এখনও দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর আকাশ-বাতাসকে শুনিয়ে তার কেচ্ছা গায়।

গাওয়ার মতো কেচ্ছা কিছু কম নেই সাঁটুলালের। তার সারাটা জীবন চুরি-ছ্যাঁচড়ামি আর ছিনতাইয়ের কান্ডে ভরা। সেসব পুরোনো কথা। গত সপ্তাহে পালপাড়ার কদমতলায় সাঁটু নিজের মেয়ে কুন্তিকে 'গঙ্গা-যমুনা' খেলতে দেখে মায়ায় পড়ে দাঁড়িয়ে গেল। শত হলেও সন্তান। মেয়েটাও খানিক খেলা করে বাপের কাছে এল দৌড়ে। একগাল মিষ্টি হেসে ডাকল—'বাবা'! বুক জড়িয়ে যায়। মেয়েটার খালি গা, পরনে শুধু একটা বাহারি রংচঙে ইজের।

সাঁটুর চোখটাই পাপে ভরা। যেখানে যত লোভানি আছে, সেখানে তার পাপ নজর পড়বেই কী পড়বে। মেয়েটাকে দেখতে গিয়ে প্রথমেই তার নজর পড়ল মেয়ের কোমরের কাছে, ইজেরের কষি এক জায়গায় একটু উলটো ভাঁজ হয়ে আছে। আর সেই ভাঁজে স্পষ্ট একটা আধুলি আর কয়েকটা খুচরো পয়সার চেহারা মালুম হচ্ছে।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে খানিক আদর করছিল সাঁটু। তারপর মেয়ে ফের 'গঙ্গা-যমুনা'র কোটে ফিরে গেল, সাঁটু গেল বাজারে বাবুর জন্যে সিগারেট আনতে। আর যেতে-যেতেই টের পেল, কখন যেন তার হাতে একটা আধুলি দুটো দশ পয়সা আর একটা পাঁচ পয়সা চলে এসেছে। মাইরি! মা কালীর দিব্যি! সে টেরও পায়নি কখন আপনা থেকে পয়সাগুলো এসে গেল। একেবারে আপনা থেকে।

এসে যখন গেলই তখন তাকে ভগবানের দেওয়া পয়সা মনে করে সাঁটুলাল তৎক্ষণাৎ নগদানগদি তাড়ি খেয়ে ফিরল। বাবুর বাড়ির ফটকে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী আর তার গা ঘেঁষে কুন্তি। আর যাবে কোথায়! প্রথমে মেয়েটাই দেখতে পেয়ে চেঁচাল—'মা! মা! ওই যে, আসছে'। সঙ্গে-সঙ্গে সরস্বতী ঠিক কলেরগানের পুরোনো বয়ান ছেড়ে যেতে লাগল—বাপের ঠিক নেই, নষ্ট মাগির পুত, কেলেকুত্তার পায়খানা। ডোমে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তোকে টেনে ভাগাড়ে ফেলবে। নিব্বংশের ব্যাটা, মেয়েকে পয়সা দিয়ে ডাল আনতে পাঠিয়েছি—আর মেয়েরও বলিহারি বাবা—কোন আক্কেলে তুই ওই গোরুচোরের ব্যাটাকে

সোহাগ দেখাতে গেলি! গেল তো ঘাটের মড়ার আক্কেল দেখ! মেয়ের ইজেরের কষি থেকে পয়সা মেরে দিল। বলি ও ঢ্যামনা, পয়সার জন্য তুই না পারিস কী বল দেখি?

বলত আরও। বাবুর বউ বেরিয়ে এসে চোখা চোখা গলায় বলল—'দ্যাখো সরস্বতী, ছোটোলোকের মতো চেঁচাবে তো দূর হয়ে যাও। সাঁটু, তুমিও এক্ষুনি বিদেয় হও। একটা চোর, আর একটার মুখ আস্তাকুঁড়। আমার বাচ্চাটা এসব শুনে আর দেখে শিখবে। যাও, যাও।

সরস্বতী অবশ্য বাবুর বউকে ভয় পায় না। উলটে তেজ দেখায়। কিন্তু সেদিন আর বাড়াবাড়ি করেনি। শুধু শাসিয়ে রেখেছিল আটচাক্কির বিশেকে দিয়ে মার খাওয়াবে। সেদিন-ই সন্ধের মুখে বিশে সাঁটুকে ধরে দোকানঘরের পেছনে আবডালে টেনে নিয়ে দিলও ঘা কতক। আরও দিত, সুখচন্দ্র সাড়াশব্দে এসে পড়ে বলল—যাক গে, বারো আনা তো মোটে পয়সা। কিন্তু সুখচন্দ্র মাপ করে তো, সরস্বতী করে না। সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—'মুখ দিয়ে রক্ত বেরোবার পর ছাড়া পাবে'। সাঁটুলাল সরস্বতীর পা ধরতে উবু হয়ে বলল—'কাল থেকে হবে না।'

সাঁটুলাল নিজেকে আরও জিজ্ঞেস করে—পয়সাটা কি সত্যিই মেরেছিল সাঁটু? সাঁটু শিউরে উঠে বলে—'মাইরি না। মা কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি। শালার পয়সাগুলোই ফক্কড়, বুঝলে! আমাকে জব্দ করতে কোন ফাঁকে সুট করে চলে এল হাতে।'

এইসব দুঃখের কথা সাঁটুলাল কাউকে বলতে চায়। উজাড় করে বলবে সব। কিন্তু সাধুটা সটকেছে। আছেই বা কে?

গতকাল সাঁঝের মুখে বাবুর বউ 'নদীয়াল' মাছ কিনতে পয়সা দিয়ে পইপই করে বলেছিল—'দ্যাখো সাঁটু, পয়সার হিসেব দিয়ো। সরে পোড়ো না'।

সাঁটুলাল মনে-মনে দিব্যি কেটেছিল—আর নয়। এবার মানুষ হতে হবে। পাঁচজনের কাছে দেখানোর মতো মুখ চাই।

পয়সাটা ফেরত দিত সাঁটু, যদি নিজে সে ফিরত। হল কী গ্রহের ফের। বাজারে গিয়ে দেখল 'নদীয়াল' মাছ ওঠেনি। কয়েকটা 'ন্যাটাং চ্যাং' মাছ উঠেছে যা, বাবুরা খায় না। পয়সা নিয়ে ফিরেই আসছিল। তেমনি সময়টায় হরগোবিন্দ খবর দিল খাড়ুবেড়েয় যাত্রা হচ্ছে। যাবে নাকি সাঁটুলাল? আগুপিছু ভাবনা সাঁটুলালের কোনো কালেই ছিল না। চাঁদনি রাত ছিল। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। বাবুর বাড়িমুখো হতে আর ইচ্ছে হল না তার। মনে-মনে ভাবল—আজকের রাতটাই শেষ পাপ-তাপ করে নিই। কাল থেকে মাইরি—কাল থেকে ভালো হয়ে যাব একেবারে। এই ভেবে তাড়ি খেয়ে নিল প্রাণভরে। তারপর খাড়ুবেড়ের রাস্তা ধরল।

আজ তাই ফিরতে একটু লজ্জা-লজ্জা করছে তার। সরাসরি গিয়ে ঢুকে পড়লে বাবুর বউ বড়ো চেঁচামেচি করবে।

সাঁটুলাল তাই বাজারের দিকে আটাচাক্কির দোকানে গিয়ে উঠে বলল—'কী খবর হে সুখচন্দ্র? ভালো তো'?

সুখচন্দ্র বেশ মানুষ। মুখে একটা নির্বিকার ভাব। ঝড় হোক, ভূমিকম্প হোক সুখচন্দ্রের মুখে কোনো শুকনো ভাব নেই। বলল—'ভালো আর কই? কাল থেকে নাকি তুমি হাওয়া! বাবুর বাড়িতে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে, যাও।'

'যাচ্ছি'। বলে সাঁটুলাল বেঞ্চিতে বসে পড়ে। বিশে চাক্কি চালাচ্ছিল। আটা উড়ছে ধুলোর মতো চারদিকে। হুড়ো দিয়ে বলল—যাও যাও। কাজের সময় বসতে হবে না।

সাঁটুলাল দাঁত খেঁচিয়ে বলে—'তুমি কে হে? যার দোকান সে কিচ্ছু বলে না, তোমার অত ফোঁপরদালালি কীসের?'

লেগে যেত। কিন্তু এ-সময়ে সাঁটুর ছেলে বিষ্ণু রাস্তা থেকে উঠে এসে সুখচন্দ্রকে বলল—'বাবা, মা বলে দিল ফেরার সময় আনাজ নিয়ে যেতে।'

সাঁটু প্রাণভরে দেখছিল। তার ছেলে। হ্যাঁ, তার-ই ছেলে। সুখচন্দ্রকে 'বাবা' ডাকছে। আহা ডাকুক। ওর 'বাবা' ডাকার মতো লোক চাই তো। সে নিজে তো আর মানুষ নয়।

ছেলে বেরোল তো পিছু-পিছু সাঁটুলালও বেরোয়। ছেলে কয়েক কদম হেঁটেই পিছু ফিরে বলে—'তুমি আসছ কেন'?

সাঁটু একটু রেগে বলে—কেন, তোর বাবার রাস্তা?

—তুমি অন্য বাগে যাও। নইলে মাকে বলে দেব।

—কী বলবি?

—তুমি কুন্তির পয়সা চুরি করেছিলে, না? মনে নেই?

—ওঃ চুরি! 'গঙ্গা-যমুনা' খেলতে গিয়ে, ছুঁড়ি কোথায় পয়সা হারিয়ে আমার ঘাড়ে চাপান দিলে।

—সে যাই হোক, তুমি কাছে আসবে না আমাদের।

—বাপকে কি ভুলে গেলি বুঝি?

ছেলে চলে গেল। পালপাড়ার পুকুরধারে শেফালি ধরল তাকে। গা ধুয়ে ঘরে ফিরছে। দেখতে পেয়ে বলে—'তোমার সঙ্গে কথা আছে'।

শেফালি মোটা মানুষ শরীর ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। ঘামাচিতে গা কাঁথার মতো হয়ে আছে। গোলপানা থোম্বা মুখখানা দেখলে কাতলা মাছের মাথার মতো মনে পড়ে। দাঁতে নস্যি দেওয়ার নেশা আছে। একগাল হেসে বলল—'খবর শুনেছ নাকি? তোমার যে, আবার ছেলে হবে।'

ছেলে কি বাতাসে হয়! সাঁটু অবাক হয়ে বলে—আমার ছেলে হবে কী গো?

—ওই হল! তোমার বউয়ের।

সাঁটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে—কী যে, বলো বউঠান!

—বলছি বাপু, শুনে রাখো! তবে এও বলি, সরস্বতীর পেটেরটা যদি তোমার ছেলে না হয়, তবে সে তোমাদের সুখবাবুর ছেলেও নয়।

সরস্বতীর ছেলে হবে শুনে সাঁটুলাল খুশিই হল। আহা! হোক, হোক। ছেলেপুলে বড়ো ভালোবাসে সরস্বতী। ছেলেপুলে নিয়ে সব ভুলে থাকে।

খুশি মনে সাঁটুলাল বলল—'ভালো, ভালো।'

—ভালো কী! অ্যাঁ! ভালোটা কী দেখলে? পাঁচজনে যাই বলুক, আমি তো সুখবাবুর মুরোদ জানি। ছেলের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা সে মেনিমুখোর নেই। থাকলে আমার বাঁজা বদনাম ঘুচত। তুমি বুঝি ভেবেছ, সুখবাবুর ক্ষমতায় কান্ডটা হচ্ছে? আচ্ছা দিনকানা লোক তোমরা। এ সুখবাবুর কাজ নয় গো। সাঁট আছে।

—কীসের সাঁট?

থোম্বা মুখে ঢলাঢলি হাসি খেলিয়ে শেফালি বলে—'দেখেও দ্যাখো না নাকি? বিশে যে, তোমাকে সেদিন খুব ঠেঙাল, সে কেন জান? বিশেকে যে, দীনবন্ধুবাবু তার কারবারে বেশি মাইনেয় লাগাতে চেয়েছিল তাতে বিশে গেল না কেন জান? সে যে এখানে, বিশ টাকা মাইনে আর দু-বেলা খোরাকি পেয়ে আঠার মতো কেন লেগে আছে জান? বোঝ-না? বিশে আর সরস্বতীর ভাবসাব দেখেও বোঝ-না? চোখ-কান খোলা রেখে চলবে। তাহলে আর পাঁচজনের কাছে শুনে বুঝতে হবে না। যাও, বাড়ি গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো।

ভাবাভাবির কী আছে, তা সাঁটুলাল বোঝে না। দিনের মতো পরিষ্কার ব্যাপার। তবে কিনা সাঁটু এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আসল ব্যাপার হল, সরস্বতীর আবার ছেলে হচ্ছে।

বাড়ি ঢুকতেই আগে বাবুর সঙ্গে দেখা। বাগানের রাস্তায় শোয়ানো চেয়ার পেতে বসে বই পড়ছে। কেবল বই পড়ে। শোনা যায় কলেজের খুব নামকরা মাস্টার। মেলা বিদ্যে জানে। যদিও ধান আর চিটের তফাত

বুঝতে পারে না। তা সে যা-হোক, বেশি বোঝেন না বলেই ভালো। বুঝলে বড়ো মুশকিল।

বাবু মুখ তুলে দেখে বললেন—সাঁটুলাল যে! কোথায় গিয়েছিলে?

—এই আজ্ঞে। কাল থেকে আর হবে না।

—সে জানি। কিন্তু বাড়ির সবাই ভাবছিল খুব।

—আর হবে না।

বাবু রোগা-রোগা লোক, বেশি কথা বলে না। শুধু গম্ভীর হয়ে বলল—বিশ্বাসী লোক পাওয়া বড়ো মুশকিল দেখছি।

ভেতর-বাড়িটা থমথম করছে। বউদি এই সবে দুপুরের ঘুম থেকে উঠল। মুখ-টুখ ফুলে রাবণের মা। তার ওপর এলোকেশী ঠোঁটে শুকনো রক্তের মতো পানের রস। গলায় কপালে ঘাম। আঁচল কুড়োতে-কুড়োতে কুয়োতলায় যাচ্ছিল, ভেতরের বারান্দায় তাকে দেখে থমকে গিয়ে বলল—'তুমি কার হুকুমে বাড়িতে ঢুকেছ? বেরোও এক্ষুনি'।

সাঁটুলাল টপ করে কান ধরে ফেলে বলল—'কাল থেকে আর হবে না।'

ঘুম থেকে উঠলে মানুষের তখন-তখন আর তেমন তেজ থাকে না। বউদিরও রাজ্যের আলিস্যি। হাই তুলে বলল—পয়সাটা ফেরত দেবে তো?

—মাইনে থেকে কাটান দিয়ে দিব বরং।

—চায়ের জল চড়াও গে যাও।

বলে বউদি কুয়োর দিকে গেল।

চায়ের জল চড়ানোর কথা সাঁটুলালের নয়। সে বাইরের কাজের লোক। জল তোলে, গোরুর দেখাশোনা করে, দুধ দোয়ায়, বাগান করে, কাপড় কাচে আর ফাইফরমাশ খাটে। ঘরের কাজ সরস্বতীর ওপর। রান্না, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁটানো বা মোছা। তাই চায়ের জল করার কথায় অবাক মানে সাঁটুলাল।

কাজ তেমন জানা নেই। তবু পায়ে-পায়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল। রান্নাঘরের দরজাজুড়ে মেঝেয় আঁচল পেতে সরস্বতী শোয়া। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

আহা, ঘুমোক। আবার মা হবে। এ-সময়টায় শরীর এলিয়ে যায়। সরস্বতীর হাঁ মুখের কাছে মাছি উড়ছে, বসছে। হাত নেড়ে তাড়াল সাঁটুলাল।

তারপর খুব সাবধানে সরস্বতীকে ডিঙিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে সে। কেরোসিনের স্টোভকে জুত করতে পারছিল না। খুটুরমুটুর করে নাড়ছিল। শব্দ পেয়ে সরস্বতী পাশ ফিরে রক্তচোখে চেয়ে বলল—'ও কী! রান্নাঘরে ধুলোপায়ে ঢুকেছ যে, বড়ো! বাইরের জামাকাপড় নিয়ে ছিষ্টি ছুঁচ্ছ! তুমি কি মানুষ? সাতবাসি হেগো মোতা কাপড়। তার ওপর কোথায় কোন আস্তাকুঁড়ে রাত কাটিয়েছ! বেরোও!'

সাঁটুলাল সরস্বতীর মুখপানে চেয়ে খুব হাসে। বেশ লাগছে দেখতে। মা হওয়ার চেহারাই আলাদা।

সরস্বতী উঠে বসতে-বসতে বলল—চৌকাঠ পেরোলে কেমন করে বলো তো? আমাকে ডিঙোলে নাকি?

—তা কী করব?

—কী করব মানে? জলজ্যান্ত মানুষকে ডিঙোতে হয়?

সাঁটুলাল খুব গম্ভীর মুখ করে বলল—'পোয়াতি মানুষ, যেখানে সেখানে শুয়ে থাকো কেন? এ-সময়টায় অসাবধান হওয়া ভালো না।'

কে জানে কেন, এ কথায় সরস্বতীর মুখে বন্ধন পড়ে গেল। আর একটাও কথা না বলে, উঠে চলে গেল বোধ হয় কুয়োতলায়। একটু বাদে ভেজা মুখচোখ নিয়ে ফিরে এসে বলল—'সরো, আমি চা করছি।'

সাঁটুলাল সরল বটে, কিন্তু গেল না। দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সরস্বতীর দিকে। সরস্বতী টের পাচ্ছে তবু চোখ তুলে তাকাচ্ছে না।

সরস্বতী তাকাচ্ছে না বলে যে সাঁটুকে খাতির দেখাচ্ছে তা নয়। আসলে এই পোড়ামুখখানা দেখাতে তার ইচ্ছেই করে না।

স্টোভের সলতে কমে গিয়েছিল। টিনের চোঙাগুলো খুলে সরস্বতী সলতে টেনে বড়ো করে দেশলাই জ্বেলে সলতে ধরাল। কেটলি চাপিয়ে কেরোসিনের হাত ধুতে গেল উঠোনবাগে। দেশলাইটা পড়ে রইল মেঝেয়।

সাঁটুলালের দেশলাই ফুরিয়েছে। সেই আধখানা কাঠি দিয়ে কখন একটা বিড়ি খেয়েছে। ভাবাভাবির বড়ো ঝামেলা। দেশলাইটা তুলে নিয়ে সাঁটু সরে পড়ল। রাজ্যের কাজ পড়ে আছে। জল তুলতে হবে, গোরুর জাবনা দিতে হবে, গোয়ালে ধোঁয়া। তার আগে আবডালে কোথাও বসে ভরপেট বিড়ি খাবে এখন।

তেঁতুলের ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে সাঁটুলাল পশ্চিম আকাশে রঙের বাহার দেখছিল। বিড়ি খেলে মাথাটা খুলে যায়। সব ভালো লাগে কিছুক্ষণ। তাড়ি খেলে আরও খোলে। গাঁজা খেলে তো স্বর্গরাজ্য হয়ে যায় দুনিয়াটা।

বিড়িটা যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন বাবুর ছ-বছরের মেয়ে বাবলি এসে পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরল—'সাঁটুদা, তুমি পয়সা চুরি করে পালিয়েছিলে?'

সাঁটু একগাল হেসে বলে—'না। মাইরি না।'

—আমি জানি। তুমি পয়সা চুরি করে কাল চলে গিয়েছিলে। কান ধরো।

সাঁটু কান ধরে জিভ কেটে বলে, ছি ছি। বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে। কাল থেকে আর বলব না।

রোজ নতুন-নতুন সব ব্যাপার শিখেছে বাবলি। আজকাল ইস্কুলে যায়। ইস্কুল থেকে কত কী শিখে আসে। যেমন এখন বাবলি একটা, শুকনো গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে বলে—'হাত পাত।' সাঁটু হাত পাতে। বাবলি দুর্বল হাতে গাছের ডালটা দিয়ে সাঁটুর হাতে মারে। বলে, 'আর করবে?'

—না গো।

—নীলডাউন হও।

সাঁটু নীলডাউন হয়।

আর কী করবে ভেবে না পেয়ে বাবলি বলে—আচ্ছা, হয়েছে। মেরেছি তো! শাস্তি দিয়েছি তো! এসো, এবার আদর করি।

বলে কাছে এসে বাবলি সাঁটুর মাথাটা নিজের কাঁধে চেপে ধরে চুলে হাত বুলিয়ে বলে—'ষাট, ষাট, ষাট। লেগেছে সাঁটুদা'।

বড়ো যন্ত্রণা হল সাঁটুর বুকটার মধ্যে। এক পুকুর জল উঠে আসতে চায় চোখে। মাথা নেড়ে বলে—না, না, লাগেনি। আমি চোর খুকুমণি, তাই আমার ছেলেপুলেরাও আমাকে ঘেন্না পায়। তুমি রোজ মেরো আমাকে। বুঝলে?

—এমন শাস্তি দেব তোমাকে আজ সাঁটুদা, দেখবে ভয় পেয়ো না, আবার ষাট করে দেব।

ভেতরবাড়িতে দেশলাই নিয়ে ফের চেঁচামেচি হচ্ছে। হোক। সবদিকে কান দিলে হয় না। সাঁটুলালের অনেক কাজ। তাই উঠে গোয়ালঘরের দিকে গেল।

সন্ধের পর বাগানের রাস্তা থেকে বাবুর শোয়ানো চেয়ার আর জল বা চা রাখবার ছোটো টুল তুলতে গিয়ে সাঁটুলাল সিগারেটের প্যাকেটটা পেয়ে গেল। তাতে দু-দুটো আস্ত সিগারেট। সাঁটু খুব অভিমানভরে ভাবল, নিলে লোকে বলবে চোর। কিন্তু এই যে, হাতের নাগালে দুটো সিগারেট তার ভাগ্যে পড়ে আছে, এর মধ্যে কি ভগবানেরও ইচ্ছে নেই?

সাঁটু সিগারেটের প্যাকেটটা যামিনীঝোপের মধ্যে গুঁজে রেখে দিল। রাতে ভাত খাওয়ার পর জমবে ভালো।

রাতের কাজ সেরে সরস্বতী বিদায় নিয়েছে। বিকেলে দেশলাই নিয়ে আজ আর বেশি চেঁচায়নি। মুখোমুখি দেখা হতে, তেমন চোখে চোখে তাকায়ওনি লাল চোখ করে। বাবু আর বউদিও আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুতে

গেল।

বাইরের বারান্দায় শতরঞ্চি আর একটা কাঁথা পেতে শুয়ে সিগারেট টানছিল সাঁটুলাল। ঠিক সে-সময়ে অন্ধকার ফুঁড়ে সরস্বতী উঠে এসে বলল—'আমি পোয়াতি—এ কথা কে বলল তোমায়?'

সাঁটু শুয়ে-শুয়েই ঠ্যাং নাচাতে-নাচাতে বলে—'আমার সঙ্গে থাকতে তিনবার হয়েছিলে, লক্ষণ সব চিনি কিনা। বলবে আবার কে?'

সরস্বতী উবু হয়ে বসে বলে—'মিছে বোলো না। শেফালি কুচ্ছো গেয়ে বেড়াচ্ছে। তার কাছেই শুনেছ। আচ্ছা পাজি মেয়েছেলে যা-হোক। নিজের হবে না, অন্যের হলে শতেক দোষ খুঁজবে। এসব কথা জানাজানি হলে, সুখকর্তা আর রাখবে ভেবেছ?'

সাঁটুলাল মাথা চুলকোয়।

সরস্বতী আস্তে আস্তে বলল—'শোনো, তুমি সুখচন্দ্রকে বুঝিয়ে বলবে যে, তোমার সঙ্গে যখন থাকতুম, তখনও আমার চরিত্রের দোষ ছিল না, এখনও নেই। বুঝলে? তোমার মুখের কথার দাম হবে। নইলে সুখচন্দ্র আজ রাতে ওই মাগির কাছে থাকতে গেছে, রাতভর এমন বিষ ঢালবে কানে যে, পুরুষটা বিগড়োবে। কাল-ই গিয়ে সুখচন্দ্রের সঙ্গে বসে নানা কথার মধ্যে একফাঁকে কথাটা তুলো।'

উদাসভাবে সাঁটুলাল বলে—তুলবখন।

—তুলো! তুমি লোক খারাপ নয় আমি জানি। দুটো টাকা রাখো।

বলে আঁচলের গেরো খুলে ভাঁজ-করা টাকা বের করতে যায় সরস্বতী।

ভারী লজ্জা পায় সাঁটুলাল। বলে—আরে থাক, থাক। ওসব রাখো।

—নাও। বিড়িটিড়ি খেয়ো। মাসে দশ টাকা মাইনে পাও, তাতে কী হয়। রাখো এটা। আমি সদর ভেজিয়ে রেখে চলে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

—হ্যাঁ, যাও। চারিদিকে ভারী চোর-ছ্যাঁচোড়।

—সে জানি। বলে সরস্বতী আঁধারে মিলিয়ে যায়।

সাঁটুলাল দু-নম্বর সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল। সরস্বতী বলে গেল, সে নাকি ভালো লোক। সত্যিই কী আর বলেছে! মন-রাখা কথা। কিন্তু যদি সত্যিই তাকে ভালো লোক বলে জানত সবাই।

হাতের সিগারেটটার দিকে চেয়ে রইল সাঁটুলাল। ভারী রাগ হল নিজের ওপর। আচমকা সিগারেটটা প্রায় আস্ত অবস্থায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে, নিজের দু-গালে ঠাসঠাস করে কয়েকটা চড় দেয়।

রাগ তাতে কমে না। নিজের ঘাড় ধরে নিজেকে তোলে সে। তারপর নিজেকে নিয়ে ফটকের বার করে দিয়ে বলে—যা হারামজাদা আহাম্মক ছ্যাঁচড়া চোট্টা কোথাকার। ফের যদি আসিস তো, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।

এই বলে হাত ঝেড়ে সাঁটুলাল ফিরে আসে। কাল-ই গিয়ে সুখচন্দ্রকে বুঝিয়ে আসবে যে, সরস্বতী বড়ো সতী মেয়ে। তার গর্ভে সুখচন্দ্রের-ই ছেলে। আর টাকা দুটোও ফেরত দেবে সরস্বতীকে। সে ঘুস-টুস খাবে না আর। পুরোনো সাঁটুলাল বিদেয় নিয়েছে।

খুব আনন্দে খানিক ডগমগ হয়ে বসে রইল সাঁটুলাল। মনটা ভারী বড়োসড়ো হয়ে গেছে। বুকে যেন হাওয়া-বাতাস খেলছে। প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

কামিনীঝোপের নীচে পড়ে থাকা সিগারেটটা ধোঁয়াচ্ছে। এখনও অনেকটা রয়েছে। খামোকা পয়সা নষ্ট।

সাঁটুলাল গিয়ে সিগারেটটা তুলে আনল ফের। বসে-বসে মনের সুখে টানতে লাগল। দেশলাইটা নেড়ে দেখল অনেক কাঠি রয়েছে। বাঁ-ট্যাঁকে সরস্বতীর দেওয়া টাকাটা।

সাঁটুলাল ভাবল—এই শেষ পাপ-তাপ বাবা! কাল থেকে ভালো হয়ে যাচ্ছি।

আমরা

সেবার গ্রীষ্মকালের শেষদিকে দিন চারেক ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগে উঠলেন আমার স্বামী। এমনিতেই তিনি একটু রোগা ধরনের মানুষ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর তাঁর চেহারাটা আরও খারাপ হয়ে গেল। দেখতাম তাঁর হনুর হাড় দুটো গালের চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, গাল বসা, চোখের নীচে গাঢ় কালি, আর তিনি মাঝে মাঝে শুকনো মুখে ঢোক গিলছেন—কণ্ঠাস্থিটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। তাঁকে খুব অন্যমনস্ক, কাহিল আর কেমন যেন লক্ষ্মীছাড়া দেখাত। আমি তাঁকে খুব যত্ন করতাম। বিট, গাজর সেদ্ধ, টেংরির জুস, দু-বেলা একটু একটু মাখন, আর রোজ সম্ভব নয় বলে মাঝে-মধ্যে এক-আধটা ডিমের হাফ-বয়েল তাঁকে খাওয়াতাম। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার একমাস পরেও তাঁর চেহারা ভালো হল না, বরং আরও দুর্বল হয়ে গেল। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে তিনি ভয়ংকর হাঁফাতেন, রাত্রিবেলা তাঁর ভালো ঘুম হত না, অথচ দেখতাম সকালবেলা চেয়ারে বসে চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি ঢুলছেন, কষ বেয়ে নাল গড়িয়ে পড়ছে। ডাকলে চমকে উঠে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যেত যে, তিনি স্বাভাবিক নেই। বরং অন্যমনস্ক এবং দুর্বল দেখাচ্ছে তাঁকে।

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—'তোমার কী হয়েছে বলো তো!'

তিনি বিব্রতমুখে বললেন—অনু, আমার মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা আমার এখনও সারেনি। ভেতরে ভেতরে আমার যেন জ্বর হয়, হাড়গুলো কটকট করে, জিভ তেতো-তেতো লাগে। তুমি আমার গা-টা ভালো করে দ্যাখো তো।

গায়ে হাত দিয়ে গা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা লাগে। সে-কথা বলতেই তিনি হতাশভাবে হাত উলটে বললেন—কী যে হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার বোধ হয় একটু এক্সারসাইজ করা দরকার। সকাল-বিকেল একটু হাঁটলে শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন থেকে খুব ভোরে উঠে, আর বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তিনি বেড়াতে বেরোতেন। আমি আমাদের সাত বছর বয়সের ছেলে বাপিকে তাঁর সঙ্গে দিতাম। বাপি অবশ্য বিকেলবেলা খেলা ফেলে যেতে চাইত না, যেত সকালবেলা। সে প্রায়-ই এসে আমাকে বলত—'বাবা একটুও বেড়ায় না মা, পার্ক পর্যন্ত গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে, আর রেলিং-এ ঠেস দিয়ে ঢুলতে থাকে।' আমি বলি, 'চলো বাবা, লেক পর্যন্ত যাই, বাচ খেলা দেখে আসি, আমাদের স্কুলের ছেলেরাও ওখানে ফুটবল প্র্যাকটিস করে, কিন্তু বাবা রেললাইন পার-ই হয় না। কেবল ঢুল-ঢুল চোখ করে বলে, 'তুই যা, আমি এখানে দাঁড়াই, ফেরার সময়ে আমাকে খুঁজে নিস।'

আমাদের স্নানঘরটা ভাগের। বাড়িওয়ালা আর অন্য এক ভাড়াটের সঙ্গে। একদিন সকালবেলা অফিসের সময়ে অন্য ভাড়াটে শিববাবুর গিন্নি এসে চুপি চুপি বললেন—'ও দিদি, আপনার কর্তাটি যে বাথরুমে ঢুকে

বসে আছেন, তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমার কর্তাটি তেল মেখে কখন থেকে ঘোরাফেরা করছেন।' এইমাত্র বললেন—'দ্যাখো তো, অজিতবাবু তো কখনো এত দেরি করে না—'

শুনে ভীষণ চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি বাথরুমের দরজায় কান পাতলাম। কিন্তু বাথরুমটা একদম নিশ্চুপ। বন্ধ দরজার ওপাশে যে কেউ আছে তা মনেই হয় না। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম—ওগো, কী হল?

তিনি বললেন—কেন?

—এত দেরি করছ কেন?

তিনি খুব আস্তে, যেন আপনমনে বললেন—ঠিক বুঝতে পারছি না—তারপর হুড়মুড় করে জল ঢেলে কাক-স্নান সেরে তিনি বেরিয়ে এলেন।

পরে যখন জিজ্ঞেস করলাম, বাথরুমে কী করছিলে তুমি? তখন উনি বিরসমুখে বললেন, গা-টা এমন শিরশির করছিল যে, জল ঢালতে ইচ্ছে করছিল না। তাই চৌবাচ্চার ধারে উঠে বসেছিলাম।

—বসেছিলে কেন?

—ঠিক বসেছিলাম না। জলে হাত ডুবিয়ে রেখে দেখছিলাম ঠাণ্ডাটা সয়ে যায় কিনা।

বলে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে এক সময়ে বললেন—আসলে আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না। বাথরুমের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, জলে-ভেজা অন্ধকার, আর চৌবাচ্চা-ভরতি জল ছলছল করে উপচে বয়ে যাচ্ছে খিলখিল করে—কেমন যেন লাগে!

ভয় পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেমন?

উনি ম্লান একটু হাসলেন, বললেন—ঠিক বোঝানো যায় না। ঠিক যেন গাছের ঘন ছায়ায় বসে আছি, আর সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন—বুঝলে, ঠিক করলাম এবার বেশ লম্বা অনেকদিনের একটা ছুটি নেব।

—নিয়ে?

—কোথাও বেড়াতে যাব। অনেকদিন কোথাও যাই না। অনু, আমার মনে হচ্ছে একটা চেঞ্জের দরকার। শরীরের জন্য না, কিন্তু আমার মনটাই কেমন যেন ভেঙে যাচ্ছে। অফিসে আমি একদম কাজকর্ম করতে পারছি না। আজ বেলা তিনটে নাগাদ আমার কলিগ সিগারেট চাইতে এসে দেখে যে, আমি চোখ চেয়ে বসে আছি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছি না। সে ভাবল, আমার স্ট্রোক-ফ্রোক কিছু একটা হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে সবাইকে ডেকে আনল। কী কেলেঙ্কারি! অথচ তখন আমি জেগেই আছি।

—জেগেছিলে! তবে সাড়া দাওনি কেন?

—কী জানো! আজকাল ভীষণ অলস বোধ করি। কারও ডাকে সাড়া দিতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। এমনকী মাঝে মাঝে অজিত ঘোষ নামটা যে আমার, তা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। কেউ কিছু বললে চেয়ে থাকি কিন্তু বুঝতে পারি না। ফাইলপত্র নাড়তে ইচ্ছে করে না, একটা কাগজ টেবিলের এধার থেকে ওধারে সরাতে, পিনকুশনটা কাছে টেনে আনতে গেলে মনে হয় পাহাড় ঠেলার মতো পরিশ্রম করছি। সিগারেটের ছাই কত সময়ে জামায়-কাপড়ে উড়ে পড়ে—আগুন ধরার ভয়েও সেটাকে ঝেড়ে ফেলি না—

শুনে, আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ 'ধক' করে উঠল। বললাম—'তুমি ডাক্তার দেখাও। চলো, আজকেই আমরা মহিম ডাক্তারের কাছে যাই।'

—'দুর'! উনি হাসলেন, বললেন—'আমার সত্যিই তেমন কোনো অসুখ নেই। অনেকদিন ধরে এক-ই জায়গায় থাকলে, এক-ই পরিবেশে ঘোরাফেরা করলে মাথাটা একটু জমাট বেঁধে যায়। ভেবে দ্যাখো, আমরা প্রায় চার-পাঁচ বছর কোথাও যাইনি। গতবার কেবল বিজুর পৈতেয় ব্যাণ্ডেল। আর কোথাও না। চলো,

কাছাকাছি কোনো সুন্দর জায়গা থেকে মাসখানেক একটু ঘুরে আসি। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন জায়গায় যাব যেখানে একটা নদী আছে, আর অনেক গাছগাছালি—'

আমার স্বামী চাকরি করেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে। কেরানি। আর কিছুদিন বাদেই তিনি সাব-অর্ডিনেট অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের পরীক্ষা দেবেন বলে ঠিক করেছেন। অঙ্কে তাঁর মাথা খুব পরিষ্কার, বন্ধুরা বলে—অজিত এক চান্সে বেরিয়ে যাবে। আমারও তাই বিশ্বাস। কিছুদিন আগেও তাঁকে পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত দেখতাম। দেখে খুব ভালো লাগত আমার। মনে হত, ওঁর যেমন মনের জোর তাতে শক্ত পরীক্ষাটা পেরিয়ে যাবেন-ই। তখন সংসারের একটু ভালো ব্যবস্থা হবে। সেই পরীক্ষাটার ওপর আমাদের সংসারের অনেক পরিকল্পনা নির্ভর করে আছে। তাই চেঞ্জের কথা শুনে আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—এখন এক-দেড় মাস ছুটি নিলে তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না?

উনি খুব অবাক হয়ে বললেন—কীসের পড়াশুনো?

—ওই যে, 'এস এ এস' না কী যেন!

শুনে ওঁর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। ভীষণ হতাশ হলেন উনি। বললেন—'তুমি আমার কথা ভাবো, নাকি আমার চাকরি-বাকরি, উন্নতি এইসবের কথা? অনু, তোমার কাছ থেকে আমি আর একটু সিমপ্যাথি আশা করি। তুমি বুঝতে পারছ না, আমি কী একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আছি।'

আমি লজ্জা পেলাম, তবু মুখে বললাম—'বা:, তোমাকে নিয়ে ভাবি বলেই তো তোমার চাকরি, পরীক্ষা, উন্নতি, সব নিয়েই আমাকে ভাবতে হয়। তুমি আর তোমার সংসার, এ ছাড়া আমার আর কী ভাবনা আছে বলো?'

উনি ছেলেমানুষের মতো রেগে চোখ-মুখ লাল করে বললেন—আমি আর আমার সংসার কি এক?

অবাক হয়ে বললাম—এক নও?

উনি ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন—না। মোটেই না। সেটা বোঝো না বলেই, তুমি সবসময়ে আমাকে সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে দ্যাখো, আলাদা মানুষটাকে দ্যাখো না।

হেসে বললাম—তাই বুঝি!

উনি মুখ ফিরিয়ে বললেন—তাই। আমি যে কেরানি তা তোমার পছন্দ না, আমি অফিসার হলে তবে তোমার শান্তি। এই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমি চিরকাল এইরকম কেরানিই থাকব, তাতে তুমি সুখ পাও, আর না পাও।

—থাকো-না, আমি তো কেরানিকেই ভালোবেসেছি, তাই বাসব।

কিন্তু উনি এ কথাতেও খুশি হলেন না। রাগ করে জানলার থাকের ওপর বসে বাইরের মরা বিকেলের দিকে চেয়ে রইলেন। বেড়াতে গেলেন না। দেখলাম, জ্বর আসার আগের মতো ওঁর চোখ ছলছল করছে, মাঝে মাঝে কাঁপছে ঠোঁট, হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে তুলে এমনভাবে বসে আছেন যে, রোগা দুর্বল শরীরটা দেখে হঠাৎ মনে হয়, বাচ্চা একটা রোগে-ভোগা ছেলেকে কেউ কোলে করে জানলার কাছে বসিয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা পাগল। আমাদের ছেলের বয়স সাত, মেয়ের বয়স চার। আজকালকার ছেলেমেয়ে অল্প বয়সেই সেয়ানা। তার ওপর বাসায় রয়েছে ঠিকে ঝি, ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার ছেলেমেয়ে—এতজনের চোখের সামনে ভরসন্ধেয় কী করে আমি ওঁর রাগ ভাঙাই। তবু পায়ের কাছটিতে মেঝেতে বসে আস্তে আস্তে বললাম—'লক্ষ্মীসোনা, রাগ করে না। ঠিক আছে, চলো কিছুদিন ঘুরে আসি। পরীক্ষা না-হয় এবছর না দিলে, ও তো ফি-বছর হয়—'

উনি সামান্য একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন—তবু দ্যাখো, পরীক্ষার কথাটা ভুলতে পারছ না। এ-বছর নয় তো সামনের বার। কিন্তু আমি তো বলেই দিয়েছি কোনোদিন আমি পরীক্ষা দেব না—

—দিয়ো না। কে বলছে দিতে! আমাদের অভাব কীসের! বেশ চলে যাবে। এবার ওঠো তো—

আমার স্বামীর অভিমান একটু বেশিক্ষণ থাকে। ছেলেবেলা থেকেই, উনি কোথাও তেমন আদর-যত্ন পাননি। অনেকদিন আগেই মা-বাবা মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই মামাবাড়িতে একটু অনাদরেই বড়ো হয়েছেন। বি এস-সি পরীক্ষা দিয়েই ওকে, সে-বাড়ি ছেড়ে মির্জাপুরের একটা মেসে আশ্রয় নিতে হয়। সেই মেসে দশ বছর থেকে চাকরি করে উনি খুব নৈরাশ্যবোধ করতে থাকেন। তখন ওঁর বয়স তিরিশ। ওঁর রুম-মেট ছিলেন আমার বুড়োকাকা। তিনিই মতলব করে ওঁকে একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এলেন। তারপর মেসে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে?' উনি খুব লজ্জা-টজ্জা পেয়ে অবশেষে বললেন—'চোখ দু-টি বেশ তো!' তারপর-ই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমরা উঠলাম এসে লেক গার্ডেনসের পাশে গরিবদের পাড়া গোবিন্দপুরে। যখন এই একা বাসায় আমরা দুজন, তখন উনি আমাকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখতেন দুরন্ত অভিমানে—'এই যে, আমি অফিসে চলে যাই, তারপর কী তুমি আর আমার কথা ভাবো! কী করে ভাববে, আমি ত্রিশ বছরের বুড়ো, আর তুমি কুড়ির খুকি। তুমি আজ জানলায় দাঁড়াওনি...কাল রাতে আমি যে জেগেছিলাম কেউ কি টের পেয়েছিল! কী ঘুম বাব্বা!

ওঁর অভিমান দুরন্ত হলেও সেটা ভাঙা শক্ত না। একটু আদরেই সেটা ভাঙানো যায়। কিন্তু এবারকার অভিমান বা রাগে সেই অনাদরে বড়ো-হওয়া মানুষটার ছেলেমানুষি নেই—আঁকড়ে ব্যাপার তো নয়! এই ব্যাপারটা যেন, একটু জটিল। হয়তো উনি একেবারে অমূলক কথা বলছেন না। আমি সংসারের ভালোমন্দর সঙ্গে জড়িয়েই ওঁকে দেখি। এর বাইরে যে একা মানুষটা, যার সঙ্গে অহরহ বাইরের জগতের একটা অদৃশ্য বনিবনার অভাব চলছে, তার কথা তো আমি জানি না। নইলে উনি কেন লোকের ডাকে সাড়া দেন না, কেন চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন, তা আমি বুঝতে পারতাম।

রাত্রিবেলা আমাদের ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে উনি হঠাৎ চুপি চুপি আমার কাছে সরে এলেন। মুখ এবং মাথা ডুবিয়ে দিলেন আমার বুকের মধ্যে। বুঝতে পারলাম তাঁর এই ভঙ্গির মধ্যে কোনো কাম-ইচ্ছা নেই। এ-যেমন বাপি আমার বুকে মাথা গোঁজে, অনেকটা সেরকম। আমি কথা না বলে, ওঁকে দু-হাতে আগলে নিয়ে ওঁর রুক্ষ মাথা, আর অনেকদিনের অ-ছাঁটা চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গভীর আনন্দের একটা শ্বাস টেনে নিলাম। বুক ভরে গেল। উনি আস্তে আস্তে বললেন—তোমাকে মাঝে মাঝে আমার মায়ের মতো ভাবতে ইচ্ছে হয়। এরকম ভাবাটা কি পাপ?

কী জানি! আমি এর কী উত্তর দেব? আমি বিশ্বসংসারের রীতিনীতি জানি না। কার সঙ্গে কীরকম সম্পর্কটা পাপ, কোনটা অন্যায় তা কী করে বুঝব! যখন ফুলশয্যার রাতে প্রথম উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, সেদিনও আমার শরীর কেঁপে উঠেছিল বটে। কিন্তু সেটা রোমাঞ্চে নয়—শিহরণেও নয়, বরং মনে হয়েছিল—বাঁচলাম! এবার নিশ্চিন্ত। এই অচেনা, রোগা কালো কিন্তু মিষ্টি চেহারার দুর্বল মানুষটির সেই প্রথম স্পর্শেই আমার ভেতরে, সেই ছেলেবেলার পুতুলখেলার এক মা জেগে উঠেছিল। ছেলেমেয়েরা যেমন প্রেম করে, লুকোচুরি করে, সহজে ধরা দেয় না, আবার একে অন্যকে ছেড়ে যায়—আমাদের কখনো সেরকম প্রেম হয়নি।

উনি বুকে মুখ চেপে অবরুদ্ধ গলায় বললেন—'তোমাকে একটা কথা বলব, কাউকে বোলো না। চলো জানলার ধারে গিয়ে বসি।'

উঠলাম। ছোট্ট জানলার চৌখুপিতে তাকের ওপর মুখোমুখি বসলাম দুজন। বললাম—বলো।

উনি সিগারেট ধরালেন, বললেন—তোমার মনে আছে, বছর দুই আগে একবার কাঠের আলমারিটা কেনার সময়ে সত্যচরণের কাছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার করেছিলাম?

—ওমা, মনে নেই! আমি তো কতবার তোমাকে টাকাটা শোধ দেওয়ার কথা বলেছি!

আমার স্বামী একটা শ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ, সেই ধারটার কথা নয়, সত্যচরণের কথাই বলছি তোমাকে। সেদিন মাইনে পেয়ে মনে করলাম, এ-মাসে প্রিমিয়াম ডিউ-ফিউ নেই, তা ছাড়া রেডিয়োর শেষ ইনস্টলমেন্টটাও গতমাসে দেওয়া হয়ে গেছে, এ-মাসে যাই সত্যচরণের টাকাটা দিয়ে আসি। সত্যচরণ

ভদ্রলোক, তা ছাড়া আমার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ওর-ই কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে—বড়োলোক বলা যায় ওকে—সেই কারণেই বোধ হয় ও কখনো টাকাটার কথা বলেনি আমাকে। কিন্তু এবার দিয়ে দিই। তা ছাড়া ওর সঙ্গে অনেককাল দেখাও নেই, খোঁজখবর নিয়ে আসি। ভেবে-টেবে বিকেলে বেরিয়ে ছ-টা নাগাদ ওর নবীন পাল লেনের বাড়িতে পৌঁছোলাম। ওর বাড়ির সামনেই একটা মস্ত গাড়ি দাঁড়িয়েছিল যার কাচের ওপর লাল ক্রস আর ইংরেজিতে লেখা 'ডক্টর'। কিছু না ভেবে ওপরে উঠে যাচ্ছি, সিঁড়ি বেয়ে হাতে স্টেথোস্কোপ ভাঁজ করে নিয়ে একজন মোটাসোটা ডাক্তার মুখোমুখি নেমে এলেন। সিঁড়ির ওপরে দরজার মুখেই সত্যর বউ নীরা শুকনোমুখে দাঁড়িয়েছিল। ফর্সা, সুন্দর মেয়েটা, কিন্তু তখন রুখু চুল, ময়লা শাড়ি, সিঁদুর ছাড়া কপাল আর কেমন একটা রাতজাগা ক্লান্তির ভারে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল ওকে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই ফুঁপিয়ে উঠল—'ও মারা যাচ্ছে, অজিতবাবু!' শুনে বুকের ভেতরে যেন একটা কপাট হাওয়া লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি সত্যচরণ পুবদিকে মাথা করে শুয়ে আছে, পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে সিঁদুরের মতো লাল টকটকে রোদ এসে পড়েছে ওর সাদা বিছানায়। ওর মাথার কাছে ছোটো টেবিলে কাটা ফল, ওষুধের শিশি-টিশি রয়েছে, মেঝেয় খাটের নীচে বেডপ্যান-ট্যান। কিন্তু এগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। ঘরের মধ্যে ওর আত্মীয়স্বজনও রয়েছেন কয়েকজন। দুজন বিধবা মাথার দু-ধারে ঘোমটা টেনে বসে, একজন বয়স্কা মহিলা পায়ের দিকটায়। একজন বুড়োমতো লোক খুব বিমর্ষ মুখে সিগারেট পাকাচ্ছেন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে, দুজন অল্পবয়সি ছেলে নীচু স্বরে কথা বলছে। দু-একটা বাচ্চাও রয়েছে ঘরের মধ্যে। তারা কিছু টের পাচ্ছিল কি না জানি না, কিন্তু সেই ঘরে পা দিয়েই আমি এমন একটা গন্ধ পেলাম—যাকে—কী বলব—যাকে বলা যায় মৃত্যুর গন্ধ। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না কিন্তু আমার মনে হয় মৃত্যুর একটা গন্ধ আছেই। কেউ যদি কিছু নাও বলত, তুমি আমি চোখ বুজেও ওই ঘরে ঢুকে বলে দিতে পারতাম যে, ওই ঘরে কেউ একজন মারা যাচ্ছে। যাকগে, ওই গন্ধটা পেয়েই বুঝতে পারলাম নীরা ঠিকই বলেছে, সত্য মারা যাচ্ছে। হয়তো এখুনি মরবে না, আরও একটু সময় নেবে। কিন্তু আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আমি ঘরে ঢুকতেই মাথার কাছ থেকে একজন বিধবা উঠে গেলেন, পায়ের কাছ থেকে সধবাটিও। কে যেন একটা টুল বিছানার পাশেই এগিয়ে দিল আমাকে বসবার জন্য। তখন সত্যর জ্ঞান আছে। মুখটা খুব ফ্যাকাশে রক্তশূন্য আর মুখের চামড়ায় একটা খড়ি-ওঠা শুষ্ক ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'কে?' বললাম—'আমি রে, আমি অজিত।' বলল—'ওঃ, অজিত! কবে এলি?' বুঝলাম, একটু বিকারের মতো অবস্থা হয়ে আসছে। বললাম—'এইমাত্র। তুই কেমন আছিস?' বলল—'এই একরকম, কেটে যাচ্ছে।' আমি ঠিক ওখানে আর বসে থাকতে চাইছিলাম না। তুমি তো জানো ওষুধ-টষুধের গন্ধে আমার কীরকম গা গুলোয়! তাই একসময়ে ওর কাছে নীচু হয়ে বললাম—'তোর টাকাটা দিতে এসেছি।' ও খুব অবাক হয়ে বলল—'কত টাকা!' বললাম—'পঞ্চাশ'। ও ঠোঁট ওলটাল—'দুর, ওতে আমার কী হবে! ওর জন্য কষ্ট করে এলি কেন? আমি কী মাত্র পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিলাম তোর কাছে? আমি তো তার অনেক বেশি চেয়েছিলাম!' আমি খুব অবাক হয়ে বললাম—'তুই তো আমার কাছে চাসনি! আমি নিজে থেকেই এনেছি, অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলাম—তোর মনে নেই?' ও বেশ চমকে উঠে বলল—'না, ধারের কথা নয়? কিন্তু তোর কাছে আমি কী একটা চেয়েছিলাম-না? সে তো পঞ্চাশ টাকার অনেক বেশি।' জিজ্ঞেস করলাম—'কী চেয়েছিলি?' ও খানিকক্ষণ সাদা ছাদের দিকে চেয়ে কী ভাবল, বলল—'কী যেন—ঠিক মনে পড়ছে না—ওই যে—সব মানুষ-ই যা চায়—আহা, কী-যেন ব্যাপারটা। আচ্ছা দাঁড়া, বাথরুম থেকে ঘুরে আসি, মনে পড়বে।' বলে ও ওঠার চেষ্টা করল। সেই বিধবাদের একজন এসে পেচ্ছাপ করার পাত্রটা ওর গায়ের ঢাকার নীচে ঢুকিয়ে ঠিক করে দিল। কিছুক্ষণ—পেচ্ছাপ করার সময়টায়, ও বিকৃত মুখে ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করল শুয়ে শুয়ে। তারপর আবার আস্তে আস্তে একটু গা-ছাড়া হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল—'তোর কাছেই চেয়েছিলাম নাকি—কার কাছে যে—মনেই পড়ছে না। কিন্তু চেয়েছিলাম—বুঝলি—কোনো ভুল নেই। খুব আবদার করে গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে চেয়েছিলাম, আবার

ভিখিরির মতো হাত বাড়িয়ে ল্যাং ল্যাং করেও চেয়েছিলাম, আবার চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়েও চেয়েছিলাম—কিন্তু শালা মাইরি দিল না...।' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'কী চেয়েছিলি?' ও সঙ্গে সঙ্গে ঘোলা চোখ ছাদের দিকে ফিরিয়ে বলল—'ওই যে—কী ব্যাপারটা যেন—নীরাকে জিজ্ঞেস কর তো, ওর মনে থাকতে পারে—আচ্ছা দাঁড়া—একশো থেকে উলটোবাগে গুনে দেখি, তাতে হয়তো মনে পড়বে।' বলে ও খানিকক্ষণ গুনে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল—'না, সময় নষ্ট। মনে পড়ছে না।' আমি তখন আস্তে আস্তে বললাম—'তুই তো সবই—পেয়েছিস!' ও অবাক হয়ে বলল—'কী পেয়েছি—অ্যাঁ—কী?' আমি মৃদু গলায় বললাম—'তোর তো সবই আছে। বাড়ি, গাড়ি, ভালো চাকরি, নীরার মতো ভালো বউ, অমন সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা দার্জিলিং-এ কনভেন্টে পড়ছে। ব্যাঙ্কে টাকা, ইনশিয়োরেন্স—তোর আবার কী চাই?' ও অবশ্য ঠোঁটে একটু হাসল, হলুদ ময়লা দাঁতগুলোএকটুও চিকমিক করল না, ও বলল—'এসব তো আমি পেয়েইছি। কিন্তু এর বেশি আর একটা কী যেন—বুঝলি—কিন্তু সেটার তেমন কোনো অর্থ হয় না। যেমন আমার প্রায়ই ইচ্ছে করে একটা গাছের ছায়ায় বসে দেখি সারাদিন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। অথচ ওই চাওয়াটার কোনো মাথামুন্ডু হয় না। ঠিক সেইরকম—কী-যেন একটা—আমি ভেবেছিলাম তুই সেটাই সঙ্গে করে এনেছিস! কিন্তু না তো, তুই তো মাত্র পঞ্চাশটা টাকা—তাও মাত্র যেটুকু ধার করেছিলি—কিন্তু কী ব্যাপারটা বল তো, আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না—! অথচ খুব সোজা, জানা জিনিস সবাই চায়!'

আমার স্বামীকে অন্ধকারে খুব আবছা দেখাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভাবসাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। উনি একটু বিমনা গলায় বললেন—'অনু, সত্যচরণের ওখান থেকে বেরিয়ে সেই রাত্রে প্রথম বর্ষার জলে আমি ভিজেছিলাম—তুমি খুব বকেছিলে—আর পরদিন সকাল থেকেই আমার জ্বর—মনে আছে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

—সত্যচরণ তার তিনদিন পর মারা গেছে। সেই কথাটা শেষপর্যন্ত বোধ হয় তার মনে পড়েনি। কিন্তু আমি যতদিন জ্বরে পড়েছিলাম ততদিন, তারপর জ্বর থেকে উঠে এ-পর্যন্ত কেবল-ই ভাবছি কী-সেটা যা সত্যচরণ চেয়েছিল। সবাই চায়, অথচ তবু তার মনে পড়ল না কেন?

বলতে বলতে আমার স্বামী দু-হাতে আমার মুখ তুলে নিয়ে গভীরভাবে আমাকে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—'তবু সত্যচরণ যখন চেয়েছিল তখন আমার ইচ্ছে করছিল সত্যচরণ যা-চাইছে, সেটা ওকে দিই। যেমন করে হোক সেটা এনে দিই ওকে। কিন্তু তখন তো বুঝবার উপায় ছিল না, ও কী চাইছে কিন্তু এখন এতদিনে মনে হচ্ছে সেটা আমি জানি'—

আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'কী গো সেটা'?

আমার স্বামী শ্বাস ফেলে বললেন—মানুষের মধ্যে সবসময়েই একটা 'ইচ্ছে' বরাবর চাপা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। কোথাও কেউ একজন বসে আছেন প্রসন্ন হাসিমুখে, তিনি আমার কিছুই চান না, তবু তাঁকে আমার সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার কথা। টাকাপয়সা নয়, আমার বোধ-বুদ্ধি-লজ্জা-অপমান-জীবন-মৃত্যু—সব কিছু। বদলে তিনি কিছুই দেবেন না, কিন্তু দিয়ে আমি তৃপ্তি পাব। রোজগার করতে করতে, সংসার করতে করতে, মানুষ সেই দেওয়ার কথাটা ভুলে যায়। কিন্তু কখনো-কখনো সত্যচরণের মতো মরবার সময়ে মানুষ দেখে, সে দিতে চায়নি, কিন্তু 'নিয়তি' কেড়ে নিচ্ছে, তখন তার মনে পড়ে—এর চেয়ে স্বেচ্ছায় দেওয়া ভালো ছিল।

শেষবেলায়

নেত্য, নেত্যগোপাল সামন্তর বাড়িটা এদিকে কোথায় জানেন? ও মশায়—

রকে এক বুড়ো বসে। একটা তেলচিটে তুলোর কম্বল থেকে মুখখানা জেগে ওঠে। বড়োবেশি খানা-খোঁদল মুখে, আর নারকেল ছোবড়ার মতো রুখু দাড়িগোঁফ। শিরা-উপশিরা সব ভেসে উঠেছে। মারকুটে বুড়ো। চোখের কোণে মাখনের মতো পিচুটি জমছে।

—নেত্য?

—নেত্যগোপাল।

—সামন্ত বাড়ি? কী বললে?

—তাই বলছি। নেত্য সামন্ত। দালাল!

—হবে।

—সে থাকে কোথা?

বুড়োটা ঘোলাটে চোখে একটু চেয়ে থাকতেই কপালের চামড়ার নীচে বানমাছের মতো একটা রগ সরে গেল একটু পিছলে। মরবে! কিন্তু কফ-শ্লেষ্মা তিনটেই প্রবল। গলার ঘড়ঘড়টা সামলাতে পারছেন না। বুকে বাতাস ডাকছে।

—শেলেশশা। বুঝলে?

—বুঝেছি।

—অনেক নতুন নতুন লোক বসেছে নিশ্চিন্দায়। নতুন কালের মানুষ সব। সবাইকে কি চিনি?

হরেন চৌধুরী বুঝল, হবে না, বলল—কিন্তু খুব নামডাকের লোক। তিনচার রকমের দালালি।

—রাখো তোমার দালালি। দালাল নয় কে? কী নাম বললে? নেত্যগোপাল? নেত্যগোপাল! সামন্ত বাড়ি—

—এই বাড়িটাই দেখিয়ে দিল একজন।

—এই—বাড়ি? বলে মাথা নাড়ে বুড়োটা—কিছু ঠাহর পাই না। এই মনে পড়ে। ভুলে যাই। ঝুব্বুস হয়ে বসে গেছি বাপ, কে আর দেখে আমাকে! জারটাও বাড়ল খুব এবার।

হরেন হাসে—জার কোথা খুড়োমশাই? দিব্যি বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে।

—তোমার তো দিবেই। যার মাথায় হাত তার জার। শরীরে সেই কোন সকালে শীত ঢুকে বসে আছে। তাড়াই কত। যায় না।

—তো নেত্য সামন্তর খোঁজ পাই কী করে? বাড়িতে কে আছে?

—আছে অনেক। জ্ঞাতিগুষ্টি কি কম? তিষ্টোতে পারি না বাপ, বড্ড জ্বালায় ছেলেগুলো। নিত্যগোপালের ছেলে, আমার নাতি—

হরেন ঝুঁকে সাগ্রহে বলে—কী নাম বললেন? আপনার ছেলে নিত্যগোপাল?

বুড়ো হতচকিত চোখে চায়—তবে কার ছেলে? ভুল বললুম নাকি?

—তাহলে তো এইটেই নিত্যগোপালের বাড়ি।

—এইটাই?

—চেনেন না বললেন যে?

—চিনি। আমার ছেলে। ভুল হয়ে যায় বাপ। আমি হচ্ছি গয়েশ সামন্ত। বলে বুড়ো মাড়ি আর মুখের ফোকর দেখিয়ে হাসে—এইবার মনে পড়েছে। সব হিসেবে ঠিকঠাক। সামন্ত বাড়ি, নেত্য।

—নেত্যকে আমার দরকার।

—যাও-না ভেতরে। এটা কি সকাল বাপ? ক-টা বাজল?

—বিকেল। চারটে। এ-সময়ে থাকার কথা।

—আছে বোধ হয়। এখানেই থাকে। গয়েশ সামন্তর ছেলে হল নেত্যগোপাল, নেত্যগোপাল।

ছেলেপুলে তো কাউকে দেখছি না। কাকে দিয়ে ডাকাই! অচেনা লোক হুট করে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হবে?

—ছেলেপুলে? নেত্যর? তারা সব গর্ভস্রাব।

গালাগালটা হরেনের শোনা। বাবা দেয়।

বলল, ছেলেগুলো জ্বালায় নাকি?

—কিছু রাখে না। এক পুরিয়া চিনি লুকিয়েছি তোশকের তলায়। লোপাট। কিছু রাখে না। বড়ো এলাচ খেলে বুক ভালো থাকে, চিত্ত এনে দিয়েছিল এক মুঠো। কড়মড় করে চিবিয়ে খেল। বউমা-রা সব যে পেটে এগুলো কী ধরেছিল, ছি: ছি:!

হরেন চৌধুরী উঠে দরজায় 'নেত্যবাবু' বলে ডাকতে লাগে।

'ভেতরে শোনা যায় না।' বুড়োটা বলে।

—কেন?

—সব অনেক ভেতরে থাকে। ছেলেগুলো সর্বক্ষণ খাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, কিচ্ছু শোনা যায় না, ঢুকে যাও।

—মেয়েছেলে রয়েছেন, যদি কেউ কিছু মনে করেন! উটকো লোক।

—পর্দানশিন তো নয়। যখন গাল পাড়ে তখন তো ইয়ের কাপড় মাথায় উঠে যায়। মেয়েছেলে? যাও। সর্বক্ষণ লোক আসছে, এ বাড়ি হচ্ছে হাট।

তা হরেন চৌধুরী কিছুক্ষণ দোনামোনা করে ঢুকেই পড়ে। রক পেরিয়ে দরজা। ভেতরে একটা বাঁধানো জায়গা, বারান্দামতো। তারপর মস্ত উঠোন। বাড়িটার কোনো প্ল্যান ছিল না, নাকি? যেখান-সেখান দিয়ে ঘর-বারান্দা সব গজিয়েছে। দেওয়ালে প্লাস্টারের বালাই নেই, ইট বেরিয়ে আছে। এক পাশে ভারা বাঁধা, রাজমিস্ত্রির কাজ চলছে বোধ হয়। কান্ডটা প্রকান্ডই। উঠোনের চারধারেই ঘর, ঘরের ওপর ঘর উঠেছে কোথাও। একটাই বাড়ির খানিকটা একতলা, খানিকটা দোতলা, তেতলাও আছে। উঠোনের মাঝখানে কুয়ো, কুয়োর পাশেই আবার টিউবওয়েল। বিস্তর বাচ্চাকাচ্চা আর কয়েকটা মেয়েছেলে দেখা যায়। কুয়োপাড়ে বাসনের ডাঁই মাজতে বসেছে কুঁজো চেহারার কালো এক মেয়েছেলে। মাজতে মাজতে বকবক করছে। তার কাঁকালের ফাঁক দিয়ে বাঁদরের বাচ্চার মতো একটা বছর দেড়েকের মেয়ে ঝুলে আছে, তার মাথাটা বুকের মধ্যে সেঁদোনো। মেয়েমানুষেরা পারেও! ভেবে একটু শিউরেও ওঠে হরেন।

হেঁকেই জিজ্ঞেস করে—নেত্যগোপালবাবুর বাড়ি তো এটা?

কেউ তাকালও না। উঠোনজুড়ে চিলচেঁচানি। খাপড়া ছুড়ে গুটিসাতেক ছেলেমেয়ে 'গঙ্গাযমুনা' খেলছে। তাদের মধ্যে একজন এক ঠ্যাং-এ লাফিয়ে তিন ঘর পেরিয়ে গেল, সবাই চেঁচাচ্ছে তাই!

এই হচ্ছে জয়েন্ট ফ্যামিলির ছবি। হরেনের চোখ দুটো করকর করে উঠল। দুঃখে। একসময়ে সে এরকম একটা পরিবারে মানুষ হয়েছিল। সেসব ইতিহাস। আজ সামন্তমশাইয়ের কাছে এসেছে ছোট্ট একটা প্লট বা বাড়ির সন্ধানে। লোকটার হাতে বিস্তর জমির খোঁজ। কলকাতায় আর জমি নেই। যাও-বা ছিল ঢাকুরে, যাদবপুর, বেহালা বা গড়িয়ায়—তাও টপাটপ ফুরিয়ে এল বলে। এরপর কলকাতার জমি বিক্রি হবে ঝুড়িতে। মানুষ তাই কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখবে। দেখবার মতো জিনিস হবে একটা। তা সেই দুর্লভ জমি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই হরেন এক মুঠো চায়। ছোট্ট প্লট হলেই তার চলে যাবে। সংসার বড়ো নয়। বউ আর দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে। কাঠাখানেক কী, দেড়েক হলেই তিনতলা তুলবে। সুবিধেমতো জায়গায় হলে একতলাটা হবে দোকানঘর, দোতলায় ভাড়াটে, তিনতলায় তাদের ছোট্ট সংসার।

ছোটো পরিবার-ই সুখী পরিবার বলে বটে, কিন্তু হরেনের মনের ধন্দটা যায়নি। সামন্তমশাইয়ের বাড়ির দৃশ্যটা দেখে কী জানি কেন, হরেনের বুকটায় মেঘ জমে ওঠে। এইরকম একটা হাটখোলায় সে মানুষ হয়েছিল। সুখে নয়, আবার তেমন সুখ আর পাবেও না।

দীর্ঘশ্বাস চেপে সে দু-কদম এগোল। বারান্দার নীচে নর্দমা, তাতে একটা নীল বল পড়ে আছে। উঠোনে ফাটা বেলুনের রবার ন্যাতার মতো, একটা ছাগল ঘাস থেকে মুখ তুলে হরেনের চোখে চোখ রাখে। কোনো বিধবার রোদে-দেওয়া কাপড় অশুচি করেছে হতচ্ছাড়া কাক, বুড়ি দোতলার রেলিং ধরে ঝুঁকে চেঁচাচ্ছে—বলি নেন্তি, কাকে ছোঁয়া কাপড় মা, রাঁড়ি বলে তো আর মানুষের বাইরে যাইনি, তখন থেকে বলছি, ধো, না-হয় গঙ্গাজলের ছিটে দে...

হরেন নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

বোঝা যায় যে, এ-বাড়িতে লোকের যাতায়াত বিস্তর। সে যে ঢুকে এসে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ গ্রাহ্যই করে না। যেন-বা বাড়ির লোক। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বাড়ির লোক আর বাইরের লোক চেনা ভারি মুশকিল। কেউ অচেনা এসে দাঁড়ালে, ছোটোবউ ভাবে বড়োবউয়ের কাছে এসেছে, বাপ ভাবে ছেলের কাছে এসেছে, ভাই ভাবে দাদার কাছে এসেছে। কেউ গা করে না।

গলাখাঁকারি দিয়ে দিয়ে গলায় ব্যথা। বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা বৃথা। তারা আরও ব্যস্ত।

মিনিট দশেক ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একটা চলতি বাচ্চাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতে হদিশ পাওয়া গেল। নেত্য থাকে দোতলার ঘরে। 'ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান, ঘর খোলা আছে, কাকামশাই এ সময়ে অঙ্ক কষেন।' বলে বাচ্চাটা উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সিঁড়ি চটা ওঠা। হয় সিমেন্ট পায়ে পায়ে উঠে গেছে, নয়তো লাগানোই হয়নি। গোয়াল সকলের, ধোঁয়া দেবে কে।

দোতলার ঘরে নেত্য সামন্তর অফিস-কাম-বেডরুম। ঘরটায় তক্তপোশ আছে, টেবিল-চেয়ারও। কিন্তু দলিল-দস্তাবেজ, মুসাবিদা আর মামলার কাগজে ছয়লাপ। টেবিল-চেয়ারে ডাঁই, বিছানাও অর্ধেক দখল নিয়েছে কাগজেরা। থলথলে চেহারার কালোমতো নেত্যগোপাল মেঝেয় বসে চৌকির ওপর গ্রীবা তুলে জিরাফের ভঙ্গিতে—হ্যাঁ—অঙ্কই কষছে বটে। আসলে ফর্দ। কীসের ফর্দ তা অবশ্য, দেখার চেষ্টা করে না হরেন।

—কী চাই আজ্ঞে?

—নেত্যগোপাল সামন্তমশাই কি আপনি?

—আজ্ঞে।

—এসেছিলাম একটু বিষয় ব্যাপারে—

নিত্য বা নেত্যগোপাল ঘাবড়ায় না। নিত্যকর্ম। ফর্দটা মুড়ে রেখে বলে—'আসুন।

বসুন'। বলে নেত্যগোপাল বিড়ি ধরায়। তারপর বলে—'বলুন।'

—একটু বাস্তুজমি।

—জমি?

—আজ্ঞে।

হুবহু নেত্যগোপালের অনুকরণ করে হরেন বলে।

—খরচাপাতি কীরকম? এলাকা? তৈরি বা পুরোনো বাড়ি চলবে না?

—চলবে, তবে তিনতলার ভিত হওয়া চাই।

নেত্যগোপাল হাসল। হাতের বিড়িটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল একটু। তারপর বলল—'যারা বাড়ি করে তারা তিন বা চারতলার ভিত-ই গাঁথে, সে একতলা বাড়ি করলেও। শেষপর্যন্ত আর তিন-চারতলা হয়ে ওঠে না। বেশির ভাগ-ই টাকার অভাবে য-তলার ভিত তার আদ্দেক উঠে ফুরিয়ে যায়। মাটির তলায় বৃথা খরচ।'

হরেন চুপ করে রইল। তিনতলাটা তার চাই-ই।

'আমাদের বাড়ির-ই সেই দশা। মাটির নীচে হাজার পনেরো-বিশ টাকা ওপরে তে-ঠেঙে ভূতে-পাওয়া বাড়ি।' —বলে হাসল নেত্যগোপাল।

হরেনও হাসল। কারণ নেই। তারপর হঠাৎ, দালালের সামনে বেশি হাসা উচিত নয় ভেবে গম্ভীর হয়ে বলল—তবে বাড়ির চেয়ে জমিই ভালো। পছন্দমতো করা যাবে।

—কীরকম করতে চান?

—একতলায় দুটো দোকানের প্রভিশন থাকবে, আর গ্যারেজ। দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট, তিনতলাটা আমার। ওটা—

নেত্য বা নেত্যগোপাল বিড়িটা মন দিয়ে দেখে। চোখ ছোটো, কপালে লম্বা কোঁচকানো দাগ।

'শুনছেন?' হরেন সন্দেহবশত জিজ্ঞেস করে।

'শুনেছি।' বলে নেত্যগোপাল।

তিনতলাটায় চতুর্দিকে বারান্দা-টারান্দা হবে, চিলেকোঠার পাশে চারতলায় হবে ঠাকুরঘর।

নেত্যগোপাল শ্বাস ছাড়ল।

কথাবার্তায় আরও সময় গেল খানিক। আগামপত্তর করতে হল কিছু। পেয়ে যাবে হরেন। বর্ষার আগেই ভিত গেঁথে ফেলতে পারবে। নেত্যগোপালের দু-হাতের দশটা আঙুলের নখে নখে কলকাতার মাটি লেগে আছে। কলকাতার জমি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই এক খামচা তুলে নিতে পারবে বলে, ভরসা হয় হরেনের। একতলার দুটো দোকানঘরের একটাতে বসাবে গবেট বড়োছেলেটাকে। গ্যারাজটা অবিশ্যি খালিই পড়ে থাকবে এখন, যদি ভগবান কখনো সুদিন দেন...। গোরু পুষবার বড়ো শখ ছিল তার। হবে না। গোরু, সবজিখেত, হাঁসমুরগি এসবের জন্য মফসসলের দিকে কাঁদালো জায়গাই পছন্দ ছিল তার, কিন্তু গিন্নির শখ কলকাতায় থাকবে। থাকো তাই। হরেনের গোরু তাই বাদ গেল। একটা শ্বাস পড়ে যায়। বাপ-দাদার সঙ্গে চিরকালের মতো ছাড়ান-কাটান হয়ে যাচ্ছে। যাক। এজমালি সংসারের লোভী মুখখানার 'হাঁ' আর বন্ধই হয় না। বাবা গত এগারো বছর বসে আছে, দাদা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে বুড়ো হয়ে গেল। পরের ভাই মোটরমিস্ত্রি, তার ওপর লাভ-ম্যারেজের দজ্জাল বউ। থাকা যায় না একসঙ্গে। পয়সাকড়িতে রোজগারে, ওর মধ্যে হরেনেরইযা হোক একটু চিকিমিকি। বউ তাই রোজ-ই সাবধান করে—'এই বেলা ভেন্ন হও, নইলে সব তোমার ঘাড়েই হামলে থাকবে।'

বুড়োটা নীচের বারান্দায় খেতে বসেছে। বাটিতে চিঁড়ের জাউ কিংবা সাগু—কিছু একটা হবে। সপসপে জিনিসটা হাতের কোষে তুলে ভয়ংকর মুখখানা 'হাঁ' করে সড়াৎ টেনে নিচ্ছে। এই বয়সে খাওয়া বাড়ে। বাড়লেই বুঝতে হয়, দিন শেষ হয়ে আসছে। হরেন মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

প্রশ্নটা এসে পড়ে মুখে, সামলাতে পারে না হরেন। জিজ্ঞেস করে—তা সামন্তমশাই তো ইচ্ছে করলেই নিজের মতো একখানা বাড়ি করে ভিন্ন থাকতে পারেন। এই ক্যাঁচকেঁচির মধ্যে থাকা—

নেত্য বা নিত্যগোপাল হাত-রসিদটায় চোষ কাগজ চেপে বলে—ভাবি মাঝে মাঝে, বুঝলেন! সাত ভাইয়ের সংসার, ছেলেপুলে মিলে একটা পুরো পল্টন। পয়লা তিন ভাইয়ের বিয়ে দেখেশুনে হয়েছিল, পরের চারজন কোথা থেকে একে একে সব বউ নিয়ে এসে পটাপট ঢুকিয়ে দিল বাড়িটায়। গুষ্টি বাড়ছে ভাবি বুঝলেন!

—আপনি ইচ্ছে করলেই তো হয়।

—হয়। এক সদ্যবিধবার জমি পেয়েছিলাম সুবিধামতো। বায়না-টায়নাও হয়ে গেল। ঝপ করে দর পেয়ে ছেড়ে দিলাম। দালালি করার ওই অসুবিধে। দামটা সবসময়ে মাথায় বিঁধে থাকে নিজের জন্য আর আমি ভাবতেই পারি না। কয়েকবার চেষ্টা করেও দেখেছি। ভাবি, চলে যাচ্ছে যখন যাক। তবে ভাবি মাঝে মাঝে, বুঝলেন! ভাবনাটা আছেই। বলে খুব হাসে নেত্য বা নিত্যগোপাল।

—আজকাল আর জয়েন্ট ফ্যামিলি চলে না—

—সে তো বটেই। একা একার যুগ পড়ে গেল। ছোটো সংসার সুপসাপ ঘরদোর, ছোটো হাঁড়ি, ছোটো পাতিল। এসব-ই চল হয়েছে। ইচ্ছেও করে খুব।

বুড়োটা হড়হড়ে পদার্থটা তরল করে গোটা দুই রুটি গুড় আর জল দিয়ে মাখছে। দাঁত নেই, তবু জলে গুলে খাবে। খাওয়াটা এই বয়সেই বাড়ে। হরেনের বাবারও বেড়েছে। দিনরাত খাওয়ার গল্প। হরেনের বউ করে খুব বুড়োর জন্য। আলাদা হয়ে উঠে গেলে কষ্ট হবে উভয়তই। বাবাকে কী নিজের কাছে নিয়ে যাবে হরেন? ভেবে আপনমনেই মাথা নাড়ে। নেওয়াটা ঠিক হবে না। কেন ঠিক হবে না তা অবশ্য ভেবে পায় না সে। নিজস্ব ঘরবাড়ি, তার মায়া বড়ো সাংঘাতিক। বুড়ো মানুষ ঘরে হাগবে মুতবে। তা ছাড়া, হরেনের বউ-ই একটা জীবন করে গেল হরেনের বাপের জন্য। এবার অন্য ভাইয়ের বউরাও করুক। এসব ভেবেই হরেন আপন-মনে মাথা নাড়ে।

নেত্য বা নিত্যগোপাল রসিদখানা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—'কথা তখন-ই পাকা হয় যখন জায়গাটা হয়ে গেল। ভাববেন না চৌধুরীমশাই, টাকা যখন আগাম বায়না নিয়েছি ভাবনা এবার আমার।'

হরেন ওঠে। উঠতে উঠতেই বলে—'পরের ভাবনা তো ভাবলেন-ই। আমি ভাবছি আপনার কথা! কত জমি আপনার তাঁবে। লাখোপতি থেকে আমার মতো অভাজন ধরনা দেয়। সকলের-ই জোতজমি করে দেন আপনি। অথচ নিজের বেলায়—'

নেত্য বা নিত্যগোপাল ভ্রূ কোঁচকায়। অমায়িক মুখে বলে—'আমিও ভাবি। ভেবে ভেবে কেটে যাক জীবনটা। আলাদা বাড়ি, আলাদা সংসার, তার স্বাদ-ই আলাদা। বউও বলে, খুব বলে। জলে জলে হাত-পা হেজে-মজে যায়, জায়েদের ছেলেপুলে টেনে কাঁখে ব্যথা, প্রলয় উনুনের ওপর বিশাল কুম্ভীপাকে রান্না করে মাথাধরার ব্যামো, অম্বল। সব-ই বুঝি মশাই। কিন্তু মাথার মধ্যে এমন এক দাঁও মারার মতলব বাসা বেঁধেছে যে, কী বলব!

আরও দু-চারটে কথা বলে হরেন চৌধুরী বেরোয়।

রকে এসে আবার মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে বুড়ো। হাতে বিড়ি। তাকে দেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—ক-টা বাজে বাপ?'

হরেন হাসে। ঘড়ি ঘড়ি টাইম জানা নেই, যেন কত অফিস বা সিনেমার বেলা বয়ে যাচ্ছে। ঠাট্টা করে বলল—টাইম জেনে কী হবে খুড়োমশাই? ইষ্টচিন্তা করুন।

—সময় কি ফুরিয়েছে বাপ?

হরেন হাসিটা গিলে বলে—বেলা তো ফুরিয়েই এল খুড়োমশাই!

—বেলা ফুরিয়েছে? বলে খুড়ো একটা থমকে চেয়ে থাকে। মুখখানা তুবড়ে অদ্ভুত দেখতে হয়। ঠোঁট দুটো ফোকলা হাঁয়ের মধ্যে কচ্ছপের মুখের মতো ঢুকে বেরিয়ে আসে। বুড়ো বলে—এটা কি বিকেল?

—তাই বটে।

—তবে যে মেজোবউমা বড়ো চিঁড়ের জাউ খাওয়ালে? অ্যাঁ! জাউ তো আমি সকালে খাই। বৈকেলে আজ হালুয়া খাব বলেছিলাম যে? অ্যাঁ!

হরেনের এটুকু কষ্ট হয় বুকের মাঝখানটায়। বলে—খাবেন, তাই কী? খাওয়া কি একদিনের?

—চিত্ত সুজি এনে রেখেছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে তাহলে ওই গর্ভস্রাবগুলোকে খাইয়েছে। বাপ ঝুব্বুস হয়ে বসে আছি, এখন কে আর দেখে আমাকে! চিঁড়ের জাউ আমার বেহান বেলায় খাওয়ার কথা—নেত্যর বউ কিছু খেয়াল রাখে না বাপ! সাত-সাতটা বউ ইয়ের কাপড় মাথায় তুলে দিনরাত্তির ছেলেগুলোকে গেলাচ্ছে। বিড়িটা ধরিয়ে দাও তো বাপ, হাত বড্ড কাঁপে—

হরেন চৌধুরী গয়েশের বিড়িটা ধরিয়ে দেয় যত্ন করে। একটু হেসে বলে—হিসেব সব মেলে খুড়োমশাই?

—হিসেব! কোন হিসেবের কথা বলছ?

—এই যে, আপনি গয়েশ সামন্ত, আপনার সাতটা ছেলে, সাত বউ, কত নাতি-নাতনি, তারপর এটা বেহান বেলা না সাঁঝবেলা—এসব হিসেব?

বুড়ো বিড়িটা টেনে কাশতে কাশতে গয়ের তোলে গলায়। হাঁপির টান। বিড়ি খাওয়া বারণ নিশ্চয়ই, লুকিয়ে চুরিয়ে খায়। খাওয়াটা আসল।

—মেলে না বাপ, ভুল পড়ে যায়। এই একটু আগে একজন কার খোঁজ করছিল?

—আমিই।

—হবে। বলে বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে। হরেন কান পেতে শোনে। বুড়ো হিসেব মেলাচ্ছে—আমি হলুম গে গয়েশ সামন্ত... সামন্তবাড়ি..। বড়োছেলে চিত্ত, মেজো নিত্য, আরও কতকগুলো...

হরেন ঘড়িটা দেখে নিয়ে হাঁটা দেয়। রেললাইন বরাবর হেঁটে প্ল্যাটফর্মে ওঠে। পাঁচটা পাঁচে ট্রেন। সিগন্যাল দেয়নি এখনও। প্ল্যাটফর্মে কালো কালো কিছু মেয়েপুরুষ আর বাচ্চা সংসার পেতে আছে। পোঁটলা-পুঁটলি, ইটের উনুন, কৌটোর মগ ছত্রাকার। উকুন বাছছে, ছেলে ঠেঙাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। বিশ-ত্রিশখানা রুটি রোদে শুকোতে দিয়ে একটা মেয়ে বসে কাক তাড়াচ্ছে। কেন যে, রুটি শুকোয় এরা কে জানে! একটা বাচ্চা হামা দিয়ে এসে হরেনের জুতো ধরে ফেলেছে। হরেন ঠ্যাং টেনে নেয়। সংসারটার দিকে একটু চেয়ে থাকে। ভারি নিশ্চিন্ত হাবভাব, দুনিয়াজোড়া জমি ওদের। যেখানে-সেখানে বসে যায়।

শীতের বেলা। রোদ মরে গিয়ে এ-সময়টা বাতাসটা ভারী হয়ে ওঠে। মাটির ভাপ, না-ধোঁয়া মেঘের মতো গড়ায় মাটির ওপর। ওর ভারী বাতাস দুঃখের শ্বাসের মতো জমে আছে পৃথিবীর ওপর।

সামন্তমশাই পাকা লোক। জমি একটা পেয়েই যাবে সুবিধেমতো। বর্ষার আগেই ভিত গেঁথে ফেলবে। ভারি একটা আনন্দ হয় হরেনের।

আবার কী জানি কেন, রোদমরা বিকেলটার দিকে চেয়ে বুকটা হঠাৎ ছাঁৎ করে ওঠে। কী একটা যেন, মনে হয় একটু ভয়-ভয় করে। বুকটায় বগড়ি পাখির মতো কী একটা গুরগুর করে ডাকে। পেটটা পাকিয়ে ওঠে।

ভিখিরিদের সংসার, প্ল্যাটফর্মের কৃষ্ণচূড়া গাছ, দূরের সিগন্যাল—এসবের ওপর দিয়ে আকাশ আর জমির মাঝ-বরাবর একটা অদ্ভুত আলো-আঁধারি ঘনিয়ে আসছে। ট্রেন রেলপুল পেরিয়ে আসছে। হরেন চৌধুরী গাড়ির শব্দটা ঠিক শুনতে পায় না। সেই আলো-আঁধারিটার দিকে অন্যমনে চেয়ে থাকে।

সাহেবের তলোয়ার

—গোঁসাইনি?

—আইজ্ঞা।

—আইলানি?

—আইজ্ঞা আইলাম।

—বহ বহ, খবর বার্তা কও।

—খবর বার্তা ভালো নয়। রাসুবাবু ঘাড় কাইত করলেন না।

—কও কী? মাইনকা টিপির মইধ্যে পড়লাম নাকি হে গোঁসাই?

—আইজ্ঞা মাইনকা টিপি বইলাই তো মনে হয়।

—পাকঘরে একখান চুপি মাইরা দেইখ্যা আসো তো, তাইন পাকঘরে নাকি!

—আইজ্ঞা চুপি মারতে হইব না। এইখান থিক্যাই ছ্যাক-ছোক শব্দ পাইতেছি।

—তা হইলে নিশ্চিন্তে কথা কওন যায়। রাসুবাবু কয় কী?

—'এয়ারলিং' মানে জানন আছে?

—এয়ারলিং? না হে গোঁসাই। ইংরেজি শব্দ নাকি?

—তাই তো মনে হয়। কইলেন, এইটা হইল আমাগো এয়ারলিং। বেচুম ক্যান? এইটা বেচলে তো নিজেরেও বেচন যায়।

—ঘাড়খানা অখনও তেড়াই আছে, না?

—আইজ্ঞা। আমারে তো একরকম খেদাইয়াই দিলেন। কইলেন, পরেশরে গিয়া কইও, তার যে টাকার গমর হইছে হেইটা আমি জানি। কিন্তু টাকা দিয়া কি সব কিনন যায় হে?

এত বড়োকথা?

আইজ্ঞা, কথা উনি বড়োই কন।

—ফুটানি যায় নাই। আর সব গেছে, ফুটানি যায় নাই।

অন্ধকার চেপে বসেছে চারদিকে। ঘর থেকে একটা লণ্ঠনের আলোর চৌখুপি এসে পড়েছে উঠোনে। তার আভায় দেখা যাচ্ছে, উঠোনে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে দুটো দিশি কুকুর। উত্তর আর পুব দিকে আরও দু-খানা ঘর। আশপাশে কচু বন, বাঁশঝাড়। জোনাকি পোকা উড়ছে খুব। মশার শব্দ হচ্ছে। শীতের প্রথম দিককার কুয়াশাও ঘন হয়ে আছে চারদিকে। একটা মাছ ভাজার গন্ধ ভাসছে চারদিকে। পরেশ ঘোষ তার নিবন্ত হুঁকোটায় দুটো নিষ্ফল টান দিয়ে একটা হাঁক মারল, 'বুচি রে, তামুক সাইজ্যা দিয়া যা।'

ফ্রক-পরা আট-নয় বছরের একটা মেয়ে এসে হুঁকো থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে গেল। মাছভাজার গন্ধটা বড়োই ভালো লাগছিল কানু গোঁসাইয়ের। সারাদিন ঘুরে তার পেটে এখন উথাল-পাতাল খিদে। বাড়ি ফিরতে এখনও দেড় মাইল পথ। নাকটা তুলে গন্ধটা প্রাণভরে শুঁকছিল সে। বুচি এসে হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে গেল।

—তামুক খাইবা গোঁসাই?

—না, থাউক গা।

—রাসু আমার টাকা দেখতাছে, কিন্তু আর কিছু দেখে না ক্যান কও-না? প্যাটে গামছা বাইন্ধা, উদয়াস্ত খাইট্যা তবে-না দুইটা পয়সার মুখ দেখছি। কেউ কইতে পারব পরেশ ঘোষের ফুটানি আছে?

—আমি কই কী, আপনি নিজে একবার গিয়া খাড়ান। আপনে গিয়া খাড়াইলে রাসুবাবু না কইতে পারবেন না।

পরেশ মাথা নেড়ে বলল, উপায় নাই হে গোঁসাই।

—ক্যান, কাইজ্যা হইছে নাকি?

—কাইজ্যা বলে কাইজ্যা? তার সামনে যাওনের উপায় নাই।

—হইছে কী কইবেন তো?

—শোনবা?

—কইয়া ফ্যালান।

—অখন কওন যায়। পুরানা ঘটনা তো, অখন কইলে দোষ নাই।

পরেশ ঘোষ কিছুক্ষণ তামাকে টান দিল। 'গুড়ুক গুড়ুক' মিষ্টি শব্দের সঙ্গে এসে মিশল পেঁচার ডাক। মাছভাজার গন্ধটা মিইয়ে গিয়ে জিরা বাটা, লঙ্কা আর হলুদের টগবগ করা ঝোলের টাটকা গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কানু গোঁসাইয়ের পেটের অস্বস্তিটা বাড়ল। এই শীতের মরশুমে মেলা মাছ উঠছে বাজারে। তেলাল সরপুঁটি, ভ্যাদা, ট্যাংরা, কই। একটু ধনেপাতা ছিটিয়ে রাঁধলে অমৃত। কিন্তু কানু গোঁসাইয়ের ট্যাঁকের জোর নেই। বাড়ি ফিরে চারটি ভাত আর একটু শাকপাত, কচু, ঘেঁচু জুটলেই বহুত। পরেশ ঘোষ আজ কিছু দেবে। দিলে কাল না-হয় 'দুর্গা' বলে কিনেই ফেলবে একটু মাছ। গন্ধটা তাকে বড্ড কাহিল করে ফেলেছে।

—রাসুর বইন চন্দ্রিমার কথা শোনছ?

—খুব শুনছি। কুসারি পাড়ায় শ্রীশ দাসের লগে বিয়া হইছে যার।

—হেই। তার লগে আমার একখান সম্বন্ধ আইছিল।

—নাকি?

—সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। বিয়া পাকা, আশীর্বাদও হইয়া গেছিল, নিমন্ত্রণের চিঠিও বিলি হইয়া গেছে, এমন সময়ে আমার পিতৃদেব একখান কান্ড কইর‍্যা বইলেন। পাঁচ হাজার টাকা নগদের কথা আছিল, কিন্তু তাইন হঠাৎ বাইক্যা বইস্যা কইলেন, আমাগো দক্ষিণের ঘর ভাইঙ্গা পড়ছে, ঘর না মেরামত করলে পোলা আর বউ থাকব কই? সুতরাং ঘর তোলনের লিগ্যা আরও পাঁচ হাজার লাগব।

—ছিল না?

—পাঁজ হাজার কী ফাইজলামি নাকি হে, গোঁসাই? রাসুর বাপের অবস্থা তখন পড়তি, ঘরে কর্জ কইরাই বিয়া দিত্যাছিল। গেল বিয়া ভাইঙ্গা।

—ইস রে! চন্দ্রিমা তো শুনছি খুব সুন্দরী।

—আরে হেই লিগ্যাই তো বাবার লগে আমার বনে নাই। বুড়া 'টাকা-টাকা' কইরা দাপাইয়াই মইরা গেল। শ্যাষে কুলতলির এই কুচ্ছিতটারে আমার গলায় আইন্যা ঝুলাইয়া দিল।

—কী যেন কন! বউঠাইন তো লক্ষ্মীপ্রতিমা।

—তোমার মাথা। যেমন রূপ তেমন-ই গলার জোর। মাথার চুলগুলি কী আমার উইঠ্যা গেল সাধে? এই মাগির লিগ্যা উঠতে-বসতে অশান্তি।

—কী যে কন ঘোষমশায়?

—মাগির গায়ের রংখান দেখছ? লণ্ঠনের কালি, ধলা না হইল, এমন কালাও মানুষ হয়? আর দ্যাখো এই মাগির লিগ্যাই রাসুর পায়ে তেল দিতে হইতাছে।

—বৃত্তান্তখান কী?

—কী লেন, কী দেন, কী বৃত্তান্ত কইতে গেলে রাইত ফুরাইব। সংক্ষেপে কই, আমার শালা ব্রাউন নামে কোনো এক সাহেবের লগে নারায়ণগঞ্জে স্টিমার কোম্পানি খুলছে। পয়সা লুটতাছে মন্দ না। তবে সাহেবটার বাতিক আছে। গ্রামে-গঞ্জে ঘুইরা কেবল পুরানা জিনিস খুঁইজ্যা বেড়ায়। রাসুর বাড়িতে গিয়াও হানা দিছিল। পুরানো তরোয়ালখান দেইখ্যা খুব পছন্দ। শুনছি এক হাজার টাকায় কিনতেও চাইছিল। রাসু দেয় নাই।

—তাই, ক্যান?

—খাড়াও, কথা অখনও শ্যাষ হয় নাই।

রাসুর লগে না পাইরা অখন আমার শালা রামপদরে ধরছে সাহেব। যত টাকা লাগে লাগুক, তরোয়ালখান তার লাগব।

—সাহেব কততে উঠব?

—ওই যে, তোমারে যা কইয়া দিছি, তিন হাজার। তিন হাজারে ষাইট বিঘা জমি হয়। সোজা কথা নাকি? সাহেবটা পাগল বইল্যা শ্যাষে টাকাটা জলে ফালাইতে চাইতাছে।

খিদেটা হঠাৎ যেন, উধাও হল কানু গোঁসাইয়ের। টাকার কথা শুনতে তার ভালোই লাগে। একটা তরোয়ালের এত দাম হতে পারে, তা তার ধারণায় ছিল না। সোনার কাজ করা, রুপোর খাপে মোড়া তরোয়ালটা নাকি রাসুদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। বিস্তর পুরোনো। কিন্তু দামটাও বেজায় বেশি হয়ে যাচ্ছে।

সে বলল, সাহেবটা পাগল-ই।

—আর কইও না। সাহেব কইছে, তরোয়ালখান না পাইলে রামপদর লগে আর কারবার-ই করব না। আর হেই লিগ্যাই রামপদর গুণধরী বইন, আমার অর্ধাঙ্গিনী আমারে উঠতে বইতে তিষ্ঠাইতে দিত্যাছে না।

—রামপদ নিজে যায় না ক্যান?

—গেছিল। খেদাইয়া দিছে।

—খেদাইয়া দিল ক্যান? রামপদ তো আর আমার মতো ছাতামাতা মানুষ না।

—আর কইওনা হে গোঁসাই। রামপদ একটা বলদামি কইরা ফালাইছিল। গিয়া কথায় কথায় কইয়া ফালাইছে, পরেশ ঘোষ আমার ভগ্নীপতি। ভাবছিল আমার নাম কইলে রাসু ভড়কাইব। আর যাইবা কই? এই মারে কী সেই মারে। কইছে কী জান?

—আইজ্ঞা, ভালো কথা না নিশ্চয়ই?

—কইছে তোমার ভগ্নীপতির বংশ খারাপ, তোমার ভগ্নীপতি হারামি, আরও কত কথা। মুখ তো না, ফ্যান ছিটাল।

—আইজ্ঞা, রাসুবাবুর বায়ু একটু চড়া। হইব না ক্যান কন। কত বড়ো বংশ আছিল। হাতি ফান্দে পড়ছে ঠিক-ই, তবে অখনও হামবড়াইটা তো যায় নাই।

—আরে রাসু হইল ফোতো কাপ্তান। অর আছেটা কী? 'বংশ' ধুইয়া কী জল খাইব?

—আইজ্ঞা, কথাটা ঠিক-ই। শোনলাম গতমাসেও পঞ্চাশ বিঘা জমি বেইচ্যা কর্জ শোধ করতে হইছে। সোনাদানাও বোধ হয় আর বেশি কিছু নাই।

—আরে, থাকব কইত্থিকা? বেইচ্যা-বেইচ্যাই তো এতকাল খাইল। অকালকুষ্মান্ড আর কারে কয়? তবু ফুটানি ছাড়ে না।

—আইজ্ঞা, যা কইছেন।

মাছের ঝোল নেমে গেছে উনুন থেকে। এবার একটা সোনামুগ ডালের গন্ধ ছড়াচ্ছে। জ্বালাতন আর কাকে বলে। এসব গন্ধের পর বাড়ি ফিরে কচুর ঝোল দিয়ে আউস চালের মোটা ভাত কি মুখে রুচবে?

—কিছু দিবেন নাকি ঘোষমশায়?

পরেশ হুঁকোটা বাঁশের খুঁটির গায়ে ঝুলিয়ে রেখে বলল, আরে রও, দিমু। কিন্তু কামটা উদ্ধার কইর‍্যা দাও।

—ক্যামনে?

—য্যামনে পারো। কথার লড়চড় হইব না। যদি তরোয়ালখান বাগাইয়া আনতে পারো, তোমারে কড়কড়া পঞ্চাশটা টাকা দিমু।

—পঞ্চাশ?

—ক্যান, পঞ্চাশ কি কম হইল?

—আইজ্ঞা না, কথাটা ভালো শুনতে পাই নাই বইলাই, আর একবার শুইন্যা নিলাম।

—যাওন আহনের খরচা আলাদা দিমু। কিন্তু কামটা উদ্ধার কইর‍্যা দাও। রামপদ পরশু দিন আইয়া মেলা কাকতি-মিনতি কইরা গেছে। সাহেব যদি তারে খেদায় তবে তার গণেশ-উলটাইব। খোঁটার জোরে যেমন মেড়া কোন্দে, তেমন আমাগো রামপদ কোন্দে ব্রাউনের জোরে।

—বুঝছি।

—আরও একটু বুইঝ্যা যাও। এই যে, কালি মাগিরে লইয়া ঘর করি সেই মাগি কিন্তু আমারে খাবলাইয়া খাইতাচে। তার ভাইরে উদ্ধার করতে না পারলে আমার আর শান্তিতে ঘরে বইয়া তামাকটুকু খাওনেরও উপায় থাকব না। কাজ-কারবার লাটে উঠব। বোঝলা?

—ভাবতে দ্যান।

—বেশি ভাবতে হইব না। আমি জানি তুমি বুদ্ধিমান লোক। উপায় একটা করতে পারবাই।

—একটা চোরারে কামে লাগামু ঘোষমশায়?

—চোর! কও কী?

—আইজ্ঞা, এই মাইনকা চিপি থিক্যা রক্ষা পাইতে হইলে আর উপায় কী? লাটু দাসেরে চিনেন?

—হবিবগঞ্জের লাটু নাকি?

—আইজ্ঞা। তারে লাগাইলে হয়। ব্যাটার খুব নামডাক। আমার লগে চিনা আছে।

পরেশ পাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, আরে বা:, এই মতলব তো আমার মাথায় আসে নাই হে গোঁসাই? তা হইলে তারেই লাগাও।

—দশ বিশ টাকা খর্চ লাগব কিন্তু।

—ঠিক আছে। জিনিসটা আইন্যা আগে আমার হাতে দাও। খর্চ তো আছে। খাড়াও, তোমার দক্ষিণাটা দিতাছি।

মুগডালের গন্ধ তীব্র হচ্ছে। এ তো শুধু সেদ্ধর গন্ধ। এরপর ফুটন্ত ডালে জিরেবাটা, আদাবাটা আর হলুদ পড়বে। তারপর পড়বে ঘি দিয়ে জিরে ফোড়ন। ওঃ, তখন যা গন্ধ ছাড়বে না, গোলাপ ফুলকে বলবে ওদিকে থাক।

পাঁচটা টাকা আশা করেনি কানু গোঁসাই। দুটো-একটা টাকাই জোটে। আজ পাঁচ টাকা পেয়ে বুকটা নেচে উঠল।

—গোঁসাই, কাইল সকালেই গিয়া লাটুরে ধইর‍্যা ফালাও। দেরি কইরো না। সাহেবের মতিগতি কুনদিন বদলাইয়া যায় ঠিক কী?

কানু গোঁসাই উঠে পড়ল। তার ট্যাঁকে ঘড়ি নেই ঠিক-ই, কিন্তু সময়ের আন্দাজ আছে। এখন রাত বড়োজোর ন-টা। এ-সময়ে চাঁদিপুরের রতন জেলে 'নদীয়াল' মাছ ধরে এনে ঘাটে বসে। ভাগ-বাঁটোয়ারা

করে। অনেক সময়ে পাওয়া যায়। চার-ছ-আনার মাছ কিনতে পারলে আজ রাতে পেটভরে দুটো ভাত খাওয়া যাবে।

—সে বলল, তা হইলে আসি গিয়া ঘোষমশায়।

—আহ গিয়া। মনে থাকে য্যান—

না, মাছ পেল না কানু গোঁসাই, ঘরে ফিরে ঠাণ্ডা ভাত আর মানকচুর ঝোল-ই খেতে হল। তা হোক, পকেটে পাঁচটা টাকা থাকায় আজ তেমন খারাপ লাগল না। মনটা নাচলে সব-ই ভালো লাগে।

মনের নাচ বন্ধ হল যখন হবিবগঞ্জের ঘাটে লাটুর সঙ্গে দেখা হল পরদিন দুপুরে। রোগা ছোটোখাটো চালাক চেহারার লাটু কথাটা শুনেই বলে উঠল, খ্যাপচেন নাকি গোঁসাই? রাসুবাবুর যে বন্দুক আছে হেইটা নি জানেন?

—বন্দুক? বন্দুকের ভয় পাও নাকি রে বাসি? তা হইলে আর কাজটা করলা কী?

—না মশায়, পাঁচ-সাত টাকায় আমার পোষাইব না।

—কত চাও?

—পঞ্চাশ টাকা দিলে ভাইব্যা দেখতে পারি।

‘পঞ্চাশ? পঞ্চাশ দিলে আর কানুর থাকে কী?’ সে বলল, ‘এক বিঘা জমির দাম চাও?’

—আমি চামু ক্যান? আপনে চুরিধারি করেন নাই, আপনে বুঝবেন ক্যামনে চোরের কাম কত কঠিন?

—আইজ্ঞা, বিশ টাকাই দিমু।

—আপনার এত পয়সা হইল কবে? করেন তো পুরুতগিরি।

—আরে কাম আমার না, আমি নিমিত্তমাত্র।

—হেইরে বুঝছি। আপনার পিছনে কেডা আছে কন তো?

—কওন যাইব না হে।

—তা হইলে মাপ করবেন মশয়, পারুম না।

—পোষাইল না, নাকি হে? কামটা তো কঠিন না হে। একখান তরোয়াল বাইর কইরা আনবা।

—বন্দুক ফুটাইলে তো প্রাণটা আপনার যাইব না, যাইব তো আমার। বালবাচ্চা লইয়া ঘর করি মশয়, গুল্লি খাইয়া মরতে পারুম না।

লাটুকে যতটা বীর ভেবেছিল কানু, ততটা বীর সে নয় দেখে একটু হতাশ-ই হল। সন্ধেবেলা ফের পরেশ ঘোষের কাছে এসে বলল, না ঘোষমশায়, লাটু একখান ভেড়ুয়া।

পরেশ ঘোষ তামাকটা একটু ঘনঘনই খায়। উত্তেজিত হলে টানটাও দেয় উপর্যুপরি।

বেশ কিছুক্ষণ তামাক খেয়ে বলল, তুমিই একবার চেষ্টা কইরা দেখবা নাকি?

আজ ফুলকপি সাঁতলানোর মাতাল গন্ধটা আসছিল। আহা, নতুন কপি, তার গন্ধই আলাদা। ঘোষের কথাটা কানেই গেল না। ফুলকপির গন্ধ কথাটা খেয়ে নিল।

—কিছু কইলেন নাকি ঘোষমশয়?

—কইলাম। ঠেকায় পড়লে মাইনষে কী না করে?

—যা কইছেন। কিন্তু কামটা কী?

—লাটুর বদলে তুমিই লাইমা পড়ো।

—বুঝাইয়া কন।

—আরে, কৃষ্ণও তো ননি-মাখন চুরি করত। করত না?

—আইজ্ঞা।

—হেই কথাই কই। তুমি চালাক মানুষ, লাটু পারলে তুমিই-বা না পারবা ক্যান? রাসুর বাড়ির তো ঝুরঝুরা অবস্থা, বিড়ালের লাথিতে কপাট ভাইঙ্গা পড়ে। আমি কই রাত বিরাইতে গিয়া যদি ভিতরে ঢুইক্যা পড়ো, কাম ফর্সা।

কানু গোঁসাই বিষণ্ণ মুখ করে বলল, 'চোরও হইতে কন? এই দুই হাতে পূজা করি।'

—শোনো হে বাপু, মূল্য দিলে দোষ থাকে না। চুরি তো নিজের লিগ্যা করবা না, আমার লিগ্যা করবা। তার মূল্য ধইরা দিলে আর দোষ থাকব না। তুমি নিমিত্ত মাত্র।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানু বলে, আমি গরিব ঠিক-ই, তবে পইচ্যা যাই নাই ঘোষমশয়।

—চুরির বুদ্ধিটা কিন্তু তুমিই দিছিলা।

—তা দিছিলাম।

—তা হইলে আমার দোষ কী কও।

—দোষ আমার কপালের।

—চেইত্যো না হে গোঁসাই। মাথা ঠাণ্ডা করো।

—চেতি নাই। ভাবতাছি কথাটা কইলেন ক্যামনে। গরিবরে কি হগ্গল-ই কওন যায়?

—দোষের কথা কিছু কই নাই। মাথা ঠাণ্ডা কইরা ভাবলেই দিশা পাইবা। যাউকগা, কাজটা তো উদ্ধার করতে হইব। একখান বুদ্ধি বাইর করো।

কানু গোঁসাই ফের ফুলকপির গন্ধ পাচ্ছিল। এবার ঝোলের গন্ধ। নতুন আলু দিয়েই বোধ হচ্ছে ঝোলটা। কইমাছ দিয়ে কী? হতেও পারে। ফুলকপি দিয়ে কই মাছ দেবভোগ্য। একটা ঢোঁক গিলে ফেলল কানু গোঁসাই।

—কিছু ভাবলা গোঁসাই? আগে ব্রাহ্মণরাই আছিল পরামর্শদাতা। তাগো বুদ্ধিতেই সমাজ চলত। তাগো ট্যাঁকে পয়সা নাই, গায়ে জোর নাই, কিন্তু বুদ্ধি আছিল ক্ষুরধার।

—আইজ্ঞা।

—কামটা উদ্ধার কইরা দাও গোঁসাই।

—রামপদর কি খুব-ই বিপদ ঘোষমশয়?

—বছরে ব্রাউন সাহেবের টার্ন ওভার জান? লাখ টাকার ওপরে। রামপদ কম কইরাও বছরে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা কামায়। ব্রাউন যদি তারে ছাড়ে, তা হইলে রামপদরে গলায় দড়ি দিতে হইব। বোঝলা?

—মেলা টাকা।

টাকার গল্প শুনতে কানু গোঁসাই খুবই ভালোবাসে। রামপদ বছরে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা কামায় শুনে কান জুড়িয়ে গেল। বড়োলোকের দুঃখ সে সইতে পারে না। বড়োলোকেরা তো আর, এমনি-এমনি বড়োলোক হয়নি, ভগবান তাদের দিয়েছেন বলেই-না, তারা বড়োলোক।

পরেশ ঘোষ হুঁকোটা মুখ থেকে সরিয়ে বলল, হ, মেলা টাকা। এখন তুমিই কও গোঁসাই, ব্রাউন সাহেব রামপদরে ছাড়লে, রামপদ যদি গলায় দড়ি দেয়, তা হইলে তার বইন আমারে পিছার বাড়ি না দিয়া ছাড়ব?

—ব্রাউন সাহেব তিন হাজার টাকার ওপরে উঠব?

—কইতে পারি না। তবে তিন হাজারে যে উঠছে এইটাই আমার বিশ্বাস হইতে চায় না।

—সমস্যা কী জানেন? রাসুবাবু টাকারে টাকা মনে করে না। ছিড়া ত্যানা পইরা থাকলেও অহংকার যায় নাই।

—ঘাড় ত্যাড়া হারামজাদা। একখান জং ধরা তরোয়াল পইড়া আছে, হেইটা দিয়া তর হইব কী রে নিব্বইংশার পো?

—এয়ারলিং না কী জানি কইছিল।

—হ, এয়ারলিং না ঘোড়ার ডিম।

—তরোয়ালখান অর ইসের মইধ্যে ঢুকাইয়া দিতে পারলে মেজাজটা আমার ঠাণ্ডা হইত।

—আইচ্ছা ঘোষমশয়, রামপদর বিয়া দিতে আছেন না ক্যান? সাতাইশ-আটাইশ বছর বয়স তো হইল।

—নবাবপুত্তুর বিয়া করলে তো? কইয়া দিছে, বিয়া-টিয়া করব না, কেবল টাকা কামাইব। টাকারেই বিয়া করছে ধইরা লও।

হ্যাঁ, কইমাছ হবেই বটে। এইবার ঝোলের গন্ধে কইমাছের গায়ের গন্ধও যেন পেল কানু গোঁসাই। কইমাছের সঙ্গে ফুলকপির বিয়েটা যেন রাজযোটক। না:, আর বসে থাকলে কচুর ঝোল আর ভাত মুখে রুচবে না। কানু উঠে পড়ল।

—গেলা গিয়া নাকি?

—আইজ্ঞা।

—খাড়াও, তোমারে কিছু দিই। আজ দুটা টাকা এল হাতে। খারাপ কী!

পরদিন বাইশপুরের ঘাটে গিয়ে রামপদকে ধরল কানু। ধরা সোজা কথা নয়। রামপদ ব্যস্ত মানুষ। মালের স্টিমারে এখানে-সেখানে বেঘোরে ঘুরতে হয়। তাকে ধরতে তিন-চার জায়গায় হানা দিতে হল কানুকে। শেষে খবর পেল, ব্রাউন সাহেবের লঞ্চ বাইশপুরের ঘাটে মাল নামাচ্ছে। রামপদ সেখানে। দুপুরে সেইখানে গিয়ে হাজির হল কানু। রামপদ দাঁড়িয়ে পাটের গাঁট গুনছিল। গোনা শেষ করতে সময় লাগল। ততক্ষণে নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফের শীত ধরে গেছে কানুর।

—রামপদ, কথা আছে।

—আসেন গোঁসাইদা, লঞ্চে আইস্যা বসেন।

—বহনের সময় নাই। মেলা কাম।

—কী কাম?

—তোমার-ই কাম। ব্রাউন সাহেবের তরোয়ালখান লইয়াই কথা।

রামপদর মুখ উজ্জ্বল হল, কিছু উপায় করলেন? সাহেব তো আমার মাথা খাইয়া ফালাইল। কইয়া দিছে এক মাসের মইধ্যে তরোয়াল না পাইলে আমারে ত্যাজ্যপুত্র করব।

—আমার লগে তোমারে একখানে যাইতে হইব।

—কোনখানে?

—যেইখানে লইয়া যামু। যা কই শোনবা।

—তা যাইতে পারি। বাইশপুর থিক্যা মাল উঠব। লঞ্চখান দুই দিন এইখানেই থাকব।

—তা হইলে লও, অখন-ই বাইর হইয়া পড়ি।

—চলেন। তার আগে নদীতে ডুব দিয়া চাইট্টা ভাত খাইয়া লই। আপনেও আসেন, কাজরি মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাইবেন।

অনেকদিন পর কাজরি মাছ। জিব থেকে পেট অবধি যেন পদ্মার ঢেউ খেলে গেল আজ কানুর।

—যাইবেন কই গোঁসাইদাদা?

—রাসুর কাছেই যামু।

—সর্বনাশ, আমারে দ্যাখলে তো তার উনপঞ্চাশ বায়ু কুপিত হইব।

—জানি, তবে তোমার লিগ্যা একখান শ্যাষ চেষ্টা তো করতে হইব। তোমার ভগ্নীপতিও ঠেকায় পড়ছে তোমারে লইয়া। মাইনকা চিপি।

—আইজ্ঞা। তরোয়ালখান না পাইলে সাহেব যে কী করব আর না করব তার ঠিক নাই। আমার সোনার কারবার ছারেখারে যাইব গোঁসাইদা।

—বুঝছি। অখন লও, একখান ডিঙা ভাড়া করো। রাসুর গ্রাম বেশ দূরে না?

ডিঙায় বসে কানুর একটু ভাতঘুম হল। তার ফাঁকে-ফাঁকে রামপদর কিছু দুঃখের কথা। বড়োলোকের দুঃখ কানুর ঠিক সয় না। দুঃখ-টু:খ যা কিছু, তা এই তার মতো গরিবরাই করবে। বড়োলোকদের দুঃখ হওয়ার দরকার কী? ভগবান তো তাদের দুঃখ করার জন্য পাঠাননি। —এই সাদা-সাপটা ব্যাপারটা কানু পাকা বুঝেছে।

রাসুর দেখা পাওয়া গেল তার বাগানে। খুরপি হাতে বাগানে ফুলগাছের জমি উসকোচ্ছে। বিশাল বাগান, বিশাল বাড়ি, তবে পড়তি অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। বাড়ির গায়ে চাপড়া খসে পড়ে খোস-পাঁচড়ার মতো দাগ। বাগানের ঘের-পাঁচিল বহু জায়গায় ভেঙে পড়েছে, সেখানে কঞ্চির বেড়া দেওয়া। না, রাসুর অবস্থা খারাপ-ই। শুধু হামবড়াই ছাড়া কিছু নেই।

—নমস্কার রাসুবাবু।

—কেডা রে? আরে গোঁসাই! আবার আইছ?

—আইলাম রাসুবাবু।

—আবার তরোয়ালের খোঁজে নাকি? পরেশ তোমায় কত টাকায় কিনছে কও তো?

—আইজ্ঞা, আমার মতো মাইনষের দাম কী কন?

—তোমারে তো কইয়াই দিছি, টাকার মলম দিয়া আমারে নরম করতে পারবা না। টাকা আমি জীবনে মেলা দেখছি।

—আইজ্ঞা, একখান কথার মানে জিগাইতে আইছি।

—কী কথা?

—হেইদিন যে কইলেন তরোয়ালখান আপনাগো 'এয়ারলিং'—হেই কথাটার মানে কী?

রাসু কিছুক্ষণ বেকুবের মতো চেয়ে থেকে বলল, কইছিলাম নাকি?

—কইছিলেন, পরেশবাবুও কথাটার মানে জানে না।

রাসু মাথা নেড়ে বলল, আমিও জানি না। ব্রাউন সাহেব কইছিল, হেইরেই কইলাম।

কানু হেসে বলল, আমি রামপদরে জিগাইছিলাম। হ্যায় কিন্তু জানে।

—কী জানে?

—'এয়ারলিং' মানে হইত্যাছে বংশের স্মারক। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দ্রব্য।

—তাই নাকি?

—আইজ্ঞা।

—তাতে হইল কী?

—কইতাছিলাম, আপনের তো একখান মাইয়া, পোলা নাই। আপনেরটা পাইব কেডা?

—ক্যান কমলি পাইব।

—হেই কথাই কইতে আইলাম। কমলিই যদি পায়, তা হইলে তো আর বংশে জিনিসটা থাকব না। বেহাতি হইবই।

—তরোয়ালখান লইয়া আর মাথা ঘামাইও না হে, গোঁসাই। অখন আসো গিয়া। আমার কাম আছে।

—আমি কই কী, তরোয়ালখান দিয়া গিটঠুটা কাইট্যা ফালান।

—তার মানে?

—কমলির বয়স চৌদ্দ গিয়া পনেরোয় পড়ছে। ঠিক কইছি?

—হ, হঠাৎ কমলির বয়স লইয়া কথা ক্যান?

—গিটঠুটা কাটনের লইগ্যা। রামপদ পাত্র ভালো। বছরে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার।

—কও কী? পরেশ ঘোষের মতো ছোটোলোক যার ভগ্নীপতি, তার লগে মাইয়ার বিয়া?

—আইজ্ঞা, পরেশ ঘোষের বংশ খারাপ হইলে কি তার শ্বশুরবাড়িতেও দোষ অর্শায়? আপনে তো আহাম্মক নন, একটু ভাইব্যা দেখেন।

রাসুর মুখটা একটু ঝুলে পড়ল, গলার স্বরটাও নেমে গেল— ফান্দে ফালাইতে আইছ নাকি হে?

—আইজ্ঞা। ফান্দে না ফালাইলে সংসার চলে কেমনে? হঙ্গলেই হঙ্গলরে ফান্দে ফালায়। সংসারের নিয়ম।

—দ্যাখো হে, রামপদ পাত্র খারাপ না। কিন্তু তার বাপেও যদি পরেশ ঘোষের বাপের মতো হারামজাদা হয় তা হইলে?

—রামপদর বাপ নাই। বিধবা মা আছে। রামপদ বিয়া-টিয়া না কইরা জীবনটা কাটাইব বইল্যা ঠিক কইরা ফালাইছিল। তারেও ফান্দে ফালাইতে হইছে।

—রাজি আছে?

—আইজ্ঞা, রাজি না হইলে সাহেব যে তারে ত্যাজ্যপুত্র করব।

—নাকি? মাইয়া না দেইখ্যাই রাজি হইল?

—দেখে নাই কে কইল? কমলি ওই জামতলায় এক্কাদোক্কা খেলতাছে। লইয়া গিয়া দেখাইয়া দিছি। কী আর কমু, ওইরকম সুন্দরী মাইয়া পছন্দ না হইয়া উপায় কী? রামপদর তো অখন লোল পড়তাছে।

—রামপদ! তারে লইয়া আইছ নাকি?

—আনছি। হ্যায় ডিঙায় বইস্যা আছে। আপনেরে ভয় পায়।

—আরে, আরে, কী কান্ড! যাও, যাও, তারে লইয়া আসো। এই বাড়ির একটা মানমর্যাদা আছে।

রামপদ এল, ভারী লাজুক মুখ, মুখে রক্তাভাও। আর রাসুর মুখেও আজ অমায়িক হাসি। রামপদ রাজি, রাসু রাজি, তলোয়ারও রাজি। চারদিকটায় যেন আজ 'রাজি-রাজি' ভাব।

কথাবার্তা একরকম পাকাই হয়ে গেল। এমনকী রাসু বিয়েটা মাঘ মাসে পিছিয়ে দিতে চেয়েছিল, রামপদই মৃদু স্বরে বলল, না, অঘ্রাণেই হউক।

ফেরার সময়ে রাসু আড়ালে ডেকে বলল, 'না হে গোঁসাই, তুমি বাহাদুর লোক, এক কোপে দুই গিটঠুই কাটলা।'

একগাল হেসে কানু বলল, 'আইজ্ঞা, আমি বড়োলোকের দুঃখ সহ্য করতে পারি না।'

পরপুরুষ

করালী গোরু খুঁজতে বেরিয়েছিল। আর তারক বেরিয়েছিল বউ খুঁজতে।

কালীপুরের হাটে সাঁঝের বেলায় দুজনে দেখা।

বাঁ-চোখে ছানি এসেছে, ভালো ঠাহর হয় না। তবু তারককে চিনতে পেরে করালী বলল, তারক নাকি?

—আর বলো কেন দাদা। মাগি সকাল থেকে হাওয়া।

—ঝগড়া করেছিস?

—সে আর কোনদিন না হচ্ছে। আজ আবার বাগান থেকে মস্ত মানকচুটা তুলে নিয়ে বেরিয়েছে। আমি ভাবলুম কচু বেচতে যদি হাটে এসে থাকে।

—বাঁধা বউ, ঠিক ফিরে যাবে। আমার তো তা নয়। গোরু বলে কথা, অবোলা জীব। হাটে যদি হাতবদল হয় তো মস্ত লোকসান।

—গো-হাটা ঘুরে দেখেছ?

—তা আর দেখিনি! পেলুম না।

ভেবো না। গোরুও ফিরবে। চলো, পরাণের দোকানে বসি।

পরাণ তাড়ির কলসি সাজিয়ে বসে, একখানা বারকোশে ভাঁড় আর কাচের গেলাস সাজানো। আশপাশে খদ্দেররা সব উবু হয়ে বসে ঢকাঢক গিলছে। দুজনে সেখানে সেঁটে গেল।

কালীপুরের হাট একখানা হাটের মতো হাট-ই বটে। দশটা গাঁ যেন ভেঙে পড়ে। জিনিস যেমন সরেস দামও মোলায়েম। এই সন্ধের পরও হ্যাজাক, কারবাইড, টেমি জ্বেলে বিকিকিনি চলছে রমরম করে। হাটেবাজারে এলে মনটা ভালো থাকে তারকের। পেটে তাড়ি-টাড়ি গেলে তো আরও তর হয়ে যায়। তবে কিনা বউটা সকালবেলায় পালিয়ে যাওয়ায় আজ সারাদিন হরিমটর গেছে। রান্নাটা আসে না তারকের। ছেলেবেলায় এই কালীপুরের হাটেই এক জ্যোতিষী তার মাকে বলেছিল, 'বাপু, তোমার ছেলের কিন্তু অগ্নিভয় আছে। আগুন থেকে সাবধানে রেখো।' তাই মা তাকে গা ছুঁইয়ে বাক্যি নিয়েছিল, 'আগুনের কাছে যাবে না।' মায়ের কথা ভাবতেই চোখটা জ্বালা করল। মা মরে গিয়ে ইস্তক কিছু ফাঁকা হয়ে গেছে যেন! দুপুরে গড়ানো বেলায় মুকুন্দর দোকানে চারটি মুড়ি-বাতাসা চিবিয়েছিল। এখন খিদেটা চাগাড় মারছে।

করালী যেন মনের কথা টের পেয়েই বলল, নন্দকিশোরের মোচার চপ খাবি?

—খুব খাব।

—পয়সা দিচ্ছি, যা নিয়ে আয়।

নন্দকিশোরের মোচার চপের খুব নামডাক। সারাদিনে দোকানে যেন পাকা কাঁঠালে মাছির মতো ভিড়। এখন সন্ধেবেলায় ভিড় একটু পাতলা হয়েছে। সারাদিনে না-হোক কয়েক হাজার টাকার মাল বিক্রি করে

নন্দকিশোরের হ্যাদানো চেহারা। চারটে কর্মচারীও নেতিয়ে পড়েছে যেন।

নন্দকিশোর মাথা নেড়ে বলল, মোচা কখন ফুরিয়ে গেছে। ফুলুরি হবে। তবে গরম নয়।

—আহা, একটু গরম করে দিলেই তো হয়।

—উনুন ঝিমিয়ে পড়েছে বাপু। এখন আঁচ তুলতে গেলে কয়লা দিতে হবে। শেষ হাটে আর আঁচ তুলে লোকসান দেব নাকি দু-টাকার ফুলুরির জন্য?

—তা বটে। তারক এধার-ওধার খুঁজে দেখল। শেষে মুকুন্দ দলুইয়ের দোকানে গরম চপ পেয়ে নিয়ে এল।

খালি পেটে ঢুকে চপ যেন নৃত্য করতে লাগল। তার ওপর তাড়ি গিয়ে যেন গান ধরে ফেলল। ভেতরে যখন নাচগান চলছে তখন তারক বলল, কালীপুরের হাট বড়ো ভালো জায়গা, কী বলো করালীদা!

জিবে একটা মারাত্মক কাঁচালঙ্কার ঘষটানি খেয়ে শিসোচ্ছিল করালী। একগাল তাড়িতে জ্বলন্ত জিবটা খানিক ভিজিয়ে রেখে ঢোঁক গিলে বলল, সেই কোমরে ঘুনসি-পরা বয়সে বাপের হাত ধরে আসতুম, তখন একরকম ছিল। এখন অন্যরকম।

তারকের বাঁ-পাশে একজন দাঁত-উঁচু লোক তখন থেকে দু-খানা সস্তা গন্ধ সাবান বাঁ-হাতে ধরে বসে আছে। ডান-হাতে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাবান দু-খানা দেখছে বার বার।

পেটের মাঝে নৃত্যগীত চলছে, মেজাজটা একটু ঢিলে হয়েছে তারকের। লোকটার দিকে চেয়ে বলল, 'সাবান বুঝি বউয়ের জন্য?'

লোকটা উদাস হয়ে বলল, বউ কোথা? ঘাড়ের ওপর দু-দুটো ধুমসি বোন, মা-বাপ। মুকুন্দ বিশ্বেস সাফ বলে দিয়েছে, আগে পরিবার থেকে আলগা হও, তারপর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।

—তা আলগা হতে বাধা কী? হলেই হয়। আজকাল সবাই হচ্ছে।

—ভয়ও আছে। মুকুন্দ বিশ্বেসের ছেলের সঙ্গে তার ঝগড়া। মেয়ের বিয়ে দিয়েই মুকুন্দ আর তার বউ আমার ঘাড়ে চাপবার মতলব করছে।

—ও বাবা! সেও তো গন্ধমাদন।

—তাই তার বিয়েটা হয়ে উঠছে না।

—করো কী?

—ভ্যানরিকশা চালাই। নয়াপুর থেকে কেশব হালদারের মাল নিয়ে এসেছি। হাটের পর ফের মাল নিয়ে ফেরা। আর সাবানের কথা বলছ! সে কী আর শখ করে কেনা! লটারিতে পেলুম।

—বা:। লটারি মেরেছ, এ তো সুখের কথা।

—ছাই। ওই যে, লোহার রিং ছুড়ে ছুড়ে জিনিসের ওপর ফেলতে হয়। রিং-এর মধ্যিখানে যা পড়বে তা পাবে। ফি বার দু-টাকা করে। তিরিশখানা টাকা গচ্চা গেল। তারমধ্যে একবার এই সাবান দু-খানা উঠল। যাচাই করে দেখেছি, এ সাবান চার টাকা পঞ্চাশ পয়সায় বিকোয়।

—লটারি মানেই তো তাইরে ভাই। তুমিই যদি সব জিতে যাও তাহলে লটারিওয়ালার থাকবে কী?

দাঁত-উঁচু লোকটা এক চুমুক খেয়ে বলল, সবার-ই সব হয়, শুধু এই ভ্যানগাড়িওয়ালার-ই কিছু হয় না, বুঝলে! মা একখানা ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছিল, ট্যাঁকে আছে এখনও। সেসব আর নেওয়া হবে না। ক-টা বাজে বলো তো!

তারকের হাতে ঘড়ি নেই। আন্দাজে বলল, তা ধরো সাতটা সাড়ে-সাতটা হবে।

উরেব্বাস রে! কেশব হালদার মাল গোটাতে লেগেছে। যাই।

করালী শিসোচ্ছিল।

উঠবে নাকি গো করালীদা?

করালী একটা হাই তুলে বলল, গোরুটার কথাই ভাবছিলুম।

—কী ভাবলে?

—বাঁজা গোরু। পুষতে খরচ, আবার বেচতেও মন চায় না। কিনবেই বা কে বলো!

—তাই বলো, বাঁজা গরু। তা গেছে আপদ-ই গেছে। ভাবনার কী?

—আছে রে আছে। আমার ছোটোমেয়ে পদীর বড়ো ভাব গোরুটার সঙ্গে।

—পাল খাইয়েছ?

—কিছু বাকি রাখিনি। আর দুটো গোরু বিয়োয়, দুধও দেয়। এটাই দেয় না।

এতবড়ো হাটে বউ খোঁজা মানে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার শামিল। এসে থাকলেও এতরাত অবধি তো আর হাটের মাটি কামড়ে সে নেই। বউ যদি রাতে না ফেরে, তাহলে রাতেও হরিমটর। তারক ভাবছিল আরও কয়েকখানা চপ সাঁটিয়ে নেবে কি না। তারপর এক ঘটি জল খেয়ে নিলেই হল। কিন্তু পয়সার নেশাটা চৌপাট হয়ে গেলে মুশকিল।

২

পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষের সম্পর্ক নাকি 'চিড়েতন'। আ মোলো। সম্পর্কের আবার চিড়েতন, হরতন, ইস্কাপন, রুইতন নাকি? হলেও বাপু, যমুনা কী সেসব বোঝে? তবে কিনা নরেনবাবু ভদ্রলোক, মেলা জানেশোনে। নরেনবাবুর কথা তো আর ফেলনা নয়।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'চিড়েতনটা আবার কী, বলো তো বাবু?'

নরেনবাবু হেসেটেসে বলল, এই ধর তুই আর আমি। আমিও কারও কেউ নই, তুইও কারও কেউ নোস। যেমন জলের মাছ, কে কার মা-বাপ জানে ওরা? তবু তো ডিম ছাড়ছে, বাচ্চা বিয়োবে। ব্যাপারটা ওরকমই আর কী। চিরন্তন মানে হচ্ছে আদি সম্পর্ক—বুঝলি-না?'

যমুনা বুঝি-বুঝি করেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। তবে এটা ঠাহর হল যে, ওই চিড়েতনের মধ্যেই প্যাঁচটা আছে।

প্যাঁচ বুঝতে যমুনা কেন—কোনো মেয়েমানুষের-ই দেরি হয় না। যমুনার এই সতেরো বছর বয়স হল। এক বছর হল পুরুষমানুষ ঘাঁটছে। পুরুষটা হল তার বর তারক। একদিন মিটমিট করে হেসে বলেছিল, বাবুর বাড়িতে কাজে যাস, তা কখনো পিট-ঠিট চুলকে দিতে বললে দিস। নরেনবাবুর মেলা পয়সা। প্যাঁচ বুঝতে যমুনার দেরি হয় না।

আর একদিন বলল, আহা, বাবুর বউটা বোবা, পিরিতের কথা-টথা কইতে পারে না। পুরুষমানুষ একটু ওসব শুনতে-টুনতে চায়।

প্যাঁচ। যমুনা বুঝতে পারে। চিড়েতনটা বুঝতেও তার অসুবিধে হয়নি।

নরেনবাবুর বউ মলয়া বোবা-কালা। তবে সে পয়সাওয়ালা নিতাই রায়ের মেয়ে। নিতাই রায় পঞ্চাশ হাজার টাকায় নরেনবাবুকে কিনেছে। একথা সবাই জানে। নগদ ছাড়াও বাড়িঘর ঠিকঠাক করে দেওয়া, মেয়ের নামে জমিজমা লিখে দেওয়া তো আছেই। নরেনবাবুকে তাই আর কিছু করতে হয় না। শুয়ে-বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটছিল। তবে বেকার জামাই বলে লোকে টিটকিরি না দেয় সেজন্য ইদানীং নয়নপুরের বাজারে একখানা ওষুধের দোকানও করে দিয়েছে নিতাই রায়। গাঁয়ের দোকান, সেখানে ওষুধ ছাড়াও নানা জিনিস রাখতে হয়। তা নরেন হল বাবুমানুষ। সকালের দিকে শ্রীপতি নামে এক কর্মচারী দোকান দেখে, সন্ধেবেলা নরেনবাবু গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে আসে। সেখানে কিছু ইয়ারবন্ধুও জোটে এসে। শোনা যাচ্ছে, নরেনবাবুর

গদাইলশকরি চালে সুবিধে হয়েছে শ্রীপতির। সে দু-হাতে লুটে নিচ্ছে। তারকের তাই ইচ্ছে, শ্রীপতিকে সরিয়ে চাকরিটা সে বাগায়।

সোজাসাপটা ব্যাপার। এতে কোনো প্যাঁচ নেই। মানুষ কত কী চায়, আর চাইবেই তো! নেই বলেই চায়। কিন্তু চাইলেই তো হল না। দিচ্ছে কে? আর তখন-ই প্যাঁচটা লাগে।

মলয়ার দুটো মেয়ে। একটা সাড়ে তিন বছরের, একটা দু-বছরের। তারা কেউ বোবা-কালা নয়। বড়োটা পাড়ার খেলুড়িদের সঙ্গে খেলতে শিখেছে, আর ছোটোটা সারাবাড়িতে গুটগুট করে হেঁটে বেড়ায়। এ দুটো মেয়ে হচ্ছে মলয়ার জান। যখন আদর করে তখন খ্যাপাটে হয়ে যায়। আর সারাদিনে মাঝে-মাঝেই মেয়েদের 'আঁ-আঁ' করে ডাকে। মেয়ে দুটো মায়ের ডাক ঠিক বুঝতে পেরে ছুটে আসে। মেয়ে দুটোর দেখাশোনা করত উড়নচন্ডী পটলি। ছোটোমেয়েটা তখন সবে হামা দেয়। পটলি তাকে বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে উঠোনে দিব্যি এক্কা-দোক্কা খেলছিল। মেয়েটা গড়িয়ে পড়ে 'হাঁ' করে এমন টান ধরল যে, দম বুঝি ফিরে পায় না। মাথা ফুলে ঢোল। শোনার কথাই নয় মলয়ার। তবু 'মায়ের মন' বলে কথা। কোথা থেকে পাখির মতো উড়ে এসে মেয়ে বুকে তুলে নিল। তারপর সে কী তার ভয়ংকর চোখ আর ভৈরবী মূর্তি। পটলি না পালালে বোধ হয় খুন-ই হয়ে যেত মলয়ার হাতে। বোবাদের রাগ বোধ হয় বেশিই হয়। কথা দিয়ে দুরমুশ করতে পারে না, গালাগাল দিয়ে বুক হালকা করতে পারে না, তাই ভেতরে ভেতরে পোষা রাগ গুমরে ওঠে।

পটলির জায়গায় এখন যমুনা। মেয়েদের দেখে-শোনে, ধান শুকোয়, ঢেঁকি কোটে, গেরস্ত বাড়িতে তো কাজের আকাল নেই। আবার ছুটে গিয়ে ঘরের অকালকুষ্মান্ড ওই তারকের জন্যও রেঁধে রেখে আসতে হয়। তা বলে খারাপ ছিল না যমুনা। খাটনিকে তো তার ভয় নেই, চিরকাল গতরে খেটেই বড়োটি হল। কিন্তু ভয়টা অন্য জায়গায়। সে হল ওই মলয়া। বোবা-কালা হলে কী হয়, যমুনার বিশ্বাস, মলয়া অনেক কিছু টের পায়। শুনতে না পেলেও টের পায়। মাঝে-মাঝে কেমন যেন বড়ো-বড়ো চোখ করে তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। একটু ভয় ভয় করে যমুনার।

নরেনবাবু ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। একদিন বলল, 'নারী আর নদীতে কোনো তফাত নেই, বুঝলি মেয়েছেলে হল বওতা জল, ডুব দিয়ে উঠে পড়ো। নদী কী তাতে অশুদ্ধ হল? এই যে, গঙ্গায় কত পাপী-তাপী ডুব দেয়, গঙ্গা কী তাতে ময়লা হয় রে!'

আগে যমুনা শুধু শুনত, কিছু বলত না। আজকাল বলে। সে ফস করে বলে ফেলল, 'তোমার কী কোনো কাজ নেই বাবু? সকালের দিকটায় দোকানে গিয়ে বসলেও তো পারো। শ্রীপতি তো শুনি দোকান ফাঁক করে দিচ্ছে।'

নরেনবাবু একটা 'ফু:' শব্দ করে বলল, দিক না, তাতে আমার কী? দোকান শ্বশুরের, শ্রীপতিও তার লোক। সে বুঝবে। আমার ওতে মাথা গলানোর কী? আমি খাব-দাব ফুর্তি করব। বোবা-কালা বিয়ে করেছি কী মাগনা?

—শ্বশুর কী আর চিরকাল থাকবে? দোকান তো তোমার-ই হবে একদিন।

—আমার নয় রে, আমার নয়। দোকান ওই বোবা-কালার নামে। ও আমি চাইও না। দু-টাকার জিনিস চার টাকায় বিক্রি করে পয়সা কামানোর ধাত-ই আমার নয়। আমাকে কী তাই বুঝলি?

আর একদিন আরও একটু এগোল নরেনবাবু। কথা নয়, একখানা তাঁতের শাড়ি দিয়ে বলল, কাল সকালে পরে আসিস। তোকে মানাবে। এসে একটু ঘোরাফেরা করিস চোখের সামনে।

খুশি হল তারকও। বলল—বা:-বা:, এই তো কাজ এগোচ্ছে।

—তার মানে?

—নরেনটা তো ভিতুর ডিম। ভাবছিলাম আর বুঝি এগোবে না।

—কী বলতে চাও তুমি বলো তো!

—দোষ ধরিসনি। একটু মাখামাখি করলে যদি কাজ হয় তো ভালোই।

—তাই যদি হবে তাহলে তো বাজারে গিয়ে নাম লেখালেই পারতুম।

—চটিস কেন? পেটের দায় বলে কথা। শ্রীপতি শালা তো শুনছি, কৈলাসপুরে চার কাঠা জমি কিনে ফেলেছে।

—তাতে তোমার কী?

জ্বলুনি হয়, বুঝলি, বুকের মাঝখানটায় বড্ড জ্বলুনি হয়। ঘরামির কাজ করে করে হাতে কড়া পড়ে গেল, সুখের মুখ দেখলাম না। প্রথমটায় বাধো-বাধো ঠেকলেও পরে দেখবি ব্যাপারটা কিছুই না। আমিও যা, ওই নরেনবাবুও তা।

—তোমার মুখে পোকা পড়বে।

—ওরে শোন, ও চাকরির মতো সুখের চাকরি নেই। মালিক চোখ বুজে থাকে, হিসেব চায় না। এমনটা আর কোথায় পাবি?

এই টানাপোড়েনের মধ্যে দিন কাটছিল যমুনার। একদিন বিকেলে ভেতরের বারান্দায় বসে মলয়ার চুল বাঁধছিল যমুনা। বেশ চুল মেয়েটার। দেখতেও খারাপ নয় কিছু। মায়াও হয়। খোঁপায় কাঁটা গুঁজে হাত-আয়নাটা মলয়ার হাতে যখন ধরিয়ে দিল, তখন হঠাৎ আয়নাটা ফেলে ঘুরে বসল মলয়া। সেই বড়ো বড়ো চোখ। দু-হাতে হঠাৎ যমুনার দু-কাঁধ খিমচে ধরে ঝাঁকায় আর বলে, ‘আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-আঁ’...

ভয়ে আত্মারাম, ডানা ঝাপটাচ্ছিল বুকে। কী জোর মেয়েটার গায়ে!

কী করছ বউদি, কী করছ? আমি তো কিছু করিনি।

মলয়া ঝাঁকানি থামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল তার চোখের দিকে। তারপর সাপে ব্যাং ধরলে ব্যাং যেমন শব্দ করে তেমনি এক অবোধ শব্দ বেরোতে লাগল তার গলা থেকে। আর দু-চোখে জলের ধারা।

নরেনবাবু পরদিন-ই বলল, শহর বেড়াতে যাবি দুদিনের জন্য? শুধু তুই আর আমি। একটু ফুর্তি করে আসি চল।

ফুঁসে উঠতে পারল না যমুনা। তার কি সেই জোর আছে? জোর হল স্বামীর জোর। তার তো সেখানেই লবডঙ্কা। যমুনা সুতরাং অন্যপন্থা ধরে বলল, তোমার শ্বশুরকে যদি বলে দিই তাহলে কী হয়?

—ও বাবা! এ যে, আমার শ্বশুর দেখায়! কেন রে, শ্বশুরের কাছে কী টিকিখানাও বাঁধা রেখেছি? নিতাই রায়-ই বা কম কীসে? পটলডাঙায় তার বসন্তকুমারীর ঘরে যাতায়াত কে-না জানে? কী করবে সে আমার? তুই বড্ড বোকা মেয়েছেলে তো!

—শোনো বাবু, বউদি কিন্তু সব টের পায়।

—সোহাগের কথা আর বলিসনি। টের পায় তো পায়। কী করবে সে?

যমুনার ভাবনা হল। নরেনবাবুর সাহস বড়োই বেড়েছে, এবার তার বিপদ।

শুনে খ্যাঁক করে উঠল তারক, বিপদ আবার কী? তোকে তো কতবার বলেছি, ওতে কিছু হয় না। তোর আমিও রইলুম। কখনো কলঙ্ক রটিয়ে তোকে বিপদে ফেলব না। নরেনবাবুর সঙ্গে আমার পষ্টাপষ্টি কথা হয়ে গেছে।

—কী কথা?

—সামনের মাসে চাকরিতে জয়েন দেব।

—নরেনবাবু অন্য মেয়েমানুষ দেখে নেয় না কেন?

—যার যাকে পছন্দ। তোকে চোখে লেগেছে। ও বড়ো সর্বনেশে ব্যাপার। যাকে চোখে লাগে তার জন্য পুরুষমানুষ সব করতে পারে।

—আমি কাল-ই বাপের বাড়ি যাচ্ছি। লাথি-ঝাঁটা খাই, শুকিয়ে মরি, তাও ভালো। তবু নষ্ট হব না।

—বিপদে ফেললি দেখছি। বলি, আমার মতো একটা মনিষ্যিকে যদি তোর সব দিয়ে থাকতে পারিস তবে নরেনবাবু দোষটা কী করল? সে দেখতে আমার চেয়ে ঢের ভালো। ফর্সা চোখমুখে শ্রী-ছাঁদ আছে। আমি তার পাশে কী বল তো?

—তুমি আমার স্বামী।

—ওই তো তোর দোষ। স্বামীর মতো স্বামী হলেও না-হয় বুঝতুম।

—তুমি খারাপ লোক নও। তোমাকে লোভে পেয়েছে।

—তোর মাথাটাই বিগড়েছে। আমি খারাপ নই? খুব খারাপ। কেউ আজ অবধি আমাকে ভালো বলেনি।

—আমি বলছি। ভালো করে ভেবে দেখো।

—নরেনবাবু তোকে চায়। এমনকী একথাও বলেছে, সে তোকে বিয়ে করতেও রাজি।

'বিয়ে!' বলে এমন অবাক হয়ে তাকাল যমুনা, যেন ভূত দেখছে।

—ভয় পাসনি। তোর একটু ধর্মভয় আছে আমি জানি। আমি সাফ বলে দিয়েছি, বিয়ে-টিয়ে নয় মশাই। আমি বউ ছাড়ছি না। দু-দিন চার-দিন বড়োজোর।

—তোমার একটু বাধল না বলতে? নরকে যাবে যে!

—সে দেরি আছে। নরকে মেলা লোক-ই যাবে। কলিকালে কী নরকযাত্রীর অভাব রে! আগে এ-জন্মে কিছু জুত করে নিই। নরক তো আছেই কপালে।

যমুনা রাগ করে বলল, দ্যাখো, আমি সাবিত্রী বেউলো নই, তবে যা-বুঝেছি তা-ই বুঝেছি। আমাকে দিয়ে ও-কাজ হবে না।

—তুই বোকাও বটে রে! নরেনবাবুর কী মেয়েছেলের অভাব? তোর কত বড়ো ভাগ্য যে, এত মেয়েছেলে থাকতে তুই-ই ও-শালার চোখে পড়েছিস। আমি বলি, সময় থাকতে এসব ভাঙিয়ে নে। রূপ-যৌবন সব ভাঙিয়ে মা-লক্ষ্মীকে ঘরে এনে তোল আগে।

—মা-লক্ষ্মী এমন ঘরে লাথি মারতেও আসবে না।

মনটা ঠিক করে ফেলেছিল যমুনা। এখানে থাকলে যে, তার আর 'পরকাল' বলে কিছু থাকবে না তাও বুঝেছে। কিন্তু যায় কোথা? বাপের বাড়ি বলতে তুলসীপোঁতা গাঁয়ে একখানা ঝুপড়ি। এণ্ডি-গেণ্ডি অনেক ভাইবোনের সংসার। তার বাবা দাদ আর হাজার মলম বিক্রি করে, মা বেচে ঘুঁটে।

৩

বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটা তোলপাড় হচ্ছিল। ভোঁস-ভোঁস শ্বাসের শব্দ, সেইসঙ্গে কে যেন, আদাড়-বাদাড় ভাঙচে।

তারক ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল, 'ও কী গো?'

করালী চাপা গলায় বলল, 'চুপ'।

কান খাড়া করে শুনছিল করালী। বাঁশবনের মধ্যে দুটো চোখ চকচক করে উঠল হঠাৎ।

আহ্লাদের গলায় করালী বলল, 'ওরে পাজি মাগি, এখেনে সেঁধিয়ে রয়েছিস। আয়, আয় বলছি শিগগির।'

বাঁশবনে প্রলয়ের শব্দ তুলে আর ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ফেলতে-ফেলতে গোরুটা বেরিয়ে এল। গোরু না হাতি বোঝা ভার। বিশাল চেহারা।

—উরেব্বাস রে! এই তোমার গোরু?

গোরুটা করালীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল, তার গলা এক হাতে জড়িয়ে ধরে করালী বলল, ‘আহা, বাঁজা বলেই ওর মনে সুখ নেই কিনা। মনের দুঃখে মাঝে মাঝে বনবাসে যায়। ফিরেও আসে। চল চল পা চালিয়ে চল। মেয়েটা এতক্ষণে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে।’

তারক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তুমি কপালঅলা মানুষ, গোরুটা দিব্যি পেয়ে গেলে। এখন আমার বউ কোথা পাই বলতে পারো? আমার কপাল তো আর তোমার মতো নয়।

—পাবি পাবি। বাঁধা বউ যাবে কোথায়? মারধর করিস নাকি?

—আরে না। সেসব নয়, নরম-সরম আছে, গায়ে হাত তোলার দরকার হয় না। তবে গোঁ আছে খুব। যেটা ‘না’ বলবে, সেটাকে ‘হ্যাঁ’ করায় কার সাধ্যি?

রথতলার কাছ বরাবর করালী বাঁয়ের রাস্তা ধরল, তারক ডাইনে।

সামনেই ‘মলয়া’ ফার্মেসি। আলো জ্বলছে। দিব্যি পাকাঘর। দোকানও বড়োসড়োই। আজ নরেনবাবু নেই। শ্রীপতি একা বসে মাছি তাড়াচ্ছে।

তাকে দেখে শ্রীপতি বিশেষ খুশি হল না। হওয়ার কথাও নয়। মুখটা আঁশটে করে বলল, বাবু নেই।

—আসেনি আজ?

—না। সকাল থেকেই পাত্তা নেই। বাড়ি থেকেও লোক এসে খুঁজে গেছে।

—অ্যাঁ। তবে তো—

শ্রীপতি চেয়ে আছে। বুকটা ধকধক করছিল তারকের। তাড়ির নেশাটা কেটে যাওয়ার উপক্রম।

—গেল কোথায় নরেনবাবু?

শ্রীপতি ঠোঁট উলটে বলল, তা কে জানে। বলে যায়নি কিছু। বাড়ির লোকও খুঁজছে।

দুইয়ে-দুইয়ে তবে কী চার-ই হল? যমুনা আর নরেনবাবু যদি একসঙ্গেই হাওয়া হয়ে থাকে তো শ্রীপতির জায়গায় সামনের মাসে সে-ই জয়েন দেবে।

তারক বসে গেল।

—দোকানে বিক্রিবাট্টা কেমন হে?

—বিক্রি কোথায়? ওষুধের স্টক-ই নেই।

—নেই কেন?

—ওষুধ কী মাগনা আসবে? টাকাটা দেবে কে?

—কেন, নিতাইবাবু দেবে।

—দিচ্ছে কোথায়? অন্য সব কারবারে টাকা আটকে আছে। দোকান চলছে নমো-নমো করে।

—ইয়ে—তা উপরি-টুপরি কেমন?

—উপরি! সেটা আবার কী? মাসমাইনের-ই দেখা নেই তো উপরি।

তারক মৃদু-মৃদু হাসছিল। শ্রীপতি তো আর পাঁঠা নয় যে, তার কাছে কবুল করবে।

—নরেনবাবু বাড়িতে কিছু বলে যায়নি?

তা কে জানে! ঠসা-বোবা বউ, তাকে বলাও-যা, না-বলাও তা।

তারক উঠে পড়ল। না:, এতদিনে যমুনার তাহলে সুমতি হয়েছে। নরেনবাবুর সঙ্গেই যদি গিয়ে থাকে—গেছেই—তাহলে তো মার দিয়া কেল্লা। ওষুধের দোকান মানে কাঁচা পয়সা।

ঘরে ফিরে টেমি জ্বেলে বসে বসে খানিক ভাবল তারক। খবর নিয়েছে, শ্রীপতির মাইনে মাসে তিনশো টাকা। কম কীসের? বসা চাকরি। তার ওপর উপরি তো আছেই।

মনটা বেশ ভালোই লাগছে তারকের। সে টেমি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

কত রাত হবে কে জানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙল তারকের। কোথা থেকে চেঁচামেচিটা আসছে, তা প্রথমে ঠাহর হল না। কারো বিপদ-আপদ হল নাকি?

দরজা খুলে বেরিয়ে এল তারক। মনে হল পুরো গাঁ-ই চেঁচাচ্ছে। মেয়েপুরুষের গলা শোনা যাচ্ছে।
—ডাকাত! ডাকাত!

তারক লাফ দিয়ে উঠোনে নামল। তারপর নরেনবাবুর বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। গন্ডগোলটা ওখানেই হচ্ছে যেন!

নরেনবাবুদের পুরোনো ভাঙা বাড়ি সারিয়ে দালান তুলে দিয়েছে নিতাই রায়। বেশ বড়োসড়ো বাড়ি। উঠোনে ধানের মরাই, টিপকল, পেছনে গোয়াল, ঢেঁকিঘর। বাড়িটা হাতের তেলোর মতোই চেনে তারক।

চেঁচালেও পাড়ার লোক কেউ বেরোয়নি ভয়ে। বাইরের উঠোনে মশাল হাতে কালিঝুলি-মাখা একটা লোক দাঁড়িয়ে। হাতে একখানা বড়োসড়ো ছোরা চকচক করছে। আর ভাঙা দরজা দিয়ে আর দুজন টেনে-হিঁচড়ে বাইরে বের করে আনছে নরেনবাবুর বোবা-কালা বউটাকে। বউটার শাড়ি খুলে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে ঘর অবধি। তার মুখে কথা নেই, কেবল 'আঁ-আঁ' চিৎকার।

তারক চেঁচিয়ে বলল, 'ডাকাতি করছ করো, বউটাকে ওরকম করছ কেন হে? ওকে ছেড়ে দাও। বোবা-কালা মানুষ।'

উঠোনের ছোরা হাতে লোকটা একবার তার দিকে ফিরে দেখে একটা হাঁক মারল, 'ভাগ শালা শুয়োরের বাচ্চা। পেট ফাঁসিয়ে দেব...'

তারক থমকে গেল। 'হচ্ছেটা কী? ডাকাতি করবি কর। কিন্তু মেয়েছেলেটাকে টেনে বের করছিস কেন? অবোলা মানুষ।'

হঠাৎ ঝাঁক করে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তারকের। এ শালারা ভাড়াটে খুনে নয় তো?

চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে মলয়াকে। একজন খেঁটে মোটা একটা লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে অমানুষিক জোরে। হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার কথা।

'আঁ-আঁ-আঁ-আঁ' চিৎকারটা চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে সাইরেনের মতো। সেই চিৎকারে মরা মানুষও শিউরে উঠবে। মশালের আলোয় তারক দেখতে পেল, মলয়ার মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

উঠোনের লোকটা ছোরা হাতে এগিয়ে যাচ্ছিল মলয়ার দিকে।

তারক জন্মে মারদাঙ্গা করেনি। সে ভীতু মানুষ। কিন্তু আজ মাথাটা যেন, বড্ড তেতে গেল হঠাৎ। চারদিকে ঢেলা আর ইটের অভাব নেই। পুরোনো বাড়ির ভাঙা টুকরো চারদিকে ছড়ানো। তারক একখানা ইটের টুকরো তুলে খানিক দৌড় দিয়ে টিপ করে মারল। একটা, দুটো, তিনটে...
—মার শালাকে! মার শালাকে... বলে চেঁচাচ্ছিল তারক।

তার পয়লা ইটেই ছোরাঅলা মাথা চেপে বসে পড়ছিল। আর ইটগুলো লাগল কি না কে জানে, তবে লোকগুলো ভড়কে ছিটকে গেল এদিক-ওদিক। তারক লাফ দিয়ে গিয়ে উঠোনে ঢুকল।

সামনে একটা খেঁটে লাঠি পড়েছিল। সেইটে তুলে নিল সে। তারপর বসা ডাকাতটা উঠতে যেতেই পাগলের মতো মারতে লাগল তাকে।

কে একজন চেঁচাল, 'পালা-পালা... লোক আসছে...'

ডাকাতের 'জান' বলে কথা। অত পিটুনি খেয়েও লোকটা হঠাৎ উঠে প্রাণভয়ে দৌড় লাগাল। কে কোথায় গেল কে জানে! তবে মেয়েটা বেঁচে গেল এ যাত্রা।

গাঁয়ের লোক বোধহয় তারকের সাহস দেখেই বেরিয়ে এল এতক্ষণে। লহমায় লাঠিসোঁটাধারী পুরুষ আর মেয়েছেলেতে উঠোন ভরতি। মেয়েদের কারো হাতে বঁটি অবধি। চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়।

মলয়াকে ধরে তুলতে হল। বোবা মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে, চোখে ভূতুড়ে দৃষ্টি। সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। তারক পাঁজাকোলা করে তাকে ঘরে এনে শোয়াল বিছানায়। মেয়ে দুটো চেঁচিয়ে কাঁদছে।

নরেনবাবু কোথায়? নরেনবাবু কি খাটের নীচে নাকি? নাকি পালিয়ে গেছেন? এসব নানা-জন জিজ্ঞেস করতে লাগল।

একজন মুনিশ এগিয়ে এসে বলল, বাবু আজ সাতসকালেই একটু শহরে গেছেন। আজ ফিরবেন না।

তারকের গা জ্বালা করছিল হঠাৎ। নরেন শালাই মলয়াকে খুন করতে লোক লাগায়নি তো? শালার যে যমুনার ওপর দারুণ লোভ। তারকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব অবধি দিয়ে রেখেছে।

মাথাটা বড্ড গরম হচ্ছিল তারকের। সবাই এসে পিঠ চাপড়ে যত তার বীরত্বের প্রশংসা করছিল আর ততই তারকের গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল রাগে। ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার। ডাকাতি নয়, ডাকাতরা অকারণে খুন করে না। এরা খুন করতেই এসেছিল।

তপন হালদারের ছেলে মিতুল মোটরবাইকে করে কালীপুর থেকে মন্মথ ডাক্তারকে নিয়ে এল। গাঁয়ে হোমিয়োপ্যাথিক জগন্নাথ, কীসব ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল মলয়াকে। যাই হোক বউটার চোট তেমন মাত্রাছাড়া নয়। মন্মথ ডাক্তার দেখেটেখে বলল, হাড়-টাড় ভাঙেনি। তবে ভোগান্তি আছে।

তারক ভিড়ের বাইরে উঠোনের এক ধারে এসে দাঁড়িয়ে ওপরে চেয়ে আকাশটা দেখল। সে অমানুষ ঠিক-ই, কিন্তু তার চেয়েও ঢের অমানুষ তো, পৃথিবীতে আছে দেখা যাচ্ছে।

কালীপুর থানা থেকে পুলিশও এসে পড়ল জিপে করে। জবানবন্দি দিতে দিতে রাত প্রায় ভোর। তারপর তারক বাড়িমুখো রওনা হল। মনটা খারাপ লাগছে। বউটা এঁটো হয়ে পড়ল!

বাঁশঝাড় পেরোনোর সময় কে-যেন বলে উঠল, ‘আমি তো জানতুম তুমি খারাপ লোক নও।’

তারক ‘হাঁ’।

—কে? কে?

—আমি।

—অন্ধকারেও কী আর চিনতে ভুল হয়?

—তুই! তুই নরেনবাবুর সঙ্গে যাসনি?

—তোমার কী মুখে কিছু আটকায় না? তার আগে গলায় দড়ি দেব।

—তাহলে কোথায় ছিলি?

—কোথায় আবার! বউদি লুকিয়ে রেখেছিল নতুন গোয়ালঘরে। ডাকাত যখন পড়ল, তখন বেরিয়ে এসে কান্ড দেখে খড়ের গাদার পেছনে লুকিয়ে পড়ি। তুমি না-এলে আজ কী যে হত!

—নরেনবাবু তাহলে কার সঙ্গে গেল?

—তার আমি কী জানি! নিয়ে যেতে চেয়েছিল বলেই তো পালিয়েছিলুম।

—ও শালা মহা হারামি। একবার ভেবেছিলুম, পুলিশকে বলে দিই, খুনটা ও শালাই করাচ্ছিল।

—না-না, ওসব বলার দরকার নেই। আমাদের তো এ গাঁয়েই থাকতে হবে। আমরা গরিব মানুষ।

—হুঁ।

—আর আমাকে বেচতে চাইবে না তো?

তারক একটু হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে যমুনার একটা হাত ধরে বলল, সেই তারকটা ভেগে গেছে। এখন যে-তারকের হাত ধরে হাঁটছিস, সেটা একটা পরপুরুষ।

তারকের হাতে একটা জোর চিমটি কাটল যমুনা।

বয়স

তখন দিন শুরু হত স্মৃতিশূন্যভাবে। অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনোটার-ই কোনো ভার ছিল না। দিনটা নতুন তামার পয়সার মতোই আদরের ছিল, প্রতিটা দিন ছিল উৎসবের মতো। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধে ঘুম ভাঙত। দাঁত মাজতে কী যে আলিস্যি। উঠে এক দৌড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়লেই পৃথিবীর আদিমতম গন্ধটি পাওয়া যেত তখন। ঘাস, গাছপালা আর মাটির ভিজে সোঁদা গন্ধ। পুবে রোদের মুখ লাল, পশ্চিমে আমাদের লম্বা ছায়া। চারদিকে মাটি, গাছপালা, পৃথিবী। পৃথিবী কেমন তা অবশ্য জানা ছিল না। শোনা ছিল, নীচে এক গভীর জলাশয় আছে, তার ওপর জাহাজের মতো ভাসছে পৃথিবী। সতুয়ার বিশ্বাস ছিল, ব্রহ্মপুত্র আড়াই প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে পৃথিবীকে, গারো পাহাড় পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। মিসিসিপি আর মিসৌরির কথা সে কখনো বিশ্বাস করত না। ম্যাপ দেখালে হাসত। বলত—ওসব হচ্ছে সাহেবদের কথা। ওসব কী বিশ্বাস করতে আছে? যারা খেয়ে হাত প্যান্টে মোছে, দাঁত মাজে না—অ্যাঃ।

দিন শুরু হত দুঃখের সঙ্গেই। পড়াশুনো। কালী চক্রবর্তী বারোমাস কফের রুগি, কম্ফটারটা গামছার মতো হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কণ্ঠমণি আমরা কখনো দেখিনি। মুঠ মুঠ মুড়ি মুখে দিয়ে, সুরুৎ সুরুৎ চা টেনে নিতেন ভেতরে, বলতেন—আঃ! তাঁর আঙুলের ডগা থেকে সরল, সাঙ্কেতিক আর সুদকষা ঝরে পড়ত। সবসময়ে উবু হয়ে বসতেন, অর্শ বা ভগন্দর কিছু একটা ছিল বলে বসতে পারতেন না। তাঁর গা থেকে একটা শসা-শসা গন্ধ আসত। স্নান বারণ ছিল বলেই বোধ হয় ঘাম বসে একরকম গন্ধ ছাড়ত।

ঝাঁপের জানালাটা লাঠি দিয়ে ঠেলে তোলা। পাশেই উত্তরে ছোট্ট একটু জমি, তারপর শওকত আলির বাড়ি। যুবা শওকত আলি সেই জমিতে সকালের মিঠে রোদে কসরত করছে। তুর্কি লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে শরীর উলটে ঝপ করে নেমে আসত প্রথমটা। সেই শূন্যের ডিগবাজি ছিল দেখবার মতোই। এত সহজে করত যেন মনে হত ওরকম করাটাই যেকোনো মানুষের নিত্যক্রিয়া। তারপর লাঠির কসরত। লোকে বলত, শওকত লাঠি ঘুরিয়ে বন্দুকের গুলি আটকায়। আমরা অবশ্য ছোটো ছোটো ঢিল ছুড়ে দেখেছি, সেগুলো টুকটাক ছিটকে পড়ে। গায়ে লাগে না। আমরা ভূগোল পার হয়ে ইতিহাসের পড়া দিতে দিতে আলেকজাণ্ডারের বাবার নাম ভুল করতামই। বারবার 'ম্যাসিডনের নৃপতি... ম্যাসিডনের নৃপতি ছিলেন... অ্যাঁ... ম্যাসিডনের...' মনে পড়ত না। কারণ বাইরে শওকতের স্যাঙাত নিধে তখন এসে গেছে। ছোটো দু-খানা কাঠের ছুরি নিয়ে দু-পক্ষ ঘুরে ঘুরে বলছে, 'শির, তামেচা, বাহেরা, কোটি, ভান্ডা, উর্ধ্ব... শির তামেচা বাহেরা, কোটি ভান্ডা উর্ধ্ব...' মাথা থেকে শুরু করে সারাশরীর জুড়ে আক্রমণ এবং প্রতিরোধ। ছোরা খেলার নামতা আমাদের ওইভাবেই মুখস্থ হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডারের বাবার নাম মনে পড়ত না।

শওকত আলির ছিল একটা ম্যাজিকের ঘর। সে-ঘরে ঢোকা বারণ ছিল। কিন্তু আমরা জানতাম। সে-ঘরে মড়ার মাথার খুলি আছে, আর আছে হাতের হাড়—জাদুদন্ড। পুরোনো পুথির মতো জাদুর বই। বাইরের

ঘরে একটা বাঘছাল, দেওয়ালে টাঙানো, মাথাসুদ্ধ। চিতাবাঘের ছাল। সেবার মাদপুরে বাঘটা এসে এক মাঘমাসে উৎপাত শুরু করে। একটা কুকুরের মতো ছোটোখাটো বাঘ, তবু তার দাপটেই বাহেরা অস্থির হয়ে গেল। জোতদার দলুইয়ের গাদা বন্দুক তার গায়ে আঁচড়ও কাটল না। সে এসে গঞ্জে খবর দিল। শৌখিন শিকারিরা ছুটির দুপুরে বন্দুক কাঁধে চলল। শওকত আলির বন্দুক ছিল না। বশংবদ লাঠিগাছ কাঁধে নিয়ে সেও চলল বিটারদের সঙ্গে। মাদপুরের ধানখেত পার হলে জঙ্গল, জল। সেখানে টিন আর ক্যানেস্তার চোটে বিস্তর পাখি উড়ে গেল। বন্দুকের শব্দ ধুন্ধুমার। বাঘ আর বেরোয় না। একা শওকত আলি জঙ্গল ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে এক গর্তের মধ্যে দুটো বাচ্চাসমেত মাদি বাঘটাকে ঘুমোতে দেখতে পেল। দেখে অবাক। এইটুকু বাঘ গোরু-মোষ মারে! সদ্য-বিয়োনী সেই বাঘ একবার শওকতকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে ঠিক বেড়ালের মতো শব্দ করে। বাঘটাকে ছোট্ট দেখেই শওকত আলি তার লাঠির ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যায়। সেই লাঠি নিপুণভাবেই চালিয়েছিল শওকত আলি কিন্তু বাঘটা কেবল একটা ছোট্ট চকিত লাফ দিয়ে উঠে এসেছিল। নি:শব্দে। একটা চড়ে কোথায় গেল লাঠি। বাপরে বলে শওকত আলি জান বাঁচাতে লড়াই শুরু করে। সমস্ত গা ফালা ফালা করে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ছিঁড়ে ফেলছিল বাঘ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। শিকারিরা দৌড়ে এসেছে, হাতে বন্দুক কিন্তু কিছু করার নেই। গুলি যে কারও গায়ে লাগতে পারে। গলা টিপে অবশেষে মেরেছিল শওকত আলি বাঘটাকে। গভর্নমেন্ট থেকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার আর চিকিৎসার খরচ দিয়েছিল। স্কুল ছুটি ছিল একদিন। সোনা-রুপোর গোটাকয় মেডেল আর মানপত্র দেওয়া হয়েছিল তাকে। সে সবই বাইরের ঘরে আলমারিতে সাজানো। আলমারির পাশের দেওয়ালে একটা বেতের ঢাল, তার পিছনে দু-খানা সত্যিকারের তরোয়াল ছিল। মাঝে মাঝে সেগুলোতে তেল মাখাতে খাপ থেকে বের করে আমাদের ডাকত সে। আমরা সর্বস্ব ফেলে তরোয়াল দেখতে যেতাম। গঞ্জে শওকত আলিকে সবাই খাতির করত।

সেবার চা-বাগান ঘুরে ছেঁড়া পাতলুন পরা ম্যাজিশিয়ান প্রোফেসর ভট্টাচার্য গঞ্জে এসে হাজির হল। ডাক্তার শশধর হালদারই তখন গঞ্জের সবচেয়ে বড়োলোক। ফোড়া কাটতে ভয় পেতেন দারুণ, একমাত্র ইঞ্জেকশনেই ছিল তার হাতযশ। ব্যথা লাগত না যে তার নয়। এমনকী রুগীর যে-রকম মুখ বিকৃত হত ব্যথায়, তারও সেরকম হত। তবে ইঞ্জেকশনটা খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারতেন এবং তারপর ভালো করে ধুয়ে ফেলতেন। ডাক্তারির চেয়েও তার পসার ছিল ওষুধের ব্যবসায়, আর গোরুর দুধে! সাত সের দুধ দেয় এমন গোরু আমরা তার বাড়িতেই প্রথম দেখি। গঞ্জে গণ্যমান্য লোক এলে তার বাড়িতে ওঠাই ছিল রেওয়াজ।

বড়ো একখানা টিনের গুদামঘর ছিল সেই গঞ্জের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, তার একধারে বাজুরিয়াদের সিমেন্টের বস্তা, ত্রিপল, কাঠ আর বাঁশের স্তূপ। অন্য ধারে কাঠের তক্তা জুড়ে মঞ্চ। টিনের চেয়ারে সামনের দিকে বসতেন গণ্যমান্যরা, তাদের সামনে বিছানো ত্রিপল আর শতরঞ্চিতে বাচ্চারা, পিছনের বেঞ্চ-এ পাবলিক। প্রোফেসর ভট্টাচার্য প্রথমদিকে এলেবেলে খেলা দেখালেন। পিস্তল ছুড়ে ধোঁয়ার ভিতর থেকে ভারতমাতার আবির্ভাব দেখে পাবলিক আর বাচ্চারা খুব হাততালি দিল। তারপর বাক্সবন্দি খেলা, কঙ্কালের জলপান, শূন্যে ভাসমান মানুষ। ক্লাস সিক্সের দিলীপকে ডেকে নিয়ে অদৃশ্য করে দিলেন। আধঘণ্টা পর খেলার মাঠের গোলপোস্টের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় তাকে পাওয়া গেল। এসব দেখে গণ্যমান্যরা হাততালি দিতে লাগল। প্রোফেসর ভট্টাচার্য বারবার বলতে লাগলেন—

এই পুওর বেলিটার জন্য ডোর টু ডোর বেগিং করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে... এই পুওর বেলিটার জন্যে... এইসব বললেন আর মড়ার হাড় নেড়ে সব আশ্চর্য খেলা দেখাতে লাগলেন। সবশেষে চ্যালেঞ্জ। যদি কেউ থাকেন যিনি প্রোফেসর ভট্টাচার্যের সব খেলা দেখাতে পারবেন, তবে ভট্টাচার্য তাঁকে একশো টাকা দেবেন, যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে না পারেন তবে তাঁকে একশত টাকা দিতে হবে।

শওকত আলি টিনের চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি পারি।

পরদিন সকালেই প্রোফেসর ভট্টাচার্য হাওয়া হয়ে গেলেন। কিন্তু শওকত আলি সব খেলা দেখাল। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত। এমনকী নন্তুকে ডেকে হিপনোটাইজ করে তাকে দিয়ে এমন সব শক্ত শক্ত অঙ্কের উত্তর করিয়ে নিল যে, কালীমাস্টারমশাই পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেলেন। নন্তু সাতঘরের নামতাও পারে না যে! সবশেষে নন্তুকে শওকত আলি বলেছিল—সাবধান, কাউকে ছুঁয়ো না, তুমি কিন্তু কাচের তৈরি। সেই ঘোর নন্তু পরের সাতদিনেও কাটাতে পারেনি। খেত ঘুমোত খেলত, কিন্তু কেউ ছুঁতে গেলেই আঁতকে উঠে চেঁচাত—ধোরো না, ধোরো না আমাকে, আমি কাচের তৈরি।

দিন শুরু হত। কালীমাস্টারমশাই বেলা করেই পড়িয়ে উঠতেন। আইবুড়ো মানুষ। গঞ্জে কী করে যে কবে এসে পড়েছিলেন কে জানে! নন্তুদের বাড়ি সকালবেলাটায় খেয়ে স্কুল সেরে বিকেলে সাধনদের পড়িয়ে রাতে শশধরবাবুর বাড়িতে খাওয়া সেরে ওদের বাইরের ঘরের একধারে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। আমাদের দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে শুরু হত, শেষ হতে চাইত না। কালীমাস্টার চলে গেলে দুই লাফে বাইরে গিয়ে পড়তাম। বই খাতা গুছোনোর জন্য দিদি পড়ে থাকত। বাইরে তখন সকালের প্রথম বনজ গন্ধটি আর নেই। শওকত আলির কসরত শেষ হয়ে গেছে। মাঠ ফাঁকা। তবু পৃথিবীতে করণীয় কিছুর শেষ ছিল না। মড়ার হাড় খুঁজতে শেলিদের বাড়ির পিছনে পোড়ো মাঠটাতে চলে যেতাম।

সেই মাঠে পশ্চিমাদের বয়েল গাড়ির বড়ো বড়ো বলদগুলো চরে বেড়াত। কাঁধে ঘা। সেই ঘা খুঁটে খাচ্ছে কাক। সেখানে হাড় পাওয়া যেত বিস্তর। কিন্তু সাধন বলত—ও হাড় ছুসনি, ভাগাড়ের গো হাড়। সেই মাঠ পার হলে নদীর ধারে ছিল শ্মশান। শরৎকালে শ্মশানের দিকটায় কাশ ফুলে ঢেউ দিত। কিন্তু শ্মশান পর্যন্ত যেতে সাহস হত না। সেই মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা দূর থেকে শ্মশান দেখতাম। ভয় করত। মানুষের হাতের হাড় পাওয়া হয়নি।

দূর থেকেই দেখতাম বাবুপাড়ার রাস্তা দিয়ে শচীন আর শেলি গোবরের ঝুড়ি হাতে ফিরছে। শচীনরা ছিল তিন বোন আর এক ভাই। পিকলি, বিউটি, শচীন, শেলি। শচীনের বোনদের এইসব সাহেবি নাম রেখেছিলেন তার বাবা। একসময়ে শচীনরা ছিল গঞ্জের বড়োলোক। তার বাবা কাছেপিঠের এক চা-বাগানের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বন্দুক ছিল, ঘোড়া ছিল। বাড়িখানাও ছিল বাংলো প্যাটার্নের। তার ছিল দুই বিয়ে, অনেককাল সেটা জানা যায়নি। আগের পক্ষের ছেলেরা সব বড়ো বড়ো। সেবার শচীনের বাবা কালাজ্বরে মারা গেলে, আগের পক্ষের ছেলেরা এসে সব সম্পত্তি দখল করে। কলকাতায় তাদের বাড়ি ছিল বলে কেবল গঞ্জের বাড়িখানা ছেড়ে দেয়। শচীনরা গরিব হয়ে গেল। পিকলি, বিউটি আর শেলি লেস-এর জামা পরা, রুজ পাউডার মাখা, অর্গান বাজিয়ে গান গাওয়া, কিংবা জন্মদিনে পার্টি দেওয়া—এসব ভুলেই গেল। বাড়িখানা এখন রংচটা, কোথাও দেওয়ালের ইট বেরিয়ে আছে, বাগানের ভিতরে মোরামের বাহারি রাস্তাটায় গর্ত, সকাল থেকেই শচীন আর শেলি গোবর কুড়োয়, কাঠ-পাতা কুড়োয়। তার মা একসময়ে জর্জেটের শাড়ি পরত, এখন লজ্জার মাথা খেয়ে বাজুরিয়াদের বাড়ি আয়ার কাজ করে। বাজুরিয়াদের এক ছেলে বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করে এনেছিল। বাজারের ভেতরে তাদের পৈতৃক বাড়িতে সেই মেমবউয়ের ঠাঁই হয়নি বলে হাই স্কুলের পেছনদিকে চমৎকার একখানা বাড়ি করে সেইখানে থাকত। সেই বাড়িতেই যেত শচীনের মা। পিকলি আর বিউটি একসময়ে কারও সঙ্গে মিশত না। ঘরে তাদের ব্যাগাটেলি, কারম, লুডো কত কী ছিল, ভাই-বোনেরা সেসব নিয়ে থাকত। এখন সেই দু-বোন পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। এ-বাড়ি সে-বাড়ি গিয়ে এর-ওর তার নিন্দেমন্দ করে। কেউ তাদের বসতে বলে না। তাদের চরিত্র নিয়ে কথা ওঠে। শচীন ক্লাসে ফার্স্ট হয়। হেডমাস্টার এমদাদ আলি বিশ্বাস নিজের পকেট থেকে তাকে বই কেনার খরচ দেন। বলেন, গরিবরাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের যোগ্য।

ছোটো ছোটো ঝুপসি লিচুগাছের ঘন ছায়ার ভেতর দিয়ে পথটি গেছে। বইখাতা হাতে সেই পথ ধরে যেতে যেতেই হঠাৎ শুনতে পেতাম দূর থেকে ইস্কুলের ঘণ্টার শব্দ। ওয়ার্নিং। সাধন বলত—দৌড়ো।

এমদাদ আলি বিশ্বাস এ সময়টায় গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। টর্চবাতির মতো তাঁর চোখ জ্বলে। আমরা দৌড়োতাম!

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে সেই ইস্কুলে। মাস্টারমশাইরা আছেন, দিদিমণিরাও আছেন। মেয়েরা ক্লাসে বসে থাকে না, তারা থাকে মেয়েদের কমনরুমে। মাস্টারমশাই কিংবা দিদিমণিদের সঙ্গে ক্লাসের শুরুতে লাইন বেঁধে আসে, আবার ক্লাসের শেষে লাইন বেঁধে ফিরে যায়। ছেলেদের দিকে তাকানো বারণ। কথা বলা তো দূরের কথা। দিদি এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত, ফেল করে আমার সঙ্গে পড়ে তখন। ক্লাসে আমি পড়া না পারলে একমাত্র সে-ই আমার দিকে কটমট করে চেয়ে থাকত। বিশ্বাস সাহেবের দাপটে তখন বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।

সেবার শহরের ইস্কুলের টিম ফুটবল খেলতে আসে। এইট-এর কামু দারুণ খেলেছিল। শহরের টিম দু-গোল খেয়ে গেল। ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ বলে কোনো প্রাইজ ছিল না। তবু বিশ্বাস সাহেব কামুদার পিঠ চাপড়ে দিয়ে আদর করলেন এবং ঘোষণা করলেন—কামুদাকে তিনি রুপোর মেডেল দেবেন। খেলার শেষে আমরা কামুদাকে ঘিরে ধরলাম। কামুদা বাড়ি ফেরার সময়ে বলল—বিশ্বাস সাহেবের গায়ে যা সুন্দর আতরের গন্ধ, না রে!

পরদিন হইহই কান্ড। সারাস্কুলের দেওয়ালে সব অসভ্য কথা লেখা। কমনরুমেই বেশি। শহরের ফুটবল টিম ইস্কুলবাড়িতেই রাত্রিবাস করে সকালে ফিরে গেছে। সবাই বলল—এ ওদেরই কাজ। দু-গোল খেয়ে রাগের চোটে এসব করে গেছে। কিন্তু তবু আমাদের ইস্কুলের কোনো ছেলে এ কান্ডের সঙ্গে জড়িত কিনা সে-বিষয়ে নি:সংশয় হওয়ার জন্য এমদাদ আলি বিশ্বাস ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে ডিকটেশন দিলেন—মনোজ মাংস মুখে দিয়া মুখ মুছিয়া মালদহ মুখে যাত্রা করিল। এই বাক্যটা আমরা সবাই খাতায় লিখে, সেই পাতায় নাম ক্লাস রোল নম্বর দিয়ে পাতাটা ছিঁড়ে বিশ্বাস সাহেবকে দিয়ে দিলাম। ভয়ে বুক শুকিয়ে আছে। কিন্তু কারও কিছু হল না। আমরা সেই বাক্যটার মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো অসভ্য কথা পেলাম না। বিশ্বাস সাহেব তবে কেন ওই অদ্ভুত বাক্যটা আমাদের দিয়ে লেখালেন? দেওয়ালের কথাগুলো আমরা দেখিনি! তবে অনেকে বলল বেশির ভাগ অসভ্য কথাই 'ম' দিয়ে লেখা। সাধন সেদিন সন্ধেবেলা এসে বলল—মাংস মুখে দিয়ে কেউ মুখ মোছে নাকি! না আঁচালে এঁটো থেকে যায় না?

বিকেলটা ফুরোত সবার আগে। পূর্ণিমা থাকলে খেলা শেষ হতে না হতেই চাঁদ উঠে পড়ত। বিকেলটা শেষ হয়ে যাক এরকম ভাবতে ভালো লাগত না। দরগার পেছনে চাঁদমারির মতো উঁচু একটা ঢিবি ছিল। আমরা সেটার ওপর উঠে বসতাম। সাধন, দীপু, প্রদীপ, নন্তু, কোনো কোনো দিন সতুয়া। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু তালগাছ আছে তাদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়ে, সে গাছ শুইয়ে দিলে পৃথিবী ছাড়িয়ে আধ হাত বেরিয়ে থাকবে—এই গল্প বলত সতুয়া। সেই তালগাছ থেকে তাল পড়লে নাকি আশপাশের দশ-বিশটা গ্রামে ভূমিকম্প হয়। এক-একটা তালের ওজন বিশ মন। দীপু বয়সে প্রায় আমার সমান। কিন্তু সে দৌড়ঝাঁপ তেমন করতে পারত না। একটু খেলেই হাঁফিয়ে পড়ত, মারপিট লাগলে বরাবর সে মার খেত। তারপর কাঁদতে বসত। বলত—ম্যালেরিয়া না হলে তোদের দেখে নিতুম। সে সব সময়ে আমার পাশ ঘেঁষে বসত এবং বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা করত। সেই ঢিবির ওপর থেকে দেখা যেত, শেলিদের বাড়ির পেছনের মাঠে সূর্য ডুবে গেলে কেমন দু-খানা আকাশজোড়া পাখনা মেলে অন্ধকার উঠে আসছে। সেই দিকে চেয়ে ক্ষণস্থায়ী বিকেলের জন্য খুব দুঃখ পেতাম। নীল সমুদ্রে চাঁদ সাঁতরে চলত অবিরাম। খেলার শেষে আমরা সেই ঢিবির ওপর বসে আরও কিছুক্ষণ বিকেলের আলো দেখার চেষ্টা করতাম। সন্ধে উতরে ফিরলেও আমার তেমন ভয় ছিল না। বাবা বারমুখো লোক, মা রোগাভোগা। আমাদের বাড়ির শাসন তেমন কঠিন নয়। সবচেয়ে বেশি শাসন ছিল প্রদীপের। তার বাবা দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ছিলেন সাহিত্যিক। অল্প বয়সেই মারা যান। প্রদীপের মা নানারকম হাতের কাজ শিখে গঞ্জে মহিলা সমিতির দিদিমণির চাকরি পেয়ে কলকাতা থেকে চলে আসেন। শোভনা দিদিমণি রোগা কালো মানুষ, ঠোঁটে একটু শ্বেতির দাগ, খুব নিয়ম মেনে চলতেন। প্রদীপ কড়া

শাসনে থাকত। তার এক বড়ো ভাই আছে—সুদীপ। সে মার সঙ্গে আসেনি। কলকাতায় মাসির কাছে থেকে ইস্কুলে পড়ে। সন্ধে হলেই প্রদীপের বাসায় তার বাবার বড়ো করে বাঁধানো ছবির সামনে দীপ জ্বেলে, ধূপকাঠি জ্বেলে দেওয়া হয়, ফুলের মালা দেওয়া হয় ছবিতে। প্রদীপ তাদের বাড়িতে যত্নে রাখা মাসিক পত্রিকা বের করে আমাদের দেখাত। শ্রীদেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর নাম ছাপা গল্প আর কবিতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। তাঁর লেখা একটা কলের কোকিলের গল্প ছিল। কিছু বুঝিনি। প্রদীপ বলত—বাবার লেখা বুঝতে হলে মাথা চাই। আমার মা-ই কত লেখা বোঝে না। গঞ্জের সবাই তাদের খাতির করত। যদিও দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা কম লোকই পড়েছে। শোভনা দিদিমণি তাঁর স্বামীর কথা উঠলেই চোখ আধবোজা করে রাখতেন। সেই চোখের পাতার গভীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল জন্ম নিত। কিন্তু অন্য সময়ে তিনি ছিলেন ভীষণ কড়া। প্রদীপকে কখনো আদরের কথা বলতেন না। উঠতে-বসতে খেতে-শুতে সময় বাঁধা ছিল। বিকেলের দিকটায় দিদিমণির ফিরতে দেরি হত বলে সেই সময়টুকুতে চাঁদের আলোয় চাঁদমারির মতো উঁচু টিবিটায় সময় চুরি করে সে আমাদের সঙ্গে খানিক বসে থাকত। বলত—আমি একদিন পালাব, দেখিস। লোকের বাড়ি বাসন মাজব, ঘর ঝাঁট দেব, তবু পালাব। কথার মাঝখানে দীপু হঠাৎ চেঁচিয়ে বলত, রন্টু, ওই দেখ তোর বাবা আজও আবার লোক এনেছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতাম ঠিকই। দরগার সামনে লিচুবাগানের ভেতর থেকে রাস্তাটা যেখানে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে সেই জায়গাটা পার হয়ে গল্প করতে করতে বাবা আসছে, সঙ্গে একটা খাকির হাফপ্যান্ট পরা লোক, মাথায় হ্যাট। কোথা থেকে যে ধরে ধরে বাবা অতিথি নিয়ে আসত কে জানে। সপ্তাহে তিন-চার দিনই বাইরের অচেনা লোকেরা এসে পাত পাড়ত আমাদের বাসায়। মা রাগ করলে বাবা উদার গলায় বলত—অতিথি খেলে বাড়ির মঙ্গল হয়, মানুষের পায়ের ধুলোয় কত জায়গা তীর্থ হয়ে গেল। মা তখন ঝোঁকে বলত—তা অসময়ে লোক এলে যে আমাদের হরিমটর করতে হয়। বাবা শান্ত গলায় মিনমিন করে বলত—তিথি মেনে যে না আসে সেই তো অতিথি। যারা আসত তাদের মধ্যে ভবঘুরে, চোর, জ্যোতিষী সব রকমের মানুষ ছিল। এসব লোক আমাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এই হাফপ্যান্ট আর হ্যাটঅলা লোকটা আসার আগে যে এসেছিল, সে এক সকালে চলে গেলে দেখা গেল একটি পেতলের ঘটি, বিছানার চাদর, একজোড়া চটিজুতো সে নিয়ে গেছে। এরপর মা রাগারাগি করায় বাবা আর লোক আনত না। কেবল একা খেতে বসে দুঃখ করে বলত—আমাদের দেশের বাড়িতে প্রতিবেলা একশোখানা পাত পড়ে। বিদেশে চাকরি করতে দেখে এসে দেখ কেমন একা একা খেতে হয়। একা খেলে আমার পেট ভরে না। সেই চুরির পর অনেকদিন বাদে লোক এল। দীপু আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল—মামিমা আজ কুরুক্ষেত্র করবে। চল দেখি গিয়ে—! শুনে আমি তাকে একটা গাঁট্টা মারি, বলি আমার মা-বাবার ঝগড়া দেখবি কেন? সে কাঁদতে থাকে।

খাকি হাফপ্যান্ট পরা লোকটা ছিল গায়ক। মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারা, গালে পানের ঢিবি। বাবার একখানা লুঙ্গি পরে নিয়ে দিদির সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়ামটা নিয়ে সে বারান্দায় চাঁদের আলোয় শতরঞ্চি পেতে বসে গাইতে লাগল—ভুলিনি, ভুলিনি, ভুলিনি প্রিয়, তব গান সে কি ভুলিবার...! বাবা শুনতে শুনতে আধশোয়া হয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে উদাস হয়ে গেল। মা নতুন করে রাঁধতে বসেছে। সেই ফাঁকে দেখি উত্তরের মাঠে নালির ধারে শওকত আলি হ্যারিকেন জ্বেলে মুরগি জবাই করতে বসেছে। মুরগি কাটা দেখতে চুপে উঠে গেলাম। ভুলিনি... ভুলিনি... গানের সঙ্গে মুরগিটার প্রাণান্তকর ডাক মিশে যাচ্ছিল। আকাশে জ্যোৎস্নার বান।

লোকটার নাম আমরা দিলাম ডি ও সান্যাল। আমাদের বাড়ির অতিথিরা দু-রকমের ছিল। কিছু লোক ছিল যারা একবার এসে সেই যে চলে যেত, আর আসত না। আর কিছু লোক ছিল যারা ঘুরে-ফিরে আসত। এই লোকটাকে দেখে মনে হল, এ দ্বিতীয় দলের। কাজেই এর একটা নাম দেওয়া দরকার। বাবা তাকে সান্যাল, সান্যাল বলে ডাকে, নাম টের পাই না। সান্যাল আরও একজন আমাদের বাড়িতে আসে। সে ফোকলা। এ-লোকটার দাঁত আছে তাই তার নাম দেওয়া হল, দাঁতঅলা সান্যাল। সংক্ষেপে ডি ও এস। ফোকলা জনের

নাম এফ সান্যাল আগেই দেওয়া ছিল। পরদিন সকালে কোনো সময়ে যেন বাবার চটিজোড়ায় আমার পা লাগলে লোকটা বলল, খোকা, বাবার চটিতে পা লাগলে প্রণাম করবে। তারপর সে মার রান্নার প্রশংসা করল। আমাকে শংকরা আর বেহাগের পার্থক্য বোঝাতে লাগল। দু-দিন গানে গানে আমাদের মাথা গরম হয়ে রইল। কালীমাস্টারমশাই পর্যন্ত একদিন কামাই করলেন। তারপর লোকটা চলে গেল। শুনলাম সে যুদ্ধে যাচ্ছে। ডি ও সান্যাল আর কোনোদিনই ফিরে আসেনি।

হিটলারের হাতে ইংরেজ তখন বেজায় মার খাচ্ছে। তার ফলে চারদিকে বেকার আর ভবঘুরে বেড়ে গেল খুব। চাল-ডাল পাওয়া যায় না, কেরোসিন নেই, দেশলাইয়ের আকাল। মার মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকে। দেশ থেকে সেই সময়ে বাবার দু-চারজন জ্ঞাতি, আর তাদের আত্মীয়েরা এসে আমাদের বাসায় থানা গাড়ল। তারা শুনেছে যুদ্ধের বাজারে ধুলো বেচে অনেকে বড়োলোক হচ্ছে। তারাও সব কারবার কনট্রাক্টরি করার জন্য চলে এসেছে কিন্তু ঘাঁতঘোঁত জানা না থাকায় বেমক্কা সারাদিন ঘোরে, রাতে ঘরে বসে জটলা পরামর্শ করে। বাবা অনেকদিন থেকেই সিগারেট ছেড়ে স্বদেশি বিড়ি ধরেছে। জ্ঞাতিরা আসার পর সেই বিড়ি প্রায়ই চুরি হতে লাগল। বাবা কিছু বলতে পারে না কাউকে। তাড়ানো তো দূরের কথা। আমাদের ভাতের ফ্যান গালা বন্ধ হয়ে গেছে তখন। বাসায় অঙ্ক কষতে আর কাগজ নষ্ট করি না, স্লেটে কষে মুছে ফেলি, স্কুলে উঁচু ক্লাসে স্লেট অ্যালাউ করলেন বিশ্বাস সাহেব। বাড়িতে মা-বাবার কথাবার্তা বন্ধ। শোনা গেল শওকত আলি যুদ্ধে যাবে। আমরা ক-দিন খুব উত্তেজিত হয়ে রইলাম। শওকত আলি লাঠি দিয়ে গুলি ঠেকায়, হাতে বাঘ মারে, মানুষকে সম্মোহিত করে দেয়, সে যুদ্ধে গেলে একটা হেস্তনেস্ত হবেই।

জ্ঞাতিদের জ্বালায় মার প্রাণ ওষ্ঠাগত। দিনে পঞ্চাশবার উনুন থেকে কাগজ জ্বেলে তাদের বিড়ি ধরিয়ে দিতে হয়। দেশলাই নেই। মা প্রকাশ্যে রাগারাগি শুরু করে। জ্ঞাতিরা তখন মাকে খুশি রাখার জন্য বিচিত্র কান্ড শুরু করল। কেউ মার চেহারার, কেউ মার রান্নার প্রশংসা শুরু করল। কেউ বা এর-ওর বাগান থেকে চুরিচামারি করে ফলপাকুড় এনে দিত। ঘরের কিছু কিছু কাজকর্মেও আসত। বাবা ফিরলে তারা সবাই একসঙ্গে হইহই করে উঠত—কাকা এসেছেন, কাকা এসেছেন! তারপর বাবার চটি ধরে টানাটানি, জামা খুলে দেওয়া নিয়ে কাড়াকাড়ি। শেষে বাবা হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম করার সময়ে তারা বাবার হাত-পা-পিঠ দাবাতে বসত, আঙুল মটকে দিত, পিঠে সুড়সুড়ি, মাথা চুলকোনো—সবই করত। বাবা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে চেঁচামেচি করত—ওরে আর জোরে দাবাসনি, হাড়গোড় ভেঙে যাবে। তারা ছাড়ত না।

জ্ঞাতিদের মধ্যে একজন ছিল পুলিন। একদিন তাকে দেখি শেলিদের বাড়ির পেছনের মাঠে ভাগাড়ে হাড় কুড়িয়ে একটা বস্তা বোঝাই করছে।

ভারি অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এসব কুড়োচ্ছেন কেন?

পুলিন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল—চুপ। একটা কারবারের কথা মাথায় এসেছে। হাড়ে বোতাম হয় জানো তো?

জানি।

পুলিন খুব হেসে বলল—কথাটা এতদিন একদম মাথায় আসেনি। হঠাৎ সেদিন এপাশটা দিয়ে যেতে যেতে ব্যাপারটা মাথায় এসে গেল। শুধু বোতাম না, লবণ শোধন করতেও লাগে। গোরারা তো সবই কিনে নিচ্ছে, যুদ্ধে নাকি সব লাগে। কাউকে বোলো না কিন্তু, লোকে বুদ্ধি পেয়ে যাবে।

পুলিন সেই হাড়ের বস্তা নিয়ে বাসায় ঢোকামাত্র মার উনপঞ্চাশ বায়ু কুপিত হয়। সন্ধেরাতে সেই হাড় পুলিনকে ফেলে দিয়ে আসতে হয়। তারপর শীতের রাতে স্নান করে ঘরে ঢোকা। সেই বস্তার মুখটা একবার আমি একটু ধরেছিলাম। কিন্তু পুলিন খুব মহত্ত্ব দেখাল, আমার কথা মাকে বলল না। বাজারে তখন লোহার বোতাম চালু হয়েছে।

ব্ল্যাক মার্কেট কথাটা তখন শোনা যাচ্ছে খুব। পুলিন সর্দিজ্বরে পড়ে থেকেই প্রায়ই বলত—এবার ব্ল্যাক মার্কেটের ব্যাবসা চালু করব। কথাটার অর্থ সেও ভালো বুঝত না।

বাড়িতে জ্ঞাতিরা জড়ো হওয়ায় বাবা অখুশি ছিল না। একা খেতে হত না। পেট ভরত। কিন্তু মার মূর্তিখানা দিন দিন মা কালীর মতো হয়ে আসছিল। ঠিক সেই সময়ে কলকাতায় বোমা পড়ায় সেখানে আমার মামাবাড়ি থেকে দিদিমা, তিন মামা, দুই মাসি চলে এল আমাদের বাসায়। মার আর কিছু বলার রইল না। বাবার মুখ উজ্জ্বল দেখাল। মামাবাড়ির লোকজন যেদিন গেল সেইদিনই মা নিজে যেচে বাবার সঙ্গে ভাব করে। বাড়িতে আর জায়গা ছিল না। পড়াশুনো মাথায় উঠে গেল। আমরা সারাদিন মনের আনন্দে ঘুরি। সাধনদের বাড়িতেও লোক, দীপুদের বাড়িতেও। কেবল প্রদীপদের বাড়িতে সন্ধেবেলা সাহিত্যিক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর ফটোতে রোজ বিকেলে মালা দেওয়া হয়, ধূপকাঠি জ্বলে। প্রদীপ সকাল-বিকেল পড়তে বসে। তার মা বলে—কত বড়ো সাহিত্যিক ছিলেন তোমার বাবা সে-কথা কখনো ভুলো না। তোমাকে বড়ো কিছু হতেই হবে। প্রদীপ আড়ালে-আবডালে বলত—সাহিত্যিক না কচু! লিখত তো বাচ্চাদের লেখা, তাও বেশির ভাগ অনুবাদ।

আমরা অবাক হয়ে বলতাম—তুই কী করে জানলি?

মামাবাড়িতে এই নিয়ে হাসাহাসি হত কত! আমি যুদ্ধে যাব জানিস। সাহিত্যিক-ফাহিত্যিক নয়, আমি হব সোলজার।

চারদিকে ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে তখন। দরগার মাঠে লোকলশকর লেগে দিব্যি আঁকাবাঁকা ট্রেঞ্চ কেটে দিল। নতুন রকমের একটা খেলা পেয়ে গেলাম আমরা। গর্তের মুখে লাফ দিই। সবাই পারি, কেবলমাত্র দীপুই পারে না। তিন বোনের পর দীপু একমাত্র ভাই, তার মা-বাবার খুব আদরের, তাই বোধ হয় পারত না। তার হাত-পা নরম নরম ছিল।

বর্ষায় ট্রেঞ্চে ব্যাঙের আস্তানা হল। জল জমে ডুবজল। নিধে ছিপ ফেলত। চ্যাঙা-ব্যাঙা মাছ ধরত। অনেক রাতে বৃষ্টি নামলে প্রবল ব্যাঙের ডাক শোনা যেত। আকাশে কাক, চিলের মতো এরোপ্লেন দেখে দেখে আর শব্দ শুনেও চোখ তুলে তাকাতাম না।

মামারা ছিল বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। তারা তখন কিশোর কিংবা যুবা। প্রখর চোখে তারা মেয়েদের দেখত। দীপুদের বাড়িতে তাদের বয়সি কয়েকটা ছেলে এসেছিল। সব কলকাতার ছেলে। মামারা তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সিঁথি কাটা, জুতো পরা, জামার হাতা গুটোনো—এসব আমরা তখনই তাদের কাছ থেকে শিখছি।

দরগার সামনে আমাদের ট্রেঞ্চ-এর দু-ধারে লাফাতে দেখে মামারা হেসে খুন। দীপু লাফাতে পারে না দেখে আমার ছোটোমামা জ্যোতির্ময় গম্ভীর হয়ে বলল—ও লাফাবে কী! ও তো মেয়ে!

যা:। বলে আমি চেঁচিয়ে উঠি।

মামা হাসল। বলল—আমি জানি। ওর ভাই নেই বলে ওর মা-বাবা শখ করে ওকে ছেলে সাজিয়ে রাখে।

আমরা তাকিয়ে দেখি, দীপু দরগার মাঠ ধরে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

পরদিন বিকেলে টিলার ওপর আমাদের মিটিং বসল। আমি সাধন, প্রদীপ, সতুয়া, নন্তু আর একধারে দীপু গোঁজ হয়ে বসে। তার চোখে জল।

তুই মেয়ে? সাধন জিজ্ঞেস করল। মাথা নাড়ল দীপু, হ্যাঁ।

আমরা অনেকক্ষণ কথা খুঁজে পাই না। কী বলব! দীপু ততক্ষণে কাঁদতে থাকে। বলে—আমার সঙ্গে খেলবি না? আর খেলায় নিবি না?

সেসময়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে খেলতে আমাদের মধ্যে পৌরুষ এসে গেছে। প্রদীপ বলল—কী করে খেলি বল! সবাই জেনে গেলে বলবে মেয়েদের সাথে খেলি।

দীপু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমি যে মেয়েদের খেলা কখনো খেলিনি। আমার মেয়ে-বন্ধুও নেই।

সতুয়া খুব অবাক হয়েছিল। বলল—মেয়েছেলে তো তোকে হতেই হবে। ও কি লুকোনো যায়?

আমার মন খুব খারাপ ছিল। দীপু আমার বন্ধুত্বই সবচেয়ে বেশি চাইত। আমার দিকে চেয়ে দীপু বলল—মেয়ে হতে আমার একটুও ভালো লাগে না।

নন্তু ধমক দেয়—মেয়ে হবি আবার কী! তুই তো মেয়েই।

দীপু গোঁজ হয়ে বসে কাঁদতে থাকে, সে কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না।

নন্তু আমাদের আড়ালে ডেকে বলল—ভাই, বদনাম হয়ে যাবে কিন্তু। আমরা ক-জন ছাড়া দীপুর সঙ্গে আর কেউ খেলত না। ওকে দলে রাখা যাবে না।

আমরা পরামর্শ করলাম অনেক। সবশেষে সতুয়া গিয়ে বলল—দীপু, তোকে আমরা অনেক জিনিস দেব। কাল থেকে আর আমাদের সঙ্গে খেলতে আসিস না।

সেই দিন দীপুকে আমরা প্রায় একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দিলাম। সেদিনও দিনের শেষে চাঁদ উঠেছিল। আমরা যে-যার বাসা থেকে মার্বেল, ছুরি, গল্পের বই এনে দিলাম। দীপু নিল। চলে যাওয়ার সময় বলল—বড়ো হয়ে তো কোনো ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই, তখন আমি—

বলে সে সবার দিকে তাকাল। আমরা চুপ।

দীপু পায়ের আঙুলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মুখ নীচু করে বলল—তখন আমি রণ্টুকে বিয়ে করব।

এই বলে এক ছুটে টিলা থেকে নেবে গেল দীপু।

যুদ্ধের শেষে একদিন বাড়ি বাড়ি তেরঙা পতাকা উড়ল। ইস্কুলে পতাকা তুললেন এমদাদ আলি বিশ্বাস। তার কিছুদিন পরেই ফেয়ারওয়েল দেওয়া হল তাঁকে। সবাই তাঁর কৃতিত্বের কথা বললেন। তিনি বলতে উঠে বললেন—আমি যে মুসলমান বলে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি তা নয়। আমি বুড়ো হয়েছি, এই জায়গা ছেড়ে কোথাও না কোথাও আমাকে যেতেই হত। গোরও তো ডাকছে। আমি হিন্দু-মুসলমান দু-রকম ছেলেই পড়িয়েছি। যখন শাসন করতে হাত তুলেছি তার ভালোর জন্য তখন হিন্দু বলে ভয় পাইনি, মুসলমান বলে ছেড়ে দিইনি। যে শেখায় তার ভয় পেতে নেই। যে ভয় পায় সে ভয় পেতে শেখায়। ... ইত্যাদি। শহরসুদ্ধ লোক তাঁর জন্য দুঃখ করল। তিনি চট্টগ্রামে চলে গেলেন। শওকত আলি যুদ্ধে যায়নি। যাব যাব করছিল, তার আগেই যুদ্ধ থেমে গেল। শওকত আলি চলে গেল লালমণিরহাট।

আমরা স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ি তখন। স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলতে নামি। গোঁফের জায়গাটা কালচে হয়ে আসছে। ট্রেঞ্চগুলো বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। দরগার পেছনের টিলাটা ফাঁকা পড়ে থাকে। এখনও দিনের শেষে চাঁদ ওঠে। টিলার ওপর কেউ গিয়ে বসে না। আলাদা গার্লস স্কুল খোলায় পুরোনো স্কুলে মেয়েদের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তখন মেয়েদের মানে বুঝতে শিখেছি।

দীপু অনেক লম্বা হয়েছে। মাথার চুলে পিঠ ঢাকা যায়। লালচে আভার এক ঢল চুল তার। পরনে কখনো ফ্রক, কখনো শাড়ি। তার নাম এখন দীপালি। খুব সুন্দর হয়েছে, কেবল একটু রোগা। তারা এখন চার বোন। মাঝে মাঝে লিচুগাছে ছাওয়া রাস্তায় দেখা হয়। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের সঙ্গে কথা না বলার অভ্যেস। বিশ্বাস সাহেবের নিয়ম ছিল। দেখা হলেও দীপুর সঙ্গে কথা বলতাম না। দীপুও বলত না। তাকাতও না।

দিন শুরু হত। দিন শেষ হত। আবার শুরু হত। তার মানে তখন বুঝতে শিখেছি। বয়স।

বিয়ের রাত

'আচ্ছা মশাই, 'আত্মবিশ্বাস' জিনিসটা আসলে কীরকম বস্তু তা বলতে পারেন?'

বলা কঠিন। তবে যতদূর মনে হয় লোহার রডের মতো একটা শক্ত জিনিস মেরুদন্ডের ভিতর দিয়ে ঠেলে মাথা অবধি ওঠে। তাতে হয় কি, ঘাড়-গর্দান সব সোজা থাকে, মাথাটাও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে না। আমাদের পটলবাবুকে তো দেখেছি, সবসময়ে যেন খাড়া হয়ে আছেন।

তাই হবে। ওই রডটা আমার নেই।

বেশিরভাগ লোকেরই থাকে না। রেয়ার জিনিস হলেই সাপ্লাই কম হয়। খুঁজে দেখেছি আমারও নেই।

দুজনেরই দুটো দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

আত্মবিশ্বাস জিনিসটা খুব কাজের জিনিস, কী বলেন?

খুব। তবে না হলেও যে চলে না তা নয়। এই ধরুন ফ্রিজ। থাকলে খুব ভালো—বাসি স্যাঁতা সব জমিয়ে রাখা যায়, তিন-চারদিন রান্না না চাপালেও চলে। চমৎকার কাজের জিনিস। কিন্তু ধরুন, যাদের নেই তাদেরও কি চলে না?

তা অবিশ্যি ঠিক।

আপনার যা-যা নেই তার একটা লিস্টি তৈরি করে ফেলুন। ধরুন, আত্মবিশ্বাস নেই, সাহস নেই, বিবেক নেই, বিবেচনা নেই, শক্তি নেই, বুদ্ধি নেই, মেধা নেই, জেদ নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, সততা নেই, চরিত্র নেই, ব্যক্তিত্ব নেই, স্মার্টনেস নেই, অনুভূতি নেই, কল্পনাশক্তি নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। নেই-এর একটা লিস্টি থাকলে কী কী আছে তার একটা হদিশ বেরিয়ে আসবে। ডেবিট-ক্রেডিটের মতোই। তাতে হবে কি, অল্পস্বল্প যা আছে তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়ার একটা সুলুকসন্ধান করতে সুবিধে হবে।

ঠিকই বলেছেন। তবে নেই-এর লিস্টিটা বড্ড বড়ো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

বেশিরভাগ লোকেরই তাই। নেই-এর লিস্ট আমারও খুব বড়ো। এত বড়ো যে তাই দিয়ে ঘুড়ির ল্যাজ বানানো যায়। আচ্ছা, কীসের গন্ধ আসছে বলুন তো! দিব্যি খুশবু।

ওঃ, এ গন্ধটা! দাঁড়ান বলছি। এ হল বিরিয়ানির গন্ধ। জাফরান পড়েছে, আর খোয়া ক্ষীর। আর ক্যাওড়ার জলও।

বা:, আপনার নাক তো খুব শার্প।

হ্যাঁ, আমি বড্ড গন্ধ পাই।

বা:, তাহলে ওটা আছে-র লিস্টিতে ধরবেন। তা আর কী কী আইটেম আছে আজ জানেন?

খুব জানি। পয়লা পাতে রাধাবল্লভি, বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, ফিশফ্রাই। তারপর বিরিয়ানি, কষা মাংস। শেষপাতে চাটনি, আইসক্রিম, সন্দেশ আর রসগোল্লা। পাঁপড়ভাজাও আছে।

নেমন্তন্ন বাড়ির খাওয়া প্রায় একরকম হয়ে যাচ্ছে। একটা অন্যটার কার্বনকপি। কী বলেন?

যে আজ্ঞে।

তা মশাই, এই বিয়েবাড়ির মেনু আপনি জানলেন কী করে? আপনি কী কন্যাপক্ষের কোনো কর্মকর্তা?

না। পাড়ায় থাকি। বীরেশবাবু একটু স্নেহ করেন।

অ। তাই তাঁর মেয়ের বিয়েতে খাটছেন বুঝি?

আজকাল আর বিয়েবাড়ির খাটনি কোথায়? সব তো ডেকোরেটর, ক্যাটারার এরাই করে দেয়। ক্যাটারারের সঙ্গে আমার একটু ভাবসাব আছে, আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম।

তাই বলুন।

একশো কুড়ি টাকা করে প্লেট।

একশো কুড়ি! সে তো সস্তা মশাই। গেল হপ্তায় সত্যেনবাবুর ছেলের বিয়ে খেয়ে এলুম, শুনলুম দুশো টাকা করে প্লেট।

দুশো! ও বাবা, দুশো টাকা তো বিরাট ব্যাপার।

আপনার-আমার কাছে বিরাট, সত্যেনবাবুর কাছে তো আর নয়। সত্যেনবাবুরা নমস্য ব্যক্তি। আপনার আর আমার যেমন নেই-এর লিস্টিটা অনেক লম্বা, সত্যেনবাবুদের তেমনি আছে-র লিস্টিটা বেজায় বড়ো। তবে কিনা এমন অনেক লোক আছে যাদের কাছে সত্যেনবাবুও নস্যি।

খুব ঠিক কথা। আরও-র কোনো শেষ নেই।

এই তো বুঝেছেন। লোককে কোনো কথা বোঝাতে পারলে আমি বড়ো খুশি হই। ভারি তৃপ্তি পাই। মুশকিল কী জানেন, আজকাল বেশিরভাগ লোককে কোনো কথাই যেন বুঝিয়ে উঠতে পারি না। তখন সন্দেহ হয় আমি হিব্রু ভাষায় কথা বলছি না তো! এটা বেশিরভাগ কোথায় হয় জানেন? বাড়িতে। নিজের বাড়ির লোকেরা এই আমার বউ, ছেলে, মেয়ে—এদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ভয়ংকর ল্যাংগুয়েজ প্রবলেম হয় মশাই।

কেন, আপনার স্ত্রী কি মাদ্রাজি না জার্মান?

নৈকষ্যি বাঙালি মশাই। কোলাঘাটে বাপের বাড়ি। না না, ভাষাগত সমস্যা ঠিক ওরকম নয়। আসল কথা, তারা আমার বক্তব্য বুঝতে চায় না। কিংবা বলতে পারেন গ্রহণ করে না। আমি হয়তো খুব মোলায়েম করে বললুম, ওগো, বাড়িওলার সঙ্গে ঝগড়া করার দরকার নেই। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ কী ভালো? সঙ্গে সঙ্গে আমার বউ খেপে উঠে বলল, ঝগড়া করব না মানে? একশোবার করব। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে করেই তো দেশটার আজ এই অবস্থা। তোমার মতো মেনিমুখোদের দিয়ে সংসার চলে না—ইত্যাদি। যা বোঝার বুঝে নিন।

বুঝেছি।

তারপর ধরুন, হয়তো অফিস থেকে ফিরে এসে দেখলুম আমার ডায়েরির মধ্যে কে যেন একটা চিরুনি গুঁজে রেখেছে। চিরুনির তেলে ডায়েরির পাতায় জলছাপ। পুরুষসিংহ নই জানি, তবে হয়তো সামান্য একটু হেঁকে কথাটা বলতে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও এসে গলা মেলাল। তাদের ধারণা, এরকম চেঁচামেচি নাকি নারী নির্যাতন ছাড়া কিছু নয়। যুগ যুগ ধরে নারীরা পুরুষদের হাতে যে কীভাবে নিরন্তর নির্যাতিতা হয়ে আসছে তা নাকি নির্যাতনকারী পুরুষেরা নির্যাতনে অভ্যস্ত বলে বুঝতেও পারে না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল, খুবই খারাপ অবস্থা তো!

খুব। আচ্ছা, এই ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, গোর্খাল্যাণ্ড হচ্ছে, আপনি কি জানেন আলাদা নারীরাজ্য বা নারীল্যাণ্ড নিয়ে কোনো দাবিদাওয়া উঠেছে কিংবা আন্দোলন হচ্ছে কিনা?

না তো। আমি শুনিনি।

উঠছে না কেন বলুন তো?

মনে হয় নারীল্যাণ্ডে চাকর-বাকরদের অভাব দেখা দিতে পারে বলেই দাবি উঠছে না।

বা:, বেশ বলেছেন মশাই। অতি ঠিক কথা। নারীল্যাণ্ড হলে ফাইফরমাশ করার জন্য পুরুষ জুটবে কোত্থেকে? তাই তো, কথাটা আমার মাথায় আসেনি। এটা কিন্তু আপনার আছে-র লিস্টিতে যায়। বুঝলেন?

বুঝেছি।

তা ফার্স্ট ব্যাচের ডাক কখন পড়বে বলতে পারেন?

মোটে সাতটা বাজে। আরও আধঘণ্টা বা থ্রি-কোয়ার্টার ধরে রাখুন।

আমি তো সেই দমদম পার্কে ফিরব, তাই বলছিলাম। তা লগ্ন ক-টায় জানেন নাকি?

খুব জানি। রাত বারোটা বিয়াল্লিশ মিনিট।

ও বাবা!

ভয় পাবেন না, লগ্ন দেরিতে বলে ব্যাচ দেরিতে বসবে না। দমদম পার্কে ফেরার সবচেয়ে ভালো রুট হল এখান থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে গিয়ে রাসবিহারীর মোড় থেকে পাতাল রেল ধরা।

সেটাই তো প্ল্যান মশাই। আর ব্যস্ত হচ্ছি সেই কারণেই। পাতাল রেল তো বোধ হয় সাড়ে ন-টায় বন্ধ হয়ে যায়।

তার মধ্যেই পারবেন। এখান থেকে রাসবিহারীর মোড় তো হাঁটাপথ। বাসে পাঁচ-সাত মিনিট, ট্যাক্সিতে মিনিট তিনেক। কিংবা আরও কম হতে পারে।

বলছিলাম কী তাড়াহুড়ো করলে খাবারের স্বাদ-সোয়াদ তেমন পাওয়া যায় না। বিরিয়ানির গন্ধটা বেশ ভালোই ছেড়েছে মশাই।

হ্যাঁ, কারিগর খুবই ভালো।

বীরেশবাবু তাহলে বেশ খরচা করেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, কী বলেন?

হ্যাঁ, খরচ তো আছেই।

তা পাত্রটি কেমন পেলেন? ইঞ্জিনিয়ার না কী যেন শুনেছিলাম?

আমারও শোনা কথা। কম্পিউটার-ইঞ্জিনিয়ার।

বেশ গালভরা কথা। কিন্তু কম্পিউটার-ইঞ্জিনিয়ার ব্যাপারটা কী তা কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন? তারা কি কম্পিউটার বানায় না মেরামত করে? আসল ব্যাপারটা কী?

আপনিও যে তিমিরে আমিও সে তিমিরে।

বীরেশবাবু বলছিলেন আমেরিকা না কোথা থেকে যেন ঘুরে এসেছে। তা আজকাল ওই এক দেশ হয়েছে। সবাই শুনি ল্যাজ তুলে সেখানে দৌড়োচ্ছে। আগে বিলেতের কদর ছিল, এখন তো সেটা বোষ্টমঘাটার মতো এলেবেলে জায়গা হয়ে গেছে।

কিছুদিন সবুর করুন, আমেরিকাও তাই হয়ে যাবে।

তাই হোক মশাই, তাই হোক। এই আমরা যারা আমেরিকা-টিকা যাইনি তাদের ভারি আত্মগ্লানি হচ্ছে। বাড়িতেও সবাই ঠেস দিয়ে কথা কয় কিনা।

বাড়ির লোকদের নিয়ে আপনার একটু প্রবলেম আছে, তাই না?

সবারই আছে মশাই, সবারই আছে। আমি পেটপাতলা মানুষ বলে কবুল করে ফেলি, অন্যেরা চেপেচুপে রাখতে পারে। আপনার তো বয়স কম, বুঝবেন না। বলি, বিয়ে-টিয়ে করেছেন?

আজ্ঞে না।

আগে করুন, তারপর বুঝবেন। বাইরে আপনি যত বড়ো কেওকেটা মানুষই হন না কেন, বাড়ির লোকের কাছে পাপোশের বেশি সম্মান আশা করবেন না।

কিন্তু আপনি তো সেই বাড়িতেই ফিরে যাওয়ার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি।

ওটাই তো জীবনের ট্র্যাজেডি। কতবার সন্ন্যাসী-বিবাগি হওয়ার কথা ভেবেছি, পেরে উঠিনি, সুইসাইড করব বলে মনস্থির করেও রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে। কেন জানেন?

কেন বলুন তো?

তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বটে, মুখনাড়াও দেয়, আবার শরীর-টরীর খারাপ হলে বা বিপাকে পড়লে হামলে এসে আগলায়ও তো। সংসার এক রঙ্গ মশাই।

সেরকমই শোনা যায় বটে।

এতক্ষণ ধরে কথা কইছি কিন্তু আপনার সঙ্গে ভালো করে পরিচয়ও হয়নি। তা আপনি কি বীরেশবাবুর আত্মীয়-টাত্মীয় নাকি?

না, না, এই কাছেই থাকি, চেনাজানা আছে আর কী।

আমার নাম দিবাকর দত্ত, সরকারি ঠিকাদার। বীরেশবাবুর এই বাড়িটা আমিই করে দিয়েছিলাম।

আপনি সরকারি ঠিকাদার! তাহলে তো বড়োলোক মানুষ আপনি।

আরে না। ঠিকাদারদের আজকাল আর বেশি মার্জিন থাকে না। একে-ওকে তাকে দক্ষিণা দিতে-দিতেই সব উজাড় হয়ে যায়। পেমেন্ট পেতেও নাভিশ্বাস। শুনতেই ভালো।

গাড়ি-টাড়ি নেই?

তা থাকবে না কেন? কিন্তু কলকাতার যা হাল হয়েছে, গাড়ি নিয়ে পারতপক্ষে বেরোয় কোন আহাম্মক।

ঠিকই বলেছেন।

তা আপনার নামটি কী?

সুজিত।

বামুন না কায়েত?

কায়েত।

তা কী করা হয়-টয়?

এই টুকটাক হাতের কাজ।

চাকরি করেন না?

ওই সামান্য একটা।

বয়স তো বোধ হয় সাতাশ-আঠাশ?

আঠাশ।

তা এই বয়সে আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব হচ্ছে কেন?

ব্যাপারটা হঠাৎ আজ সকালেই ধরা পড়ল কিনা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, আমার যেন আত্মবিশ্বাসটা নেই।

তার মানে কি আগে ছিল, এখন নেই?

আগে ছিল কিনা ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে এখন নেই, এটা বেশ বুঝতে পারছি। কেমন একটু নার্ভাস লাগছে।

হ্যাঁ, আপনি যে বেশ নার্ভাস তা বুঝতে পারছি, নইলে আলটপকা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন না যে, আত্মবিশ্বাস জিনিসটা কীরকম। কিন্তু হঠাৎ নার্ভাসই বা লাগছে কেন?

বলা মুশকিল। মাঝে মাঝে জীবনে এক-একটা দিন আসে যখন কোনো একটা সত্য উদঘাটিত হয়ে যায়।

বা:, বেশ বলেছেন। ওরকম আমারও হয়। এই তো বছরটাক আগে পাঞ্জাব মেল থেকে হাওড়া স্টেশনে নামছি, দরজার কাছটায় উঠন্ত কুলি আর নামন্ত যাত্রীদের মধ্যে খুব ঠেলাঠেলি। হাতের অ্যাটাচিকেসটা সামলাতে পারছি না। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো একটা বেশ মিষ্টি দেখতে ছেলে হঠাৎ ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন না, অ্যাটাচিকেসটা আমার হাতে দিন। তারপর নামুন। এসব লোকেরা বোধ হয়

খানিকটা হিপনোটিজমও জানে। কে জানে কেন ছেলেটাকে আমার বেশ চেনাচেনাও ঠেকল, তাই দিব্যি অ্যাটাচিকেসটা দিয়ে দিলাম। নেমে একগাল মাছি। কোথায় সেই ছোকরা, আর কোথায় বা অ্যাটাচি। তা সেদিন আমি বুঝলাম যতই লোক চরিয়ে খাই না কেন, আমি একটি গাড়ল।

আপনাকে কিন্তু গাড়ল বলে মনে হয় না। যদিও এ জায়গাটায় তেমন আলো নেই, তবু মনে হচ্ছে আপনি বেশ বুদ্ধিমান লোক।

কথাটা যে খুব ভুল বলেছেন তা নয়। আমি বুদ্ধিমানও বটে, আবার গাড়লও বটে। কোনো কোনো ব্যাপারে বুদ্ধিমান, কোনো কোনো ব্যাপারে গাড়ল। সব মানুষই এরকম। নিউটন বড়ো আর ছোটো বেড়ালের জন্য কক্ষে দুটো দরজা করেছিলেন, মনে আছে তো?

হ্যাঁ, মনে আছে।

আমরা আসলে আমাদের বুদ্ধিটাকে সর্বত্র প্রয়োগ করি না। এক বিষয়ে বুদ্ধির খেল দেখিয়ে বাহবা কুড়োচ্ছি, অন্য বিষয়ে আকাট বোকার মতো কাজ করে ছিছিক্কার পাচ্ছি। এই ধরুন ঠিকাদারির কাজে আমাকে বোকা বানাতে পারে এমন লোক কমই পাবেন, আবার সেই আমিই যে কী করে বাজার থেকে বুড়ো ঢ্যাঁড়শ বা পাকা পটল নিয়ে আসছি সেটা আমার কাছেও রহস্য। কাজেই আমি বুদ্ধিমানও বটে, বোকাও বটে। কিন্তু আপনার কথাটাই শোনা গেল না। আপনি যেন কেন আজ নার্ভাস বোধ করছেন।

ওই যে বললাম, আজ সকালে উঠেই মনে হচ্ছে আমার আত্মবিশ্বাস বলে কিছু নেই।

ঘাবড়াচ্ছেন কেন? যখন বিয়ে করবেন তখন থেকে টের পাবেন আপনার আরও অনেক কিছুই নেই। বউ এসে আপনার এমন অ্যাসেসমেন্ট করতে শুরু করবে যে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।

ওরে বাবা!

ভয় পেলে চলবে কেন? এটাই তো দুনিয়ার দস্তুর।

বিয়ে না করলে কেমন হয়?

ব্যাচেলর থাকবেন? তাহলে তো আরও চিত্তির। ব্যাচেলরকে সবাই এক্সপ্লয়েট করে। আত্মীয়স্বজন থেকে বন্ধুবান্ধব কেউ ছাড়বে না। তা ছাড়া ব্যাচেলাররা একটু বায়ুগ্রস্তও হয়ে পড়ে কিনা। প্রথম ব্যাচটা বসল কিনা একটু খেয়াল রাখবেন। সাড়ে সাতটা বাজতে চলল কিন্তু।

না না, সাতটা সতেরো। ফার্স্ট ব্যাচ বসার আগেই আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।

আপনি কি বিয়েবাড়ির ম্যানেজমেন্টে আছেন নাকি?

না, ঠিক ম্যানেজমেন্টে আছি বলা যায় না। তবে দেখাশোনা করছি আর কি।

বিয়েতে দেনা-পাওনা কীরকম হচ্ছে জানেন?

তেমন কিছু শুনিনি।

নগদ আছে নাকি?

যতদূর জানি, না। অবশ্য নগদের প্রশ্নও ওঠে না। শুনেছি নাকি মেয়েটি পছন্দ করে বিয়ে করছে।

ল্যাভ ম্যারেজ নাকি মশাই?

তা ওরকমই বোধ হয় কিছু।

সে কী! আপনি পাড়ার ছেলে হয়ে এসব জানেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি?

ঠিক ফেললাম না। বেরিয়ে গেল।

বীরেশবাবুর মেয়ে রিয়া বেশ সুন্দরী, তাই না?

আজ্ঞে।

কীরকম সুন্দরী বলে আপনার মনে হয়?

খুব।
সুজিতবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?
করুন না।
ভাই, এনি চান্স, রিয়ার প্রতি আপনার কোনো দুর্বলতা নেই তো!
এ কথা কেন মনে হল আপনার?
আত্মবিশ্বাসের অভাবের কথা বলছিলেন তো, তার ওপর দীর্ঘশ্বাস!
দুর্বলতাই তো মানুষকে খায়। আপনি খুবই বুদ্ধিমান।
তাহলে ঠিক ধরেছি?
ঠিকই ধরেছেন।
আত্মবিশ্বাসের অভাবের ফলেই এগোতে পারেননি তো!
সেটাও একটা ফ্যাক্টর বটে।
ভেঙে পড়বেন না মশাই। আপনার এখনও বয়স পড়ে আছে। কত কী ঘটতে পারে। বীরেশ মিত্রের মতো বড়োলোকের মেয়েকে প্রেমের প্যাঁচে ফেলে বিয়েতে গেঁথে তুলতে পারলেও হয়তো পরে পস্তাতেন। বড়োলোকের আদুরে মেয়ের বায়নাক্কা সামলানো তো সোজা কথা নয়।
সে তো বটেই।
তাহলে খারাপটা কী হয়েছে বলুন। ভালোই তো হয়েছে।
আপনি যেভাবে ধরছেন সেভাবে ধরলে বলতে হয় ভালোই হয়েছে।
আরে মশাই, সবসময়ে জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলোর কথাই তো আমাদের ভাবা উচিত, তাই না? আচ্ছা, আপনার চাকরিটা কীরকম?
সামান্যই।
সরকারি না বেসরকারি?
বেসরকারি।
ওই তো মুশকিল। বেসরকারি ফার্মগুলো বড্ড এক্সপ্লয়েট করে।
আজ্ঞে হ্যাঁ।
জব সিকিউরিটিও তেমন থাকে না।
যথার্থই বলেছেন।
মাইনে-টাইনে কেমন দেয়?
মোটামুটি দেয়, আমার চলে যায়।
খাটুনি কেমন?
খুব। মোষের মতো খাটতে হয়। দৌড়ঝাঁপও আছে।
ওই তো বেসরকারি ফার্মে চাকরির মুশকিল। আপনি তো বললেন হাতের কাজ জানেন।
আজ্ঞে যৎসামান্য।
ভালো করে শিখলে হাতের কাজ জানা লোকের অবশ্য চাকরির অভাব হয় না। তা আপনার হাতের কাজটা কী ধরনের?
এই একটু কম্পিউটার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। তাই একটু-আধটু শিখেছি।
আজকাল তো কম্পিউটারেরই যুগ। লেগে থাকুন, হবে।
লেগেই তো আছি। কোন কোম্পানিতে আছেন?
ইনফো টেকনো।
ইনফো টেকনো? না। নামটা শুনেছি বলে মনে হয় না।

শোনার মতো নয়। মোটে দু-বছর হল খুলেছে।

এবার একটু অ্যালার্ট হবেন মশাই। সাড়ে সাতটা বাজে কিন্তু।

হ্যাঁ, ওটা আমার খেয়াল আছে। এখন আপনি ধীরে ধীরে রওনা হতে পারেন, তবে গিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াতে হবে। পাঁচ মিনিট পর ডাকবে।

তাহলে উঠি?

হ্যাঁ, আসুন।

আপনার পুরো নামটা কী যেন!

সুজিত বসু!

সুজিত বসু। নামটা চেনা চেনা লাগছে কেন বলুন তো?

চেনা লাগবার কথা তো নয়। আমি বিখ্যাত লোক নই।

তাহলেও কেমন যেন চেনা ঠেকছে। আচ্ছা, ইয়ে বীরেশবাবুর জামাইয়ের নামটা কী বলুন তো!

সুজিত বসু!

তাই তো। সেইজন্যই চেনা ঠেকছিল। আপনার নামও তাহলে সুজিত বসু। তা কী করে হয়?

আর একটা দীর্ঘশ্বাস।

হয়। হয়ে যায়।

তার মানে কি আপনি বলতে চান রিয়ার সঙ্গে একজন সুজিত বসুর বিয়ে হচ্ছে যিনি আপনি নন?

আর একটা দীর্ঘশ্বাস।

সেরকমই হলেই বোধ হয় খুশি হওয়া যেত। কিন্তু লোকটা আমিই।

অ্যাঁ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পেঁপেসেদ্ধ

যারা টিফিনে পেঁপেসেদ্ধ খায় আমি তাদের খুবই শ্রদ্ধা করি।

কেন মশাই, যারা পেঁপেসেদ্ধ খায় তাদের শ্রদ্ধা করার কী আছে?

যারা এভারেস্টে ওঠে, বানজি জাম্প দেয় বা ট্র্যাপিজের খেলা দেখায় তাদের প্রতি কি আমাদের শ্রদ্ধা হয় না? আমি যা পারি না তা আর একজন যখন অনায়াসে পারে তখন শ্রদ্ধাকে ঠেকানো মুশকিল।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি পেঁপেসেদ্ধ পছন্দ করেন না।

আমি পেঁপেকে শ্রদ্ধা করি, যে খায় তাকেও শ্রদ্ধা করি।

বুঝেছি মশাই, আপনার কথার মধ্যে প্যাঁচ আছে। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ এবং চোরা ব্যঙ্গ। আমি পেঁপেসেদ্ধ খাচ্ছি বলে আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো?

না। মানুষকে খেতে দেখলে আমার বড়ো ভালো লাগে। পার্কের ওই দক্ষিণ কোণের ফুটপাথে দেখবেন দুপুরে পশ্চিমিরা পেতলের থালায় ছাতু মেখে খায়। আমি সুযোগ পেলেই দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া দেখি। কিংবা ধরুন অফিসপাড়ায় টিফিনের সময় বাবুরা যে রাস্তায় চাউমিন, রোল বা ঘুগনি দিয়ে রুটি সাঁটে সেই দৃশ্যটাও কিন্তু ভারি সুন্দর। তারপর ধরুন, সুন্দরী মেয়েরা যখন আকাশমুখো হয়ে হাঁয়ের মধ্যে জলভরা ফুচকা ফেলে তখন সেই দৃশ্য দেখে আমার বড়ো আনন্দ হয়। মানুষ খাচ্ছে, তাদের পেট ভরছে, তৃপ্তি হচ্ছে, এ তো অতিসুন্দর ঘটনা। আপনি যে এই নিরিবিলিতে দুপুরের পার্কে গাছের ছায়ায় বসে পেঁপেসেদ্ধ খাচ্ছেন এরও সুষমা আছে।

পেঁপে সম্পর্কে আপনার বিরূপ ধারণা থাকতেই পারে, কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পেঁপের মধ্যে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ এবং হজমের সহায়ক উপাদান আছে। তাই নয় কি?

হ্যাঁ, পেঁপে অত্যন্ত উপকারী জিনিস।

তাহলেই বলুন। আর ভগবান কিন্তু সব খাদ্যের মধ্যেই এক-একটি স্বাদ দিয়ে রেখেছেন। পেঁপের স্বাদও কিন্তু অতি ভালো। আমার বউ এতে বিটনুন এবং গোলমরিচ মাখিয়ে দেয় বলে স্বাদটা আরও খোলে।

হ্যাঁ, পেঁপের স্বাদগন্ধের গুণগ্রাহী মহান মানুষেরা আমাদের ঈর্ষারই পাত্র।

আপনি বেশ গোলমেলে লোক মশাই। তা সে যাই হোক, আমি রোজই কিন্তু এই পেঁপেসেদ্ধ দিয়েই টিফিন করি। ওই যে হলুদ বাড়িটা দেখছেন ওইটেই আমার অফিস। স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া। আড়াইটের পর একটু ফাঁক পেয়ে আমি এই পার্কে চলে আসি। প্রকৃতির মধ্যে বসে, গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্তে টিফিন খাই। এটাই আমার বিলাসিতা।

আপনি ঠিক কাজই করেন। যেকোনো আস্বাদনের জন্য নিরিবিলিতে বসা প্রয়োজন। জীবনানন্দের কবিতা, বিভূতিভূষণের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের নাটক ওসব ঠিক নিরিবিলি না হলে সুবিধে হয় না।

আপনি ওসব পড়েন বুঝি। সেইজন্যেই আপনার কথায় একটু সাহিত্য সাহিত্য গন্ধ পাচ্ছি। কম বয়সে আমিও পড়তাম। শরৎচন্দ্রের দেবদাস তো একসময়ে প্রায় মুখস্থ ছিল। তারপর রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, নীহার গুপ্তের হাসপাতাল। এখন আর পড়াটড়া হয় না।

ভালোই করেন। সাহিত্য না পড়েও দুনিয়ার বারো আনা লোকের দিব্যি চলে যাচ্ছে। আমারও দৌড় বেশিদূর নয়। বেকার জীবনে সময় কাটত না বলে পড়তাম।

বেকার ছিলেন বুঝি? এখন কি চাকরি পেয়েছেন?

ওই সামান্য একটা। তবে বেকারজীবনটা বড্ড ভালো ছিল।

কেন মশাই, বেকারজীবনে ভালোটা কী? বাড়িতে গঞ্জনা, দোকানে ধারবাকি, পকেটমানির অভাব।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে। তবু কতটা সময় পাওয়া যেত বলুন।

বেশিদিন বেকার থাকাটা মোটেই কাজের কথা নয়। তাতে ভিতরে ভিতরে মরচে পড়ে যায়। আপনার নামটি কী মশাই?

শুভাশিস মিত্র।

আমার নাম পীযূষ গুহ। আপনি চাকরি করেন, কিন্তু এই উইক ডে-তে দুপুরবেলা পার্কে এসে বসে আছেন যে?

আসলে আমার অফিসটাও কাছেই। দুপুরবেলা টিফিনের একটু ছুটি হলে আমি হাঁপ ছাড়তে এখানে চলে আসি কিংবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। অফিসের বন্ধ ঘরে বসে থাকার ধাতটা এখনও তৈরি হয়নি। বেকারজীবনে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে-বেড়ানোর নেশাটা একটু ঘুরে গেছে।

না না, এটা ভালো কথা নয়। নতুন চাকরি, প্রথমেই অত লিবার্টি নেবেন না। বরং ছুটির পরেও কিছুক্ষণ কাজ করবেন, তাতে ইম্প্রেশন ভালো হয়। আমি পঁচিশ বছর চাকরি করছি মশাই, সব জানি। তা সরকারি চাকরি না বেসরকারি?

বেসরকারি।

বড়ো কোম্পানি?

না, মাঝারি।

তা হোক, লেগে থাকাটাই আসল। চাকরির যা বাজার, একটা যেমন তেমন চাকরি পাওয়াও কঠিন।

তা তো ঠিকই।

বাড়িতে কে কে আছে?

মা আর আমি।

বাবা কি নেই?

আছেন।

কোথায়?

দিল্লিতে।

দিল্লিতে। চাকরি করেন বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দিল্লি বড়ো ভালো জায়গা। নিট অ্যাণ্ড ক্লিন। তা আপনার বাবা মাঝে মাঝে আসেন তো!

সময় পেলে আসেন।

আপনারা যান না?

তাও যাই।

ভাই-বোন নেই?

আজ্ঞে না।

আপনার চাকরিটা কী ধরনের?

সব চাকরিই তো ফাইফরমাশ খাটবার কাজ। তাই না? এটা করো, সেটা করো, ওটা ভুল হল কেন?

না, মশাই, আপনার হাবভাব আমার ভালো ঠেকছে না। চাকরিতে মন নেই কেন আপনার?

আমার মাও ওই কথাই বলে। আমার নাকি চাকরিতে মন নেই।

এ বাজারে চাকরি গেলে আবার পাওয়া মুশকিল।

জানি। ওপরওয়ালা আমাকে তেমন পছন্দও করেন না। বলছে, তোমার স্বভাবটা বড়ো উড়ু উড়ু।

সর্বনাশ! একে প্রাইভেট অফিসে চাকরি, তার ওপর কতৃপক্ষের বিষনজর! আপনি তো বিপদে পড়বেন মশাই।

বিপদ! হ্যাঁ, বিপদই তো! তবে যদি চাকরিটা চলে যায় তাহলে আমার খুব একটা দুঃখ হবে না। বেকারজীবনটার কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হয়।

এই রে! অতিরিক্ত সাহিত্যপাঠের এটাই হল কুফল। এইজন্যই বাড়িতে সাহিত্য-টাহিত্য আমি ঢুকতে দিতে চাইনি।

তবু কি সাহিত্য আপনার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে?

আর বলবেন না মশাই। আমার বউটির জন্যই। সে আবার সাহিত্যপাগল লোক। বই না পড়লে ভাত হজম হয় না। ওই বদঅভ্যাস আমার ছেলেমেয়ে দুটিও পেয়েছে। তবে ভাগ্য ভালো যে, তারা উচ্ছন্নে যায়নি। লেখাপড়ায় ভালোই। মেয়ে তো চাকরিও করছে।

বা:!

দেখবেন মশাই, যা করার চাকরি বাঁচিয়ে করবেন।

চাকরিটা নিয়েই তো সমস্যা। চার দেওয়ালের ভিতরে যতক্ষণ আটকে থাকি, ততক্ষণ মনে হয় যেন কবরখানা। বাইরে বেরোলেই মনে হয় মুক্তি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো আমাদের সকলেরই প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগে। কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে যাবে দেখবেন। এখন মাথার ওপর বাবা আছেন বলে হয়তো সংসারের প্রেশার টের পাচ্ছেন না। কিন্তু প্রেশার যখন আসবে তখন বুঝবেন চাকরিটার মূল্য কতখানি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বটেই।

তারপর ধরুন, বিয়েও তো করতে হবে, তখন দায়িত্ব বাড়বে। চাকরি না হলে কি চলে?

বিয়ে?

নয় কেন? বাপের এক ছেলে, বংশরক্ষা করতে হবে না?

কিন্তু বিয়ে করলে যে আরও মুশকিল হবে।

কীসের মুশকিল?

আরও বন্ধন। ইচ্ছে করলে চাকরি ছেড়ে বেরোতে পারব না।

চাকরি ছাড়ার কথা ভাবছেন কেন?

আমি ভাবছি না, চাকরিটাই ছেড়ে দিতে চাইছে আমাকে।

মাইনে কত দেয়?

দেয় কিছু। আমার চলে যায়।

চার-পাঁচ হাজার?

ওরকমই। কিছু কমবেশি।

খুব খারাপ তো নয়। তাহলে চাকরিটা আপনার ভালো লাগছে না কেন?

আমার তো সেটাই প্রবলেম। আমার কলিগরাও আমাকে খুব বোঝানোর চেষ্টা করে।

প্রেমেট্রেমে পড়েছেন কখনো?

কেন বলুন তো!

অনেক সময়ে প্রেমে পড়লে উড়ুউড়ু উড়নচণ্ডী ভাবটা কেটে যায়। স্বভাব-বাউণ্ডুলেদের দাওয়াই হল প্রেম।

না, মেয়েরা আমাকে পছন্দ করে না।

কেন, আপনি তো বেশ হ্যাণ্ডসাম, স্মার্ট লুকিং।

প্রেমের ব্যাপারেও আমি বোধহয় সিরিয়াস নই। মেয়েরা আমাকে অ্যাট্রাক্টিভ মনে করে না।

হাসালেন মশাই, আজকালকার মেয়েরা কত অপদার্থ, ভ্যাগাবণ্ড আর কাঁকলাস চেহারার ছেলেদের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর আপনার মতো উজ্জ্বল চেহারার ইয়ংম্যানের লাভার জুটছে না এ কি হয়? আপনি বোধহয় মেয়েদের ভয় পান।

ঠিক উলটো। আমার মনে হয়, মেয়েরাই আমাকে অ্যাভয়েড করে।

কেন করে ভেবে দেখেছেন?

না।

তাহলে ভাবুন এবং নিজেকে মেরামত করুন। ও কী, মুখটা অমন করুণ হয়ে উঠল কেন?

আমি তাহলে একটা ঘটনার কথা বলতে পারি।

বলুন না।

কিন্তু আপনার হাতে কি সময় আছে? আপনি তো পেঁপেসেদ্ধ শেষ করে টিফিনের বাক্স বন্ধ করে ফেলেছেন। এবার বোধ হয় অফিসে ফিরবেন?

আরে তাতে কী? পঁচিশ বছর চাকরি হয়ে গেছে, আর চোদ্দো মাস পরে রিটায়ার করব। এখন একটু-আধটু লিবার্টি নিতেই পারি। দেরি হলেও কেউ কিছু বলবে না।

তাহলে বলব কি?

স্বচ্ছন্দে।

আমি যখন বেকার অবস্থায় ভ্যগাবণ্ডের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি সেই সময়ে হঠাৎ একদিন সকালে রাস্তায় একটি মেয়েকে দেখে ভারি অবাক হয়ে যাই। মেয়েটি খুব একটা লম্বা নয়, বেঁটেও নয়, খুব ফর্সা নয়, কালোও নয়। রোগাটে হলেও রোগাও বলা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য এবং অদ্ভুত হল তার মুখখানা। মুখখানা যেন মুখের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এত নমনীয়, কোমল লাবণ্য চোখেই পড়ে না। আর ভারি মিষ্টি ছিল তার চোখ দু-খানা। মায়ায় ভরা। তাকে দেখেই কেমন যেন আমার অস্তিত্বের মূল টলে গেল। তার আগে বা পরে কোনো মহিলাই আমাকে এত বিচলিত করেনি। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো, হিপনোটিক একটা স্পেলের মধ্যে তাকে পাছে হারিয়ে ফেলি এই ভয়ে ফলো করতে শুরু করি। আজকাল মেয়েদের ফলো করা-টরা উঠেই গেছে। ওসব আপনাদের আমলে ছিল।

তা বটে।

কিন্তু আমি এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করার সাহস পেলাম না, যদিও সেটাই স্বাভাবিক হত। ফলো করে করে আমি শেষ অবধি একটা গলির মুখ অবধি যেতে পেরেছিলাম। মেয়েটা গলির মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় আমি আর সাহস করে এগোতে পারলাম না। খুব নার্ভাস লাগছিল।

আচ্ছা, তারপর?

আমি গলিটা চিনে রাখলাম। পরদিন সকালে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম গলির উলটোদিকে। ঘণ্টাখানেক বাদে সে বেরোল এবং আমি তাকে আবার ফলো করতে শুরু করলাম। কলেজ অবধি।

কোন কলেজে?

এসব এখন গোপন থাক।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলুন।

বাড়ির গলি এবং কলেজ দুটোই আমার চেনা হল এবং রোজই ফলো করা চলতে লাগল। এবং আমার নার্ভাসনেস, ভয় এবং লজ্জা আরও বাড়ল। বাড়ল তার প্রতি আকর্ষণ। মেয়েটা প্রথম কিছুদিন আমাকে লক্ষ করেনি। তারপর করল।

কী করে বুঝলেন?

ওসব বোঝা যায়।

মেয়েটা আপনাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছিল কি?

আজ্ঞে না। বরং মুখে বিরক্তি এবং পায়ে সন্ত্রস্ত ভাব দেখতে পেতাম। তেমন জাঁহাবাজ মেয়ে হলে গার্জিয়ান বা পাড়ার দাদাদের দিয়ে হামলা করতে পারত। সেসব করায়নি। কিন্তু কাঠিন্য দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে, ব্যাপারটা সে পছন্দ করছে না।

এমন হতেই পারে। হয়তো তার কোনো বয়ফ্রেণ্ড ছিল। আজকাল তো লেজুড় জুটতে দেরি হয় না।

হ্যাঁ, সেটা একটা সম্ভাবনা বটে। আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তার বয়ফ্রেণ্ড থাকলে কোনো না কোনো সময়ে দেখা যেত হয়তো। কিন্তু সেরকম কাউকে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেখিনি। আমার চিন্তারাজ্যের যাবতীয় লজিক উধাও হল, আমি সবসময়ে তাকে নিয়ে নানা সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা করতাম এবং সবই পরাবাস্তব চিন্তা। ঠিক এরকম ইনফ্যাচুয়েশন এযুগের ছেলেদের হওয়ার কথাই নয়।

হুঁ হুঁ, খুব কঠিন।

মেয়েটির ব্যক্তিত্ব ছিল সাংঘাতিক। কখনো উগ্র সাজে সাজত না। খুব সাদামাটা পোশাক পরত, সঙ্গীসাথিও বিশেষ দেখিনি। যখন কলেজ থেকে বেরোত তখন দুজন বা তিনজন বান্ধবী কখনো-সখনো সঙ্গে থাকত।

নামটাম বা ঠিকানা জানার চেষ্টা করেননি?

না। কারণ উপায় ছিল না।

তাহলে তো লস্ট কেস।

ঠিক তাই। মাত্র মাস তিনেক বাদে একদিন মেয়েটি গলি থেকে বেরোল না। পরদিনও না। তার পরদিনও না। মেয়েটি সম্পূর্ণ মুছে গেল।

অ্যাঁ! কোথায় গেল?

আমার অনুমান কোনো একটা ছুটির মধ্যে তারা বাড়ি পালটে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল।

এঃ হে:। আপনি তখন কী করলেন?

বুঝতেই পারছেন। আমি কয়েকদিন সম্পূর্ণ বেহেড হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর এম বি এ পড়তে দিল্লি চলে যাই।

কী বললেন! এম বি এ?

হ্যাঁ।

বাপ রে! দিল্লির সেই বিখ্যাত ইনস্টিটিউট নাকি?

ইয়ে—ওই আর কী!

তাহলে তো আপনি সোজা লোক নন! এম বি এ পাস। আহা, অমন লজ্জা পাওয়ার কী আছে! শিক্ষা কি লজ্জার ব্যাপার?

ওটা কিছু নয়। গুরুত্ব দেবেন না।

ঠিক আছে, দিচ্ছি না। তারপর?

কলকাতায় এসে আমি এই অফিসটায় চাকরি পেয়ে যাই।

বেতনের কথাটা কি আবার জিজ্ঞেস করব?

আর লজ্জা দেবেন না। এটা অর্থনৈতিক গল্প নয় কিন্তু।

বুঝলাম। বলুন।

চাকরি পেয়ে যাওয়ার পরই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটল। আমি দেখলাম, মেয়েটিও এই অফিসেই চাকরি করছে।

বলেন কী?

হ্যাঁ, সে আমার সহকর্মী।

এ তো দারুণ গল্প! এবার নিশ্চয়ই—

না। আপনি যা ভাবছেন তা নয়। মেয়েটা ঠিক আগের মতোই কঠিন ও অবিচল। লক্ষ করলাম, অফিসের কেউই তাকে ঘাঁটায় না। সবাই প্রবল সমীহ করে এবং দূরত্ব বজায় রাখে।

মেয়েটা কি আপনাকে চিনতে পারল?

না পারার কথা নয়। কিন্তু সেটা একেবারেই প্রকাশ করল না। এমনকী কোনো সূত্রেই আমার সঙ্গে পরিচয় বা বাক্যবিনিময়ও করল না।

এরকম হয় নাকি?

খুব প্রয়োজন হলে সে বেয়ারা দিয়ে আমার কাছে নোট পাঠায়। কখনো নিজে যেচে কথা বলে না।

আর সকলের সঙ্গে বলে?

হ্যাঁ। প্রয়োজনে সকলের সঙ্গেই কথা বলে। বাদ শুধু আমি।

লক্ষণটা ভালো না খারাপ?

জানি না। এসব ব্যাপারে আমি খুবই অনভিজ্ঞ।

আপনি নিজে কথা বলার চেষ্টা করেননি?

পাগল নাকি? মেয়েটিকে দেখেই আমি এমন নার্ভাস হয়ে পড়ি যে ভালো করে তাকাতেও পারি না।

আপনার অফিসে ক-টা মেয়ে কাজ করে?

অনেক। অধিকাংশ স্টাফই তো মহিলা। তাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ সুন্দর দেখতে। আমাদের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তো কোনো একটি বিউটি কনটেস্টে মিস কী যেন হয়েছিল।

তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

অত্যন্ত ফ্রেণ্ডলি। জড়তাহীন সম্পর্ক।

আপনি কি ওই মেয়েটির কারণেই চাকরি ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন?

বোধহয় ওই মেয়েটিই প্রধান কারণ।

সে কি আপনার অধস্তন।

আমাদের অফিসে ঠিক ওরকম কিছু হায়ারার্কি নেই। সবাই নিজের নিজের কাজ করে। প্রত্যেকেই প্রফেশনাল। প্রাইভেট অফিসে কেউ কোনো সুবিধে পায় না। সবাইকেই প্রচন্ড কাজ করতে হয়। বসিং ব্যাপারটা দরকার হয় না। অফিসের মোটো হচ্ছে, ইট ইজ এ ফ্যামিলি।

হ্যাঁ। আজকাল এরকম একটা স্লোগান শোনা যাচ্ছে বটে। তাতে নাকি কাজ ভালো হয়।

হ্যাঁ।

আপনার কোম্পানির অন্য কোনো ব্রাঞ্চ নেই?

আছে। বোম্বে, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর। হেড অফিস দিল্লি।

আপনি বদলি হয়ে যেতে পারেন না?

পারি। কিন্তু কলকাতার অফিসটা নতুন। এখানে কনসেনট্রেট করা বেশি প্রয়োজন বলেই আমাকে এখানে কাজ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমাকে অন্যান্য অফিসেও ট্যুর করতে হয়।

একটা কথা বলব?

বলুন।

মেয়েটির কোনো বয়ফ্রেণ্ড আছে কিনা খোঁজ নিন।

দিগন্তে সেরকম কোনো মেঘ এখনও দেখা যায়নি।
যা দেখা যায় না তা কি নেই? হয়তো বয়ফ্রেণ্ড এখন বিলেত বা আমেরিকায়। কিংবা অন্য কোথাও চাকরি করছে। মেয়েটি তার জন্যই অপেক্ষায় আছে।
সর্বনাশ!
কী হল?
একথাটা ভাবিনি তো!
এটাও তো সম্ভব!
হ্যাঁ। খুবই সম্ভব।
লক্ষণ দেখে আমার সেকথাই মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হচ্ছে।
তাহলে?
সেক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। বয়ফ্রেণ্ড না থাকলেও কিছু করার ছিল না অবশ্য।
আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি?
কী করবেন?
আমি মেয়েটিকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি।
কী করে?
আমি একজন বয়স্ক মানুষ, কাজেই সে আমাকে হয়তো অসম্মান করবে না। আমি তার অবস্থানটা জানবার চেষ্টা করতে পারি।
সেটা কি খুব খারাপ দেখাবে না?
হুঁ। আপনি তো বেশ পাকিয়ে তুললেন দেখছি।
সমস্যা আছে বটে। সমাধানও আছে।
কী সেটা?
আমার ফের ভ্যাগাবণ্ড হয়ে যাওয়া। মাকে আমি বলেছি যে, চাকরি করতে আমার ভালো লাগছে না। আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন কোনোরকমে চলে যাবে। আমার মা তাতে খুব একটা আপত্তি করেনি। মা বরাবরই আমার সাপোর্টার।
ভ্যাগাবণ্ড হলেই কি সমস্যা মিটবে?
হ্যাঁ। ছুটি পেলে আমি ফের আগের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। গাঁয়ে-গঞ্জে চলে যাব। আপনার জানার কথা নয় যে, আমি গান লিখি, সুর দিই এবং গাই।
তাই নাকি?
আমি ছবি-টবিও আঁকতে পারি। একসময়ে সেসবই আমার প্রিয় বিষয় ছিল। অফিসে বন্দি হওয়ার জন্য আমার জন্ম নয়। মুক্ত, চিন্তাশীল, দায়িত্বহীন জীবনে ফিরে যেতে পারলে আমি এসব ছোটোখাটো ব্যাপার ভুলে যেতে পারব।
আপনি যে একজন কালচারগেঁড়ে তা আপনাকে দেখেই আমি বুঝেছি। সত্যি কথা বলতে কি আপনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন, বাস্তববোধবিবর্জিত, ইম্প্র্যাকটিক্যাল, ভাবালু এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন মানুষ।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি ঠিক ওইরকম।
এইসব ভর্ৎসনা শুনেও আপনি যে বিন্দুমাত্র অপমান বোধ করলেন না এবং আপনার চোখ যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাতেই বুঝতে পেরেছি যে, আপনার জীবনে উন্নতির কোনো আশা নেই। এ যুগের মেয়েরা আপনার মতো পুরুষকে পছন্দ করার মতো আহাম্মক নয়। তবে একথাও আমাকে কবুল করতে হবে যে, আপনার

মতো দু-একটা পাগল ধারে-কাছে না থাকলে পৃথিবীটা সহনীয় হত না। আপনার সম্পূর্ণ অপদার্থতা সত্ত্বেও আপনাকে আমার বেশ ভালোই লাগছে।

ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ।

যদিও আপনার মতো ভাবালু লোক কোনো মহিলাকে বিয়ে করলে তার জীবনটাই বরবাদ হবে, তবু আপনার মতো লোকেরই বিয়ে করাটা জরুরি। তেমন মেয়ে হলে সে আপনার মাথা থেকে ভাবের ভূত ঝেড়ে তাড়াবে। বিয়ের পর পুরুষদের নানারকম পরিবর্তন হয়ে থাকে।

আপনি বেশ বিজ্ঞ মানুষ।

বিজ্ঞ নই, অভিজ্ঞ।

সঞ্চিত অভিজ্ঞতাই তো বিজ্ঞতা!

তাহলে এই বিজ্ঞ লোকটির একটা কথা শুনুন। এই বেলা চোখ বুজে চট করে একটা বিয়ে করে ফেলুন। তাতে প্রেমজ্বর সেরে যাবে। যে মেয়েটা আপনাকে পাত্তা বা মূল্য দিচ্ছে না, ফিরেও তাকাচ্ছে না, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে, তার জন্য বিবাগি হওয়াটা কি পুরুষ মানুষের কাজ? সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ের তো অভাব নেই।

সেটা কি নিজের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না? যে মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব তার প্রতিও হয়তো অবিচারই করা হবে।

আরে মশাই, বিয়ের পর দেখবেন ওই ধিঙ্গি মেয়েটাকে ভুলে যেতে আপনার সাতদিনও লাগবে না। আমার মেয়েকেও তো আমি ওই কথাই বলি।

কী বলেন?

এমনিতে আমার মেয়ে ভীষণ স্ট্রং মর‍্যালের মেয়ে, ছেলেদের পাত্তা দেয় না, সিরিয়াস টাইপের। পড়াশোনা আর নিজের কাজ নিয়ে থাকে। কথাও বলে কম। কিছুদিন হল দেখছি খুব অন্যমনস্ক, অস্থির, রাতে ভালো ঘুম হয় না। চাপা স্বভাবের বলে কিছু ভেঙে বলেও না। আমরা বুঝতে পারছি, কারও প্রেমেট্রেমে পড়েছে এবং সেটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। ওর মা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কথা বের করতে পারেনি। তবে আমার ছেলের কাছে নাকি একদিন বলেছে, সে চাকরি ছেড়ে দেবে।

সে কী? চাকরি ছাড়ার মতো কী হল?

আমাদের কাছে তো বলে না। তবে দাদার সঙ্গে খুব ভাব। দাদাকে নাকি কথায়-কথায় বলেছে, সে তার টপ বসের প্রতি মনে মনে ভীষণ সফট হয়ে পড়েছে, কিন্তু এক্সপ্রেস করা সম্ভব নয়। তাই চাকরি ছাড়তে চায়। চাপা এবং অহংকারী মেয়েদের তো ওটাই প্রবলেম কিনা।

ঠিকই বলেছেন। ভীষণ প্রবলেম।

আমাদের প্রবলেম কী জানেন?

কী বলুন তো!

মেয়েকে কিছুই বলার মতো সাহস আমাদের নেই। আমার মেয়ের ভীষণ স্ট্রং পার্সোনালিটি। শি ইজ অ্যান অ্যাভিড অ্যানিম্যাল লাভার, যে কারণে নিরামিষ খায়, তার ওপর স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে বলে জাংক ফুড বা ভাজাভুজি বাড়িতে একরকম বন্ধ করে দিয়েছে। ওর জন্য আমরা তটস্থ। নিজের কোনো প্রবলেম হলে বরাবর নিজেই সলভ করে, কখনো আমাদের সাহায্য নেয় না। এই যে দশ-বারো হাজার টাকা বেতনের চাকরিটা পেল এটাও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। কারও সুপারিশে নয়।

হ্যাঁ, আমি জানি।

আপনি জানেন! তার মানে?

না, মানে ওরকম মেয়ের পক্ষে ওটাই তো স্বাভাবিক কিনা।

এগজ্যাক্টলি। মাঝখানে ওর বিয়ের জন্য একটু সম্বন্ধ-টম্বন্ধ করছিলাম। কিন্তু পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে শুনলে এমন খেপে যায় যে, আমরা রণে ভঙ্গ দিয়েছি।

আমি ভদ্রমহিলার পোট্রেটটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

ভিসুয়ালাইজ করলেন তো!

হ্যাঁ।

আমার ছেলেও ভালো চাকরি করে। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। সেই মেয়েটি আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসে টাসে, আমাকে বাবা আর স্ত্রীকে মা বলে ডাকে। সবর্ণ, পালটি ঘর। নো প্রবলেম। আশা করি স্মুথলি বিয়েটাও হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েকে নিয়ে কী করি বলুন তো? যাকে ভালোবাসে তাকে একবার চোখ বুজে বলে ফেললেই তো হয় ব্যাপারটা। তাও বলবে না, দগ্ধে দগ্ধে মরবে। কী যে জ্বালা আমাদের!

বস বলেই বুঝি সংকোচ বোধ করছেন?

আরে না মশাই, তা নয়। দাদাকে তো বলেছে, বস হওয়ার অনেক আগে থেকেই নাকি ও ছেলেটার ইয়েতে পড়েছে। তা মুখে বলতে না পারিস আজকাল তো ই-মেলটেল করা যায়, তাই কর না। ঠিক কিনা বলুন?

ঠিকই তো! বিশেষ করে বসটি যখন অবিবাহিত এবং ইকুয়ালি ইল লাক।

কিছু বললেন?

একটা স্বগতোক্তি করছিলাম আর কী। মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকে না কিনা।

আচ্ছা, আপনিও তো সেই মেয়েটিকে একটা ই-মেলে করতে পারেন।

পারি। কিন্তু মেয়েটা হয়তো জবাব দেবে না। হ্যাংলা ভাববে।

কী মুশকিল। আপনিও তো দেখছি আমার মেয়ের মতোই সনাতন যুগের লোক। এ যুগের ছেলে-মেয়েরা মেন্টালি কত ফ্রি, কত স্মার্ট!

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমাদের খুব মিল। সনাতন যুগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না।

আপনার কোম্পানির নামটা কী যেন?

টাইট রোপ।

অ্যাঁ। ঠিক শুনলাম কি? টাইট রোপ?

আপনি ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? ঠিকই শুনেছেন।

টাইট রোপের অফিস তো ক্যামাক স্ট্রিটে?

ক্যামাক স্ট্রিটেই।

তাহলে যে বললেন, আপনার অফিস কাছেই?

ক্যামাক স্ট্রিটটাই বা কী এমন দূর বলুন। আপনি কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন?

ফেললাম।

কেন?

কারণ পেঁপেসেদ্ধ সম্পর্কে আপনার মতামত এরপর হয়তো পালটাতে হবে।

পেঁপেসেদ্ধ খেতে কি খুবই খারাপ? আপনার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছিল যেন অমৃত খাচ্ছেন।

পেঁপেসেদ্ধর মতো খারাপ জিনিস দুটো হয় না মশাই। আর শুধু পেঁপেসেদ্ধই বা কেন? পেঁপেসেদ্ধর পরদিন কাঁচকলাসেদ্ধ, তারপর গাজর বিন টম্যাটোসেদ্ধ, তারপর বরবটি আর ঢ্যাঁড়শসেদ্ধ, পরদিন আলু আর ঝিঙেসেদ্ধ। জিভ অসাড় হয়ে গেছে, বুঝলেন! কিন্তু ওই একরত্তি মেয়ের শাসনে এসব খেয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। খেতে যখন হবেই তখন সোনাহেন মুখ করেই খাই। তবে হ্যাঁ, একটা কথা কবুল

করতেই হবে যে, এসব খাই বলে গ্যাস অম্বল বা পেটের কোনো কমপ্লেন হয় না। ভেবে দেখুন, পারবেন তো?

মানুষ তো এভারেস্টেও ওঠে, তাই না?

তা ওঠে বই কী। আজকাল তো শুনি এভারেস্টে কুম্ভমেলার ভিড়।

হ্যাঁ, তাই ভেবে-চিন্তে আমি খুঁজে খুঁজে আপনার কাছেই এসেছি। পেঁপে এবং অন্যান্য সেদ্ধ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত জানার জন্যই।

ভালো করেছেন মশাই, ভালো করেছেন। আমি বলি পৃথিবীর অপ্রিয়তম কাজটি করার সময়ে হাসিমুখে করবেন, মনটাকে পজিটিভ রাখবেন এবং ভয়কে পরিহার করবেন। বাই দি বাই, মেয়েটা কি কোনো সিগন্যাল দিয়েছে?

গতকাল অনেক সাহস সঞ্চয় করে আমি তাকে একটা ই-মেল করেছিলাম। তাতে শুধু ছিল, ওয়াই আর এন— ?

বটে! কী জবাব এসেছে?

ওয়াই।

পারিজাত ও ছোটোকাকা

আপনি কি পুলিশের লোক?

কেন বলুন তো! আমাকে কি পুলিশের লোক বলে মনে হয়?

আজকাল কাউকে দেখে কি কিছু বোঝা যায়, বলুন! আমাদের নিমাইবাবুর কথাই ধরুন না কেন! দিব্যি মোটাসোটা, হাসিখুশি, দিলদরিয়া, নির্বিরোধী মানুষ। ভিখিরিকে ভিক্ষে দেন, কীর্তন শুনে কাঁদেন, পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে ছুটির দিনে ব্যাটবল খেলেন, ঘরে ঠাকুর-দেবতার ছবি আছে। অথচ একদিন সকালে তাঁর বাড়ি পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। তাঁর শোয়ার ঘরের খাটের তলা থেকে দুটো এ কে ফর্টি সেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল, দুটো বেলজিয়ান পিস্তল, আর ডি এক্স, কার্তুজ, আরও কী কী সব যেন বেরোল। আমাদের একগাল মাছি।

নিমাইবাবু ধরা পড়লেন বুঝি?

পাগল! শুনলুম ওই থলথলে চেহারা নিয়েও তিনি নাকি নিজের বাড়ির ছাদ থেকে পাশের বাড়ির ছাদে লাফিয়ে পড়ে হাওয়া হয়েছেন। তাই বলছিলুম, লোক দেখে আজকাল আর কে যে কী তা চেনা মুশকিল। শুনলুম নিমাইবাবু নাকি কোনো টেররিস্ট দলের সর্দার। বুঝুন কান্ড!

তা আমাকে দেখে কী মনে হয় আপনার?

শার্লক হোমস হলে বলতে পারতুম। তবে এমনিতে আপনাকে একজন মধ্যবয়স্ক, মধ্যবিত্ত, মধ্যশিক্ষিত, মধ্যম উচ্চতা ও মধ্যম স্বাস্থ্যের ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। একজোড়া সন্দেহভাজন জম্পেশ গোঁফ থাকলেও আপনাকে ভয়ংকর মানুষ বলে মনে হয় না। আর ওইটেই হচ্ছে মুশকিল। আজকাল লোক দেখে চেনার উপায় নেই কিনা।

কথাটা যে খুব ভুল বলেছেন তা নয়। আমি ভয়ংকর লোক নেই। তবে আমাকে যে কেন পুলিশ বলে আপনার মনে হল সেইটেই বুঝতে পারছি না।

বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আজ ছুটির দিনটা বাড়িতে বসে কাটাব না ঠিক করে সকালে রুটি-তরকারি খেয়ে যখন বেরোলাম তখন শরৎকালের আকাশ দেখে মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠল। শরৎ আমার ভারি প্রিয় ঋতু। যদিও কলকাতা শহরে শিউলি বা কাশফুল বড়ো একটা দেখা যায় না, হিমেল ভাবটাও ডিজেল আর জনসংখ্যার জন্য তেমন নেই। তবু যাকে বলে স্মৃতিতাড়িত হয়েই বেরিয়ে পড়েছিলুম। ভাবলুম আজ একটু প্রকৃতিচর্চা করে কাটাব।

আপনি কি একটু প্রকৃতিপ্রেমিক?

প্রকৃতিপ্রেমিক কে নয় বলুন তো! আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো বনজঙ্গলেই থাকতেন। ফলে এর একটা উত্তরাধিকার আমাদের রক্তে আছেই। ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিই বটে, কিন্তু প্রকৃতি

আমাদের সর্বদাই ডাকে।

অতি সত্য কথা। তাই আজ প্রকৃতির ডাকে বেরিয়ে পড়লেন বুঝি?

হ্যাঁ। তবে কলকাতায় প্রকৃতির জনপ্রিয়তা এতই বেশি যে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। ময়দানে যান, গুচ্ছের লোক। লেক-এ যান, গুচ্ছের লোক। নিরিবিলিতে যে উড়ু-উড়ু মন নিয়ে বসে থাকবেন তার জো নেই। তাই আজ ভাবলুম, লোকাল ট্রেনে চেপে বারুইপুর কী লক্ষ্মীকান্তপুর কিংবা ক্যানিং কোথাও গিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসি।

তা গেলেন না কেন?

আরে মশাই, সেই কথাই তো বলছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখনই দেখতে পেলুম বাসস্টপে একটা লোক আমাকে আড়ে আড়ে লক্ষ করছে। এ ব্যাপারটা কিছু অভিনব। কারণ আমাকে লক্ষ করার মতো কিছু নেই। আমি অতি সাদামাটা, নগণ্য মানুষ। অথচ লোকটা বারে-বারেই আমার দিকে বেশ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছিল। এবং সেই লোকটা আপনি।

তা হবে হয়তো। আমি ইচ্ছে করেই যে তাকাচ্ছিলাম তা নয়। আসলে আমি খুব ভুলোমনের মানুষ। ভাবতে ভাবতে কোনোদিকে হয়তো তাকিয়ে থাকি, কিন্তু কিছু দেখি না।

আপনাকে খুব আনমনা লোক বলে মনে হয় না কিন্তু।

কিন্তু একটু আগে আপনিই তো বলেছিলেন লোক দেখে কে কেমন তা ঠিক বোঝা যায় না।

হ্যাঁ মশাই, তা বলেছি। তাহলে আপনি নিজেকে ভুলোমনের মানুষ বলেই দাবি করছেন?

দাবিদাওয়া কীসের? আমি ভুলোমনের মানুষ কিনা তাও সঠিক জানি না। তবে গত তেত্রিশ বছর ধরে আমার বউ বলে আসছে আমি নাকি বেজায় ভুলোমনের মানুষ। বউ যা বলে তা নাকি আমি বেমালুম ভুলে যাই। শুনে শুনে আজকাল কথাটা আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে।

কিন্তু মুশকিল কি জানেন, বাসস্টপে আমি আপনাকে এড়ানোর জন্য তিনটে বাস ছেড়ে দিই। বাস ফাঁকাই ছিল, তবু আমি উঠিনি। দেখলুম, আপনিও হিসেব কষেই ওই তিনটি বাস ছেড়ে দিলেন।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক তাই। চতুর্থ বাসটায় উঠতেই দেখলুম আপনিও উঠে পড়েছেন। তখনই মনে একটা খটকা লাগল।

খটকা! খটকা লাগবে কেন? এরকম তো হতেই পারে। প্রতিদিন এই কলকাতা শহরেই কত লোক তিনটে বাস ছেড়ে দিয়ে চার নম্বর বাসে ওঠে। এতে খটকা লাগার কী আছে? আপনি একটু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, তাই না?

সন্দেহ তো এমনি হয় না মশাই, কারণ থাকলেই হয়। শ্যামবাজার থেকে শেয়ালদা যেতে যেতে আমি বার বারই লক্ষ করছিলাম যে, আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন। আমি তখন আকাশ-পাতাল ভেবেও বুঝতে পারছি না আমার ওপর নজর রাখার কারণ কী হতে পারে। তাই আপনাকে বাজিয়ে দেখার জন্যই আমি শেয়ালদা না গিয়ে মানিকতলার মোড়েই নেমে পড়লুম। কাছেই আমার মেজোমাসির বাড়ি। অনেককাল যাওয়া হয় না। প্রকৃতিচর্চা ছেড়ে অগত্যা মাসির বাড়িতেই এ-বেলাটা কাটিয়ে দেব বলে মনস্থিরও করে ফেললুম। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেখলুম আপনিও ঠিক ওই স্টপেই নেমে পড়েছেন এবং দিব্যি আমার পিছু পিছু আসছেন।

আপনার কি মনে হয় যে মানিকতলায় আমারও কেউ থাকতে নেই? বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, ওই মানিকতলায় আমার জ্যেঠতুতো ভাই পরেশের বাড়ি। পরেশ বেশ নামকরা লোক, কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। সমাজসেবা-টেবা করে। শোনা যাচ্ছে সামনের ইলেকশনে এম এল এ হওয়ার জন্যও ভোটে দাঁড়াবে।

খুব ভালো কথা। ফ্যামিলিতে একজন পলিটিক্যাল লোক থাকা খুব ভালো। বিপদে-আপদে খুব কাজ দেয়।

তা যা বলেছেন। আজকাল পলিটিক্স ছাড়া বেঁচে থাকাই শক্ত।

দুঃখের বিষয় কী জানেন? আমার কোনো পলিটিক্যাল দাদা বা ভাই নেই। পলিটিক্যাল মুরুব্বি না থাকায় আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে নানা ধরনের ইনসিকিউরিটিতে ভুগতে হয়। খুঁটির জোর না থাকার ফলে আমরা কোনো সাহসের কাজই করতে পারি না।

খুবই ঠিক কথা। আজকাল সাহসের কাজ না করাই ভালো। অন্যায়ের প্রতিবাদ বা অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এসব করতে গেলে উলটো বিপত্তি হতে পারে।

হ্যাঁ। তা শেষ পর্যন্ত আপনি তো আপনার ভাই পরেশবাবুর বাড়িতে যাননি।

কে বলল যাইনি?

আমিই বলছি। আজ মাসির বাড়িতেই একটা বেলা কাটিয়ে দেব বলেই স্থির ছিল। মাসিও আমাকে দেখে বেজায় খুশি। দুপুরে না খাইয়ে ছাড়বে না কিছুতেই। কিন্তু কিছুক্ষণ বসার পরই আমার কেমন উশখুশ শুরু হল।

কেবলই মনে হতে লাগল, লোকটা যে আমাকে ফলো করেছিল সে কী রাস্তায় এখনও ওত পেতে আছে? তিনতলার জানালা দিয়ে চেয়ে অবশ্য রাস্তায় আপনাকে দেখতে পাইনি।

আপনার মাসির বাড়ির নম্বরটা বলুন তো?

তিনের সি।

পরেশের বাড়ি তিনের সি বাই ওয়ান। পাশেই। আপনার মেসোমশাইয়ের নাম কি বিপুলকান্তি সেন?

ও বাবা! আপনি যে অনেক খবর রাখেন মশাই?

বিপুল সেন মস্ত অ্যাডভোকেট। পরেশের সঙ্গে খুব দহরম-মহরম।

পরেশ গুপ্তর নাম অবশ্য আমি শুনিনি। তবে আপনার কথা সত্যি হলেও অবাক হওয়ার ঘটনাও অস্বীকার করা যাচ্ছে না। মাসির সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। সুখ-দুঃখের কথাও মাসির অনেক জমে আছে। কিন্তু উদবেগ আর উশখুশনির চোটে আমার দু-দন্ড বসে থাকার জো রইল না। কেবলই মনে হতে লাগল, লোকটা এখনও নিশ্চয়ই আমার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছে। মাসি পর্যন্ত আমার অস্বস্তি লক্ষ করে বলে উঠল, কী হয়েছে তোর? অমন ছটফট করছিস কেন? কথাটা ভেঙে মাসিকে বলতেও পারি না, মাসি নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেবে। আমার মতো একজন অপদার্থর পিছু নিয়ে সময় নষ্ট করার মতো আহাম্মক কে আছে বলুন। তাই সামান্য কিছুক্ষণ বসে দুপুরের খাবার না খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

দুপুরে না খাওয়াটা আপনার আহাম্মকিই হয়েছে। নিশ্চয়ই মাসি আজ ভালোমন্দ রেঁধেছিলেন। বিপুল সেনের অনেক টাকা, রোজই ভালোমন্দ খায় নিশ্চয়ই।

তা কথাটা আপনি খারাপ বলেননি। মাসির রান্নার লোকটি খুবই উঁচু জাতের।

বামুন নাকি?

আরে না, সেই জাতের কথা বলিনি। বলছি হাইগ্রেড রাঁধুনি। চাইনিজ, মোগলাই সব রাঁধতে জানে। আজ তো শুনলুম গুলাবি বিরিয়ানি আর রেশমি কাবাব রান্না হয়েছিল। তা বলে ভাববেন না ওরা রোজ এরকম রিচ খাবার খায়। আজ মাসির বেয়াইবাড়ি থেকে কারা যেন আসবে। সেইজন্যেই ওসব স্পেশাল ডিশ।

একটু টেস্ট করে আসতেও পারতেন।

টেস্ট কী মশাই। সত্যি কথা বলতে কী, পৃথিবীতে একটা জিনিসই আমি সত্যিকারের ভালোবাসি আর তা হল খাওয়া। ভালো খাবারের প্রতি আমার আকর্ষণ দুর্নিবার। সুতরাং মাসির বাড়িতে আজ আমার পাত পেড়ে আকণ্ঠ খাওয়ার কথা। কিন্তু তাতে বাধ সেধেছেন আপনি। কে আমাকে ফলো করছে, কেন ফলো করছে সেই দুশ্চিন্তায় আমার অ্যাপেটাইট-টাই আজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শেষ অবধি এক কাপ কফি কোনোরকমে

খেয়ে বেরিয়ে এলাম। মাসি অবশ্য খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হল। হওয়ারই কথা। আমার মা-মাসিরা তিন বোন। একমাত্র আমার মা ছাড়া কারুরই ছেলে নেই। দুই মাসিরই দুটি করে মেয়ে। ফলে আমি তাদের খুবই আদরের বোনপো।

আপনারা তো বোধ হয় দুই ভাই-বোন, তাই না?

আশ্চর্য তো! আপনি কী করে জানলেন?

জানি না তো! আন্দাজে বললাম। আপনি বোধ হয় আমার 'বোধ হয়' কথাটা লক্ষ করেননি!

করেছি। আপনি বলেছেন, আপনারা বোধ হয় দুই ভাই-বোন, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাই বলেছি। অনুমানের ওপর নির্ভর করে।

অদ্ভুত আপনার অনুমানশক্তি। অবশ্য যদি সেটা সত্যিই অনুমান হয়ে থাকে। আমার মন বলছে আপনি আমার বিষয়ে সব খোঁজখবরই রাখেন।

আরে না না। আপনি সন্দেহবাতিকে ভুগছেন। এই তো একটু আগেই আপনি বললেন পরেশ গুপ্তের নাম আপনি শোনেননি। যদি তা নাই-ই হয় শুনবেন তাহলে পরেশ যে গুপ্ত তা কী করে জানলেন বলুন তো! আমি আপনাকে পরেশের নামটা বললেও পদবিটা কিন্তু বলিনি। পরেশ যে গুপ্ত তা তো আপনার জানার কথাই নয়।

বলেছি নাকি?

হ্যাঁ, বলেছেন।

তাহলে না জেনেই আন্দাজে বলেছি।

আমিও তো সেটাই বলতে চাইছি। আন্দাজে বলা অনেক কথা মিলে যায়।

আপনি খুব বুদ্ধিমান লোক, আর সেটাই ভয়ের কথা।

আপনার রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে।

সেটা হওয়াই বরং ভালো। সর্পতে রজ্জুভ্রম হওয়া যে আরও মারাত্মক।

আপনার বিচলিত হওয়ার মতো কিছুই তো হয়নি!

সেটা আপনিই বলতে পারেন বটে, কিন্তু আমার সিচুয়েশনে পড়লে বিচলিত না হয়ে আপনারও উপায় থাকত না। কারণ মাসির বাড়ি থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে আমি আপনাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার তালে ছিলুম। কিন্তু হঠাৎ দেখলুম আপনি মোড়ের পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একজন মোটাসোটা লোকের সঙ্গে কথা কইছেন এবং আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। এমনকী সঙ্গের লোকটাকে ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিলেন বলেও আমার মনে হল। কারণ লোকটাও হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল।

আহা, ওই তো পরেশ। ব্যাপারটা হয়েছিল কী, পরেশের বাড়িতে আমার একটু কাজ ছিল। সেটা সেরে বেরোতে যাব, পরেশ বলল, চলো দাদা, তোমাকে মোড় অবধি এগিয়ে দিই, কয়েক খিলি পানও কিনতে হবে। আমার আবার শিবুর পান ছাড়া চলে না। তা তাই পরেশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু কথা কইছিলুম। খারাপ কথাও কিছু নয়। বাগবাজারের এক গলির মধ্যে আমার পৈতৃক বাড়ি। তিনতলা বেশ বড়ো বাড়িই। তা পুরোনো বাড়ি ভেঙে বহুতল করার একটা কথা চলছে। কিন্তু বাদ সাধছে কর্পোরেশন। তারা বলছে ওই সংকীর্ণ গলির মধ্যে বহুতলের পারমিশন দেওয়া অসম্ভব। তা সেসব নিয়েই পরেশের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বলতে কী আপনাকে আমি লক্ষই করিনি।

লক্ষ করেছেন কিনা তা জানি না। তবে তাকিয়েছিলেন।

তা ওরকম তো আমরা কতই তাকাই। তাকানো মানেই কী আর দেখা! সবকিছুর দিকেই তাকাচ্ছি অথচ কিছুই দেখছি না, এমন অবস্থা আপনার কি কখনো হয় না?

তা হবে না কেন? সবসময়েই হয়। ভুলোমনের মানুষদের তো আরও বেশি করেই হয়। তবু আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল আপনি তাকাচ্ছেন এবং দেখছেনও। তাই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বড়ো রাস্তায় এসে দক্ষিণের একটা বাসে উঠে পড়ি।

আপনি এরপর কী বলবেন আমি জানি। আপনি বলবেন যে ওই বাসে আমিও সওয়ার হয়েছিলাম, তাই তো?

যদি অন্তর্যামী না হয়ে থাকেন তবে তা-ই। হাসছেন যে!

হাসছি কী আর সাধে? কাকতালীয় আর কাকে বলে! আমারও যে আজ দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে আমার বড়ো মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। তার শাশুড়ির অসুখ। যাব যাচ্ছি করে আর যাওয়া হয়ে উঠছিল না। আজ গিন্নি একেবারে মাথার দিব্যি দিয়ে বললেন, না যাওয়াটা খুবই দৃষ্টিকটু হচ্ছে। আমাদের কিছু হলেই ওরা এসে দেখাসাক্ষাৎ করে যান।

'কাকতালীয়' কথাটার অর্থ আমি কিন্তু সঠিক জানি না। 'কাক' আর 'তাল' মিলিয়ে শব্দটা যা দাঁড়ায় তার কোনো মানে হয় কি?

সত্যি কথা বললে বলতে হয়, আমিও জানি না। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি তাই বলি। বাংলা ভাষাটা যাচ্ছেতাই। বরং ইংরিজি শব্দগুলো একটু বোঝাটোঝা যায়। তা আপনি তো ইংরিজির এম এ, 'কাকতালীয়' কথাটার ইংরেজি কী হবে বলুন তো!

স্ট্রেঞ্জ কোইনসিডেন্স।

বা! এই তো বেশ বোঝা গেল। স্ট্রেঞ্জ কোইনসিডেন্স!

না, মশাই, বোঝা গেল না। বরং আরও ঘোরালো হল।

কেন বলুন তো?

আমি যে ইংরিজির এম এ তা আপনি কী করে জানলেন?

মোটেই জানি না মশাই, আন্দাজে একটা ঢিল ছুড়লাম। লেগে গেল।

বটে! আন্দাজে ঢিল ছুড়তে থাকলে এক-আধটা লাগতে পারে, সবক-টা লাগে কী?

তাহলে মশাই, কথাটা আপনাকে ভেঙেই বলি।

আজ্ঞে, আমি তো তার জন্যই অপেক্ষা করছি।

আসলে কারও কোয়ালিফিকেশন বা বেতন কিংবা জাত জিগ্যেস করাটা ঘোর অভদ্রতা। তাই আমি কারও বেতন জানবার দরকার হলে তাকে গিয়ে বলি, আরে রামবাবু আপনি তো মাসে চল্লিশ হাজার টাকা বেতন পান, তাহলে বারো টাকার বেগুন কিনতে পিছোচ্ছেন কেন। তখন রামবাবু বলে উঠলেন, কে বলল চল্লিশ? আমার বেতন মোটে বাইশ হাজার সাতশো টাকা। কিংবা কারও জাত জানবার দরকার হলে তাকে গিয়ে বললাম, ওঃ, আপনারা বামুনরাই দেশটার সর্বনাশ করলেন মশাই। তাতে লোকটা একটু তেড়িয়া হয়ে বলল, মোটেই আমি বামুন নই, আমরা বদ্যি। তেমনি কারও কোয়ালিফিকেশন জানার দরকার হলেই আমি তাকে বলি, আরে, আপনি তো ইংরিজির এম এ, বলুন দেখি এই শব্দটার ইংরিজি কী হবে। খুবই প্রাচীন এবং বহু ব্যবহৃত কৌশল। কাজও ভালো দেয়। আচ্ছা, আপনি কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন?

ফেলিনি। আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো কিছু ঘটেছে কি?

ঘটেছে।

কী বলুন তো?

আমার বেতন চল্লিশ হাজার, আমি বদ্যি এবং ইংরিজির এম এ।

বলেন কী মশাই? এঃ, আজ তো দেখছি আমার লটারি মারার দিন ছিল। কেন যে একটা রয়াল ভুটানের টিকিট কেটে রাখিনি!

আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকেরা লটারির টিকিট কেটে পয়সা রোজগার করার স্বপ্ন দেখে না। লটারির টিকিট কাটে বোকারা। আপনার মতো লোকেরা বুদ্ধি খাটিয়ে লটারির চেয়ে অনেক বেশি টাকা কামাতে পারে।

কেন যে আমাকে লজ্জায় ফেলছেন জানি না। কয়েকটা কাকতালীয় ব্যাপার থেকে এতটা ধরে নেওয়া কি ঠিক?

তা কাকতালীয় ব্যাপারগুলো আজ এমন হিসেব করে ঘটছিল যে ঘটনাগুলোকে নিতান্তই বেহায়া এবং বেশরম বলতে হয়। বাসটা যখন ল্যান্সডাউন দিয়ে যাচ্ছে তখন আমি দুশ্চিন্তায় রীতিমতো ঘামছি। আপনার হাত এড়ানোর জন্য আমি অগত্যা আচমকাই একটা স্টপে নেমে পড়লাম।

বুঝেছি! বুঝেছি! ওই ন্যাপার দোকানের সামনে তো! দেখুন যোগাযোগ আর কাকে বলে! মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছি অথচ খালি হাতে। গিন্নি পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, ওগো বেয়াই বাড়িতে খালি হাতে যেয়ো না কিন্তু, ভালো দোকান থেকে একশো টাকার ভালো মিষ্টি নিয়ে যেয়ো। কথাটা একদম খেয়াল ছিল না। মনে পড়তেই ওই ন্যাপার দোকানের স্টপে নেমে পড়লাম।

হ্যাঁ, সেখানে একটা বড়ো মিষ্টির দোকান ছিল বটে।

থাকতেই হবে, নইলে নামব কেন?

কিন্তু মশাই, নেমে আপনি তো দাঁড়িয়ে দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে লাগলেন, মিষ্টি তো কিনলেন না।

বলিনি বুঝি আপনাকে? আমারও দেখছি আপনার হাওয়া লেগেছে। জরুরি কথা বেমালুম ভুলে যাই। আসলে সমস্যা হল, আমার বেয়াইমশাই হলেন ব্লাড সুগারের রুগি। চারশোর নীচে সুগার মোটে নামেই না। কিন্তু মিষ্টি খাওয়ার এমনই লোভ যে ঠাকুরের বাতাসা অবধি চুরি করে খান। তাই সে বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বাস থেকে নেমেই কথাটা মনে পড়ে গেল বলে আমি মিষ্টি কিনিনি।

ব্লাড সুগার খুবই খারাপ জিনিস। আমার বাবারও সম্প্রতি ধরা পড়েছে এবং তাঁরও খুব মিষ্টি খাওয়ার ঝোঁক।

তাহলেই বুঝুন, এক বর্ণ মিথ্যে বলিনি।

আপনি বলেনও ভারি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছেও করে।

তাই তো বলছি। সত্যি কথার একটা আলাদা জোর আছে। বিশ্বাস না করেই পারা যায় না।

আপনার বড়ো মেয়ের শ্বশুরবাড়িটা কোথায় যেন?

সাউথে।

সাউথ তো বিরাট জায়গা। বেহালা, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, কসবা। শুধু সাউথ বললে কিছুই বোঝা যায় না।

কথাটা আপনি খারাপ বলেননি। সাউথ কথাটা ভারি গোলমেলে। আজকাল তো সোনারপুর-টুরও শুনি সাউথের মধ্যে চলে এসেছে। কলকাতা শহরের পরিধি যে শেষ অবধি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেইটেই বোঝা যাচ্ছে না। বাসন্তী, গোসাবা, সবই না শেষে কলকাতার মধ্যে চলে আসে।

খুব ঠিক কথা। সাউথ ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে। নর্থও হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। মধ্যমগ্রাম, বিরাটি, বারাসাত, রাজারহাট ছাড়িয়ে সেও ধাওয়া করছে উত্তর চব্বিশ পরগনা গ্রাস করে নিতে।

আপনি তো ছোকরা মানুষ। আমরা একটু বয়স্করা তো দেখেছি। ওই যে আপনাদের ঝাঁ-চকচকে সল্টলেক সিটি, একসময়ে কী অখদ্যে জায়গাই না ছিল। সাপ-গোসাপের আড্ডা, জলা, ভেড়ি। আমরা তো বলতাম বাদা অঞ্চল। এখনও সেখানে মাঝে মাঝে সাপখোপ বেরোয়।

শেয়ালের ডাকও শোনা যায়।

আগে এই লেকেই কত শেয়াল ছিল। আমাদের আমলের কথা বলছি।

আপনার বয়স কত?

সাতান্ন।

প্লাস?

ওসব প্লাস-মাইনাস ঠিক বুঝতে পারি না। গত শ্রাবণে সাতান্ন কমপ্লিট করেছি। সার্টিফিকেটে অবশ্য দু-বছর কমানো আছে।

আপনাদের আমলে বয়স কমানোর একটা ব্যাড হ্যাবিট ছিল, তাই না?

হ্যাঁ, তা ছিল। ছেলে যাতে বেশিদিন চাকরি করতে পারে। মেয়ে যাতে বুড়ি হলেও ছুঁড়ি থাকে তার জন্যই বয়স কমানো হত।

ব্যাপারটা কিন্তু মিথ্যাচার।

তা তো বটেই।

তবু আপনারা যাঁরা বয়স্ক তাঁরা নিজেদের আমলের পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন।

ও হল নস্টালজিয়া। আপনিও বয়স হলে এই আমলের প্রশংসা করবেন।

বয়স তো আমার কিছু কম হল না!

তাই নাকি? আমার হিসেবমতো আপনার বয়স উনত্রিশ বছর দু-মাস হতে পারে।

কত বললেন?

উনত্রিশ বছর দু-মাস। খুব আন্দাজেই বলছি।

দাঁড়ান মশাই, হিসেব করে দেখি। আমারও তো অত অ্যাকিউরেট হিসেব করা নেই কিনা। দাঁড়ান। জাস্ট এ মিনিট।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সময় নিন না। এখনও বেশি রাত হয়নি। মোটে তো আটটা বাজে।

আপনাকে কিন্তু পুলিশে দেওয়া উচিত।

কেন মশাই, কী করলাম?

আমার বয়স সত্যিই উনত্রিশ বছর দু-মাস। কিন্তু আপনি সেটা কী করে জানলেন?

জানার প্রশ্ন উঠছে না। চেহারা দেখেই বয়স অনুমান করা যায়।

তা যায়। কিন্তু এতটা অ্যাকিউরেট ক্যালকুলেশন করা যায় না।

তাও যায়। আমার মনে হচ্ছিল আপনার বয়স আঠাশ থেকে ত্রিশের মধ্যেই হবে। তাই একটা মাঝামাঝি রফা করে নিয়ে বলে দিলাম। তা সেটা লেগেও গেল দেখছি। এক-একদিন এরকম হয় মশাই, মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা তৃতীয় নয়ন যা-ই বলুন, বেশ ভালো কাজ করতে থাকে।

ভালো কথা, আপনার বড়োমেয়ের শ্বশুরবাড়িটা কোথায় যেন বলছিলেন?

সাউথে। এখান থেকে কাছেই।

সাউথে এবং এখান থেকে কাছেই—এই কথা দুটোর কোনো অর্থ হয় না।

কেন মশাই, বাংলা কথাই তো।

হ্যাঁ, কিন্তু ও থেকে কিছু বোঝা যায় কি?

আহা, বোঝবার দরকারটাই বা কী? আমার বড়োমেয়ের শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আমাদের তো কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না।

হবে। কারণ, আপনি সেখানেই যাবেন বলে বেরিয়ে শেষ অবধি সেখানে যাননি। আমার মৌটুসির শ্বশুরবাড়ি বালিগঞ্জেই এবং আমার সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল বটে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, তার চেয়েও একটা জরুরি কাজ আমার আছে।

সেটা কি টালিগঞ্জের মেজোমেয়ে মৌবনের শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া।

আশ্চর্য! অতিআশ্চর্য! বয়সে নিতান্তই আমার ছেলের বয়সি না হলে আমি আপনাকে একটা নমস্কার জানাতাম।

কেন মশাই, আমি তেমন ভালো কাজ তো কিছু করিনি!

করেছেন বই কী! আমার মেজোমেয়ের নাম যে মৌবন সেটা আপনার জানার কথাই নয়। এমনকী আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তার শ্বশুরবাড়ি যে টালিগঞ্জে সেটাই বা আপনি জানলেন কী করে?

জানি না মশাই, আমি কিছুই জানি না। আপনি কী কী অজুহাত দিতে পারেন তা আন্দাজ করতে গিয়ে যা মুখে এসেছে বলে দিয়েছি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা তৃতীয় নয়ন কিছুই আমার নেই।

কিংবা একটু বেশি মাত্রাতেই আছে। আমার মেজোমেয়ের নাম বা তার শ্বশুরবাড়ি কোথায় তা ঠিকঠাক বললেও একটা জায়গায় আপনার ভুল হচ্ছে। আমি কিন্তু বড়োমেয়ের বদলে মেজোমেয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলাম না। আসলে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মহেন্দ্র সিং নামে একটা লোকের কাছে আমি ছ-হাজার টাকা পাই। লোকটা অনেকদিন ধরে ল্যাজে খেলাচ্ছে। গতকালই তাকে তার মোবাইল ফোনে ধরে কিছু হুমকি দেওয়াতে সে টাকাটা আজই দিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে। অধমর্ণদের তো জানেন, যতক্ষণ পারে টাকাটা আটকে রেখে সুদে খাটিয়ে দেয়। তা কথাটা মনে পড়তেই আমি গন্তব্য বদল করে মহেন্দ্র সিং-এর কাছেই যাচ্ছিলাম।

কিন্তু যাননি।

কেন যাইনি তারও গভীর কারণ আছে। মহেন্দ্র সিং ল্যান্সডাউনের একটা গলিতে থাকে। ন্যাপার দোকান থেকে একটুখানি পথ। যাব বলে পা বাড়িয়েই হঠাৎ দেখি মহেন্দ্র, পাশে তার বউ।

আপনি কি চেঁচিয়ে মহেন্দ্র সিংকে ডেকেছিলেন?

আহাম্মক হলে ডাকতাম। মহেন্দ্র সিং-এর গাড়ি এয়ারকণ্ডিশন, জানলার কাচ আঁট করে বন্ধ ছিল।

তারপর?

তারপর আর কী? তারপর অগত্যা কিছুক্ষণ হাঁটা।

হ্যাঁ। আমার পিছু পিছু।

শুধু আপনি কেন, আমার সামনে আরও অনেক লোক হাঁটছিল।

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, এত জরুরি কাজ ফেলে অবশেষে আপনি এই লেক-এর ধারে এসে বসে আছেন কেন? আপনি কি জানেন, আপনার জন্য আজ দুপুরে আমার খাওয়া হয়নি?

আপনি কি আমাকে আজ দুপুরে খেতে দেখেছেন?

না, তা দেখিনি।

আমারও আজ দুপুরে খাওয়া হয়নি। কাছেই সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে একটা ভালো চিনে রেস্তোরাঁ আছে। যাবেন নাকি?

এটা কি আরও একটা ষড়যন্ত্র?

খিদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের কী আছে বলুন। আপনি আমার ওপর একটু ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন, তাই আমার খুব ইচ্ছে করছে আপনাকে কিছু খাওয়াই। চাইনিজ তো আপনি ভালোই বাসেন।

না মশাই, আমার অ্যাপেটাইট নেই। ধন্যবাদ।

প্রেমে পড়লে দু-রকম হতে পারে। কারও খুব খিদে হয়, আবার কারও একদম খিদে থাকে না। দুটোই এক্সট্রিম।

কিন্তু আমি প্রেমে পড়িনি তো!

দেশবন্ধু পার্কে রোজ সকালে যে স্বপ্নের মতো একটা মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার দিকে কি আপনি খুব হতাশ চোখে চেয়ে থাকেন না?

অ্যাঁ!

আহা লজ্জা পাওয়ার কী আছে বলুন তো! আপনি তো আপনার প্রিয় বন্ধুদের বলেইছেন যে ওই স্বপ্নের মতো মেয়েটি এতটাই স্বপ্নের মতো যে, আপনি আজ অবধি তার সঙ্গে ভরসা করে কথাটাও বলে উঠতে

পারেননি। আর যতই তাকে দেখছেন ততই মেয়েটিকে আরও অধরা মনে হচ্ছে। আপনার নাকি ধারণা হয়েছে মেয়েটি রিয়াল নয়।

ইয়ে...দেখুন...এসব...

ঘাবড়ানোর মতো কিছু তো নয়। এরকম তো হতেই পারে। প্রেমে পড়লে অনেক সময় আত্মবিশ্বাস কমে যেতে থাকে। কত কী মনে হয়। মনে হয়, আমি তো কুচ্ছিত, আমি তো আনস্মার্ট, আমি তো ভীতু, আমি তো মোটেই ওর যোগ্য নই, আমাকে নিশ্চয়ই পাত্তা দেবে না। হয় না বলুন!

ইয়ে, মানে আমি...

আহা, আরও একটু ধৈর্য ধরে শুনুন না।

আপনি এসব কী করে...

ওটা কোনো কথা নয়। ঘটনাটা সত্যি কিনা সেটাই আসল কথা। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি?

হ্যাঁ। আসলে ও মেয়েটা সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ নয়।

তাহলে তো চিমটি কেটে দেখতে হয়।

ছি:, কী যে বলেন! কিন্তু আপনি কী করে এসব...?

‘রবার্ট ব্লেক এজেন্সি’র নাম শুনেছেন?

রবার্ট ব্লেক এজেন্সি? না তো! তারা কারা?

একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা।

ও বাবা:, হঠাৎ তাদের কথা কেন?

আপনার সম্পর্কে গত এক মাসে তারাই সব তথ্য সংগ্রহ করেছে।

ও বাবা! কেন?

গূঢ় কারণ আছে যে!

কী কারণ?

ওই মেয়েটিই।

ওই মেয়েটি। কেন, সে কী আমাকে পুলিশে দিতে চায়? কিন্তু শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমি তো আর কোনো অসভ্যতা করিনি। তা ছাড়া, আমি ড্যাবড্যাব করেও তো চেয়ে থাকি না। খুবই বিশুদ্ধ চোখে তাকে আলতোভাবে দেখি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আমি খুব হতাশা নিয়েই চেয়ে থাকি। কারণ, তাকে আমার মর্ত্যের মানবী বলেই মনে হয় না। কিন্তু আমি তাকে কখনো ডিস্টার্ব করিনি।

করেছেন বই কী! ডিস্টার্ব না করলে এত জলঘোলা করার দরকারই হত না।

তাহলে ঠিকই ধরেছিলাম। আপনি পুলিশের লোক।

আমি কথাটা অস্বীকার করছি না।

মেয়েটি কি আমার নামেই অভিযোগ করেছে?

আপনার নামেই।

আর কেউ নয় তো! মানে অনেক দুষ্টু লোক তো থাকে, সুন্দর মেয়েদের পিছনে লাগে। ওরকম কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেনি তো!

না। লম্বা, ফরসা, হ্যাণ্ডসাম, বাঁ-গালে আঁচিল। আপনিই।

বুঝেছি। আমাকে অ্যারেস্ট করার আগে আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি?

পারেন।

আমাকে দয়া করে ইভটিজার হিসেবে অ্যারেস্ট করবেন না। সেটা লজ্জার ব্যাপার হবে। আমাদের পরিবারটি সম্ভ্রান্ত, তাদেরও মান থাকবে না। দয়া করে আমাকে একজন উগ্রপন্থী বা তোলাবাজ বা সাট্টা ডন যা খুশি অভিযোগে গ্রেফতার করুন। ইভটিজারের চেয়ে এসবও বরং ভালো।

তার মানে আপনি ইভটিজিং-এর মতো পেটি ক্রাইমের আসামি হতে চান না। কিন্তু অভিযোগ করলেই তো হবে না। অভিযোগ প্রমাণ হবে কীসে?

আমি অভিযোগ স্বীকার করে নেব।

ও বাবা! আপনি তো ডেনজারাস লোক মশাই।

বিশ্বাস করুন, ইভটিজার হিসেবে আমাকে আদালতে তুললে আমার মা-বাবা আমার আর মুখদর্শন করবে না। মেয়েটা হয়তো আমাকে খানিকটা শাস্তি দিতে চায়। তা যেকোনো অভিযোগে আমি কিছুদিন জেল খাটলেই তো হল! কী বলেন?

কথাটা ভেবে দেখতে হবে।

পুলিশ তো ঘুসটুস খায়, তাই না? এ বাবদে না হয় আমি দু-পাঁচ হাজার টাকা দেব।

বলছেন?

বলছি বলে কিছু মনে করবেন না যেন। খারাপ ভেবে বলিনি। চাইনিজ খেতে চাইছিলেন, চলুন আজ আপনাকে আমিই না হয় খাওয়াচ্ছি।

সেটা কী খুবই খারাপ দেখাবে না? আমি বয়সে বড়ো, সম্পর্কেও বড়ো।

বয়সে বড়ো মানছি। কিন্তু সম্পর্কেও বড়োটা বুঝতে পারলাম না। তা সে না হয় না-ই বা বুঝলাম। চলুন, যাওয়া যাক।

আরে মশাই, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কথাটা আগে খোলসা হোক।

বেশ খোলসা হোক। আপনি কত চান?

সেটা পরে ঠিক করা যাবে। তার আগে আজকের চাইনিজ ডিনারের দামটা কার দেওয়া উচিত সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আমিই দেব।

সেটা যে হয় না।

কেন হয় না?

তাহলে একটু ব্যাকগ্রাউণ্ডটা যে আপনার জানা দরকার।

ওর আর ব্যাকগ্রাউণ্ড কী?

আছে মশাই। ব্যাকগ্রাউণ্ড হচ্ছে ভোরবেলার দেশবন্ধু পার্ক। সেখানে আপনি একখানা বেঞ্চে বসে থাকেন আর সামনে একটা স্বপ্নের মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাই তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি বলছেন মেয়েটাকে আপনি ডিস্টার্ব করেন না।

আজ্ঞে না।

অথচ মেয়েটা বলছে আপনি ওকে রীতিমতো ডিস্টার্ব করছেন।

যে আজ্ঞে।

ডিস্টার্ব করা বলতে আপনি কী বোঝেন?

পিছু নেওয়া, সিটি দেওয়া, ফলো করা, মন্তব্য ছুড়ে দেওয়া। চিঠিচাপাটি পাঠানো। এইসব আর কী।

আরও একরকমভাবে ডিস্টার্ব করা সম্ভব।

সেটা কীভাবে?

আপনি এক্সটারনালি মেয়েটিকে ডিস্টার্ব করেননি ঠিকই। কিন্তু ইন্টারন্যালি হয়তো করেছেন। হয়তো নয়, করেছেনই।

আজ্ঞে না।

কী করে বুঝলেন করেননি? আপনি কি মেয়েটির মনের ভেতরটা দেখেছেন?

আরে না। মেয়েটা তো আমাকে কখনো লক্ষই করেনি। যে আমাকে লক্ষই করেনি তাকে আমার পক্ষে মানসিক উৎপীড়ন করা কি সম্ভব?

সম্ভব।

কীভাবে?

উৎপীড়ন না বলে যদি নাড়া দেওয়া বলি তাহলে কেমন হয়?

নাড়া দেওয়া! এ কথাটার অর্থ কি আলাদা হয়ে যাচ্ছে না?

তা যাক না। ধরুন সেটাই হয়েছে।

একটু বুঝিয়ে বলুন।

খুব সাদামাটা কথায় বললে বলতে হয় পারিজাতবাবু, আপনি যেমন আড়চোখে মেয়েটিকে লক্ষ করেছেন তেমনভাবে মেয়েটিও আপনাকে লক্ষ করেছে। এবং সে একটু নাড়া খেয়েছে। এবং তারও মনে হয়েছে তার স্বপ্নের পুরুষটি রোজ সকালে নিতান্ত ভদ্র এবং কাপুরুষ বলে কখনো মেয়েটিকে হৃদয়ের কথা জানাতে পারেনি। অগত্যা মেয়েটি তার ছোটোকাকার শরণাপন্ন হয়। ছোটোকাকা ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার। সে ওই রবার্ট ব্লেক এজেন্সিতে ছেলেটি সম্পর্কে খোঁজখবর সংগ্রহ করতে লাগায়। সংগৃহীত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, পারিজাত সেনগুপ্ত মেধাবী, কৃতবিদ্য, লম্বা বেতন, সম্ভ্রান্ত পরিবারওলা ছেলে। কাপুরুষ সন্দেহ নেই। কিন্তু বরণীয়। আপনার চোখ ছলছল করছে কেন?

বিশ্বাস হচ্ছে না।

আপনি আজ সকাল থেকে আগাগোড়াই আমাকে অবিশ্বাস করে আসছেন।

এখনও করছি। তবে ডিনারের বিলটা আপনি দিলে আমি আপত্তি করব না।

তাহলে চলুন, ওঠা যাক। এখন খিদে পাচ্ছে তো?

হ্যাঁ, এখন বেশ খিদে হয়েছে ছোটোকাকা।

প্রিয় মধুবন

মাথা অনেক শূন্য লাগছে আজকাল। অনেক বেশি শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর। মাঝে মাঝে শুধু একটি কি দু-টি শালিক কী চড়াইয়ের আনাগোনা। এরকম ভালো। এরকম থাকা ভালো। আমি জানি।

কালকেও আমার কাছে একখানা বেনামি চিঠি এসেছে। তাতে লেখা 'বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে!' লাল কালিতে লেখা চিঠি। নাম সই নেই, তবু আমি হাতের লেখা চিনি। লিখেছে কুণাল মিত্র। আমার বন্ধু। এখন বোধ হয় ফেরারি। প্রায় দশ বছর তার খোঁজ জানি না।

আমাদের ডাকঘরগুলির কাজে বড়ো হেলাফেলা। চিঠির ওপর ঠিকঠাক মোহরের ছাপ পড়েনি। আমি কাল সারাদিন আতশকাচ নিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম। না, কোথা থেকে যে চিঠিটা ডাকে দেওয়া হয়েছে তা পড়াই গেল না। জানি যেখান থেকেই দেওয়া হোক ডাকে, কুণাল আর সেখানে নেই। সে সরে গেছে অন্য জায়গায়। রমতা-যোগীর মতো ফিরছে কুনাল, কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাচ্ছে! তবু বড়ো ইচ্ছে করছিল কুণাল কোথায় আছে তা জানতে।

কাল বিকেলের দিকে আলো কমে এলে আমি আতশকাচ নামিয়ে রাখলাম। মাথা ধরে গিয়েছিল সারাদিন আতশকাচের ব্যবহারে। তাই চোখ ঢেকে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। ভুল হয়েছিল। সে তো ঠিক চোখ-ঢাকা নয়! টের পেলাম দু-টি হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে গড়িয়ে নামছে চোখের জল।

বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে! এ আমারই কথা। কুণাল কেবল কথাটা ফিরিয়ে দিয়েছে। যেন ও কথার আড়ালে উঁকি মারছে তার সকৌতুক দয়াহীন মুখ— রাস্তা তুমিই দেখিয়েছিলে, ঘর থেকে বের করে এনেছিলে তুমিই। তারপর সরে গেছ কোথায়! এখন কার এঁটো চেটে বেড়াচ্ছ মধুবন? তোমার ঘেন্না করে না?

চমৎকার এইসব শব্দভেদী বাণ কুণালের। মেঘের আড়াল থেকে লড়াই। প্রতিদিন পালটে যাচ্ছে তার ঠিকানা। আর আমি মধুবন—আমি বাঁধা পড়েছি স্থায়ী ঠিকানায়। কুণাল হয়ে গেছে ছায়া কিংবা মায়া। আমি এখন কোথায় পাব তাকে? এ চিঠির তাই জবাব দেওয়ার দায় নেই।

কাল সন্ধেবেলায় আমি ঘরের আলো জ্বালিনি। কুণালের চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। আমার বুকের মধ্যে টিকটিকির বাসা। ঘর ছাড়ার কথা মনে হলেই সে ডাক দেয় টিকটিক টিকটিক। যেয়ো না। যাব না যে তা আমি জানি। তবু চোখের জলে আমার দু-হাতের আঙুল ভিজে গিয়েছিল। নিজের জন্য নয়, আমি কুণালের জন্য কেঁদেছিলাম। তারপর ফাঁকা একখানা ঘরের মতোই শূন্য হয়ে গেল মাথা। মাঝে মাঝে একটি, দু-টি শালিক কি চড়ুইয়ের মতো ভাবনা ও স্মৃতি আনাগোনা করে গেল।

অনেকক্ষণ আমার বাইরের কোনো জ্ঞান ছিল না। তারপর আমার বউ সোনা আমায় ডাকল, 'রাজা, একটু এ-ঘরে এসো।'

গিয়ে দেখি সে কাপড় পালটাচ্ছে। বলল, 'দেখো, আমি তোমাকে সারাদিন একটুও জ্বালাইনি। তবু এখন জিজ্ঞেস করছি ও চিঠিটা কার? সারাদিন তুমি ওটা নিয়ে বসে আছ।'

আমি চিঠিটা এনে তার হাতে দিলাম।

ও দেখল। তারপর অবহেলায় চিঠিটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, 'দেখো কী বিচ্ছিরি ব্লাউজ পরেছি। পিছনদিকে বোতাম ঘর। কিছুতেই আটকাতে পারছি না, তুমি একটু বোতাম এঁটে দাও না।'

তখন সোনার সাজ আমি লক্ষ করলাম। কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা একটা ব্লাউজ পরেছে সে, গলায় আর হাতে খুব পাতলা লেস-এর ফ্রিল দেওয়া। ব্লাউজটা আরও অনেকদিন ওকে পরতে দেখেছি। কোনোদিনই বোতাম এঁটে দেওয়ার জন্য আমার ডাক পড়েনি। তাই মৃদু হেসে আমি ওর পিঠের দিকে বোতাম আর হুকগুলো লাগিয়ে দিলাম।

ও আস্তে করে বলল, 'ইস, কী ঠাণ্ডা হাত!'

'ঠাণ্ডা! আমি অবাক হয়ে বললাম, কই!' বলে হাত দুটো ওর গালে রাখলাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোনা বলল, 'না, সে ঠাণ্ডা নয়! নিস্পৃহতার কথা বলছিলাম।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সোনা ধীরে ধীরে আঁচল তুলে নিচ্ছিল শরীরে। হঠাৎ মুখ এগিয়ে বলল, 'আদর!'

তক্ষুনি কুণালের চিঠিটার কথা একদম ভুল হয়ে গেল।

সোনার ব্লাউজের বোতাম আর হুকগুলো আর একবার লাগিয়ে দিতে হল আমাকে।

তারপর সোনা টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে বলল, 'লাল কালিতে লেখা এই দেড় লাইনের চিঠিটা নিয়ে এখন আমরা কী করব? বাঁধিয়ে রাখব?'

হেসে বললাম, 'ঠাট্টাটা আমাকেই লাগল, সোনা। চিঠির ওকথাগুলো একদিন আমিই বলতাম। বহুদিন পর অনেক খুঁজে খুঁজে আমার কাছে ফিরে এসেছে আমারই কথা।'

ও ভ্রূ কুঁচকে চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এটা কি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য?'

'না, না!' আমি মাথা নেড়ে হেসে উঠি, 'ওটা এমনিই, ঠাট্টার ছলেই আমার কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া।'

সামান্য দ্বিধা করে সোনা বলল, 'চিঠিটার নাম-সই নেই। তবু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি একে জানো। কে?'

একটু ভেবে বললাম, 'ও বোধ হয় আমারই এক সত্তা। অতীত থেকে লিখে পাঠাচ্ছে।'

'কবিতা!' সোনা হেসে ফেলল, 'এ তো কবিতা হয়ে গেল, রাজা।' হাসি থামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তো তোমার কাছে শুনেছিলাম যে আমি তোমার এক সত্তা। তোমার এরকম আর ক-টা সত্তা আছে, রাজা?'

হিংসুক। সোনা ভীষণ হিংসুক। ঘরে ওর রাজতন্ত্র। আমি ওর রাজা। ওকে এখন কিছুতেই বোঝানো যায় না যে, একদিন আমি কুণালের ছিলাম প্রিয় মধুবন।

না, কুণালের প্রিয় মধুবন হওয়ার জন্য আর একটির পিছু-হাঁটার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার। এখন আমি বেশ আছি। ফাঁকা, খোলামেলা শান্ত একটি ঘরের মতো শূন্য মাথা। মাঝে মাঝে এক-আধটা শালিক কি চড়ুইয়ের আনাগোনা। এক-আধটা ভাবনা, এক-আধখানা স্মৃতি। তার চেয়ে বেশি কী দরকার? এখন আমার আলো বাতাস ভালো লাগে, ছুটির দিন ভালো লাগে, অবসর আমার বড়ো প্রিয়। আমার প্রিয় সেলাইকলের আওয়াজ, আমার শিশু-ছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। আর বুকের মধ্যে সেই টিকটিকির ডাক। যেয়ো না। যেয়ো না।

তবু মাঝে মাঝে যখন ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় চলি তখন হঠাৎ বড়ো দিশেহারা লাগে। কিংবা যখন মাঝরাতে হঠাৎ কখনো ঘুম ভেঙে যায় তখন লক্ষ করে দেখি পাথর হয়ে জমে আছে আমার অনেক আক্ষেপ। আয়নায় নিজের মুখ দেখে কখনো চমকে উঠি। মনে কয়েকটা কথা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কোনো অলীক শূন্য থেকে এসে পড়ে। তুমি যে এসেছিলে কেউ তো জানলই না। হায়, মধুবন।

সত্য বটে এসবই আবেগের কথা। নইলে আমার মনে স্পষ্ট কোনো আক্ষেপ নেই। না আছে পিছু-হাঁটার টান। খুব একটা স্মৃতিচারণও নেই আমার। মাঝে মাঝে সোনা যখন আমাদের ছেলেটাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যায়, বা বাপের বাড়িতে থেকে আসে একটি-দুটি দিন, তখন কখনো-সখনো সন্ধেবেলায় বা রাত্রে আমি ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। একটি-দুটি কথা অন্ধকারে মশা ওড়ার শব্দের মতো অন্ধকারে গুনগুন করে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাচ্চা ছেলেটার কান্নার শব্দ মনে মনে ডেকে আনি, সোনার গলার স্বরের জন্য নিস্তব্ধতার কাছে কান পেতে রাখি। আস্তে আস্তে সব আবার ঠিক হয়ে যায়। যদি কখনো হঠাৎ মনে হয় যে, এরকম শান্ত জীবন হওয়ার কথা ছিল আমার, আরও দূরতর, ভিন্ন অনিশ্চয় এক জীবন আমার হতে পারত, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি হাতের কাছে যা পাই—হয়তো ওষুধের শিশি, ফাউন্টেন-পেন কিংবা অন্য কিছু না পেলে হাতের আংটির পাথরের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মনকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসি। অতীত এবং ভবিষ্যৎ থেকে ফিরিয়ে নিই আমার মুখ। আস্তে আস্তে বলি, এরকমই ভালো। এরকম থাকাই আমাদের ভালো। তখন মাথা অনেক শূন্য লাগে। অনেক বেশি শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকাঘর।

অনেকদিন আগে কুণালের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হওয়ার কিছু পরে ওইরকম লাল কালিতে লেখা বেনামি আর একখানা চিঠি এসেছিল আমার সঠিক ঠিকানায়। তাতে লেখা, 'জীবনে সৎ হওয়াই সব হওয়া নয়! আদর্শই সব! আদর্শ না থাকলে পুরোপুরি সৎ হওয়াও যায় না।' প্রতিটি বাক্যের পর একটি করে বিস্ময়ের চিহ্ন। আসলে ওগুলো সকথিত জিজ্ঞাসা। ছুঁচের মুখের মতো ওই চিহ্নগুলোআমাকে বিঁধেছিল। আমারই বলা কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া। সেই তার প্রথম বেনামা চিঠি। তারপর আমার বিয়ের কিছু পরে আরও একখানা। এইরকম 'বৃষ্টি হলেই মিছিল ভেঙে যাবে! দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে গাছতলায় মাথা বাঁচাতে।' কী জানি সে গাছতলায় বলতে এ ক্ষেত্রে ছাদনাতলায় বুঝিয়েছিল কিনা। চিঠিটা আমি সোনাকে দেখাইনি। শুধু মনে মনে বুঝতে পেরেছিলাম, সে আমার সব খবর রাখে, হদিশ রাখে সঠিক ঠিকানার। সে আমাকে ভোলেনি। সামান্য ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। কী জানি, আমি তাকে আরও কত কী শিখিয়েছিলাম। সে যদি সব মনে রেখে থাকে। তারপর ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম যে তা নয়। এ তার আমাকে নিয়ে খেলা। আসলে পুরোনো পুতুলের মতো ভেঙে সে আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তার জীবন থেকে। মাঝে মাঝে সে কেবল দূর থেকে আমাকে ওইভাবে স্পর্শ করে দেখতে চায় আমি কতটা চমকে উঠি।

বলতেই হয় খেলাটা চমৎকার শিখেছে কুণাল। সে খেলতে জানে। গতকাল আমি সামান্য অন্যরকম হয়ে গেলাম। আজ সকালে তাই আমার মুখের দিকে ঘুমচোখে চেয়ে সোনা প্রথম প্রশ্ন করল, 'আজও তুমি ওই ভূতুড়ে চিঠিটার কথা ভাবছ।' চমকে উঠলাম। বস্তুত তা নয়। চিঠিটার কথা আমি ভাবছিলাম না, কুণালের কথাও না।

হেসে বললাম, 'দুর।'

সোনা হাসল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ করে ছেলের কাঁথা বিছানা গুছিয়ে রাখল, মশারি চালি করল, তারপর একসময়ে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'কেন ভোরে উঠে জানলার কাছে বসে আছ। এত সকালে ওঠা বুঝি তোমার অভ্যাস?'

সেকথা ঠিক। ভোরে ওঠা আমার অভ্যেস নয়। কেন যে আজ অত ভোরে ঘুম ভেঙে গেল কে জানে। তারপর আর ঘুম আসছিল না। শীতকাল, তবু লেপের ওম ছেড়ে উঠে গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে এসে আমি

জানলার ধারে বসলাম। খুব কুয়াশা ছিল, জানলার নীচের রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল আবছায়ায় নি:শব্দে নদী বয়ে যাচ্ছে। আর দূরের কলকাতা খুব উঁচু গাছের অরণ্যের মতো জমে আছে হিমে। সিগারেট ধরাতেই একটি-দুটি পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে সেগুলো ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলাম। ঠেকানো গেল না। খুব ভোরে একদিন এক আশ্রমের ঋত্বিককে দেখেছিলাম ডান হাতখানি ওপরে তুলে চোখ বুজে আহ্বানী উচ্চারণ করতে 'তমসার পার অচ্ছেদ্য-বর্ণ মহান পুরুষ, ইষ্টপ্রতীকে আবির্ভূত, যদবিদা চরণে তদুপাসনাতেই ব্রতী হই। জাগ্রত হও, আগমন করো। আমরা যেন একেই অভিগমন করি...।' গান নয়, শুধু টেনে টেনে উচ্চারণ করে যাওয়া। কবেকার কথা। তবু গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা যেন একেই অভিগমন করি। ভোরের শান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে আমার মনে হয়েছিল—হায় মধুবন। হায়! কুণাল!

আমি আমার আংটির মদরঙের গোমেদ পাথরটার দিকে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আবছা অন্ধকারেও পাথরটা চিকমিক করছিল। আমি আস্তে আস্তে আংটির গোমেদ পাথরটায় আমার মনকে স্থির করার চেষ্টা করছিলাম। তখন হঠাৎ—খোলা জানলা দিয়ে যেমন ঘরের মধ্যে উড়ে আসে পোকামাকড়— তেমনি হঠাৎ অনেকদিন আগে শোনা কয়েকটি শব্দ বিদ্যুদবেগে আমার মধ্যে খেলা করে গেল। প্রথমে আমি কিছুক্ষণ ভেবেই পেলাম না এই শব্দগুলি কী, কিংবা কোথা থেকে এল চেনা শব্দ। বড়ো চেনা। কয়েকটি মুহূর্তের পর মনে পড়ে গেল, এ আমার বীজমন্ত্র নাম, কৈশোরে শেখা। এতকাল বীজমন্ত্রের শব্দগুলি নিয়ে মনে মনে খেলা করতে করতে সেই কৈশোরের ধ্যান অভ্যাস করার কথা মনে পড়েছিল। একটা সাদা-কালো চক্রের ছবির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতাম। তারপর চোখ বুজতেই সেই চক্রটা অমনি চলে আসত দুই ভ্রূর মাঝখানে, নাসিকার মূলে যাকে বলা হয় আজ্ঞাচক্র। অনেক শিখেছিলাম আমি। পইতের পর আমাকে শিখতে হয়েছিল পুজো-পাঠ-আহ্নিক। দণ্ডিঘরে কয়েকটা কষ্টের দিন কেটেছিল, যার মধ্যে চুরি করে খেয়েছিলাম রসগোল্লা। মনে পড়ে এক শীতের খুব ভোরে দণ্ডি ভাসাতে যাচ্ছি ব্রহ্মপুত্রে, সঙ্গে জ্ঞাতিভাই তারাপ্রসাদ। হাফপ্যান্ট পরা তারাপ্রসাদ নদীর উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল। আমি তার দিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ঢালু বেয়ে জলের কাছে নেমে গেলাম। আমার পায়ে লেগে একটা মাটির ঢেলা, আস্তে গড়িয়ে গিয়ে টুপ করে জলে ডুবে গেল। বিবর্ণ মেটে রঙের জলে ভেসে যাচ্ছিল আমার গেরুয়া ঝোলা আর লাঠি। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম মাথার ওপর ফিকে নীল আকাশ, আর চারদিকেই মাটির নরম রং। কোথাও এতটুকু আবেগ বা অস্থিরতা নেই। সব শান্ত ও উদাসীন, আর বাতাসে মিশে-থাকা সামান্য কুয়াশার মৃদু নীল আভা। জলে আমাকে ঘিরে ছোটো ছোটো ঢেউ ভাঙার শব্দ। খুব সামান্য স্রোতে ধীরে ধীরে দুলে দুলে ভেসে যাচ্ছে গেরুয়া ঝোলাসুদ্ধ আমার দণ্ডি। খুব দূরে তখনও নয়। বড়ো অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তাকে। যেন ডুবন্ত এক সন্ন্যাসীর গায়ের কাপড় ভেসে যাচ্ছে জলে। মনে হয়েছিল আর দু-এক পা দূরেই রয়েছে জন্ম-মৃত্যু ও জীবনরহস্যের সমাধান। আর মাত্র দু-এক পা দূরে। আমার চারিদিকে বিবর্ণ মাটিরঙের জলস্থল বৈরাগীর হাতের মতো ভিক্ষা চাইছে আমাকে। তার ইচ্ছে হয়েছিল আমার ওই দণ্ডি যতদূর ভেসে যায়, নদীর পাড় ধরে আমি ততদূর হেঁটে যাই। ফিরে গিয়ে কী লাভ? অনেকক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে জলে দাঁড়িয়েছিলাম বলে তারাপ্রসাদ আমাকে জোর করে তুলে এনেছিল। তারপরও বহুদিন আমার সেই ঘোর কাটেনি।

সেই কথা মনে পড়তেই আমি প্রাণপণে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আজ ভোরে। বীজমন্ত্রের যে শব্দগুলি মনে এসেছিল আমি সেগুলো নিয়ে খেলা করছিলাম। আর আমার আংটির গোমেদ পাথরটায় স্থির করার চেষ্টা করছিলাম আমার সমস্ত অনুভূতি। বহুদিন বাদে কৈশোরের সেই ধ্যান করার ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল আমাকে।

কুণাল জানে না তার চেয়ে আমি অনেক বেশি ফেরারি।

অফিসে বেরোনোর সময়ে সোনা মনে করিয়ে দিল আজ 'আমাদের বিয়ের বার্ষিকী। মনে থাকে যেন।'

মনে ছিল না। চার বছর হয়ে গেল। এখন আমার ছত্রিশ, আর সোনা বোধ হয় আঠাশ পেরিয়ে এল। ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির তলা থেকে আমি সোনাকে একটু দেখলাম, আমার দিকেই চেয়ে আছে। হাসলাম। ও হাসল। পরস্পরকে বোঝার চেনা পুরোনো হাসি। রাস্তার রোদে পা দিতেই সরগরম কলকাতার উত্তপ্ত ভিড়ের মধ্যে মন হালকা হয়ে যাচ্ছিল। একটা বেনামি চিঠির জন্য কাল আমার অফিস কামাই গেছে একথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছিল।

মিডলটন স্ট্রিটে আমার অফিস। দরজায় পা দিতেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ো দারোয়ান, রিসেপশন কাউন্টারের চঞ্চল মেয়েটি মৃদু হেসে নড করল, 'মর্নিং স্যার', বলে জুনিয়র একটি অফিসার হলের আর একদিকে চলে গেল। আমি লিফট নিলাম না। অনেকদিন পর একটু হালকা লাগছে আজ। আমি জুতোর শব্দ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে দীর্ঘ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে এলাম আমার চারতলার অফিসে। টাইপিস্টদের ঘর থেকে অবিরাম টাইপ-মেশিনের শব্দ ভেসে আসছে। আমার ছোটো অফিস-ঘরটার বাইরে অপেক্ষা করছে আমার ছোকরা চটপটে স্টেনোগ্রাফার। আমি তার দিকে চেয়ে একটু হেসে ঢুকে গেলাম ঘরে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ ছোট্ট ঘরটা আমার। সবুজ কাচে ঢাকা টেবিল, গভীর গদিওয়ালা চেয়ার আর পেছনে প্রকান্ড কাচের জানলা। দূরে ময়দানের চেনা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কোট খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিয়ে আমি কাচের শার্সি খুলে দিলাম। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে এল। পাতা-পোড়ানো ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ। উদাস রোদ হাওয়া আর মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ আমি আমার অন্তরে গ্রহণ করে নিচ্ছিলাম। বেশ নিশ্চিন্ত জীবন আমার। একটি-দুটি ছোটোখাটো অভাববোধ এবং কখনো-সখনো সামান্য একটু একঘেয়েমি ছাড়া কোনো গোলমাল নেই। আমি সুখী। একটি ছোটো শ্বাস ছেড়ে আমি চেয়ারে ফিরে এলাম।

দুপুরে হঠাৎ এল সোনার টেলিফোন। তার গলার স্বর শুনে চমকে উঠে বললাম, 'কী হয়েছে!'

'কই! কিছু না!' বলে ও হাসল, 'তোমাকে উল আনার কথা বলেছিলাম, রাজা! মনে আছে? মনে করিয়ে দিলাম। তোমার কোটের ডানদিকের পকেটে নমুনা দিয়ে দিয়েছি। চার আউন্স এনো।'

'দুর! আমি পারব না। আবার অফিসের পর দোকানে ছোটাছুটি! তা ছাড়া উলের রং মেলানো বড়ো ঝামেলা।'

'পারবে।' বলে হাসল, 'তুমি না পারলে চলবে কী করে? তুমি ছাড়া আমার কে আছে আর?'

মৃদু হাসলাম। আমাকে পটাতে সোনা ওস্তাদ।

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ বিকেলের কথা মনে আছে তো!' বলেই আবার হাসি, 'বলো তো আজ কী?'

'আজ?' আমি একটু ভাবনার ভান করে বললাম, 'আজ তো খোকনের জন্মদিন!'

'বদমাশ!'

'তাই না?'

'ঠিক আছে। তাই। শুধু সময়ে এসো।'

তারপর একটু চুপচাপ। টের পেলাম ও ফোন তখনও ছাড়েনি। আমিও ছাড়তে দ্বিধা করছিলাম। তখন হঠাৎ ও বলল, 'রাজা, আমার ফোন পেয়ে তুমি চমকে উঠলে কেন?'

সামান্য গোলমালে পড়ে বললাম, 'কই!'

'ভয় পেয়েছিলে?'

'কীসের ভয়!'

ও হাসে, 'কীসের ভয় তার আমি কী জানি! বউ-ছেলে চুরি যাওয়ার ভয় হতে পারে, ঘরে আগুন লাগার ভয় হতে পারে। কত ভয় আছে মানুষের!'

'বদমাশ', বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

সত্য যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। সোনা যেভাবে বলল সেভাবে নয়। তবে অনেকটা ওরকমই অস্পষ্ট একটা ভয়।

বিকেলে আমি অনেক ঘুরে ঘুরে ওর ফরমাশি উল কিনলাম, আর আজকের দিন উপলক্ষ্যে ওর জন্য কিনলাম কালো জমির ওপর হলুদ আর সুরকি রঙের এমব্রয়ডারি করা একটা কার্ডিগান, কিছু ফুল, গোটা দুই বাংলা উপন্যাস। বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পা দিয়েছি, সেসময়ে—কোথাও কিছু ছিল না—তবু হঠাৎ মনে হল যদি এই অবস্থায় কোনোদিন কুণাল আমাকে দেখে! কে জানে বাইরের এত অচেনা লোকজনের মধ্যে সে গা-ঢাকা দিয়ে আমাকে লক্ষ করছে কিনা! সে দেখছে তার প্রিয় মধুবনকে! পরনে স্যুট মধুবনের, উলের প্যাকেট, কাগজে মোড়া বউয়ের কার্ডিগান, হাতে ফুল আর উপন্যাস! কী জানি কেমন অস্বস্তি এল মনে, রজনিগন্ধার ডাঁটিতে আমি অকারণে বোকার মতো আমার মুখ আড়াল করলাম।

পরমুহূর্তেই হেসে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম আমি। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কয়েক পলকের জন্য আমার দুর্বলতা এসেছিল।

সন্ধেবেলায় আমাদের অনুষ্ঠান জমল খুব। আমার অনেককালের বন্ধু অতীশ এসেছিল তার বউকে নিয়ে, আরও দু-একজন বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন। যখন সবাই চলে যাচ্ছে তখন সিঁড়ির গোড়ায় অতীশ আমাকে আলাদা ডেকে নিল, 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার রে? শুনলাম তোর কাছে বেনামা একটা চিঠি এসেছে?'

মাথা নাড়লাম—হ্যাঁ। বললাম, 'কে বলল?'

'তোর বউ।' ও হাসল, 'ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছিল কাল থেকে তুই নাকি কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস। কেঁদেছিস।'

হাসলাম, 'দুর।'

অতীশ নীচু গলায় প্রশ্ন করল, 'কে লিখেছে?'

বললাম, 'কুণাল। কুণাল মিত্র।'

'ওঃ!' বলে একটু ভাবল অতীশ, 'বছর চারেক আগে সে আর একবার তোকে চিঠি দিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ। আমার বিয়ের ঠিক পরেই।'

'এবার কী লিখেছে সে?'

আমি বললাম, 'অনেকদিন আগে আমি তাকে শিখিয়েছিলাম: সাবধান। বিপ্লবের পথ কিন্তু কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসীও ফিরে আসে ঘরে। সেই কথাই সে ফেরত পাঠিয়েছে আমাকে।'

হাসল অতীশ, 'তোকে টিজ করছে, না?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ।

ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতীশ, 'ওর বেশি আর কিছুই কুণালের করার নেই।'

আমি চেয়ে রইলাম অতীশের মুখের দিকে।

অতীশ ম্লান হাসল, 'মধুবন, আমি কুণালের খবর রাখি। বছরখানেক আগে তার খবর পেয়েছিলাম। হাওড়া জেলার মফসসলে একটা কারখানায় সে চাকরি করছে। দুঃখে-কষ্টে আছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে তোর কাছে আসতে বলেছিলাম। তুই বড়ো চাকরি করিস। সে মাথা নেড়ে জানাল আসবে না। বলেছিল আমার খবর মধুবনকে দেবেন না। আমি কথা দিয়েছিলাম। আজ কথা ভাঙতে হল মধুবন, নইলে হয়তো তোর শান্তি থাকত না।'

একটু চুপ করে থেকে অতীশ আবার বলল, 'ভাবিস না মধুবন। সেইসব ছোটোখাটো চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ওর জীবনে তো আর কিছু এখন করার নেই। ওরও ছেলেপুলে নিয়ে বড়ো সংসার, তোর খোঁজখবর রাখার সময় তেমন নেই। তবু মাঝে মাঝে ওইসব চিঠি পাঠায়, পাঠিয়ে মজা পায়।'

কুণালকে প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে অতীশ চলে গেল। আমি নি:শব্দে ঘরে ফিরে এলাম। দেখি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সোনা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে ফিরে এক ঝলক হেসে বলল, 'কীগো কুণাল মিত্রের বন্ধু, ভূতপূর্ব বিপ্লবী, এবার একটু সাহস করো।'

হাসলাম। বুঝলাম অতীশ চিঠিটা আন্দাজ করে সোনাকে সব বলে গেছে। তবু কী করে আমি সোনাকে বোঝাব যে, আমি এখনও সুখী নই।

কুণাল কতদূর বিপ্লবী ছিল, সঠিক ফেরারি ছিল কিনা তা নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি স্বেচ্ছায় সরে এসেছি অনেক দূরে। এখন নিশ্চিন্ত জীবন আমার, তবু মাঝে মাঝে একজন ফেরারির কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে। রাজনীতির জন্য নয়, বিপ্লবের জন্যও নয়, এসব কোনো কিছুর জন্যই এখন আর আমার একটুও ব্যস্ততা নেই। এখন আমার প্রিয়—সেলাইকলের আওয়াজ, আমার শিশুছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। কেবল মাঝে মাঝে এসবের ফাঁকে ফাঁকে একটু বিমনা হয়ে ভাবতে ভালো লাগে আমারই এক সত্তা পালিয়ে ফিরছে মাঠে-জঙ্গলে, খেতে-খামারে, পাহাড়ে-পর্বতে। কুণালের কথা শুনে তাই আমি একটুও খুশি হইনি, অবাকও নয়। আমি তো জানতাম বিপ্লবের পথ গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে! আমি তো তা জানতাম।

রাতে শুয়ে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সোনা বলল, 'কষ্ট পাচ্ছ?'

চমকে উঠে বলি, 'কই। কীসের কষ্ট?'

'আমি জানি। পাচ্ছ।'

'কেন?'

'কী জানি।' বসে একটু চুপ থেকে বলল, 'বোধ হয় তোমার মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছা করে, না? এমন উদ্দেশ্যহীন নিস্তেজ জীবন তোমার ভালো লাগে না। আমি জানি।'

'দুর।' বলে জোরে হেসে উঠলাম। তবু সোনার মুখ সামান্য বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

'বড়ো ভয় করে গো।' ঘুমের আগে আমার আদরে তলিয়ে যেতে যেতে সোনা বলল। অমনি আমার বুকের মধ্যে টিকটিক টিকটিক। যেয়ো না। যেয়ো না।

নি:সাড়ে ঘুমের ভান করে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে আমি গভীর রাতে উঠে লেখার টেবিলে ছোটো বাতিটি জ্বেলে বসলাম। কুণালকে একটা চিঠি লেখা দরকার। চেনা কুণালকে নয়। এ আর এক কুণালকে, যাকে আমি চিনি না।

সারারাত ধরে আমি লিখলাম আমার চিঠি সিগারেটের পর সিগারেট জ্বেলে। তারপর টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ভোরবেলা সোনা আমাকে ডেকে তুলল। তার চোখে-মুখে ভয়, ঠোঁট কাঁপছে কান্নায়, 'কী করছিলে তুমি রাজা? সারারাত...সারারাত ধরে।'

আমি সুন্দর করে হাসলাম। তারপর ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম চিঠিটা। ও প্রথমে বুঝতেই পারল না।

বললাম, 'সারারাত ধরে আমি এ চিঠিটা লিখেছি সোনা। বেনামি একটা চিঠি।

'ওমা।' ও অবাক হয়ে বলল, 'এ তো মাত্র একটা লাইন।'

আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ও শব্দ করে চিঠিটা পড়ল, 'ওরে কুণাল, বনের সন্ন্যাসীর চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি।'

আমি সুমন

আমি জানি ভিনি আমাকে ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই ভিনি বার বার আমার কাছে ধরা পড়ে যায়; নাকি ইচ্ছে করেই ধরা দেয় কে জানে! তার সঙ্গে প্রথম দেখা সেই শিশুবয়সে। তখন ও ফ্রক পরে, লালচে আভার একঢাল চুল আর ঠোঁটের ওপরে বাঁ-ধারে একটা আঁচিল, খুব ফর্সা রং—ব্যস, আর কিছু মনে নেই।

প্রথম দিন, পনেরো-ষোলো বছর পর প্রথম দিন ভিনি আমার দিকে তাকালই না। কিংবা তাকিয়ে এক পলকেই সব দেখে এবং জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভালোমানুষ সেজে গেল নিজের মার সামনে, কে জানে। বসল খাটের ওপর জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

সুমন, এই হচ্ছে ভিনি। ওর মা বললেন, তাঁর চোখে-মুখে অহংকার ঝলমল করছিল, আরও অনেক নি:শব্দ কথা ছিল তাঁর মুখে যা তিনি বললেন না, আমি বুঝে নিলুম—দেখো তো আমার ভিনি কী সুন্দর হয়েছে। দেখো ওর আঙুল, ওর চুল, ওর মুখের ছাঁদ, কথা বলে দেখো কী সুন্দর মিষ্টি ওর গলার স্বর, রাজপুত্রের যুগ্যি আমার ভিনি।

এইসব কথা ভিনির মায়ের মুখে লেখা ছিল কিংবা বলা ছিল। আমি বুঝে নিলুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নিজের জন্য লজ্জা হচ্ছিল আমার। আমি তেমন কিছু হলুম না কেন। ভিনির বয়স হয়েছে বিয়ের, তবু কোনোদিন ওর অভিভাবকেরা আমার কথা ভাববে না—আমি বুঝে গেলুম প্রথম দিনের প্রথম কয়েক মিনিটেই। মনে মনে বললুম—পালা সুমন, মনে মনে যোগী ঋষি হয়ে যা। ছেলেবেলায় তুই যে সুন্দর ছিলি একথা অনেকেই ভুলে গেছে। এমন কাঠুরের মতো চেহারা তোর, গুণ্ডাদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখের ভাব চোর-চোর, কাঠ হয়ে বসে আছিস।

কতদিন দেখা নেই! ভিনির মা বলে—কী করে আমাদের ঠিকানা পেলে?

সেটা আমার গুপ্ত কথা। তাই বললুম না, হেসে এড়িয়ে গেলুম। বুঝলুম ভিনি যে আমকে তিনটে চিঠি লিখেছিল পর পর তার কথা ওর বাড়ির কেউ জানে না। তার প্রতিটিতেই লেখা ছিল—একবার আসবেন। আপনাকে বড়ো দরকার আমার। আমারও প্রশ্ন—আমার ঠিকানা ভিনি পেল কোথায়!

দরকারটা আমি বুঝতে পারছিলুম না, কেন-না ভিনি জানলার বাইরে মুখ ঘুরিয়েই ছিল। অথচ পনেরো-ষোলো বছর পর দেখা, তারও আগে দরকারের চিঠি দেওয়া!

চা খেয়ে আমি উঠে পড়লুম—চলি।

আবার আসবে তো? ভিনির মা বলল—আমরা আর তিন-চার মাস কলকাতায় আছি। উনি রিটায়ার করলেন, হেতমপুরে ওঁদের দেশেই আমাদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে, দু-তিনটে ঘরের ছাদ বাকি, ছাদ হলেই আমরা চলে যাব। এর মধ্যেই এসো আবার। মা-বাবা কেমন? বলে হাসলেন—কতদিন ওঁদের দেখি না।

হ্যাঁ, আসব বলেই বেরিয়ে আসছিলুম, মনে মনে তাগাদা দিচ্ছিলুম নিজেকে—পালা সুমন, ভীতুর ডিম, আর আসিস না কখনো।

সিঁড়িতে পা যখন দিয়েছি তখনই গলার স্বর শুনলুম—আমি অহংকারী নই।

এক ঝলক ফিরে দেখলুম—পেছনে সেই লালচে চুলের ঢল, আধো আলোতেও ঝলমল করছে মুখ। পাশে ওর মা দাঁড়িয়ে। তবু সংকোচ নেই, কেবল ওর মায়ের মুখে একটু শুকনো ভাব আর জোর করা হাসি।

পালালুম।

২

এতকাল আমি শান্তিতে ছিলুম। ছোট্ট একটা ঘর আমার। ছায়াময়, একটু গলির ভেতরের নির্জনে। সারাদিন প্রায়ই কথা না বলে কাটানো যেত। লোকে আমার নাম জানে না, খুব কম লোকেই আমাকে চেনে। আমি নিজের কাছেই নিজের সুমন। ভালোবাসার, আদরের সুমন।

বাড়িওলার বউ বলল—আপনার কাছে একজন এসেছিল।

কে? অন্যমনস্ক আমি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ঘাড় না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

সুন্দরমতো একজন।

চমকে মুখ ঘুরিয়ে দেখি বাড়িওলার বউয়ের মুখে একটু সবজান্তা হাসি। ওঁর অনেক বয়স তবু হাসিটা সুন্দর দেখাল—মায়ের মতো হাসি।

দুটো সিঁড়িতে দু-পা রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম।

খুব সুন্দর। বাড়িওলার বউ বলল—কে?

বুঝতে পারছিলুম। তবু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করছিল—ছেলে না মেয়ে!

—ভাবসাব দেখে মনে হল আবার আসবে। বাড়িওলার বউ বলল—আমাদের ঘরে বসিয়ে রেখেছিলুম অনেকক্ষণ। চা করে খাইয়ে দিয়েছি। কথাবার্তা বেশি হয়নি, ভয় নেই।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললুম না। অন্ধকারকে ডেকে বললুম—ধরা পড়ে গেছে।

রাতে শুতে গিয়ে কষ্টটা টের পেলুম। বুকে পেটে কিংবা কোথায় যে একটা বিশ্রী ব্যথা ছোট্ট একটা মাছের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুম আসছিল না। কেবল ভয় আর ভয়। কিছু একটা ঘটবে আমি টের পাচ্ছিলুম।

আমি এইরকম।

খুব বড়ো একটা বাড়িতে অনেক অপোগন্ড ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমার ছেলেবেলা কেটেছিল। তারা সব আমার জেঠতুতো, পিসতুতো ভাই-বোন—অনাদরে রুক্ষ চেহারা তাদের, ঝাকড়মাকড় চুল, গায়ে তেলচিটে ময়লা, ঝগড়াটে, হিংসুটে। প্রকান্ড ঘরের মেঝেয় ঢালাও এজমালি বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় তাদের জায়গা নিয়ে ঝগড়া হত। বাড়িটাকে বড়ো করলুম। কিন্তু হিসেবে ধরলে এলাকাই ছিল বড়ো, বড়ো উঠোন ভেতরে, বাইরে বড়ো কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু একটা মাঠ। ভেতরবাড়িতে বড়ো উঠোন ঘিরে কয়েকখানা ঘর—যাদের নাম ছিল পুব-পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণের ঘর। এক উত্তরের ঘর ছাড়া আর কোনো ঘরেরই পাকা ভিত ছিল না। আমাদের বাড়িটা যে লক্ষ্মীছাড়া ছিল, কিংবা আমাদের যে খুব অভাব ছিল তা

নয়। বরং উলটোটাই আমাদের অনেক ছিল। শুধু আশ্রিত আত্মীয়স্বজন আর যৌথ থাকার চেষ্টায় যে ভিড় বেড়েছিল তাইতেই বাড়িটার মধ্যে সবসময়ে ছিল একটা দিশেহারা ভাব। অনেক ছেলে-মেয়ে ছিলুম আমরা, যাদের কেউ কেউ পরে অনেক বড়ো কিছু হয়েছে। কিন্তু অতগুলোরমধ্যে কখন কোনটার হাত-পা কাটল, কোনটা পড়ে মরল, কোনটা পুকুরে ডুবল এই চিন্তায় একটা 'গেল গেল' ভাব সবসময়ে আমাদের বাড়িটায় টের পাওয়া যেত। আমার দাদুর কোনো ঢিলেমি ছিল না—তিনি সবসময়ে কৌটোর মুখ ভালো করে আটকাতেন, দরজার হুড়কো দিতেন ঠিকমতো, আর সন্ধেবেলা আমাদের গুনে গুনে ঘরে তুলতেন। মা-বাবার কাছে শোয়ার নিয়ম ছিল না, আমরা উত্তরের ঘরের মেঝেয় শুতুম একসঙ্গে, দাদু থাকতেন চৌকিতে, বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র বলতেন দাদু—ঠাকুমার সঙ্গে, ছোটোখাটো বচসা হত, আর ঘুম ভেঙে রাতে মাঝে মাঝে শুনতুম দাদুর গুড়ুক গুড়ুকতামাক খাওয়ার শব্দ।

আমাদের পরিবারে নাম রাখার একটা রীতি ছিল। আমার আগের ভাইদের নাম রাখা হয়েছিল অনিমেষ, হৃষিকেশ, পরমেশ, অজিতেশ, সমরেশ...ইত্যাদি। সব মিলিয়ে প্রায় উনিশজনের ওরকম নাম রাখা হয়েছিল। আমার বেলায় আর নাম পাওয়া যাচ্ছিল না। শোনা যায় অনেক ভাবনা'চিন্তার পর আমার বড়দা রায় দিয়েছিলেন—মাত্র দুটি নাম বাকি আছে আর। সুটকেস আর সন্দেশ। কোনটা পছন্দ বেছে নাও। আমার ধর্মবিশ্বাসী মেজোকাকা আমার নাম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ধর্মেশ। সেটা বাতিল করে দাদু আমার নাম রাখলেন সুমনেশ। ভালো মনের অধিকারী। কেউ মুখে কিছু বলেনি কিন্তু অনেকেরই পছন্দ ছিল না নামটা, আমার মায়েরও না। তাই কালক্রমে আমি শুধু সুমন হয়ে উঠেছিলাম।

আমি সুমন। ভালো মনের অধিকারী।

ওই বাড়িতে খুব বেশি বড়ো হয়ে ওঠবার আগেই আমরা বাড়ি ছেড়েছিলুম। আমার বাবা চাকরি নিয়ে চলে গেলেন বিহারে। প্রকান্ড বাগানঘেরা বাংলোবাড়িতে এসে আমার সেই পাঁচ-সাত বছর বয়সে প্রথম হঠাৎ মনে হয়েছিল—আমার জীবন খুব একার হবে, না, হঠাৎ নয়। সেই বাড়িতে প্রথম সকালবেলায় আমি বাড়িটা ঘুরে-ফিরে দেখতে ছুটে বেরিয়েছিলুম। একা। সামনে পপি ফুলের বাগান, তারপর ছোটো মসৃণ লন, তারপর আগাছা আর রাঙচিতার বেড়া। আমি দৌড়োতে গিয়ে থমকে গেলুম—যত যাই ততই একা। কেবল একা। শিমুলগাছ থেকে হঠাৎ হু-হু করে কেঁদে উঠল একটা কোকিল। ওরকম ডাক আমি আর কোনোদিন শুনলুম না। হাজার বছরে কোকিল বোধ হয় ওরকম একবার ডাকে। আমি কী অনেক কোকিলের ডাক শুনিনি। তবু আমাদের দেশের এজমালি বাড়িতে অনেক অপোগন্ড ছেলে-মেয়ের ভিড়ে কখনো আমি কোকিলের ডাক শুনেছিলুম বলে মনে পড়ে না। একা ভোরের ভেজা বাগানে দাঁড়িয়ে আমি প্রথম একটি কোকিলকে ডাকতে এবং কাঁদতে শুনলুম। সেই মুহূর্তেই একা একটি কোকিল আর তার ডাকের সঙ্গে আমার মিলমিশ হয়ে গেল। মনে হল আমার জীবন খুব একার হবে। সেই ভোরবেলাটির কথা আজও আমার খুব মনে পড়ে। ওইরকম একটি কোকিলের ডাক কিংবা আরও তুচ্ছ একটি-দুটি ঘটনা থেকে আমরা আবার নতুন করে আমাদের যাত্রা শুরু করি। করি না! আমার এতদিনের বিশ্বাস ছিল—আমার জীবন খুব একার হবে।

আমি আমার বাবাকে সাদা জিনস-এর প্যান্ট পরে ক্রিকেট টেনিস খেলতে দেখেছি। তবু বাবার ছিল সাধু-সন্ন্যাসী-জ্যোতিষ আর তুকতাকের বাতিক। খুব লম্বা সুন্দর সাদা চেহারার এক ভদ্রলোক, যার পরনে গেরুয়া আলখাল্লা আর চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, আমাকে দেখে বলেছিলেন—এ ছেলের স্বাভাবিক ছবি আঁকার হাত আছে। এর মন একটু দার্শনিক। বলে তিনি চুপ থেকেছিলেন।

বাবা প্রশ্ন করলেন—আর?

উনি হেসে বললেন—একটু দেখে রাখবেন, এ ঘর ছেড়ে পালাতে পারে। সন্ন্যাসের দিকে খুব টান।

—আর? বাবার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। দরজার আড়ালে মা ছিল। হঠাৎ তার হাতের চুড়ির ঝনাৎ শব্দ হয়েছিল। আমি বুঝেছিলুম, আমি সেই বয়সেই বুঝেছিলুম, লোকটা ভুল কথা বলছে না।

উনি একটু ভেবে বললেন, ওকে খুব সবুজের মধ্যে রাখবেন। ওর পোশাক যেন হয় সবুজ, ওর খাবারের মধ্যে বেশির ভাগ যেন হয় সবুজ রঙের, ওর চিন্তায় সবুজের প্রভাব যেন বেশি থাকে দেখবেন।

তার পরদিনই রং-সাবান কিনে এনে মা আমার সমস্ত পোশাক সবুজ করে তুলেছিল। রাশি রাশি শাকপাতা অনিচ্ছায় খেতে হয় আমাকে। লুডো খেলতে বসেছি, মা ছুটে এসে বলত—'সুমন, বাবা, তুই সবুজ ঘর নে।' বাড়িতে পোষা বুলবুলি ছিল, তার পাশে এল একটা টিয়াপাখি। জন্মদিনে এক বাক্স জলরং কিনে দিয়ে মা বলল—কেবল গাছপালার ছবি আঁকবি।

তবু আমার জানা ছিল যে, আমার জীবন খুব একার হবে। সবুজ রঙের ভেতরেও একটি উদাসীন মমতা আছে। আমার মা কিংবা বাবা তা ধরতে পারেনি।

৩

আমার চোখে চোখ রেখে শান্ত একটু হেসে ভিনি বলল—তারপর?

কী?

তোমার চোখ দেখলেই মনে হয় কোথাও একটু বিপদের আভাস দেখলে তুমি হরিণের মতো ছুটে পালাবে। সুমন লক্ষ্মীসোনা, আমাকে ভয় পেয়ো না। তোমার জন্য আমি অনেক কষ্ট করেছি।

আমি হাসলুম। কী জানি!

আমি সুমন। ভালো মনের অধিকারী। তবু আমি জানি ভিনির জন্য আমাকে কেউ ভাববেই না। ছেলেবেলা থেকেই ভিনি এরকম কথা শুনেছে তার মা কিংবা আত্মীয়দের কাছে—সুন্দর ভিনি, তোমার জন্যে এনে দেব সোনার রাজপুত্তুর।

কিন্তু আমি কেবল সুমন। কেবলমাত্র সুমন। নিজের কাছে আমি বড়ো প্রিয়। আমি বরং পালিয়ে যাব, লুকিয়ে থাকব, পা টিপে হাঁটব, লোকালয়ে যাব না, তবু কেউ যেন কোনো কিছুর জন্য আমায় অনাদর না করে, অপমান যেন না করে আমায়। বরং বলি—তোমাদের সুন্দর ভিনিকে নিয়ে যাও! আমি কিছুই চাই না। আমি আমার বড়ো আদরের সুমন, বড়ো ভালোবাসার। আমার সামনে আমার সুমনকে অনাদর করো না, বাতিল করে ফেলে দিয়ো না। বরং নিয়ে যাও তোমাদের সুন্দর ভিনিকে।

ভিনি আমার খুব কাছে এসে বলল—সুমন, মনে নেই তোমার বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে একদিন আর একরাত ছিলুম আমি। সন্ধেবেলা মায়ের কথা মনে পড়তে আমি খুব কেঁদেছিলুম। তুমি খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে আমার কান্না দেখে খুব খেপিয়েছিলে। মনে নেই? তখন তোমার দু-হাত তুলে নাচ, নকল কান্না আর মুখের কাছে মুখ এনে চোখ বড়ো করে তাকানো দেখে কান্না ভুলে আমি খুব হেসেছিলুম।

মনে নেই। হেসে বললুম—খেপিয়েছিলুম বলে আজও আমার ওপর রাগ পুষে রাখোনি তো ভিনি?

ও চোখ বুজে সোজা হয়ে বসে রইল, তারপর বলল—আমার গা দেখো।

দেখলুম গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

ও চোখ বুজেই সামান্য হাসল, বলল—সেদিনের কথা মনে হলে আমার সমস্ত শরীর দিয়ে শিহরণ বয়ে যায়। ওরকম সুখ আমি আর কখনো পেলুম না।

শুনে একটু লজ্জা পেলুম। কখনো মানে ভিনি আজকের কথাও বলছে কি? কে জানে মনে সন্দেহ এল, আমাকে কিশোর বয়সে যতটা ভালো লেগেছিল ভিনির ততটা আজও লাগে কিনা। কিংবা হয়তো আজও ভিনি সেই কৈশোরের ভালোবাসাই বহন করে চলেছে। কী জানি।

ভিনির দুই চোখ নি:শব্দে কথা বলছিল—আমি তোমাকে ভালোবাসি সুমন। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ভিনি বড়ো সুন্দর। বড়ো ভালোবাসে। আমার বুকের ভেতরে লাফিয়ে উঠল একটি বল। চোখে অকারণ জল আসছিল। মনে মনে বললুম—ভিনি সত্যি? তিন সত্যি? দিব্যি? আমার গা ছুঁয়ে বলো। দেখো ভিনি, আমি কিছুই না। আমি কেবলমাত্র সুমন। তাও এ নাম জানে মাত্র কয়েকজন লোক। তুমি এই নাম বুকে করে রেখেছিলে এতকাল? কেন গো? তিনটি চিঠি দিয়ে তুমি ডেকেছিলে আমায়—কী সত্যি? সত্যি বটে তোমার খেলামাটির রান্নাঘরে মাঝে মাঝে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, পাথরকুচি পাতার লুচি আর কাদামাটির তরকারি আমি জিভ আর ঠোঁটের কৌশলে চকচক শব্দ করে নকল খাবার খেয়েছি, সত্য বটে, তোমাকে আমি দেখিয়েছিলুম দু-হাত তুলে বাঁদরনাচ কিংবা চোখের পাতা উলটে ভয় দেখানোর খেলা। কিন্তু তারপর ক্রমে আমি তোমাকে ভুলেও গিয়েছিলুম। পনেরো-ষোলো বছর পরের এই তোমাকে আমি চিনিই না। ভিনি, মা কালীর দিব্যি, সত্যি বলো। তিন সত্যি! আমার গা ছুঁয়ে বলো!

ভিনি চলে গেল রাতে, আমার ঘুম এল না। আমার শরীরের ভেতরে একটিমাত্র যন্ত্রণার মাছ একা খেলা করে ফিরছে। কখনো পেটে, কখনো বুকে, কখনো মাথায়। ঠিক কোথায় যে তা বুঝতে পারি না। ওই মাছ আমার সমস্ত শরীরে এবং চেতনায় একটিমাত্র কথাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে—সুমন, তোমার জীবন বড়ো একার হবে।

আমি জানি। আমি তা জানি। অন্ধকারে আমি আপনমনে মাথা নাড়ালুম। তারপর চুপি চুপি আমার বালিশের কাছে বলে রাখলুম একটি নাম। ভিনি। ভিনি। ভিনি।

ছেলেবেলায় চেনা কিশোরীদের মুখগুলি আর মনে পড়ে না। কত নাম ভুলে গেছি। তবু মিতু নামে একটি মেয়ের সঙ্গে যে একটি-দুটি দুপুর আমি কাটিয়েছিলুম আমার কৈশোরে, তা মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে। আধো-অন্ধকার ছাদের সিঁড়িতে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম এক দুপুরে। ছাদের ওপর ঝড়ের মতো হাওয়ায় মড়মড় করে নুয়ে পড়ছে এরিয়ালের বাঁশ, কলতলায় এঁটো বাসনের ওপর কাকদের হুড়োহুড়ি, নীচের ঘরে শীতলপাটিতে শুয়ে ভাতঘুমে মা, আর তখন আমার বুক কেঁপে উঠেছিল, আমরা কথা বলছিলুম না, মিতু খুব আস্তে আস্তে আমার আরও কাছ ঘেঁষে আসছিল। অনেক কাছে চলে এল মিতু, তার মুখ আমার মুখকে ছোঁয়-ছোঁয়। আমি সরে সরে গিয়ে রেলিঙের সঙ্গে সেঁটে গেছি, আমার বুক কাঁপছে, বুকের ভিতরে আমার সেই গলার স্বর—পালা সুমন, রেলিং টপকে দেওয়াল ডিঙিয়ে পালিয়ে যা, অনেক দূরে চলে যা। আমি টের পেয়েছিলুম তখন দেওয়াল কেঁপে উঠেছিল, কথা বলে উঠেছিল সিঁড়ি, 'মার মার' শব্দে ছুটে আসছিল ছাদের বাতাস। মিতু টেরও পায়নি। মিতু বলেছিল—তোর মুখে কেমন ভাত খাওয়ার গন্ধ! রোজ খাওয়ার পর লুকিয়ে পান খাবি, কিংবা মৌরি, তারপর ফিক করে হেসে সে বলল—আমার মুখে একটালবঙ্গ আছে, খাবি? দাঁতে টিপে সে লবঙ্গর একটি কণা আমাকে দেখাল, বলল—নে, তোর দাঁত দিয়ে কেটে নে। নে না! বলে সে আমাকে টেনে নিল। সেই সময়ে, সেই নিতান্ত কৈশোরেও আমার মনে হয়েছিল আমি এক চারাগাছ, মিতু শিকড়সুদ্ধ আমাকে উপড়ে ফেলল।

আমাদের একটা ছোট্ট পুরোনো জিনিসপত্র রাখার জন্য ঘর ছিল। সেই ঘরে ছিল সবুজ রঙের একটা তোরঙ্গ। আমি আর মিতু সেই তোরঙ্গ এক দুপুরে খুলেছিলুম। তাতে ছিল বাণ্ডিল বাণ্ডিল পুরোনো চিঠি—সেগুলো সবই আমার বাবার লেখা মাকে, কিংবা মার লেখা বাবাকে। আমি আর মিতু পাশাপাশি বসে সারাদুপুর পড়েছিলুম সেইসব চিঠি। তারপর আমরা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে হেসেছিলুম। সবজান্তা হাসি। কিন্তু মা-বাবার ওপর অকারণে আমার বড়ো রাগ হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল আমি ওদের আর ভালোবাসব না। মিতু বলল—তুই আমাকে চিঠি লিখবি? লেখ না। বানান ভুল করিস না, আর চিঠির ওপর ঠাকুর-দেবতার নাম লিখিস না। লিখবি তো? আমি বিকেলে এসে নিয়ে যাব! তারপর তোকেও দেব চিঠি।

সেই ঘটনার পর থেকে অনেকদিন আমি আমার বাবা-মার ওপর খুশি ছিলুম না। আমি বাগানে ঘুরে গাছেদের জিজ্ঞেস করতুম, আমি ঘরের দেওয়ালকে জিজ্ঞেস করতুম, রাতে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে বুকজোড়া

অন্ধকারকে জিজ্ঞেস করতুম, কেন আমি তাদের আর ভালোবাসব না?

মনে মনে আমি নিজেকে ডেকে বলেছিলুম—সুমন, তুই কখনো বিয়ে করিস না।

আমাদের বাড়িতে প্রায়ই জ্যোতিষেরা আসত। তাদের মধ্যে একজন একবার বাবাকে বলেছিল—সুমনের বউ যেন খুব সুন্দর হয়। কখনো কুচ্ছিত কিংবা চলনসই মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন না। সইতে পারবে না।

সেই জ্যোতিষ কী বলতে চেয়েছিল তা বুঝতে পেরে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছিল। বুঝতে পেরেছিলুম আমার ভেতরে অন্যকে ভালোবাসার ক্ষমতা কত কম! শিশুর মতো রঙিন খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে না রাখলে আমি সহজেই সবকিছুকে অবহেলা করব।

৪

মাঘ মাসের এক গোধূলি লগ্নে ভিনির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

সমারোহ কিছুই হল না। খুব আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না। প্রায় স্তব্ধতার ভেতরে আমি মন্ত্রোচ্চারণ করলুম।

বাসরঘরেও আমরা ছিলুম একা। ভিনি চুপিচুপি আমাকে বলল—বাব্বা:! বাঁচা গেল।

কেন? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

ভিনি পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজে বলল—কী জানি ভয় হচ্ছিল শুভদৃষ্টির সময়ে হয়তো দেখব অন্য লোক। তাহলে আমি ঠিক অজ্ঞান হয়ে পিঁড়ি থেকে পড়ে যেতুম।

হাসলুম—এত ভয়!

চোখ বুজে ভিনি একটা হাত বাড়িয়ে আমার বুকে রাখল, বলল—মন, তোমার বুকের ভেতরে পালিয়ে যাওয়ার দুরদুর শব্দ। বলেই হাসল ভিনি, তেমনি চোখ বুজে থেকে বলল—সেই কবে থেকে তোমাকে ভালোবেসে আসছি মন, ভয় ছিল যদি পালিয়ে যাও! জানো না তো তোমার জন্য মা-বাবার সঙ্গে কত ঝগড়া করলুম আমি।

আমার মাথার ভেতরে গুনগুন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল ভিনির ওই কথাটুকু—কী জানি, ভয় হচ্ছিল শুভদৃষ্টির সময় হয়তো দেখব অন্য লোক।

আমি আস্তে আস্তে ভিনিকে বললুম—ভিনি, একটা কথা বলি?

—হুঁ।

ছেলেবেলায় আমার মাকে কখন ভালো লাগত জানো? যখন রান্নাবান্না আর কাজ করতে করতে মার চুল এলোমেলো হয়ে যেত, মুখে জ্যাবজ্যাব করত ঘাম, সিঁদুর গলে নেমে আসত নাকের ওপর, যখন মার আটপৌরে শাড়িতে হলুদের দাগ, তখন মাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসতুম। আর মা যখন সাজগোজ করত, গায়ে পরত ফর্সা জামাকাপড়, তখন মাকে বড়ো গম্ভীর আর রাগী দেখাত, যেন ছুঁতে গেলেই বকে দেবে। কিংবা মা যখন দুঃখ পেত, চুপ করে বসে থাকত, অথবা হয়তো কোনো কারণে কাঁদত তখনই মা আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল, আমি কেবল মার আশপাশে ঘুরঘুর করতুম। কেন বলো তো?

কেন?

আসলে একটু কষ্ট, একটু দুঃখের মধ্যেই দেখতে বোধ হয় আমার ভালো লাগে।

পাগল। বলে ভিনি হাসল।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললুম—আমার বাবাকে আমি কবে সবচেয়ে বেশি করে ভালোবেসেছিলুম জানো?

কবে?

মফসসলে রেলকলোনির এক ক্রিকেট-ম্যাচে একটি লোক ছাব্বিশ রান করে আউট হয়ে গেল। বুড়ো স্কোরারের পাশে মাঠের ঘাসে বসে আমি দেখলুম সাদা পোশাক পরা লম্বা চেহারার যুবকটি ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, মাথা অল্প নোয়ানো, হাতের ব্যাটটা শূন্যে একবার আধপাক ঘুরে গেল হতাশায়, মাথার টুপিটা খুলে নিয়ে ম্লান হাসিমুখে বাবা প্রকান্ড মাঠটা আস্তে আস্তে পার হয়ে প্যাভিলিয়নের তাঁবুর দিকে চলে যাচ্ছিল। সে জানত না সেই সময়ে মাঠের দর্শকদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাচ্ছিল তার জন্য, সে আমি। বাবা আউট হয়ে গেল বলে না, আসলে বাবার ওই হেঁটে ফিরে আসা, আধপাক ঘুরে যাওয়া ব্যাটটার হতাশা আর মুখের হাসিটুকুর জন্য আমি কেঁদেছিলুম। তারপর থেকে বাবাকে যে আমি কী ভীষণ, ভীষণ ভালোবাসি ভিনি। এখনও যে বাবাকে ভালোবাসি তার কারণ বোধ হয় ওই মুহূর্তটি, বাবার আউট হয়ে ফিরে আসার ওই মুহূর্তটি। বাবা বলে ভাবতেই ওই দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কেন বলো তো?

কেন?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—আসলে দু-একটিই ভালোবাসার মুহূর্ত থাকে আমাদের। না? বলেই হাসলুম—ছেলেবেলায় তুমি মাত্র একবারই ভালোবেসেছিলে আমায়।

শুনে ভিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমি জানি তুমি আমাকে তেমন ভালোবাসো না মন। তেমন মুহূর্ত তোমার কখনো আসেনি।

শুনে বড়ো চমকে উঠলুম। হেসে বললুম—পাগলি।

ও চুপ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল—তাতে কিছু আসে-যায় না। আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।

আমি হেসে গলা নামিয়ে বললুম—ভিনি, তোমার গায়ের জন্মদাগটা কোথায়?

অবাক হয়ে ভিনি বলল—কেন?

বললুম—তোমার গায়ের খোলা দাগটা খুঁজে পাইনি।

একটু চুপ থেকে ভিনি হঠাৎ লাল হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল—এঃ মাগো, বিচ্ছু কোথাকার...তোমার...তোমারটা কোথায়?

তারপর অনেক রাতে ভিনি আমাকে তার জন্মদাগ দেখতে দিয়েছিল।

তিন বছরে আমাদের দুটি ছেলে-মেয়ে হল। আর আমরা অল্প একটু বুড়ো হয়ে গেলুম।

মাঝে মাঝে আমি ভিনিকে বলি—ভিনি, আমার মন ভালো নেই।

কেন?

কী জানি।

শরীর খারাপ নয়তো? বলতে বলতে সে এসে আমার কপালে তার গাল ছোঁয়ায়, বুকে হাত দিয়ে দেখে গা গরম কিনা।

না, শরীর খারাপ নয়। আমি বলি।

রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে?

না।

তবে কী?

কী জানি! আমি বলি—মন ভালো নেই।

ভিনি হাসে—পাগল কোথাকার।

আমার বড়ো একা লাগছে ভিনি।

ভিনি চমকে ওঠে—কেন আমরা তো আছি।

আমি শূন্য চোখে চেয়ে থাকি। কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করি। পকেট হাতড়ে খুঁজি সিগারেট আর দেশলাই।

গত আশ্বিনে আমি আমার চৌত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে এলুম। আমি জানি আমি খুব দীর্ঘজীবী হব—আমার কুষ্ঠিতে সেই কথা লেখা আছে। ত্রিশের ঘরে বসে আমি তাই সামনের দীর্ঘ জীবনের দিকে চেয়ে অলস ও ধীরস্থির হয়ে আছি। বিছানায় শুয়ে হাত বাড়ালেই যেমন টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, জলের গ্লাস কিংবা ঘড়ি ছোঁয়া যায়, মৃত্যু আমার কাছে ততটা সহজে ছোঁয়ার নয়। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নারাতে আমার ঘরের জানলা খুলে চুপ করে বসে থাকি। হালকা বিশুদ্ধ চাঁদের আলো আমার কোলে পড়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে আমার রক্তের মধ্যে ডানা নেড়ে জেগে ওঠে একটি মাছ—ছোট্ট আঙুলের মতো একটি মাছ—শরীর ও চেতনা জুড়ে তার অবিরল খেলা শুরু হয়। আমার চেতনার মধ্যে জেগে ওঠে একটি বোধ, আমারই ভেতর থেকে কে যেন বড়ো মৃদু এবং মায়ার স্বরে ডাক দেয়, ‘সুমন, আমার সুমন।’ অকারণে চোখের জলে ভেসে যায়। আস্তে আস্তে জানলার চৌকাঠের ওপর মাথা নামিয়ে রাখি। মায়ের হাতের মতো মৃদু বাতাস আমার মাথা থেকে পিঠ পর্যন্ত স্পর্শ করে যায়। তখন মনে পড়ে—সুমন, তোমার জীবন খুব একার হবে।

ওষুধ

উকিলবাবু এখনও আসেননি। মক্কেলরা বসে বসে মশা মারছে।

দুর্গাপদ খুবই ধৈর্যশীল লোক। সে জানে, বড়ো অফিসার, বড়ো ডাক্তার, বড়ো উকিল ধরলে ধৈর্য রাখতে হয়। যে যত বড়ো সে তত ঘোরাবে।

দুর্গাপদ রাস্তা পেরিয়ে উলটোদিকের পানের দোকানে গিয়ে লেমনেড চাইল। তেষ্টা পেয়েছে অনেকক্ষণ। উকিলবাবুর বাড়ির চাকরের কাছে জল চাইলে দিত নিশ্চয়ই, কিন্তু চাইতে কেমন ভয় ভয় আর লজ্জা লজ্জা করছিল তার।

দোকানদার বুড়ো মানুষ। তার দোকানটাও তেমনি কিছু বড়ো দোকান নয়। ছোটো-মোটো, গরিবগুর্বোরদোকান। বিড়ি চাও আছে, পিলাপাতি কালাপাতি চমনবাহার মোহিনী জর্দা দেওয়া পান পাবে, ক্যাপস্টান গোল্ড ফ্লেক চাও তাও মজুদ, কম দামি কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখতে হয় বলে তাও রাখা, কিন্তু বেশি বায়নাক্কা হলে অন্য দোকান দেখতে হবে।

বুড়ো তার লাল বাক্স খুলে বরফে রাখা বোতল অনেক বেছে-গুছে একটা বের করে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—এরকম ঠাণ্ডা হলে চলবে?

অন্যমনস্ক দুর্গাপদ বলে—হুঁ:।

লজেনচুসের গন্ধওলা ঠাণ্ডা, মিষ্টি ঝাঁঝালো জলটা খেতে গিয়ে বুকের জামা ভিজে গেল দুর্গাপদর। কাগজের নল দিয়ে টেনে সে এসব খেতে পারে না। চুরুক চুরুক খাওয়া তার পছন্দ নয়। ঘোঁৎঘোঁৎ করে না গিললে তৃপ্তিটা পায় না।

জলটা খেতে খেতে চেয়ে আছে উলটো দিকের বাড়িটার দিকে। না, উকিলবাবু এখনও আসেননি।

কতকগুলো ব্যাপার আছে যা কেবল এই উকিল ডাক্তার বা অফিসাররাই জানে, আর কেউ জানে না। মুশকিলটা সেখানেই। তার ওপর দুর্গাপদ কস্মিনকালে মামলা-মোকদ্দমা বা কোর্টকাছারি করেনি। উকিলবাবু আগের দিনই সাফ বলে দিয়েছে—কেউ বিয়ে ভাঙতে চাইলে আটকানো কি যায়? কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখতে পারি বড়োজোর। আর চাও তো, বেশ ভালো মাসোহারার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। সে এমন ব্যবস্থা যাতে বাছাধনকে দ্বিতীয়বার বিয়েতে বসতে খুব ভেবেচিন্তে বসতে হবে।

কিন্তু দুর্গাপদ তার জামাইকে খুব একটা অপছন্দ করে না। লোকটা নরম-সরম, ভদ্র, বিনয়ী, খরচে ধরনের। বরং তার মেয়ে লক্ষ্মীই ট্যাটন। বিয়ের আগে পাড়া জ্বালিয়েছে। বিয়ের পর বছর দুই যেতে না যেতে বাপের বাড়িতে এসে খাদিমা হয়ে বসেছে। জামাই নিতে আসেনি। জামাইয়ের বদলে দিন কুড়ি আগে জামাইয়ের পক্ষের এক উকিলের চিঠি এসেছে। জামাই ডিভোর্সের মামলা আনছে।

তার মেয়ে লক্ষ্মীর তাতে কোনো ভাব বৈলক্ষণ নেই। রেজিস্ট্রি করা খামটা খুলে চিঠিটা তেরছা নজরে পড়ে বারান্দায় ফেলে-রাখা পা ছড়িয়ে উকুন বাছতে বসল সরু চিরুনি দিয়ে। বাতাসে উড়ে উড়ে ঘুড়ির মতো লাট খেয়ে চিঠিটা করুণ মুখে এসে উঠোনে দুর্গাপদর পায়ের পাতায় লেগে রইল। দুর্গাপদ উঠোনে বসে একটা ভাঙা মিটসেফের ডালায় কবজা লাগাচ্ছিল। ইংরিজিতে লেখা চিঠিটা বুঝতে একটু দেরি হল বটে, কিন্তু অবশেষে বুঝল এবং মাথাটা তখনই একটা পাক মারল জোর।

জামাইবাবাজি যে লোক খুব খারাপ নয় তা জানে বলেই দুর্গাপদ কটমট করে তাকাল মেয়ের দিকে। কিন্তু এসব তাকানো-টাকানোয় ইদানীং আর কাজ হয় না। কোনোদিন হতও না।

বলি ব্যাপারটা কী, শুনছিস? হুংকার দিল দুর্গাপদ।

লক্ষ্মী সূক্ষ্ম চিরুনিতে উঠে-আসা চুলের গোছা আলোয় তুলে উকুন খুঁজতে খুঁজতে নির্বিকার গলায় বলে—দেখলে তো, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?

দুর্গাপদ বুঝল পুরুষকারে কাজ হবে না। গলা নরম করে বলল—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয়, সে তো দিন-রাত্তিরের মতো সত্য। তা বলে উকিলের চিঠি কেন? তেমন কী হল তোদের?

লক্ষ্মীর মা ঘরেই ছিল। বরাবরের কুঁদুলি মেয়েছেলে। সেখান থেকেই গলা তুলে জিজ্ঞেস করল—কে উকিলের চিঠি দিল আবার?

নবীন। হাল ছেড়ে দুর্গাপদ বলে।

জামাই?

তবে আর কে নবীন আছে?

লক্ষ্মীর মা কিছু মোটাসোটা। ফর্সা গোলগাল প্রতিমার মতো চেহারা। বড়ো বড়ো চোখে রক্ত হিম-করা দৃষ্টিতে চাইতে পারে। দুর্গাপদর প্রাণ এই চোখের সামনে ভারি ধড়ফড় করে ওঠে।

ইংরিজি জানে না, তবু উঠোনে নেমে এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর দুর্গাপদকে জিজ্ঞেস করল, ডিভোর্স করবে নাকি?

তাই তো লিখেছে।

করলেই হল। আইন নেই?

ডিভোর্সের কথা তো আইনেই আছে।

তোমার মাথা। ডিভোর্স হল বেআইনি ব্যাপার। কেউ ডিভোর্স করেছে জানতে পারলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। জেল হয়।

লক্ষ্মীর মা তার বাপের বাড়ি থেকে যা যা শিখে এসেছে তার ওপরে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু শেখাতে পারেনি। অনেক ঠেকে দুর্গাপদ আর সে চেষ্টা করে না। তবু বলল—জেল দাওগে না। কে আটকাচ্ছে পুলিশে যেতে।

লক্ষ্মীর মা বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে কঠিনস্বরে বলল—আমি যাব পুলিশের কাছে? তবে তুমি পুরুষমানুষ আছ কী করতে?

এ নিয়ে যখন লক্ষ্মীর মার সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলছিল তখন লক্ষ্মী ম্যাটিনি শোয়ে যাবে বলে রান্নাঘরে গিয়ে পান্তা খেতে বসল।

লক্ষ্মীর মায়ের বাঁজা নাম ঘুচিয়ে ওই লক্ষ্মীই জন্মেছিল, আর ছেলেপুলে হয়নি। একমাত্র সন্তান বলে আশকারা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে দুর্গাপদর কাছে যতটা তার চেয়ে ঢের বেশি তার মায়ের কাছ থেকে। সারাদিন মায়ে-মেয়ের গলাগলি ভাব, গুজগুজ ফুসফুস। দুটো মেয়েছেলে একজোট, অন্যধারে দুর্গাপদ এক পুরুষ। কী-ই বা করবে? চোখের সামনেই মেয়েটা বখে গেল।

লক্ষ্মী সিনেমায় বেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্মীর মা দুর্গাপদকে বলল—জামাই খারাপ নয়, কিন্তু ওর বাড়ির লোকেরা হাড়জ্বালানি। সব ক-টাকে কোমরে দড়ি বেঁধে সদরে চালান দিয়ে আসবে। যাও। এ কী কথা!

দেশে আইন নেই। কোর্টকাছারি নেই? পুলিশ-জেলখানা নেই? ডিভোর্স করলেই হল?

এসব ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে গিয়ে লাভ নেই তা দুর্গাপদ জানে। কিন্তু কোথায় যেতে হয় তা তারও মাথায় আসে না। সে তেমন লেখাপড়া জানে না, খুব ভদ্রসমাজের লোকও সে নয়। তবে ইলেকট্রিক মিস্তিরি হিসেবে গয়েশপুর থেকে কাঁচরাপাড়া অবধি তার ফলাও প্র্যাকটিস। বলতে কী উকিল, ডাক্তার, অফিসারদের মতোই তার গাহেককেও ঘুরে ঘুরে আসতে হয়। বলতে নেই, তার টাকা অঢেল। সে সাইকেলখানা নিয়ে ভরদুপুরে বেরিয়ে পড়ল।

বুদ্ধি দেওয়ার লোকের অভাব দুনিয়ায় নেই। একজন দুঁদে এক উকিলের ঠিকানা মায় একটা হাতচিঠিও দিয়ে দিল। তাতে লাভ হল কিনা দুর্গাপদ জানে না। প্রথমদিন জামাইয়ের উকিলের দেওয়া চিঠিটা পড়ে দুঁদে উকিল মোট মিনিট দশেক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পঁচিশটা টাকা নিল। কিন্তু তবু কোনো ভরসা দিতে পারল না।

দুর্গাপদ আজও এসেছে। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ ঢিব ঢিব, মুখ শুকনো, গলা জুড়ে অষ্টপ্রহর এক তেষ্টা। মেয়েটা ঘাড়ে এসে পড়লে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। আর হারামজাদি শুধু যে ঘাড়ে এসে পড়বে তা তো নয়, ঘাড়ে বসে চুল ওপড়াবে। পাড়ায় ঢি-ঢি ফেলে দেবে দু-দিনেই। স্বভাব জানে তো দুর্গাপদ। গতকাল সে লক্ষ্মীকে খুব সোহাগ দেখিয়ে বলেছিল—মাগো, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বনিবনা করে থাকো গে যাও। আমি সঙ্গে যাব, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে আসব। থাকতে যদি পারো তো মাসে তিনশো টাকা করে হাতখরচ পাঠাব তোমায়।

শুনে লক্ষ্মীর কী হাসি! পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে এলোচুলে বসেছিল। হাসির চোটে সেই চুলে মুখ বুক ঢাকা পড়ল। বলল—মাসোহারার লোভ দেখাচ্ছ? তুমি মরলে সর্বস্ব তো এমনিতেই আমি পাব।

মূর্তি দেখে দুর্গাপদ ভারি মুষড়ে পড়েছিল। লক্ষ্মীর মা বলল—পুরুষমানুষ বোকা হয় সে তো জানা কথা। কিন্তু তোমার মতো এমন হাঁদারাম আর মেনিমুখো তো জন্মেও দেখিনি। লক্ষ্মী শ্বশুরবাড়ি যাবে কেন, ওর সম্মান নেই? জামাইদের দেমাকের দিন শেষ হয়ে গেছে। তারা পায়ে ধরে নিতে এলেও যাবে না। এ বাড়িতে বাকি জীবন বসে বসে খাবে। মেয়ে কী ফ্যালনা?

উকিলবাবুর গাড়ি এসে থামল। তাড়াহুড়োয় দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিতে ভুলে গিয়ে রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল। পেছন থেকে 'ও দাদা, দাম দিয়ে গেলেন না' শুনে লজ্জা পেয়ে ফিরে এসে দাম মেটাতে গেলে বুড়ো দোকানদার মোলায়েম গলায় বলল—উকিলবাবুর এখন দেরি হবে। হাত-পা ধোবেন, জলটল খাবেন, পাক্কা এক ঘণ্টা, রোজ দেখছি। আপনার নাম লেখানো আছে তো?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে বলল—জনা আষ্টেকের পর।

তাহলে আরও দেড়ঘণ্টা ধরে নিন।

বড়ো উকিল ধরে বড্ড মুশকিল হল দেখছি।

আসানও হবে। উনি হারা মামলা জিতিয়ে দেন। কত খুনিকে খালাস করেছেন।

দুর্গাপদ বলল—কিন্তু আমারটা কিছু হল না।

আপনার মুশকিলটা কী?

সে আছে অনেক ঝামেলার ব্যাপার। জামাই ডিভোর্স চাইছে।

অ। বলে বুড়ো মুখে কুলুপ আঁটল।

দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে উকিলবাবুর বাইরের ঘরে আরও জনা ত্রিশেক লোকের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে থাকে। আড়াই ঘণ্টা বসতে হবে। ঘরটা বিড়ি আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। শোনা গেল, উকিলবাবু এখনও চেম্বারে আসেননি। জল খাচ্ছেন বোধ হয়। গুটি গুটি আরও মক্কেল আসছে।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা। হাঁটু ব্যথা হল, মাজা ধরে গেল, হাই উঠতে লাগল ঘনঘন। তারপর ডাক এল। ব্যস্ত বড়ো উকিলবাবু মক্কেলদের এক-দুইবার দেখে মনে রাখতে পারেন না, তাই ফের পুরোনো পরিচয় এবং

বখেরার কথা বুঝিয়ে বলতে হল। সব বুঝে উকিলবাবু হাসি হাসি মুখ করে বললেন—ভাঙন রুখতে চাইছেন তো? কিন্তু কী দিয়ে রুখবেন? আজ হোক কাল হোক এ ভাঙবেই। আমরা ভাবের কথা বুঝি না, কেবল আইন বুঝি। কে, কাকে ভালোবাসে বা বাসে না, কার বিয়ে ভাঙা ভালো নয় বা কার ভালো এসব হল নীতির কথা, ভাবের কথা। আইন তার তোয়াক্কা করে না। বলেন তো লড়তে পারি। কিন্তু খামোকা।

ফের পঁচিশটা টাকা গুনে দিয়ে দুর্গাপদ উঠে পড়ল।

২

খেয়ে উঠে নবীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটির জলে আঁচাচ্ছিল। এমন সময় দেখল, উঠোনে জ্যোৎস্না পড়েছে। এই হেমন্তকালের জ্যোৎস্নার রকম-সকমই আলাদা। একটু দুধের সরের মতো কুয়াশায় মাখামাখি চাঁদখানা ভারি আহ্লাদি চেহারা নিয়ে হাসছে। বাতাসে চোরা শীত। উঠোনে বসে-থাকা ঘেয়ো কুকুরটা এঁটো খেতে খেতে ভ্যাক ভ্যাক করে ডেকে উঠল।

নবীন কাঁধের গামছায় মুখ মুছতে মুছতে শুনল মা তাকে ডেকে বলছে—ও নবীন, গায়ে একটা গেঞ্জি দে। এ সময়কার ঠাণ্ডা ভালো না।

আঁচাতে গিয়ে চারদিককার দৃশ্য দেখে জগৎ-সংসার বেবাক ভুলে চেয়ে রইল নবীনচন্দ্র। ঘটিতে আঙুলের টোকা মেরে মৃদুস্বরে একটু গানও গেয়ে বসল সে—না মারো না মারো পিচকারি...

ঘেরা উঠোনের যে ধারটায় দেওয়ালের গায়ে দরজাটা রয়েছে তার পাশেই মায়ের আদরের দু-দুটো মানকচুর ঝোপ আশকারা পেয়ে মানুষপ্রমাণ প্রকান্ড হয়ে উঠেছে। এক-একখানা পাতা ডবল সাইজের কুলোকেও হার মানায়। কুকুরটা ভ্যাক ভ্যাক করে সেদিকেই বারবার ছুটে গিয়ে ফের ল্যাজ নামিয়ে চলে আসছে। নবীনের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বোঝবারও চেষ্টা করল ভ্যাক ভ্যাক করে। নবীন গান থামিয়ে বলে—কে?

কচুপাতার আড়ালে কপাটের গায়ে লেগে-থাকা ছায়ামূর্তি বলে উঠল—আমি হে নবীন। কথা ছিল। আঁচাচ্ছিলে বলে ডাকিনি, বিষম খেতে পারো তো।

অক্ষয় উকিলের হয়ে এসেছে। আজকাল বড়ো আলতুফালতু কথা বলে। মানে হয় না।

নবীন উঠোন পেরিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বাতি জ্বেলে বলে—আসুন।

বিবর্ণ একটা শাল-জড়ানো বুড়োটে লোকটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ারে বসে ঠ্যাং তুলে ফেলল। বলল—ডিভোর্সের মামলা বড়ো সোজা নয় হে।

নবীন ভ্রূ কুঁচকে বলল—ও পক্ষ কোনো জবাব দিয়েছে?

জবাব এত টপ করে দেবে? অত সোজা নাকি? যা সব আর্গুমেন্ট দিয়েছি তার জবাব ভেবে বের করে মুসাবিদা করতে দুঁদে উকিলের কালঘাম ছুটে যাবে। তবে এও ঠিক কথা 'ডিভোর্স' জিনিসটা অত সহজ নয়।

নবীন গম্ভীর মুখে বলে—শক্তটাই বা কী? রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি ডিভোর্স হচ্ছে দেখছি।

আরে না। সরকার ডিভোর্স জিনিসটা পছন্দ করে না। আইনের অনেক ফ্যাঁকড়া আছে। যা হোক সে নিয়ে আমি ভাবব, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। খরচাপাতি কিছু দেবে নাকি আজ?

খরচ আবার কী? নবীন অবাক হয়ে বলে—এখনও মোকদ্দমা শুরুই হয়নি।

আছে, আছে। মোকদ্দমা শুরু হয়নি বলে কী আর উকিলের বসে থাকলে চলে? আইনের পাহাড়প্রমাণ বই ঘাঁটতে হচ্ছে না? এই যে মাঝে মাঝে এসে খবর দিচ্ছি, এর জন্যও তো কিছু পাওনা হয় বাপু। মহেশ উকিলের সঙ্গে বাজারদর নিয়ে কথা বলতে গেলে পর্যন্ত ফিজ চায়।

নবীন বেজার হল। তবে বলল—ঠিক আছে, কাল সকালে কারখানায় যাওয়ার সময় দুটো টাকা দিয়ে আসবখন। মোকদ্দমাটা বুঝছেন কেমন?

অক্ষয় শালটা খুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলে, সোজা নয়। তোমার বউ বাগড়া দিতে পারে। তারও অনেক পয়েন্ট আছে। সবচেয়ে মুশকিল হল মাসোহারা নিয়ে।

নবীন খেঁকিয়ে উঠে বলে—মাসোহারাই যদি দেব তবে আর উকিলকে খাওয়াচ্ছি কেন?

সান্ত্বনা দিয়ে উকিল বলে—সেই নিয়েই তো ভাবছি। ওরা কী কী পয়েন্ট দেবে, আর আমাদেরই বা কী কী পয়েন্ট সেসব গুছিয়ে ভাবতে হচ্ছে। তোমার বউ যদি বলে যে শ্বশুরবাড়িতে তার ওপর খুব অত্যাচার হত?

অত্যাচার আবার কী? মা, খুড়ি একটু খিচখিচ করত, তা অমন সব মা, খুড়িই করে। ভারি বেয়াড়া মেয়েছেলে, কাউকে গ্রাহ্য করত না। উলটে মুখ করত, বিনা পারমিশনে সিনেমায় যেত, যেসব বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঝগড়া সেইসব বাড়িতে গিয়ে আমাদের নিন্দে করে আসত।

মারধর করা হয়নি তো?

কস্মিনকালেও না। বরং ও-ই উলটে আমার হাত খিমচে দিয়েছিল। একবার কামড়েও দেয়। আমি দু-একটা সটকান মেরেছি হয়তো। তাকে মারধর বলে না।

চরিত্রদোষ ছিল কি? থাকলে একটু সুবিধে হয়। ডিভোর্সের বদলে অ্যানালমেন্ট পেয়ে যাবে, মাসোহারা দিতে হবে না।

ছিল কি আর না? তবে সেসব খোঁজখবর আর কে নিয়েছে!

অক্ষয় উকিল উঠতে উঠতে বলে—কোন পয়েন্ট টিকবে, কোনটা টিকবে না বলা শক্ত। ভাবতে হবে। তুমি বরং কাল চারটে টাকাই দিয়ে যেয়ো।

জ্বলন্ত চোখে নবীন চেয়েছিল। অক্ষয় উকিলের আসল রোজগার হল জামিন দেওয়া। সস্তা হয় বলে নবীন ধরেছে, কিন্তু এখন ভারি সন্দেহ হচ্ছে তার যে লোকটা এজলাসে দাঁড়িয়ে সব গুলিয়ে না ফেলে।

জ্যোৎস্নাটা আর তেমন ভালো বলে মনে হল না নবীনের। গলায় গানও এল না। নিজের বিবাহিত জীবনের ভুল-ভ্রান্তিগুলো মনে হয়ে খুব আপশোশ হচ্ছে। ঢ্যামনা মেয়েছেলেটাকে সে চিরকালটা প্রশ্রয় দিয়েছে। উচিত ছিল ধরে আগাপাশতলা ধোলাই দেওয়া। তাহলে হাতের সুখের একটি স্মৃতি থাকত। এখন দাঁত কিড়মিড় করে মরা ছাড়া গতি নেই। আদালতে তো বড়োজোর বিয়ে ভেঙে দেবে, তার বেশি কিছু করবে না। আইনে মারধরের নিয়ম নেই কিন্তু থাকা উচিত ছিল।

কাউকে কিছু না বলে লক্ষ্মী সটকে পড়েছিল। প্রথমে সবাই ধরে নিয়েছিল, অন্য কারও সঙ্গে ভেগেছে। পরে খবর এল, তা নয়। বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। তাতে খানিকটা স্বস্তিবোধ করছিল নবীন। মুখটা বাঁচল। কিন্তু সেই থেকে তার লোহা-পেটানো হাত-পা নিশপিশ করে।

সকালে কারখানা যাওয়ার পথে অক্ষয় উকিলের চেম্বারে উঁকি দেয় নবীন। চেম্বারের অবস্থা শোচনীয়। ওপরে টিনের চালওলা পাকাঘরের চুন বালি গত বর্ষার স্যাঁৎসেঁতে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ঝুরঝুর করে সব ঝরে পড়ে যাচ্ছে। উকিলের নিজস্ব চেয়ারের গদি ফেড়ে গিয়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। তিন আলমারি বইতে উই লেগেছে, আলমারির গায়ে উইপোকার আঁকাবাঁকা মেটে সুড়ঙ্গ। বই অবশ্য নকল, মক্কেলদের শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য সাজিয়ে রাখা, বেশির ভাগ বই-ই ডামি। ওপরে মলাট, ভেতরটা ফোঁপরা। মক্কেলহীন ঘরে বসে অক্ষয় উকিল গতকালের শালটা গায়ে দিয়ে নাতিকে অঙ্ক কষাচ্ছে। চারটে টাকা পেয়ে গম্ভীর মুখে বলল—এ মামলা তুমি জিতেই গেছ ধরে নাও।

নবীন নিশ্চিন্ত হল না।

৩

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে আসে। ওভারটাইম খেটে বেরোতে বেরোতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

কারখানা ছাড়িয়ে বাজারের পথে পা দিতেই মোড়ের মাথায় শুকনো মুখে তার শ্বশুর দুর্গাপদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু থমকাল নবীন। কথা বলা উচিত কিনা ভাবছে। লোকটা তেমন খারাপ নয়।

নবীনকে বলতে হল না, দুর্গাপদই শুকনো মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে এগিয়ে এল—সব ভালো তো?

নবীন বে-খেয়ালে প্রণাম করে ফেলে। বলে—মন্দ কী?

দুর্গাপদ শুকনো ঠোঁট জিভে চেটে বলে—এদিকে একটু বিষয় কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।

নবীনও ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করে—ওদিকে সব ভালো?

দুর্গাপদ হতাশ মুখে বলে—ভালো আর কই? তুমি উকিলের চিঠি দিয়েছ। আমি অতশত ইংরিজি বুঝি না, তবে পড়ে মনে হল, ডিভোর্স-টিভোর্স কিছু একটা কথা আছে।

নবীন বিনীতভাবেই বলল—তাই লেখার কথা। ঠিকমতো লিখেছে কিনা কে জানে? আইনের ইংরিজির অনেক ঘোরপ্যাঁচ।

দুর্গাপদ বলে—শুধু ইংরিজি কী, উকিলের মুখের কথাও ভালো বোঝা যায় না। দু-বারে কড়কড়ে পঞ্চাশটা টাকা দিলাম দুটো মুখের কথা শোনার জন্য। ডিভোর্স ঠেকানোর নাকি উপায় নেই, বলছে উকিল। আমরা তবু ঠেকাতেই চাই।

নবীন গম্ভীর হয়ে বলে—আমার উকিল বলছে ডিভোর্স পাওয়া নাকি খুব শক্ত। সরকার নাকি ডিভোর্স পছন্দ করে না।

কারও কথাই বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে লক্ষ্মীর মা বলছে, ডিভোর্স নাকি বেআইনি। পুলিশ খবর পেলে জেল দেবে।

নবীন হাসল।

দুর্গাপদ করুণ নয়নে চেয়ে বলল—হাসছ বাবা? লক্ষ্মীর মা যে কীভাবে আমার জীবনটা ঝাঁঝরা করে দিল তা যদি জানতে।

লোহা-পেটানো শরীরটা গরম হয়ে গেল নবীনের মেনিমুখো শ্বশুরের কথা শুনে। ঝাঁকি দিয়ে বলল—স্ট্রং হতে পারেন না? মেয়েছেলেকে দরকার হলে চুলের মুঠি ধরে কিলোতে হয়।

একথায় দুর্গাপদও গরম হয়ে বলল—বেশি বোলো না বাবাজীবন! তুমি নিজে পেরেছ? পারলে উকিলের শামলার তলায় গিয়ে ঢুকতে না!

একথায় নবীন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

৪

সিনেমা থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মীর খুব উদাস লাগছিল। দুনিয়ার কাউকে সে গ্রাহ্য করে না, শুধু এই উদাস ভাবটাকে করে। এই যে কিছু ভালো লাগে না? উদাস লাগে, এই দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে ভারি আলাদা মনে

হয়, এই যে সিনেমা দেখেও মন ভালো হতে চায় না—এই তার রোগ। ভেতরে নাড়াচাড়া নেই, নিথর, ভ্যাতভ্যাতে পান্তার মতো জল-ঢ্যাপসা একটা মন নেতিয়ে পড়ে আছে।

সিনেমা-হলের বাইরে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে চেয়ে থাকে লক্ষ্মী। কোথায় যাবে তা যেন মনে পড়তে চায় না।

লক্ষ্মী একটা রিকশা নিল। স্টেশনে এসে উদাসভাবেই নৈহাটির ট্রেনে উঠে বসল। নিজের কোনো কাজের জন্য কখনো কাউকে সে কৈফিয়ত দেয় না।

উঠোনে ঢুকতেই নেড়ি কুকুরটা ভ্যাক ভ্যাক করে তেড়ে এসে ল্যাজ নেড়ে ফুইফুই করে গা শোঁকে। কচুপাতা একটু গলা বাড়িয়ে গায়ে একটা ঝাপটা দেয়।

প্রথমটা কেউ টের পায়নি। কয়েক মুহূর্ত পরেই সারাবাড়িতে একটা চাপা শোরগোল পড়ে গেল।

লক্ষই করল না লক্ষ্মী। উদাস পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে উঠল। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রাস্তার ধকলটা সামলাতে বড়ো বড়ো শ্বাস টানতে লাগল।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে! লক্ষ্মীর হয়তো একটু ঘুমই পেয়ে থাকবে। হঠাৎ ঘরে একটা বোমা ফাটল দড়াম করে। কানের কাছে একটা বিকট গলা বলে উঠল—উকিলের শামলার তলায় ঢুকেছি? কেন আমার হাত নেই?

বলতে না বলতেই চুলের গোছায় ভীষণ এক হ্যাঁচকা টানে লক্ষ্মী খাড়া হয়ে স্তম্ভিত শরীরে দাঁড়িয়ে রইল, গালে ঠাস করে একটা চড় পড়ল দু-নম্বর বোমার মতো, মেঝেয় পড়তে না পড়তেই নড়া ধরে কে যেন ফের দাঁড় করায়।

বিকট গলাটা বলে ওঠে—কার পরোয়া করি? কোনো উকিলের ইয়েতে তেল মাখাতে যাবে এই শর্মা? এই তো আইন আমার হাতে? বলি, পেয়েছে দুর্গাপদ দাস?

বলতে না বলতেই আর একটা, তত জোর নয়, থাপ্পড় পড়ল গালে।

লক্ষ্মীর গালে হাত। ছেলেবেলা থেকে এত বড়োটি হল কেউ মারেনি তাকে। এই প্রথম। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখো! মনের ম্যাদামারা ভাবটা কেমন কেটে যাচ্ছে। টগবগ করছে রক্ত! আর তো মনে হচ্ছে না পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নেই মানে? ভীষণভাবে সম্পর্ক আছে। ভয়ংকর নিবিড় সম্পর্ক যে।

মেঝেয় বসে লক্ষ্মী কাঁদতে লাগল হাঁটুতে মুখ গুঁজে। কিন্তু সে কাঁদতে হয় বলে কাঁদা। মনে মনে কী যে আনন্দে ভেসে যাচ্ছে সে!

দরজার একটু তফাত থেকে উঁকি মেরে দৃশ্যটা দেখে দুর্গাপদ হাঁ। বজ্জাত মেয়ে বটে। এত নাকাল করিয়ে নিজে এসেছে।

একমাত্র সন্তান মার খাচ্ছে বলে একটু কষ্টও হল দুর্গাপদর। কিন্তু লোভীর মতো জুলজুলে চোখে সে দেখলও দৃশ্যটা। ঠিক এরকমই দরকার কিছু লক্ষ্মীর মায়ের। দুর্গাপদ পেরে ওঠেনি। কিন্তু বহুদিনকার সেই পাকা ফোঁড়ার যন্ত্রণার মতো ব্যথাটা আজ যেন কেটে গিয়ে টনটনানি কমে গেল অনেক।

পরিশ্রান্ত নবীন ঘরে শিকল তুলে বেরিয়ে এলে পর দুর্গাপদ গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে হাসি হাসি মুখে বলল—এই না হলে পুরুষ।

রাত্রিবেলা লক্ষ্মী নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল বাবাকে। মার খেয়ে মুখ-চোখ কিছু ফুলেছে। কিন্তু সেটা নয়, দুর্গাপদ লক্ষ করল লক্ষ্মীর চোখ দু-খানায় আর সেই পাগুলে চাউনি নেই। বেশ জমজম করছে মুখ-চোখ।

লক্ষ্মী বলল—বাবা, রাতটা থেকে যাও না কেন?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে ম্লানমুখে বলে—ও বাবা, তোর মা কুরুক্ষেত্র করবে তাহলে। চিনিস তো!

দুর্গাপদ জানে সকলের দ্বারা সব হয় না। নিয়তি কেন বাধতে।

খগেনবাবু

নলতাপুরের বাসে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সামনের দিকে খগেনবাবুকে দেখতে পেল দিগম্বর। অন্তরাত্মা পর্যন্ত চমকে উঠল। নলতাপুরের বাসে খগেনবাবু কেন? ইদিকে তো ওনার আসার কথাই নয়। তবে কী এত বছর বাদে খবর হয়েছে?

মেয়েদের সিটে এঁটে বসে আছে জুঁইফুল। সংক্ষেপে জুঁই। জায়গা নিয়ে একটু আগে ক্যাটর ক্যাটর করে ঝগড়া করেছে অন্য সব মেয়েমানুষদের সঙ্গে। তারা বলছে, জায়গা নেই। জুঁই বলছে, ঢের জায়গা, চেপে বসলেই হয়। সেই কাজিয়ায় দিগম্বর নাক গলায়নি। জুঁইয়ের গলার জোরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পারেও বটে মেয়েটা। সীটে গায়ে গায়ে মেয়েমানুষ বসা, সরষে ছড়ালেও পড়বে না এমন অবস্থা। তার মধ্যেই ঠিক ঠেলে গুঁতিয়ে জায়গা করে বসেছে। খুব আরামে না হলেও বসেছে তো। এখন দিব্যি ঘাড় ঘুরিয়ে চলন্ত বাস থেকে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

জুঁইয়ের মুখোমুখিই প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল দিগম্বর। প্রাইভেট বাস, কনডাক্টর ঠেলে লোক তোলে, যতক্ষণ-না বাসের পেট ফাটো ফাটো হয়। ফলে লোকের চাপে ঠেলা খেতে খেতে অনেকটা সরে এসেছে সে। আরও সরত, সামনে এক বস্তা গাঁটি কচু থাকায় ঠেকে গেছে। এখান থেকেই জুঁই মাত্র হাত তিনেক তফাতে। কিন্তু মাঝখানে বিস্তর কনুই, হাত, জামা আর মাথার জঙ্গল থাকায় তিন হাতই এখন তিনশো হাত। আর বাসের মধ্যে চতুর্দিকে এমন গন্ডগোল হচ্ছে যে, খুব চেঁচিয়ে না ডাকলে জুঁই শুনবেও না।

কিন্তু জানান দেওয়াটা একান্ত দরকার। একেবারে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা দাঁড়াল কিনা ব্যাপারটা। আর কেউ নয়, স্বয়ং খগেনবাবুই বাসে সামনের দিকে।

একটু আগে জুঁই যখন চেঁচিয়ে ঝগড়া করছিল তখন তার গলা খগেনবাবুর কানে যায়নি তো! এতদিনে অবশ্য জুঁইয়ের গলার স্বর খগেনবাবুর ভুলে যাওয়ারই কথা। আর বাসের কে না চেঁচাচ্ছিল তখন? অত চেঁচামেচিতে কে কার গলা চিনবে!

সুবিধে এই যে, বাসে একেবারে গন্ধমাদন ভিড়। একটু আগে দিগম্বর ভিড়ের জন্য কনডাক্টরকে দু-কথা শুনিয়েছেন, পয়সাটাই চিনলে, মানুষের সুখ-দুঃখ বুঝলে না। আমাদের কী গোরু-ছাগল পেয়েছ, নাকি তামাকের বস্তা? এখন অবশ্য দিগম্বর মনে মনে বলছে, ভিড় হোক, বাবা, আরও ভিড় হোক। গাড়ির পেট একেবারে দশমেসে হয়ে যাক।

খগেনবাবুকে দেখেই ঘাড়টা নামিয়ে ফেলেছে দিগম্বর। এখনও সেটা নোয়ানো অবস্থাতেই আছে। সুযোগ বুঝে পেছন থেকে কে হাত ভেরে যাওয়ায় নিজের হাতব্যাগটা আলতো করে তার কাঁধে রেখেছে। অন্য সময় হলে খেঁকিয়ে উঠত, এখন কিছু বলল না। বরং ব্যাগটার আড়াল থাকায় একরকম স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তিটা বড়ো ঠুনকো। সানকিডাঙায় বেশ কিছু লোক নেমে যাবে, হত্তুকিগঞ্জে আজ হাটবার—সেখানে তো বাস একেবারে শুনশান হয়ে যাওয়ার কথা, তবে উঠবেও কিছু সেখান থেকে। কিন্তু তা ওঠা-নামার ফাঁকেই খগেনবাবু যে পেছনে তাকাবেন না এমন কথা হলফ করে কী বলা যায়? জুঁইকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। এদিকে তাকাচ্ছেও না। নতুন নতুন কারণে-অকারণে তাকিয়ে থাকত। পুরোনো হওয়ায় এখন আর চোখেই পড়ে না।

ভেবে একটু অভিমান হচ্ছিল দিগম্বরের। এই যে সে ভালোমানুষদের চাপে অষ্টাবক্র হয়ে গাঁটি কচুর বস্তায় ঠেক খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার জন্য 'আহা উহু' করার আছে কে দুনিয়ায়?

কিন্তু অভিমানের সময় নেই। জানান দেওয়াটাই এখন ভীষণ দরকার। গলা তুলে ডাকতে পারছিল না দিগম্বর। খগেনবাবু শুনে ফেলবে। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জুঁইয়ের প্লাসটিকের চটি-পরা একটা পা একটু এগিয়ে আছে। চেষ্টা করলে পা বাড়িয়ে জুঁইয়ের পা-টা ছোঁয়া যায়।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে যেই পা তুলেছে অমনি হড়াস করে কচুর বস্তায় বসা লোকটার কোলসই হয়ে গেল দিগম্বর। লোকটা খুন হওয়ার আগে যেমন মানুষে চেঁচায় তেমনি চেঁচাতে থাকে, ওরে বাবারে! গেলাম! গেলাম!

দিগম্বর বুঝল, হয়ে গেছে। এই গোলমালে খগেনবাবু নিশ্চয়ই তাকাবে। সে মুখ তুলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ! চুপ!

লোকটা কোঁকাতে কোঁকাতেও তেজের সঙ্গে বলে, কেন চুপ করব? চুরি করেছি নাকি? কোথাকার ঢ্যামনা হে তুমি? ওপরের শিক ভালো করে ধরতে পারো না? ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

কাঁকালে লেগেছিল দিগম্বরের। গাঁটি কচু যে বাসের ছাদেই ওঠানো উচিত, বাসের ভেতরে নয়, সে-কথাটা তুলতে পারত। কিন্তু খগেনবাবুর ভয়ে বলল না কিছু।

ভেবেছিল চেঁচামেচি শুনে সবাই তাকাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে বুঝল, চারদিকে হাটুরে গন্ডগোলে ব্যাপারটা লোকে গ্রাহ্যই করেনি। জুঁইও আচ্ছা লোক বটে। সামনেই এত বড়ো কান্ড ঘটে গেল, একবার তাকাবে তো! তা নয়, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঠঘাট দেখছে।

বাস থামে। চলে। আবার থামে। দিগম্বরের দু-জোড়া থাকলে ভালো হত। তবু সাধ্যমতো সে খগেনবাবু আর জুঁইয়ের দিকে নজর রাখে। খগেনবাবুর কপালের বড়ো আঁচিলটা এখনও দিব্যি আছে। মাথার চুলে বাঁকা টেরি। গায়ে সেই একপেশে বোতামঘরওলা পাঞ্জাবি। জুঁই কালো রঙের মধ্যেই আরও ঢলঢলে হয়েছে। চোখ দু-খানা আগের মতো চঞ্চল নয়। ধীরস্থির।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দিগম্বর। পাপ কাজ করলে ধরা পড়ার ভয়ও থাকে বটে। কিন্তু এই হাওড়া জেলার নলতাপুরের বাসে খগেনবাবুর দেখা পাওয়ার কথাই নয়। পেট থেকে একটা ভয়ের ভুড়ভুড়ি গলায় উঠে আসায় দিগম্বর একটা ঢেঁকুর তুলল।

জুঁইয়ের মাথার ওপর দিয়ে কে একজন জানলায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বগলটা জুঁইয়ের নাকের ডগায়। জুঁই দুর্গন্ধ পাওয়ার মতো নাক কুঁচকে মুখ তুলে বগলবাজকে কী যেন বলল। জয় মা! যদি এবার তাকায়!

তা তাকালও, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিঁড়েচ্যাপটা দিগম্বরকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বগলবাজ ধমক খেয়ে তার বগল গুটিয়ে নিয়েছে। যত সব মেনিমুখো পুরুষ। বগলটা আর একটু রাখলে আবার তাকাত জুঁই।

সানকিডাঙা! সানকিডাঙা! দিগম্বরের পিলে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কনডাক্টর।

বাস থেমেছে। হুড়হুড় করে লোক নামছে। দিগম্বর পাটাতনে উবু হয়ে বসে আছে। সর্বনাশ! বাস খালি হয়ে যাবে নাকি! নেমেই যাচ্ছে যে!

উবু হওয়ায় জুঁইয়ের চটির ডগাটা হাতের কাছে পেয়ে গেল সে। ভিড়ও অনেক হয়েছে। হাত বাড়িয়ে একবার নাড়ল। কচুওয়ালা বড়ো বড়ো চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। কিছু বলতে মুখটা ফাঁকও করেছিল বোধ হয়। কিন্তু তা দেখার অত সময় নেই দিগম্বরের।

জুঁই পা-টা পট করে টেনে নিয়েই সোজা তাকাল তার দিকে। বলল, ও কিগো?

এমন সুযোগ আর আসবে না। দিগম্বর একটু হামা টেনে মুখটা কাছে নিয়ে বলল, বাসের সুমুখ দিকে খগেনবাবু। তাকিও না বোকার মতো। ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বোসো।

শুনে কেমনধারা ফ্যাকাশে মেরে গেল জুঁই। দু-বার বলতে হল না। ফট করে ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে ফেলল।

সানকিডাঙায় নামল যত, উঠলও তত। আবার ঠাসা-চাপা গন্ধমাদন ভিড়। তবে দিগম্বর বসেছিল, বসেই রইল। দু-একজন হাঁটুর গুঁতো দিয়ে অবশ্য দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। বলল, দাঁড়াও! দাঁড়াও! বসলে জায়গা আটকে থাকে। দিগম্বর কাতর মুখ করে বলল শরীর খারাপ। বড়ো বমি আসছে। শুনে লোকজন আর কিছু বলল না, বরং একটু তফাতে চেপে থাকারই চেষ্টা করতে লাগল। কচুওয়ালা মহাত্যাঁদড়। কিছু আঁচ করে মাঝে মাঝে শেয়ালের মতো চাইছে। দিগম্বর তার দিকে চেয়ে দেঁতো হাসি হেসে বলল, হত্তুকিগঞ্জের হাটে যাচ্ছ নাকি? কচুওয়ালা দিগম্বরকে পাত্তা না দিয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছোটোলোক আর বলে কাকে!

বসে থেকে চারদিকে বাঁশবনের মতো লোকের পা দেখে দিগম্বর। পা দেখে কে কেমন লোক তা বোঝা যায় না। মুখ দেখে যায়। বেশির ভাগ পা-ই প্যান্ট ধুতি পায়জামা আর লুঙ্গিতে ঢাকা। এর ফাঁকফোকর দিয়ে অবশ্য জুঁইকে দেখতে পাচ্ছে দিগম্বর। কান্ড দেখো! জুঁই গলা টানা দিয়ে ঘোমটা ফাঁক করে সামনের দিকে চাইছে মাঝে মাঝে। মেয়েমানুষ কোনোকালে কথা শুনবে না। হাঁ-হাঁ করে ওঠে দিগম্বর, কিন্তু তার কথা জুঁইয়ের কানে যায় না। মেরে বসে আরও কষ্ট। হাঁটু ঝিনঝিন করে এত টাইট বসে থাকায়। চারদিকে পা, তার ঠেলাও কম নয়। কচুর গাঁটটায় এক হাতে ভর দিতে গিয়েছিল, কচুওয়ালা তেরিয়া হয়ে বলল, ভর দেবে না। কচু থেঁতলে যাবে। দিগম্বর ফোঁস করে ওঠে, আর তুমি যে বসেছ কচুর ওপর। কচুওয়ালা তার জবাব দিল, আমার কচু। আমি বসব, তোমার তাতে কী যায়-আসে?

বিপদে পড়লে সবাই মাথায় চড়ে। দিগম্বর আর কথা বাড়ায় না।

কখন যেন একটা মেয়েছেলে নেমে যাওয়ায় জুঁই একটু এগিয়ে এসে বসতে পেরেছে। এখন প্রায় দিগম্বরের মুখোমুখি। হঠাৎ ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা নামিয়ে এনে বলল, কোথায় দেখলে? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো।

দিগম্বর দাঁত কিড়মিড় করে। আহা, দেখার জন্য একেবারে আঁকুপাঁকু যে। দু-দুটো বউ পেরিয়েও মেয়েছেলেদের আজও ধাঁধা লাগে দিগম্বরের। কী যে চায় তা ওরাই জানে।

সে চাপা ধমক দিয়ে বলল, আছে, আছে। ঘোমটা টেনে চুপ মেরে বসে থাকো। খবরদার তাকাবে না!

কচুওয়ালা সব শুনছে। ভারি লজ্জা লাগে দিগম্বরের।

ভুল দেখোনি তো! জুঁই বলে।

জলজ্যান্ত খগেনবাবু। ভিড় টপকে দেখবে কী করে? দাঁড়ালে দেখা যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে দেখব?

আ মোলো! একজন বসা মেয়েমানুষের হাঁটুতে কপালটা ঠুকে গেল দিগম্বরের। বলল, পাগল হলে নাকি?

আহা আমার তো ঘোমটা আছে। দেখব?

মরবে! বলছি, মরবে!

জুঁই আবার সোজা হয়ে বসে। দেখার চেষ্টা করে না ঠিকই। তবে বে-খেয়ালি ঘোমটা অনেক সরে গেছে।

হত্তুকির হাট! হত্তুকির হাট! কনডাক্টর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

খগেনবাবু কোথায় নামবে তা জানা নেই। কাঁটা হয়ে থাকে দিগম্বর। চারদিকে পায়ের যে ঘন বাঁশবন ছিল তা এক লহমায় ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেল। হত্তুকির হাট জায়গাটা বড়ো ভয়ের। এখানেই সবচেয়ে বেশি লোক নামে। এমনকী কচুওয়ালা পর্যন্ত তার গাঁট কাঁধে তুলছে। সামনে একটা আড়াল ছিল। তাও গেল। গাঁট তুলতে তুলতে কচুওয়ালা কটমট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। কিছু লোক আছে কিছুতেই অন্য মানুষকে ভালো চোখে দেখে না।

দিগম্বর চোখ বুজে ভগবানকে বলছিল, খগেনবাবুর যেন এখানেই কাজ থাকে।

বেহায়া মেয়েছেলেটাকে দেখো। ঘোমটা প্রায় খসে পড়েছে। মুখখানা উদোম খোলা। গলা টানা দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে ড্যাবা ড্যাবা চোখে। লজ্জার মাথা খেয়ে দিগম্বর জুঁইয়ের কাপড় ধরে টান দিল। চাপা গলায় বলল, বসে পড়ো। বসে পড়ো!

জুঁইয়ের জ্ঞান ফেরে। ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দেয়। তারপর কুঁজো হয়ে দিগম্বরকে বলে, দেখেছি।

দিগম্বর কটমট করে তাকায়। বলে— উদ্ধার করেছ। তোমাকে দেখেছে?

না। এদিকে তাকাচ্ছে না। সঙ্গে কারা আছে মনে হল। তারা বসে আছে বলে দেখা গেল না। আবছা যেন মনে হয়, বউমতো কেউ। তার সঙ্গে কথা বলছে আর সিগারেট খাচ্ছে। বলেই জুঁই আবার সোজা হয় এবং ফের অবাধ্য হয়ে সামনের দিকে টালুকটুলুক চেয়ে থাকে।

বাসের মাথায় ধমাধম মাল চাপানোর শব্দ হচ্ছে। বিস্তর চেঁচামেচি। কাতারে লোক উঠছে ভেতরে। অনেক ধমক চমক অপমান সয়েও দিগম্বর বসেই থাকে। সামনে বাঁশগেড়ের খাল। পুরোনো পোল দু-বছর আগের বানে ভেসে গেছে। নতুন পোল তৈরি হচ্ছে সবে। ফলে বাস ওপরে যায় না। যাত্রীরা একটা বাঁশের সাঁকো পায়ে হেঁটে পেরিয়ে ওপাশে বাস ধরে। বাঁশগেড়েতে বাস থেকে নামলে কী হবে তাই ভাবে দিগম্বর, আর বিরক্ত চোখে জুঁইয়ের কান্ড দেখে! নতুন নতুন যেমন তাকে অপলক চোখে দেখত, এখন ঠিক সেই চোখে সামনের দিকে চেয়ে খগেনবাবুকে দেখছে! মেয়েছেলেদের কি ভয়ভীতি নেই?

ভিড়টা আবার চেপে আসার পর বুকে আটকানো দম ছাড়ে দিগম্বর। জুঁই এখনও দেখছে। বিরক্তি কেটে এবার একটু মায়া হল দিগম্বরের। জুঁইকে দোষ দেওয়া যায় না। একসময়ে তো খগেনবাবুরই বিয়ে-করা বউ ছিল জুঁই! চার-পাঁচ বছর সুখে-দুঃখে টানা ঘরও করেছে। তারপর না হয় পালিয়ে এসেছে দিগম্বরের সঙ্গে। তা বলে তো আর সব কিছুই ভুলে যাওয়া যায় না। দিগম্বরের সঙ্গে আছে মাত্র চার বছর, ভুলে যাওয়ার পক্ষে সময়টাও বেশি যায়নি। বাচ্চাকাচ্চা হয়েছিল না ভাগ্যিস! হলে এতক্ষণে বোধ হয় গিয়ে হামলে পড়ত।

জুঁই হঠাৎ আবার নীচু হল। বলল, সঙ্গের জন মেয়েছেলেই বটে, বুঝলে!

হোক না। দিগম্বর তেতোমুখে বলে।

মুখটা দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য। নীল রঙের শাড়ি, জরির পাড়।

তোমাকে দেখেনি তো!

না। দুজনে খুব কথা হচ্ছে।

হোক। তুমি মুখ ঘুরিয়ে থাকো!

পান খেল এইমাত্র। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলতে দেখলাম। মেয়েছেলেটাই পান দিল।

দিকগে। অত দেখো না, ধরা পড়ে যাবে।

জুঁই ভ্রূ কুঁচকে বলে, মেয়েছেলেটা কে বলো তো? বউ নাকি?

কে বলবে! তুমিও যা জানো, আমিও তাই।

খুব বলত, আমি মরে গেলে নাকি আর বিয়ে করবে না।

আহা, তুমি তো আর মরে যাওনি!

মরার চেয়ে কম কী? মেয়েমানুষের কতরকম মরণ আছে, জানো?

জুঁই আবার সোজা হয়।

বাঁশগেড়ে এসে গেল বলে। বসে থেকেও বুঝতে পারে দিগম্বর। এইবার নামতে হবে। ভাবতে শরীর হিম হয়ে আসে। মাঝখানে শুধু পাথরগড়ে একটুখানি থামবে। তা সে পাথরগড়েই থামল বোধ হয়। কারা যেন নামল সামনের দরজায়। এখানে বেশি লোক নামেও না, ওঠেও না। তাই নামবার তেমন হই-রই নেই। তবু বোঝা গেল কারা যেন নামছে। খগেনবাবুই কী?

জুঁইয়ের শাড়ি ধরে আবার একটু টান মারে দিগম্বর। জুঁই নীচু হয়।

কী বলছ?

কারা নামল?

কী করে জানব? কত লোক নামছে-উঠছে। কেন?

ওরা কিনা?

জুঁই ফিক করে এই বিপদের সময়ে একটু হাসেও। বলে, না। কর্তা বসার জায়গা পেয়েছেন। এদিকে পেছন ফেরানো। ভয় নেই। মেয়েমানুষটাকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না।

দেখতে চাইছ কেন?

দেখি না কীরকম।

ভালোই হবে। খগেনবাবুর মেলা পয়সা। ভালো মেয়েছেলেই পাবে। তুমিও তো খারাপ ছিলে না।

আমি তো কালো।

রংটাই কী সব?

জুঁই মুখ গোমড়া করে বলে, কর্তা অবশ্য কোনোদিন কালো বলেনি। বরং বলত, মাজা রং-ই আমার পছন্দ।

এদিকে কোথায় যাচ্ছে বলো তো। দিগম্বর জিজ্ঞেস করে।

কী জানি।

আত্মীয়স্বজন কেউ নেই তো?

না। তবে শ্বশুরবাড়ি হতে পারে।

দুর। এদিকে বিয়ে হলে সে খবর আমি ঠিক পেতাম।

জুঁইয়ের কথা বলায় মন নেই। আবার সোজা হয়ে বসে দেখছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে প্রায়।

এই করতে করতে বাসটা থেমে এল প্রায়। কনডাক্টর ছোকরা তেজি গলায় চেঁচাল, বাঁশগেড়ে, বাঁশগেড়ে। বাস আর যাবে না।

ঘচাং করে বাসটা থামতেই হুড়ুম-দুড়ুম লোক নামতে থাকে। জুঁই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দিগম্বর হাত ধরে টেনে বলল, দেখেশুনে! দেখেশুনে!

জুঁই হাঁ করে চাইল দিগম্বরের দিকে, যেন চিনতেই পারছে না। চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ যেন চেতন হয়ে বলে উঠল, ফর্সা, খুব ফর্সা। বুঝলে!

কে?

বউটা।

হোক না। তাতে তোমার কী?

জুঁই মাথা নেড়ে বলে, কিছু না। বললাম আর কী।

সাবধানে মাথা তোলে দিগম্বর। ভিড়ের প্রথম চোটটা নেমে গেছে। ধীরেসুস্থে খগেনবাবু উঠল। ফর্সা মেয়েছেলেটাও। খগেনবাবু মেয়েছেলেটার কোল থেকে একটা বছর খানেকের খোকাকে নিজের কোলে নিল। বলল, সাবধানে নেমো।

জুঁই প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, খোকাটা দেখেছ! কী সুন্দর নাদুসনুদুস।

আর একটু হলেই খগেনবাবু ফিরে তাকাত। ধুতির খুঁটটা সিটের কোণে আটকে যাওয়ায় সেটা ছাড়াচ্ছিল বলে তাকিয়েও তাকাল না। সেই ফাঁকে পেছনের দরজা দিয়ে জুঁইয়ের হাত ধরে টেনে নেমে পড়ে দিগম্বর। বাসের পেছনে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, তোমার মতলবখানা কী বলো তো! বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেল নাকি?

জুঁই হাঁ করে দিগম্বরের দিকে তাকায়। মেঘলা আকাশের ফ্যাকাশে আলোয় ওর মুখখানা দেখায় যেন ঘোরের মধ্যে আছে। চিনতে পারছে না দিগম্বরকে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চিনতে পারল যেন। বলল, বিয়েই করেছে তাহলে।

করবে না কেন? দুনিয়ায় কে কার জন্য বসে থাকে?

জুঁই মাথা নেড়ে ভালো মানুষের মতো বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।

দিগম্বর উঁকি দিয়ে দেখল বহু মানুষ বাঁশের সাঁকো পেরোতে লাইন দিয়েছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। তার মধ্যে খগেনবাবু বা সেই ফর্সা মেয়েছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে ধীরে ধীরে দিগম্বর আর জুঁই এগোয়। দেরি হয়ে গেছে। ওপারের বাসে আর বসার জায়গা পাবে না তারা। কিন্তু সেকথা কেউ ভাবছে না।

সাঁকোটা নড়বড় করে দোলে। মেলা লোকের পায়ের চাপে মড়মড় শব্দ উঠছে। কখন ভাঙে তার ঠিক নেই। খুব সাবধানে জুঁই আগে, দিগম্বর তার পিছু পিছু সাঁকোতে ওঠে। নীচে ভর বর্ষার খাল গোঁ গোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টানে সাঁকো থরথর করে কাঁপে। সবটাই ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে একেবারে জমিতে পা দেওয়ার মুখে জুঁইয়ের পা ফসকাল।

উরে বাবা:! বলে টাল্লা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে কিন্তু গায়ে গায়ে মেলাই লোক, পড়বে কোথায়। তাই পড়ল না জুঁই। একজনের পিঠে ধাক্কা খেয়ে সেই পিঠেই হাতের ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠল।

একটা খোকা কেঁদে উঠল হঠাৎ। লোকটা মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলে, দেখেশুনে চলবে তো মেয়ে! আর একটু হলেই ছেলেটা ছিটকে পড়ত।

জুঁই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিগম্বরের বুক হিম হয়ে যায়। লোকটা খগেনবাবু। কোত্থেকে যে উদয় হল হঠাৎ।

দুজনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে তার সাধ্য কী? সাঁকোর সরু মুখে ঠেলাঠেলি দৌড়োদৌড়ি। কে আগে যাবে! তাই দুজনকেই এগোতে হল।

সামনেই খগেনবাবু যাচ্ছে! কোলের খোকাটা চুপ করে চেয়ে দেখছে পিছনবাগে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দিগম্বরের। চাপা স্বরে বলে, চিনতে পারেনি।

জুঁই ফিরে চায়। তেমনি ভ্যাবলা আনমনা মুখ। চোখের দৃষ্টিতে যেন সর পড়েছে। কিছু দেখছে না যেন।

কিছু বলছ?

বললাম, কপালটা ভালো। আমাদের চিনতে পারেনি।

বউটাকে দেখলে ভালো করে?

ও আর দেখব কী? রংটাই যা ফর্সা।

জুঁই মাথা নাড়ে, না, মুখটাও সুন্দর।

থ্যাবড়া মুখ। তোমার মতো বড়ো বড়ো চোখ নয়।

তুমি তো ভয়ে চামচিকে হয়ে আছ, দেখলে কখন?

দেখেছি।

ছাই দেখেছ। বউটা সুন্দরীই।

আমার চোখে লাগল না।

জুঁই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা। দেখো ওরা মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে।

দুজনেই দাঁড়িয়ে যায়। কাঁচা সরু রাস্তায় লোকের ঠেলাঠেলি। বাসটা সামনেই দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে। তার গায়ে লোকে গিয়ে পিঁপড়ের মতো জমাট বাঁধছে।

পথ ছেড়ে দুজনে ঘাসজমিতে সরে দাঁড়ায়। দেখে খগেনবাবু কোলে বাচ্চা আর পেছনে বউ নিয়ে মাঠের পথ ধরে পুবমুখো যাচ্ছে।

দিগম্বর বলল, এ জায়গা হল দিঘরে। পুবে গামছাডোবা। গামছাডোবাতেই যাচ্ছে তাহলে।

জুঁই তেমনি আচ্ছন্ন ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলল, বেশ দেখাচ্ছে না?

বউবাচ্চা নিয়ে খগেনবাবু মেঘলা আকাশের নীচে মাঠ পেরিয়ে গামছাডোবায় যাচ্ছে, তাতে সুন্দর দেখানোর কী আছে বোঝে না দিগম্বর।

দেরি করলে চলে না। বাস ছাড়বে এখুনি। নলতাপুরে জুঁইয়ের দেড় বছরের মেয়েটা বড়োবউয়ের জিম্মায় আছে। বড়ো বউ আবার বেশিক্ষণ জুঁইয়ের বাচ্চা রাখতে হলে চেঁচামেচি করে। তার নিজেরই তিনটে।

দিগম্বর তাড়া দেয়, চলো চলো। দেরি হচ্ছে।

আঃ, দাঁড়াও না।

দাঁড়াব! বলো কী? এরপর সেই সাড়ে সাতটায় লাস্ট বাস।

হোকগে।

তার মানে?

জুঁই কথাটা শুনতে পায় না। সামনে আদিগন্ত খোলা হা হা করা মাঠে মেঘলা আলোর মধ্যে খগেনবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছে। সাবধানে আল পেরোচ্ছে। বউয়ের হাতে একটা চামড়ার ছোটো সুটকেস।

কনডাক্টর হাঁকাহাঁকি করছে জোরগলায়, নলতাপুর...নলতাপুর...চরণগঙ্গা।

দিগম্বর চেয়ে দেখে, বাসের বাইরে আর লোক পড়ে নেই। যে যেখানে পেরেছে উঠে পড়েছে। ছাদে পর্যন্ত।

জুঁইফুল! কী হচ্ছে শুনি! দিগম্বর একটু আদর মিশিয়ে ডাকে।

জুঁই জবাব দেয় না। তবে বড়ো বড়ো চোখে তাকায়। এরকম তাকানো কোনোকালে দেখেনি দিগম্বর। আজই কেমনধারা একটা অন্যরকম দেখছে। ভূতে পেলে বোধ হয় এমন হয়।

কিছু বলছ? আবার জিজ্ঞেস করে জুঁই। কিন্তু জবাব শোনার আগেই আবার মাঠের দিকে চেয়ে দেখে। ফিসফিস করে বলে, সত্যি বলছ চিনতে পারেনি?

বরাতজোর আর কাকে বলে! চিনলে রক্ষে ছিল না। একসময়ে তো খগেনবাবুর চামচাগিরি করতাম।

কিন্তু চিনল না কেন বলো তো!

ভুলে গেছে। মুখটা ভুলে গেছে।

তা কি হয়! আমি তো ভুলিনি। তবে কর্তা ভোলে কী করে?

দেখেইনি ভালো করে।

ধমকাল কিন্তু। মেয়ে বলে ডাকল।

শুনেছি তো।

এত কাছে থেকে দেখেও না চেনার কথা তো নয়।

তুমিই বা বেছে বেছে ওর ঘাড়ে পড়তে গেলে কেন?

সে কি ইচ্ছে করে? পড়লাম, উঠে বুঝলাম একেবারে কর্তার পিঠের ওপর...ওঃ, গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখো! কতকাল পর...

কী কতকাল পর?

সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি তোমায়, মেয়েমানুষটা যত ফর্সাই হোক, কর্তার চোখে ও রং ধরবে না।

তাই বা বলছ কী করে?

বলছি, জানি বলেই। কর্তার পছন্দ মাজা রং।

বিরক্ত হয়ে দিগম্বর বলে, না হয় তাই হল। এবার চলো তো। বাস ভেঁপু দিচ্ছে। কনডাক্টর ওই হাতছানি দিয়ে ডাকতে লেগেছে, দেখো চেয়ে।

দাঁড়াও না। এ বাসটা ছেড়ে দাও। পরের বাসে যাব।

উরে বাস! বলো কী? সাড়ে সাতটা পর্যন্ত থাকব কোথায়? জল এলে দিঘরেতে মাথা বাঁচানোর জায়গা নেই!

আমি এখন যাব না। দেখব।

কী দেখবে?

ওরা কতদূর যায়। একদম মিলিয়ে গেলে তবে যাব।

কিন্তু বাস যে—

তাহলে তুমি একা যাও। আমি একটু দেখি।

বাস তাদের আশা ছেড়ে দিয়ে অবশেষে ছাড়ে। দিগম্বর অবশ্য যায় না। একটা হাই তুলে গাছতলায় গিয়ে বসে বিড়ি ধরায়।

জুঁই মেঘলা আলোর মাঠের দিকে তেমনি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উত্তরের ব্যালকনি

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উলটোদিকের ফুটপাথে বকুলগাছটায় অনেক ফুল এসেছে এবার। ফুলে ছাওয়া গাছতলা। সেইখানে নিবিড় ধুলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রং ঘন নীল। পরনে একটা খাকি রঙের ফুলপ্যান্ট—লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যান্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে। মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগগে জড়ানো। পিঙ্গলদীর্ঘ চুলগুলি আস্তে আস্তে জটা বাঁধছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দু-চারটে সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা, কনুইয়ে ঘা, তাতে নীলমাছি উড়ে উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু-পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিরল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। ঘা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে—'সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে'।

পাগল।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধি জর্দা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাথের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটা ড্রাম আছে। অভ্যেসে লক্ষ্যস্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলার ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফেলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক-ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যেস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে একটু দেখে। পাগল। তবু এখনও চেনা যায় অরুণকে। চেনা যায়? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফর্সা রং, ভোঁতা নাক, বড়ো চোখ—এইরকম কতগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে যোগফল—সেই যোগফলটাই একটা মানুষ—সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ—সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। তবু তুষারের মনে হয়, এখনও অরুণকে চেনা যায়। কিন্তু আসলে বোধহয় তা নয়। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধহয়। তবু তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয় তার কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে অরুণ ওই গাছতলায় বসে আছে। ওইখানে বসে থেকে থেকেই তার চুল জট পাকাল, গালে দাড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল—এইসব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে সেই পরিবর্তনটা, অভ্যস্ত লাগে তুষারের, তাই অনেক পরিবর্তনের ভেতরেও আজও অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীলমাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর কিছু নেই। প্রথম প্রথম তুষার ওই চোখে ঘৃণা, আক্রোশ, প্রতিশোধ—এইসব কল্পনা করত। ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে, পারতপক্ষে

ব্যালকনির দরজা খুলত না। কিন্তু আস্তে আস্তে তুষার বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই। কেবল অবিন্যস্ত চিন্তারাশি বয়ে যায় মাথার ভেতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহমানতাকে লক্ষ করে অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনো ভয় নেই।

পাগল, মাতাল আর ভূত—অনেক ভয়ের মধ্যে এই তিনটের ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল কল্যাণীর। তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে, বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী, সেখানে গিজগিজ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে অদৃশ্য আবহমন্ডল তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা ঘরে দেখা যায়।

কোনো পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনো তাকায়নি। এখন তাকায়। ভয় করে নাকি? করে। তবু অভ্যেসে মানুষ সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যেসমতো বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। তারপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খায়। পানে খয়ের খায় না বলে, ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যান্ট-শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে অভ্যেসমতো বলে—'সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোয়ার ঘরের মেঝেতে বসে, জলের গ্লাস, রঙের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচ বছর বয়েসের মেয়ে। সোমা এখনও কেবল গাছ, লতাপাতা আঁকে। আর আঁকে খোঁপাসুদ্ধু মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালোই। তার আঁকা গাছপালা, মুখ সব প্রায় একইরকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে। সারাদিন।

আজও লম্বা নিমপাতার মতো পাতাঅলা একটা গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে সেটা দেখল কল্যাণী। তারপর বলল—স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ওই এক জবাব।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ওইসব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তো মা, হয়ে এল।

বিভোর সোমা জবাব দেয়—সামনের বছর স্কুলে ভরতি হবে যখন, তখন দেখবে। সময়মতো স্নান-খাওয়া, সময়মতো সবকিছু। এইসব তখন চলবে না—

বলতে বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নানকরা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার আসে, তখন কখনো কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না। সারাসকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে, তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুলগাছের নিবিড় ছায়া থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না। কী করে। তবু অভ্যেস। পাঁচ বছর ধরে পাগলটা বসে আছে ওই বকুলগাছের তলায়। পাঁচ বছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ্য করছে ও। ভয় করলে কি চলে!

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিং থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক হয়ে থাকা, মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছ্যাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধ-মুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে নীলমাছি।

ওই ঠোঁটজোড়া ছ-সাত বছর আগে, কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার। একবার মাত্র। জীবনে ওই একবার। তাও জোর করে। এখন ওই নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড়ো ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে-ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাতঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম-চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্নাঘরের এঁটোকাঁটা মুক্ত করতে থাকে তখন কল্যাণী রোজকার মতোই ঘুম-গলায় বলে—ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ওই গাছতলায় এল তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চিৎকার করত, আকাশ-বাতাসকে গাল দিত। চিৎকার করে হাত তুলে বলত 'টেলিগ্রাম... টেলিগ্রাম...'! তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে। যদি আক্রমণ করে। তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড়ো অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনো ভালোবাসেনি কল্যাণী, সে ভালোবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ, তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারেনি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল, তুষার-কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায়। চৌকি দিতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল। সংসারের ভেতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা-জানলা খুলত না।

চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? ও ঠিক সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার-কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায় বসে রইল। কিন্তু তার বেশি এগোল না। চিৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই কেন থানা গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল—ওকে কিছু খেতে দিয়ো। সারাদিন বসে থাকে।

—কেন?

—দিয়ো। ও তো কোনো ক্ষতি করছে না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন!

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দু-বেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে-ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গোগ্রাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে উড়ে নামে, চেঁচায়, নীলমাছির ভিড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয়! না, ঠিক ঘুম নয়। এক ধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন স্রোত, কূল কূল করে তার মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে যায়। চোখ বুজে সে আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত—আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারব না, মা।

মাইনের ওপর তাকে উপরি তিনটি টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত নিয়ে গিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে—'হাভাতে-পাগল, রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা! কপালও বটে তোর, এমন বাসার সামনে আস্তানা গাড়লি যে, তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।'

ভাতঘুমে রোজ কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়।

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেইসব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে দেওয়া মাছের টুকরো, নিজের ভুক্তাবশেষ সব-ই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গতবছর একটা প্রোমোশন হয়েছে তুষারের। জুনিয়র থেকে এখন সে সিনিয়র এগজিকিউটিভ। নিজের কোম্পানির দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানলার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ারকণ্ডিশন করা ঘরখানায় সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুয়াশার মতো আবছা দেখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকটিক করে নড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিভ। চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় প্রায়-ই টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকায়দায় আটকে থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির গোছা হাতে দারোয়ান এঘর-ওঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, এই প্রথম ফুসফুসভরে বাতাস টানে সে। কোনো কোনো-দিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোনো কোনোদিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে! দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইট, কাঠ, বালি আর নুড়িপাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রিট মিক্সার, ক্রেন-হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চা ছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বিমের গায়ে 'টং টং' করে ছুড়ে মারছে! ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার! শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ওই তুচ্ছ শব্দটি—ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকান্ড, ভয়ংকর সেই কাঠামোর ভেতরে ভেতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারদিক আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপ। ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ওই শব্দ যেন কখনো শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে—'ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।'

'কীসের ছুটি! কেন অবসর!' সে পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—এ তার ভালোই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা-হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দেয়—কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন তন্ন করে নিজের ভেতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছে এবং আকাঙ্ক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পেছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্যে এখনও পাথর ছুড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে।

চৌরঙ্গিরও পরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে—'সোজা চলুন'।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছে করে না। বাড়ি ফেরা—সেই একঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে—'সামনের বাঁ-দিকের রাস্তা'।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

'কোথায় যাব! কোথায়?' তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে মোড়ে এসে যায়। 'এবার'? ভেতরে সেই তীব্র ইচ্ছে এখনও কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো—লোহার বিমে নুড়ি ছুড়ে মারার শব্দ—তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয়—কেবল-ই মনে হয়—কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময়, অস্পষ্ট মুক্তি-বিনা বৃথা চলে গেল জীবন।

সে আবার বলে—'বাঁয়ে চলুন।'

ট্যাক্সি দক্ষিণদিকে আবার উত্তরমুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরোনো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার সেই বাড়িটাকে দেখল। কী-একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ-সাত বছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরোনো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্যকেনা এক প্যাকেট দামি সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরোনো বাড়ির তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তুষার ভাবে—'এখনও নিনি আছে কি এখানে? আছে তো!'

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ-সাত বছর আগেকার সেই নিনি এখানে আছে কি না সন্দেহ। যদি না থেকে থাকে, তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার?

একটু দাঁড়িয়ে ভেবে, একটু ঘুরে-ফিরে দেখে তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে।

চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরেজিতে বলল—'কাকে চাই?'

তুষার হাসল—'চিনতে পারছ না?'

নিনি ওপরের দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডানদিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রং মেলেনি। পাঁচ বছরে অন্তত এইটুকু পালটেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়—আঃ, তুমি কি সেইরকম দুষ্টু আছ! বুড়ো হওনি?

—আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছ কি না! তোমার স্বামী-পুত্র হয়নি তো! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উলটে বলল—আমার ওসব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন কাগজে ছাওয়া দেওয়াল, ভাড়া করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলি আসবাবপত্র। এখনও সেন্ট-পাউডার, ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিয়ো আর গিটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল—তুমি একটুও বদলাওনি।

—তুমিও।

কিন্তু তুষারের ভেতরের তীব্র ইচ্ছেটা এখনও অস্থির অন্ধের মতো বেরোবার পথ খুঁজছে। সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামি মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে—'এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।'

এইসব-ই তুষারের জানা ব্যাপার। ওই যে গোপনতার ভান করে দামি বোতল বের করা, ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে, নিনি বার বার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত—'মনে রেখো এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হোয়ো না, হুল্লোড় কোরো না।'

তুষার হাসল। সে বারবার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকতাময় একটা গৎ গিটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওঁত পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভেতরের তীব্র ইচ্ছেটা গিটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বিমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ ইচ্ছে আনন্দময় আবরণ উন্মোচন, তার-ই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে নিনি—'থামো, থামো, আমার বড়ো ব্যথা'—

তুষার থামে—'কী বলছ'?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে নীল মুখ তুলে বলে—'এইখানে বড়ো ব্যথা'—

পেটের ডান ধার দেখিয়ে বলে—'গতবছর আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস'—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সবকিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল, তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটে ফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনুন নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরে ব্যালকনি, উলটোদিকে ফুটপাথে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো-মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে, একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাববার কিছু নেই। এখন সে রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পেছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বকুল ঝরে পড়ে। অবিরল পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। রাত বাড়ছে। তার খিদে পাচ্ছে।

পুরোনো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার।

কখনো নির্জন শেক্সপিয়র সরণি, কখনো চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গি রোড ধরে বহুক্ষণ হাঁটল সে। এখনও মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভেতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে। তার মন বলছে—'এখানে নয় এখানে নয়। চলো সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে, ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।'

কেন যে এই ভূতুড়ে মুক্তির ইচ্ছে? সে কি চাকরি করতে করতে ক্লান্ত? সে কি সংসারের একঘেয়েমি আর পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারী বিরক্ত হয় তুষার—'কাঁদছ কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না! আমাদের যা-স্ট্রেইন হয় তাতে না খেলে চলে না'—

কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী—'শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছে যাওনি? তোমার ঠোঁটে, গালে, শার্টে লিপস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ—যা তুমি জন্মে মাখো না'—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেকটা রাত হল আরও। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুলগাছের তলায় পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকার ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে মঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—'অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার! কোই হ্যায়?'

সেই ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেব? রোজ মঙ্গলা রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসতে। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে?

—অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয়! বাবুর খাওয়া এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে?

তুষার হাসল—'তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে, ওর জন্য আমরা কিছু দিই'—

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুলগাছটার তলায় এল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না অরুণ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ওইখানে, ওই ব্যালকনিতে মাঝে মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দ্যাখো না? তার বাঁ-গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনও মাছির মতো বসে থাকে—দ্যাখো না? এখনও আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনও তেমনি উজ্জ্বল রং। চেয়ে দ্যাখো না অরুণ?

পাগল গ্রাহ্যও করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল। পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়-বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়তো কোনো গাড়িবারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে করবে প্রত্যক্ষ।

—তোমার কোনো নিয়ম না মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছ অরুণ? তোমার মুক্তি নেই?

ডাল তরকারিতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাথের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভেতরকার ঝুঁঝকো আঁধার আর একবার দেখা গেল। লোহার বিমের গায়ে নুড়ি পাথরের 'টুং টুং' শব্দ। অবিরল অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কীসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে? কিন্তু তার ইচ্ছে উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—'কী হল'?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—'এসো তো, এসো তো কল্যাণী।'

তারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভেতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দেখে, তুষার চুমু খায় তীব্র আগ্রহে, রিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড়বিড় করে বলে—'কেন তোমার জন্য ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান? আমাকে দিতে পারো তো!'

বৃথা। সবশেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু আর কিছু নয়!

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মতো উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন-হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভেতরটা ধক-ধক করতে থাকে। এতজোরে বুক কাঁপতে থাকে যে, দু-হাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কীসের শব্দ ওটা? অন্ধকারে উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচন্ড শব্দ বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে

মাঝরাতে ঘুমভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো। বুক কাঁপে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু ক্রেন-হ্যামার! অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছেয় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে—'চলো সমুদ্রে! চলো পাহাড়ে! চলো ছড়িয়ে পড়ি।'

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে আস্তে হাঁপায়।

বাইরের খরবিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে। বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে তাকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দেখে। অভ্যেস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখনার মতো, অন্ধকার ক্লান্তি নামে চারধারে। অনেকদূর হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনোদিন ওঠে না। হেঁটে হেঁটে চলে যায় বহুদূর। কী একটা কাজ বাকি রয়ে গেল জীবনে! করা হল না! এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে। সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনো-বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নীচে বকুলগাছ, তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেট-এর মশারির ভেতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়সড়ো হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাতে খোঁপাসুদ্ধু একটা মেয়ের মুখ, নীচে লেখা সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে আস্তে বলে—'কী করে ঘুমোও?'

চলো, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি।—এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্র তো দেখেছি। দার্জিলিং শিলংও দেখা।

—অন্য কোথাও। অচেনা নির্জন জায়গায়।

বলে তুষার। কিন্তু সে জানে—মনে মনে ঠিক জানে—যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। 'মুক্তি' এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছেপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। এক মাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে—না না:। বলেই চমকায়। কীসের না? কেন না?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরি ডিকটেশন দিতে দিতে বলে ওঠে—'ন না:'। স্টেনোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারদিকে চায়। অদৃশ্য মশারির মতো কী-একটা ঘিরে আছে চারদিকে। ওটা কী? ওটা কেন? কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপিয়র সরণি ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে—'জোরে চালাও ভাই। আরও জোরে...আরও জোরে...'

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মতো একটা ক্রেন-হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লোহার বিমে নুড়ি ছুড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে আমার ঘরে যেতে?

পাগল খায়। উত্তর দেয় না।

—ইচ্ছে করে না, কল্যাণীকে একবার কাছ থেকে দেখতে?

পাগল খায়। কথা বলে না।

—জানতে চাও না, সে কেমন আছে?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের ঘরে। যাবে অরুণ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে—'আপনার বড়ো দয়া। রোজ দেখি দু-বেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দেন। আজকাল কেউ এতটা করে না কারো জন্য। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।'

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার—'কী বলেন!'

—বলি, ওইরকম মহাপ্রাণ হয়ে ওঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন—এটাই আমাদের বড়ো লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যে প্রচার! দয়া! 'দয়া' কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি!

কিন্তু ভাবে তুষার। ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে—'ন না:'। চমকায়! জালবদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়-বৃষ্টি হলে এখনও মাঝে মাঝে ক্রেন-হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। জেগে উঠে যন্ত্রণায় বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।

এক রাতে সত্যিই তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নি:শব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুলগাছটার তলায়।

—চলো অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনোদিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।

কে জানে কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল।

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দ্যাখো কাকে এনেছি।

কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল একটা চামচ। ভয়ংকর 'ঠিনঠিন' শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

‘মা গো!’ চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—‘ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।’

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল।

তুষারের হাতে-ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এতকাছে থেকে অরুণকে অনেকদিন দেখেনি কল্যাণী। কী বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা। খালাসিদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে, তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা। খাকি প্যান্টের রং পালটে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ংকর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনও অকৃপণ সুন্দর, সুগন্ধ বকুলফুল ছেয়ে আছে ওর মাথায়, জটায়, ঘাড়ে।

কাঁপা হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নীচু রেখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে তুষার বলছিল—‘খাও অরুণ, খাও।’

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার। নিয়ে এল ঘরে।

—এই দ্যাখো আমার ঘরদোর। ওই যে মশারির নীচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দ্যাখো, ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দ্যাখো ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ওই ড্রেসিংটেবিল। এই দ্যাখো, আরও কত কী...

ঘুরে ঘুরে অরুণকে সব দেখায় তুষার।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—‘এখানে এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না অরুণ? ইচ্ছে করে না, এইসব জিনিসপত্রের মালিক হতে? তুমি আর চাও না, কল্যাণীর মতো সুন্দর বউ? সোমার মতো মেয়ে!

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—‘বলো অরুণ, ইচ্ছে করে না?’

‘অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার!’ পাগল বলে।

—কোথায়—কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে।

বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না অরুণ? থাকো থাকো। থেকে দ্যাখো।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার।

পাগলটা আস্তে আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুলগাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কূলকূল করে বয়ে চলে তার অন্যলগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে!

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় তুষার। চেয়ে দেখে নিশ্চিন্তে বকুলগাছের তলায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দেখে তুষার। তার দু-চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না অরুণ? বকুলগাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে! হায় পাগল, ভালোবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনো সন্দেহ নেই। সে কাছ থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থরথর করে। দুঃখে-ভয়ে-উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড়ো শীত পড়েছে এবার। বকুলগাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে। ছেঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তুরে হাওয়া লাগছে শরীরে। বড়ো দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরোনো কম্বল পাঠিয়ে দেয় কল্যাণী। পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালোবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালোবাসে এখনও! কে জানে? মাঝে মাঝে উগ্র রিরংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনো দিনের পর দিন থাকে নিস্পৃহ। আর, ওই যে-ভালোবাসার জন্য পাগল অরুণ—ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী? বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার, বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সবসময়ে উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন-হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি। কখন যে, ধম করে নেমে আসে! অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে ওঠে তুষার।

ঠিক সকাল ন-টায় পিক ফেলতে এসে, উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুলগাছটার গোড়ায় পাগলকে দেখে। দুজনে, দুজনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানি এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। ক্লান্তি বাড়ে। দিনশেষে তার শরীরজুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবল-ই নাড়া দেয় এক তীব্র ইচ্ছে। নাড়া দেয়, নাড়া দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যে অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোকা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়েস বাড়ছে।

তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন, এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারদিকে আধো আলো, আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধে। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি স্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনো ফুলবৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।—

পাগল বসে থাকে।

তোমার উদ্দেশে

'In search of you, in search of you...'

ওইখানে তুমি থাকো। ওই সাদা বাড়িটায়, যার চূড়ায় শ্বেতপাথরের পরিটাকে বহুদূর থেকে দেখা যায়। নির্জন তোমাদের ব্যালকনি, বড়ো বড়ো জানলায় ভারী পর্দা ঝুলছে, দেয়ালে লাগানো এয়ারকুলার। মসৃণ সবুজ লনে বুড়ো একটা স্প্যানিয়েল কুকুর ঘুমিয়ে আছে।

পরিষ্কার বোঝা যায়, এসব এক পুরুষের ব্যাপার নয়। জন্মের পর থেকেই তুমি দেখেছ খিলান-গম্বুজ, বড়োঘর, ছাদের ওপর ডানা মেলে-দেওয়া পরি—যা কেবল-ই উড়ে যেতে চায়। যায় না।

বিকেলের রাস্তায় ক্বচিৎ চোখে পড়ে কালো যুবতী আয়া মন্থর পায়ে প্র্যাম ঠেলে নিয়ে চলেছে। কদাচিৎ দু-একজন ভবঘুরে লক্ষ্যহীন চোখ চেয়ে হেঁটে যায়। বড়ো সুন্দর অভিজাত নিস্তব্ধতা তোমাদের, তাই যদিও আমার পথে পড়ে না, তবু আমি মাঝে মাঝে তোমাদের এই নির্জন পাড়ার রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে যাই।

আজ দেখলুম তোমাকে। তুমি একা হেঁটে যাচ্ছিলে।

যখন ক্বচিৎ কখনো তুমি এরকম হেঁটে যাও, তখনও বলতে কী, তোমার সঙ্গে এক সমতলে আমার দেখা হয়। আজ যেমন। নইলে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখি তোমাদের মভ রঙের মোটরগাড়িতে। হু-হু করে চলে যাও।

তোমাদের পুরোনো মোটরগাড়িটার কোনো গোলমাল ছিল কি আজ? কিংবা নিকেলের চশমা-চোখে তোমাদের সেই বুড়ো ড্রাইভারটার!

অনেকদিন দেখা হয়নি। দেখলুম এই শীতকালে তুমি বেশ কৃশ হয়ে গেছ। সাদা শাড়ি পরেছিলে, তবু কচি সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছিল তোমাকে। সুন্দর অভ্যেস তোমার—শাড়ির আঁচল ডান ধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত শরীর ঢেকে দাও, মুখ নীচু করে হাঁটো—যেন কিছু খুঁজতে খুঁজতে চলেছ। নাকি পাছে কারো চোখে চোখ পড়ে যায়, সেই ভয়েই তোমার ওই সতর্কতা! ওরকম মুখ নীচু করে যাও বলেই, বোধহয় তুমি কোনোদিন লক্ষ করোনি আমায়। আজকেও না।

মোড়ের মাথায় রঙ্গনগাছের ছায়ায় যে-লাল ডাকবাক্সটা আছে তুমি সেটা পেরিয়ে গিয়ে বাঁক নিলে। তোমাকে আর দেখা গেল না। এতকাছ দিয়ে গেলে আজ যে, বোধহয় তোমার আঁচলের বাতাস আমার গায়ে লেগেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল একটুক্ষণের জন্য তোমার পিছু নিই। নিলুম না। কেন-না ফাঁকা রাস্তার মোড় থেকে বেঁটে, মোটাসোটা, কালো টুপিপরা লাল ডাকবাক্সটা স্থির গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়েছিল। মনে হচ্ছিল তোমার পিছু নিতে গেলেই, সে গটগট করে হেঁটে এসে আমার পথ আটকাবে।

একটু আগে আমি ওই মোড় পেরিয়ে এলুম। বাঁক ছাড়িয়ে কিছুদূরে এক গাড়িবারান্দার তলায় দেখলুম জটলা করছে পাড়ার বখাটে ছেলেরা। বড়োরাস্তাতেও রয়েছে নির্বোধ পুরুষের ভিড়। একা ওইভাবে কোথায়

যাচ্ছিলে তুমি? আমার কাছ থেকে তুমি যত দূরে আছ, সুরক্ষিত আছ, অনেকের কাছ থেকে কিন্তু তুমি তত দূর নও। আমি তাই অনেকক্ষণ ভাবলুম তুমি ঠিকঠাক চলে যেতে পেরেছিলে কি না?

তোমাদের পাড়া ছাড়িয়ে বড়োরাস্তায় পা দিতেই কয়েকটা ভিখিরির ছেলে-মেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। রুক্ষ চুল, করুণ চোখ, কৃশ চেহারা। লক্ষ করলুম একটি ছেলের মাথায় ঠোঙার মুকুট, একটি মেয়ের গলায় শুকনো গাঁদা ফুলের মালা। কাছেই ফুটপাথের কোথাও বসে এতক্ষণ 'বর-বউ' খেলছিল বোধ হয়। কিছু সময় তারা আমার পিছু নিল। 'দাও-না, দাও-না।' উলটোদিক থেকে ধীর গতিতে হেঁটে আসছিল একজন পুলিশ। কাছাকাছি হতে হঠাৎ কী ভেবে, সে তার হাতের ব্যাটনটা দুলিয়ে বলল, 'ভাগ।' বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেলে সে একবার আমার দিকে চেয়ে, একটু তৃপ্তির হাসি হাসল। আমিও হাসলুম। বাচ্চাগুলো দূর থেকে চেঁচিয়ে বোধহয় আমাকেই বলছিল, 'ভাগ! ভাগ!'

২

রাত সোয়া ন-টায় সোমেনের পড়ার ঘরের পাশে হলঘর থেকে ওদের পুরোনো প্রকান্ড দেয়াল-ঘড়িটায় পিয়ানো 'টুংটাং' বেজে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে হাই তুললাম। সোমেন তার বইপত্র গুছিয়ে রাখছিল।

চলে আসছিলুম, সোমেন ডাকল, 'মাস্টারমশাই!'

—বলো।

—কাল সবাই বরানগর যাচ্ছি, মাসিমার বাড়ি। পড়ব না।

—আচ্ছা।

'আর মাস্টারমশাই...' বলে ও লাজুক মুখে একটু হাসল।

—কী হল?

কথা না বলে ও ইঙ্গিতে হলঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিল। হলঘর পেরিয়ে ওদের অন্দরমহল। আজ হলঘরটা অন্ধকার। মাঝে মাঝে অন্ধকার থাকে। বললুম, 'তুমি-না এস ও পি সি-তে বক্সিং করো! একটা অন্ধকার হলঘর পার হতে পারো না?' বলতে বলতে কাঁধে হাত রাখলুম। কিছুদিন আগে পইতে হওয়ায় ওর মাথার চুল এখনও ছোটো ছোটো—আর দন্ডিঘরের ব্রহ্মচর্যের আভা এখনও, ওর সমস্ত শরীরে ফুটে আছে।

—এই ঘরে তোমার দাদু মারা গিয়েছিলেন না! বেঁচে থাকতে যিনি তোমাকে অত ভালোবাসতেন, মরার পর কি তিনি তোমাকে ভয় দেখাতে আসবেন?

শুনে সামান্য শিউরে উঠল সোমেন। আমি ওর মাথায় হাত রাখলুম। কখনো যখন হোম-টাস্কের খাতার দিকে ঝুঁকে থাকা ওর মনোযোগী মুখে টেবিলবাতির সবুজ ঢাকনার আলো এসে পড়ে, কিংবা যখন, কখনো ভুলে-যাওয়া পড়া, মনে করার চেষ্টায় ও দাঁতে ঠোঁট চেপে, হাত মুঠো করে অসহায় চোখে টালমাটাল তাকায় তখন আমার কখনো-কখনো মনে হয়—এই সুন্দর, পবিত্র ছেলেটি আমার। এই আমার ছেলে সোমেন—যার হাতে রাজ্যপাট দিয়ে খুব শিগগির-ই একদিন আমি বানপ্রস্থে যাব।

আমি হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালুম। সোমেন একছুটে অন্ধকার হলঘর পার হয়ে গেল।

আমাদের বাসার সদর দরজার ছিটকিনিটা বাইরে থেকেই খোলা যায়। প্রথমে দরজাটা টেনে বন্ধ করো। তারপর ডানদিকের পাল্লাটা আস্তে চেপে ধরো। খুব অল্প একটু ফাঁক হবে। সেই ফাঁকে সাবধানে ঢুকিয়ে দাও বাঁ-হাতের আঙুল। এইবার আঙুলটা ডানদিকে বেঁকিয়ে দিলেই তুমি ছিটকিনির মুখটা নাগালে পাবে। সেটা ওপরে তুলে ঘোরাও। তারপর ছেড়ে দাও। ঠক করে ছিটকিনি খুলে যাবে।

রাত সাড়ে দশটায় কৌশলে সদরের ছিটকিনি খুলে, অন্ধকার প্যাসেজ পার হয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম। বাতি জ্বলছে। মার বিছানায় মশারি ফেলা। মার জেগে থাকার কোনো শব্দ শোনা যায় না।

রান্নাঘরে আমার ভাতের ঢাকনা খুলে বেড়ালে মাছ খেয়ে গেছে। মা টেরও পায়নি। আজকাল বড়ো সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে মা। বয়স হচ্ছে। কথা বলতে বলতেও হঠাৎ বুকের ওপর ঝুঁকে নেমে আসে মাথা। খেয়াল হতে চমকে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করে, 'কী বলছিলাম যেন!' আমি হেসে বলি, 'কিছু না, মা, কিছু না।'

রান্নাঘরের জানলার একটা শার্সি ভাঙা। মেঝের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঝোল, আর তার সঙ্গে এখানে-ওখানে বেড়ালের পায়ের ছাপ ভাঙা শার্সিঅলা জানলাটা পর্যন্ত গেছে। ভাতের পাশে কালচে আর মেরুন রঙের দুটো তরকারি, হাতলভাঙা কাপে হলুদ ডাল। রাতে ঠাণ্ডা এই খাবারের দিকে চেয়ে মনে হয় মুখে দিলে বড়ো বিস্বাদ লাগবে।

খেয়ে ঘরে এসে সিগারেট ধরাব, মা ঘুমের মধ্যেই 'ওঃ' শব্দ করে পাশ ফিরল।

—কে!

—আমি।

মা চৌকির শব্দ করে উঠে বলল, দেখ তো, একটা চিঠি এসেছে বিকেলে। চোখে ভালো দেখি না। দেখ তো। কর্তার চিঠি মনে হয়।

মশারির ভেতর থেকে হাত বের করে মা আমার হাতে চিঠি দিল, 'জোরে পড়।'

কালচে রঙের পাকিস্তানি পোস্টকার্ডের ওপরে ইংরেজিতে লেখা—'কালী'। তার নীচে—পাঠঃ 'পরমকল্যাণবরেষু বাবা রম, ইতিপূর্বে তোমার নিকট কার্ডে পত্র দিয়াছি তাহা পাইয়াছ কি না জানাইও। তোমাদের চিঠি না পাইলে চাঞ্চল্য ও চিন্তা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখন-ই অসুখ অশান্তি দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খারাপ হইয়া যায়—চোখে ভালোরূপ দেখিতে পারি না বলিয়া নানারূপ জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বর্তমান অবস্থা-ব্যবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, তাড়াতাড়ি কোনো কিছু না হইলে, অবস্থা ক্রমশ জটিল ও সংকটাপন্ন হইবে। তোমার কাগজাত কাকা আসিলে অবশ্য খবর পাওয়া যাইত। অনিলের সহিত যোগাযোগ করিয়ো। ওই সঙ্গে কলিকাতা পাকিস্তানি হাই-কমিশনার বরাবর দরখাস্ত দিয়া তাহাতে অনুমতি পাইবার ব্যাপারে রিকমেণ্ড করাইয়া পাঠাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভালো হয়। কারণ এখানকার ডি আই জি হইতে পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও দুষ্প্রাপ্য জানিবা।... বলিয়াছিলাম, বরং মুসলমান হইব তবু ভিটা ছাড়িব না।...অসুখে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি...তোমরা নিকটে না থাকায় অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল বোধ করি। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, রিকমেণ্ড থাকিলে কাজের সুবিধা হইবে।... দেরি হইলে আরও বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়া পড়িব... তোমাদের সহিত আর দেখা হইবে না। হিন্দুস্থানে মরিতে চাহি। তোমার গুড়া কাকিমার মাথার কিছু বিকৃতি দেখা দিয়াছে—আজ চার-পাঁচ মাস যাবৎ নানারূপ চিকিৎসা চলিতেছে।... সোনারপুরে আমাদের যে-জমি তাহাতে অন্তত দুইখানি দুই চালা তোলার চেষ্টা করিয়ো। বর্তমান যে-দুঃসময় দেখা দিয়াছে তাহাতে মিতব্যয়ী না হইলে, নিরুপায় হইবা। সাবধানে থাকিয়ো ও মঙ্গল জানাইয়ো। অন্যান্য এক প্রকার। ইতি আঃ তোমার বাবা।'

চিঠি শুনে মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সারাদিন তুই করিস কী? সার্টিফিকেটটার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করলে যদি হয়, করিস না কেন! অনিলের কাছে যা—ও অতবড়ো চাকরি করে, ঠিক বের করে দেবে।'

—যাব।

'যাস। বুড়োবয়সে এখন জেদ কমেছে লোকটার, এই বেলা নিয়ে আয়।'

মা মশারির ভেতরে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। বলল, 'চোখে কেমন কুয়াশার মতো দেখি আজকাল। কর্তা আসবে, তার আগেই একবার হাসপাতালে নিয়ে যাস তো!'

আমি মার মশারি তুলে দিয়ে ভেতরে পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে শুলুম। 'মশা ঢুকছে না!' —বলে ছোট্টো একটা ধমক দিয়ে মা আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'কী এত খরচ করিস! এতদিন একটু-আধটু জমালে দুটো দো-চালা সত্যিই উঠে যেত। একটু গাছগাছালি লাগাতে পারতুম। নিজেদের বাগানের ফলপাকুড় খাই না কত দিন।'

—একটু আদর করো-না সোনা মা!

৩

আমার সামনের রাস্তায় হঠাৎ পড়ে লাফিয়ে উঠল একটা লাল বল। এমন চমকে উঠেছিলুম! তারপর-ই শোনা গেল সামনে হলুদ বাড়িটার দেওয়ালের আড়াল থেকে বাচ্চাছেলেদের চিৎকার, 'ওভারবাউণ্ডারি...ওভারবাউণ্ডারি!...মিলনের একুশ!' শুনে আমি আপনমনে হেসে উঠলুম।

পেছনের পার্কটায় দেখে এলুম একপাল কাকের সভা বসেছে। আর খোলা মাঠে ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে খেলছে বাতাস। মোড় ফিরতেই মুখোমুখি দেখা হল সেই মোটা, বেঁটে, লাল ডাকবাক্সটার সঙ্গে। দূরে দেখা যায়, তোমাদের বাড়ির চূড়ায় পরিটাকে—আকাশের দিকে বাড়ানো এক হাত—অন্য হাতে সে তার বাঁ-দিকের স্তন ছুঁয়ে আছে।

তখন দুপুর। রাধাচূড়া গাছের তলায় জলের ড্রাম, পেতলের থালা, আর ছাতুর ঝুড়ি সাজিয়ে বসেছে এক অল্পবয়সি ছাতুওয়ালা। তাকে ঘিরে, রিকশাওয়ালাদের ভিড়। এক হাত খাবারের থালায় রেখে, অন্য হাতে লোভী পাখি-পক্ষীদের তাড়াতে তাড়াতে, যখন মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে তখন মনে হয় ওই খাবারের সঙ্গে আকাশ, মাটি ও উদ্ভিদের বড়ো মায়া মিশে আছে। ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে বসে যাই।

চমৎকার দিন আজ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। শীতের খরবাতাস বইছে।

তুমি আজ কোথাও ছিলে না। যখন তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেলুম তখন দেখি, একটা ঘাস-ছাঁটা কল বাগানময় ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে তোমাদের মালি। ব্যালকনিতে দুটো ডেকচেয়ার। তোমাদের অর্ধবৃত্তাকার গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আছে একা একটা স্কুটার, যার রং ছানার জলের মতো সবুজ।

সারাদুপুর আমি আজ আর ভুলতে পারলুম না—ওই ঘাস-ছাঁটা কল, দুটো ডেকচেয়ার, আর ওই সবুজ একা একটা স্কুটার।

৪

আজ প্রথম পিরিয়ডে আমি ক্লাসে ছাত্রদের ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখের ভেতরে তখনকার গার্হস্থ্য চিত্র আর সমাজজীবন বিষয়ে একটা প্রশ্ন লিখতে দিয়ে জানলার কাছে এসে যখন দাঁড়ালুম, তখন দেখা যাচ্ছে আকাশে নীচু একটা মেঘ। বৃষ্টি হবে কি! বৃষ্টির আগে ভেজা মাটির যে-গন্ধ পাওয়া যায় আমি তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম। বৃষ্টি এল না। শেষ ক্লাস ছিল সেভেন-এ। ওরা গেল ক্লাস লিগে ক্রিকেট খেলতে। টিফিনে তাই ছুটি পেয়ে বেরিয়ে আসছি, গিরিজা হালদার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সই করুন।' চটপট সই করে দিলুম! হালদার গজগজ করতে করতে কমনরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'কীসে সই

করলেন, একবার পড়েও দেখলেন না?' চেঁচিয়ে বললুম, 'যে-কোনো আন্দোলন-ই করুন—আমি সঙ্গে আছি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।' বেরিয়ে এসে খুশিমনে দেখলুম ঝকঝক করছে দিন।

পাবলিক ইউরিন্যালের নোংরা দেওয়ালে পেনসিলে লেখা অনেক অশ্লীল কথার মধ্যে কে লিখে গেছে—গোপাল আর নাই। 'গোপাল' থেকে পেনসিলের হালকা রেখা 'নাই'-তে এসে গভীর। যেন-বা হতাশা থেকে ক্রমে ক্রোধ! লেখা নেই, তবু মনে হয় হতাশার 'হায় গোপাল' থেকে শুরু, শেষে এসে রাগ 'নাই কেন?' লেখা আছে—গোপাল আর নেই। আমি পড়লুম—'হায়! গোপাল!' পড়লুম, 'গোপাল আর নাই কেন?'

বেরিয়ে আসছি, দেখি দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ট্রামের স্টপে ভিড়ের মধ্যে একটা চেনা মুখ! সুধাকর না? কলেজ-টিমের দুর্দান্ত লেফট আউট ছিল! দেখি গায়ে চর্বি জমেছে, থলথল করছে ভুঁড়ি, কাঁধে ঝুলছে শান্তিনিকেতনের ঝোলা ব্যাগ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল।

ফার্স্ট ডিভিশনেও কিছুদিন খেলেছিল সুধাকর। তখন ওর দৌলতে ডে স্লিপে কত খেলা দেখেছি। মনে পড়ে লাইটহাউসে দুজনে দশ আনায় লাইন দিতে গেছি, দুটো অচেনা ছেলে লাইন থেকে ডেকে বলল, 'আপনি এস. সেন না?' সুধাকর মাথা নাড়ল—হ্যাঁ। 'আসুন-না, এখানে জায়গা করে দিচ্ছি।' লাইনে দাঁড়িয়ে সুধাকর চাপা গলায় বলেছিল, 'কীরে শালা দেখলি!'

চার বছর আগে শেষ দেখা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটালের সামনে। তখন ওর মায়ের ক্যান্সার। ইউটেরাসে। দুজনে চৌরঙ্গি পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলুম। বললে, 'খেলা ছাড়ার পর-ই একটা মজার চাকরি পেয়ে গেছি ভাই। কনস্ট্রাকশনে। কাজকর্ম কিছু বুঝি না, কিন্তু এধার-ওধার থেকে কেমন করে যেন পয়সা এসে যায়।' পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি ইমমর‍্যাল নই, খেলার মাঠেও মার না খেলে কখনো মারিনি।' তখন শীত শেষ হয়ে কলকাতায় গরম পড়ে গেছে তবু সুধাকরের গায়ে ছিল একটা পুরোনো ব্লেজার—বুকের কাছে মনোগ্রাম করা, যেন চোখ পাকিয়ে বলছিল—'আমি খেলোয়াড় সুধাকর।'

আমি ওকে ডাকলুম না। দূর থেকে দেখলুম ধুতি-পাঞ্জাবি-চপ্পল পরা মোটা থলথলে সুধাকর যেন, সবাইকে দেখিয়ে চলন্ত ট্রামের হ্যাণ্ডেল ধরে চটপটে পায়ে পা-দানিতে উঠে গেল।

সন্ধেবেলায় কফি-হাউসে অনেকের সঙ্গে দেখা। অমর ফিরেছে বিলেত থেকে অনেকদিন পর। আড্ডা তাই জমজমাট ছিল। অমররা সিং। পাঞ্জাবি শিখ। বাঙালি হয়ে গেছে। আগে দাড়ি-গোঁফ-পাগড়ি ছিল না।

আজ দেখি জালে ঢাকা দাড়ি, মাথায় জরির চুমকি দেওয়া পাগড়ি। বললুম, 'আগে-না তুই ছিলি, মেকানাইজড শিখ! তবে আবার কেন দাড়ি গোঁফ পাগড়ি, হাতে কেন তোর বালা?'

হাতজোড় করে বলল, 'রিলিজিয়ান নয় ভাই, এ আমার পলিটিক্স। বিলেতে গিয়ে দেখি, ইণ্ডিয়ানদের পাত্তা দেয় না। আমার গায়ের রং ফর্সা, অনেকেই সাহেব বলে ভুল করে, খাতির-যত্ন পাই। কেমন লেগে গেল সেন্টিমেন্টে। তাই দাড়ি গজিয়ে পাগড়ি বেঁধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম—ইণ্ডিয়ানদের যা-পাওনা তাই দাও আমাকে। খাতির চাই না।'

রাত আটটার সময় ওরা উঠে গেল মদের দোকানে। সেলিব্রেট করবে। আমি গেলুম না। যাওয়ার সময় তুলসী আড়ালে ডেকে বলে গেল, 'অনিমেষকে একবার দেখতে যাস। ওর অসুখ।'

কী অসুখ?

মুখ টিপে হেসে বলল, 'বলছিল অসুখের নাম মীরা। দেখিস গিয়ে।'

রাত সাড়ে ন-টায় আমি লণ্ডনের এক অচেনা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলুম। চারদিক হিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ পড়বে। একটা দোতলা বাস হল্টে থেমে আছে, বাস-এর পেছনে বিজ্ঞাপন—'সিনজানো'। চোখে পড়ে অদ্ভুত পুরোনো ধরনের পথিক লাইটপোস্ট, ভিক্টরীয় দালানের ভারী স্থাপত্য, পেছনে দূরে বহুতল স্কাইস্ক্র্যাপারের জানলায় আলোর আভাস। ওভারকোটের পকেটে আমার দুই হাত। আমি হেঁটে যাব। সামনের যে-কোনো পাব-এ, রহস্যময়ভাবে ঢুকে আমি খেয়ে নেব এক গ্লাস বিয়ার, অল্প গুনগুন করে গাইব ওই অচেনা শব্দটি, যা কিনা কোনো মদের নাম—'সি-ই-ন-জা-আ-ন-ও-ও'। ঘরে ফেরার আগে আমি কোনো হোটেলের বলরুমে ঢুকে নেচে নেব দু-চক্কর নাচ, 'হে : এ, টুইস্ট, টুইস্ট, টুইস্ট।'

আমি দূর বিদেশে পৌঁছে গেছি আজ। ঘন কুয়াশার পর্দা সরালেই দেখা যাবে আমার চারধারে জীবন্ত এই ছবি।

চেনা রাস্তাঘাট আজ আর চেনা যাচ্ছিল না। বিবর্ণ দেওয়াল, ছেঁড়া পোস্টার, কালো ক্ষয়া চেহারার মানুষ—এইসব-ই ঢাকা পড়েছিল। কলকাতায় বড়ো সুন্দর ছিল আজকের কুয়াশা। হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি ধরিয়ে নিলুম একটা সিগারেট। ট্র্যাফিকের সবচেয়ে সুন্দর আর ক্ষণস্থায়ী হলুদ বাতিটি ঝলসে উঠলে স্টেটবাসের গিয়ার বদলানোর শব্দ হয়েছিল। জ্বলে উঠল সবুজ। 'আস্তে ভাই ট্যাক্সিওয়ালা' —বলতে বলতে আমি ডান হাত ট্র্যাফিক পুলিশের ভঙ্গিতে তুলে ধরে দুই লাফে রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

আমার যাওয়ার কথা বকুলবাগান, সেদিকে না গিয়ে আমি মোড় নিলুম ডাইনে, এসে দাঁড়ালুম আদিগঙ্গার পোলের ওপর। আমার পায়ের তলা দিয়ে অন্ধকার রেলগাড়ির মতো বয়ে চলেছে জল। না, গঙ্গা কোথায়! এ তো রাইন! অদূরে ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে ভেসে আসছে রাতের ঘুমভাঙা কবুতরের পাখার শব্দ, আমার পেছনে অস্পষ্ট আইফেল টাওয়ার, সামনে বহুদূর স্ট্যাচু অব লিবার্টি, বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে শম্ভুগঞ্জের দিকে ভেসে চলেছে 'গুদারা' নৌকো। কুয়াশার আবডাল সরে গেলেই সব দেখা যাবে। কিংবা বলা যায়, কুয়াশার আবডালেই বহু দূরের সবকিছু পুরোনো এই কলকাতার হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি এসে গেছে। কাছে আসবার এই তো সুসময়—বর্ষায়, বা ঝড়ে বা কুয়াশায়! ভালোবাসায় একাকার হয়ে যায় পৃথিবী, সমুদ্র তার তট অতিক্রম করে উত্তাল হয়ে আসে স্থলভূমির দিকে, আমাদের চেনা শহরে ফুটে ওঠে অচেনা বিদেশের ছবি।

আজ রাতে তুমি একবারও খোলা জানলার কাছে এসে দাঁড়াবে কি? যদি দাঁড়াও, তবে—আমার মনে হয়, তুমি টের পাবে তোমাদের বাড়ির চূড়ার শ্বেতপাথরের পরিটা কুয়াশার আড়ালে তার মার্বেলের ভিত ছেড়ে উড়ে গেছে মোড়ের ওই লাল রঙের বেঁটে ডাকবাক্সটার কাছে। বহুকালের পুরোনো তাদের প্রেম—কেউ কখনো টেরও পায়নি। এখন পায়ের কোনো শব্দ না করে যদি, তুমি উঠে যেতে পারো তবে দেখবে—পরিটা সত্যিই নেই।

নাকি রাতের ডাকে চিঠিপত্র চলে গেছে বলে, হালকা সেই ডাকবাক্সটাই বেলুনের মতো উড়ে এসেছে তোমাদের ছাদে! পরিটার কাছে! এখন তাই ডাকবাক্সটা খুঁজে না পেয়ে, পৃথিবীর ভুলো মানুষেরা ভাবছে—কোথায় গেল আমাদের এতকালের চেনা সেই ডাকবাক্স! নাকি আমাদের-ই রাস্তা ভুল!

৬

অনিমেষ একা থাকে। অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম।

শুয়ে আছে। দেখলুম নাকটা অল্প ফুলে লাল হয়ে আছে। মুখের এখানে-ওখানে ফাঁটা-ছেঁড়া, কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত টানা লম্বা একটা কালশিটের দাগ।

আমাকে দেখে কনুইয়ে ভর রেখে ওঠবার চেষ্টায় মুখ ভয়ংকর বিকৃত করে বলল, 'চারটে লোক! বুঝলি, চারটে লোক ফিলজফি পালটে দিয়ে গেল।'

—কী হয়েছে তোর?

—কী জানি! একা পড়ে আছি, সিগারেট এনে দেওয়ারও লোক নেই। আর শালা দুপুরটা যে কী লম্বা মনে হয়!

চারটে লোক কারা?

পাশ ফিরে বলল, চিনি না! নাইট শো দেখে ট্যাক্সিতে ফিরছি, তখন রাত বারোটা। আমার ঘরের সামনে ওই যে, অনেকটা ফাঁকা জায়গা, মাঠের মতো, বড়োরাস্তায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে, যেই মাঠে পা দিয়েছি, টের পেলুম ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আবছা চারটে লোক। তক্ষুনি কেন যেন মনে হল—বিপদ। ফিরে দেখলুম ট্যাক্সিটা ব্যাক করে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ভাবলুম ট্যাক্সিওয়ালাকে একবার ডাকি। ততক্ষণে চারটে লোক চটপটে পায়ে এসে আমার চারধারে দাঁড়াল। মুখোমুখি যে, তার হাতে একটা সাইকেলের চেন। জিজ্ঞেস করল—'তুমি শালা অনিমেষ চৌধুরী? মীরার সঙ্গে তোমার-ই ভাব?' বোঁ করে চেনটা এসে মুখে লাগল। পড়ে যাচ্ছিলুম, ধরে বলল, 'ঘরে চলো'। ঘরে নিয়ে এল! আমি তালা খুললে চারজন-ই ঢুকল ঘরে। বলল, তোমাকে কাট মারতে হবে। আমি অল্প টলছিলুম, মাথার ভেতরটা ধোঁয়াটে লাগছিল, তবু ওদের কথা বুঝলুম। বললুম, কেন? বলল, 'মীরার সঙ্গে বিয়ে হবে হরির। ছেলেবেলা থেকে ওদের ভাব, মাঝখানে তুমি কে? হরিকে আমি চিনি, মীরাদের বাসায় কাজেকর্মে আসে, ছুতোরের কাজ করে, জগুবাজারে দোকান আছে।' আমি মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বললুম, 'মীরা শিক্ষিতা মেয়ে, হরিকে বিয়ে করবে কেন?' আমার বুকে আঙুল ঠুকে বলল, 'শালা, শিক্ষিতা মেয়ের শরীরে ফুল ফোটে না? পাতা গজায় না?' হাসল, 'বিয়ে করতে না চায়, আমরা জোর করে দেব। সমাজের ব্যবস্থা আমরা পালটে দিচ্ছি শিগগির-ই। তোমাকে চিঠি লিখতে হবে। লেখো।' ওরা বলে গেল, আমি লিখলুম—

প্রিয় মীরা,

তোমার সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নেই। কাল থেকে তোমার সঙ্গে কাট। দেখা হলে আমাকে না চেনবার চেষ্টা কোরো। আমি তোমাকে আর ভালোবাসি না।

ইতি অনুতপ্ত অনিমেষ।

লেখা হলে ওরা একটা খাম বের করে দিয়ে বলল, 'নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দাও।' দিলুম। তারপর ওরা আমাকে মারল, মেরে শুইয়ে দিয়ে গেল মেঝেয়। বলে গেল, 'যদি কথার নড়চড় হয়, তবে আবার দেখা হবে, না-হলে গুডবাই।'

অনিমেষ আমার দিকে চেয়ে চকমকে চোখে হাসল, মীরা এসেছিল দু-দিন পর। দরজা খুললুম না। বাইরে থেকেই বলল, 'অফিসে তোমাকে ফোন করে পাইনি। তুমি এত খারাপ বাংলা লেখো, জানতুম না। এ চিঠি তুমি লিখেছ?'

শান্তভাবে বললুম, 'হ্যাঁ'। জিজ্ঞেস করল, 'কেন'? বললুম—

—কী বললি?

ধপ করে বালিশে মাথা ফেলে অনিমেষ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, দুর শালা! সে অনেক কথা। ছেড়ে দে। তোর কাছে যে ক-টা সিগারেট আছে দিয়ে যা।

আমার সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বালিশের পাশে রাখল, 'মীরার কথা এখন আর ভাবছিই না। ভাবছি ওই চারটে লোকের কথা। কী আত্মবিশ্বাস! আমাকে দিয়ে ওই চিঠি লিখিয়ে নিল, আমার ঘরে ঢুকে মেরে গেল আমাকে, বুঝিয়ে দিয়ে গেল আমার জোর কতখানি। আমি শালা হারামির বাচ্চা এতদিন ভদ্রলোক...'

রাতে বেড়াল খুঁজতে গিয়ে মা পড়ে গিয়েছিল উনুনের ধারে। হাঁটুতে চোট। একটা আঙুল সামান্য পুড়েছে। ডাক্তার বলে গেল—'হাই প্রেশার, সাবধানে রাখবেন। খুব বিশ্রাম। আর নুন বারণ।'

পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম, 'কেন মা, এত কাজকর্ম করতে যাও?'

মা মিনমিন করে বলল, 'বউ আন।'

স্বপ্ন দেখলুম।

আমার চোখের সামনে দেওয়ালের পর দেওয়ালের সারি। আর সেই অসংখ্য দেওয়ালের গায়ে কে যেন, অবিশ্রাম চক দিয়ে লিখে যাচ্ছে—'গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই।' কোথাও লেখা—'হায় গোপাল!' কোথাও বা—'গোপাল আর নাই কেন?' আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিয়ের 'স্বাগতম' লেখবার লাল শালুতে উড়ছে কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন, 'বসন্ত—টিকা নিন। বিপদ—টিকা নিন। ভয়—টিকা নিন।'

৭

দেখলুম স্টিয়ারিং হুইলে বন্ধ তোমার দুই অসহায় হাত, অহংকারে একটু উঁচু তোমার মাথা। কপালের ওপর নেমে এসে দুলছে চুলের একটা ঘুরলি। দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসছ। তোমার কপালে ঘাম। তোমার মুখ লাল। পাশে খাকি শার্ট পরা, নিকেলের চশমা চোখে বুড়ো সেই ড্রাইভার। একটু ডানদিকে হেলে সে তার একখানি সাবধানি হাত বাড়িয়ে রেখেছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর তোমার হাতের দিকে।

বড়ো ভালোবাসায় তোমাকে আগলে নিয়ে গেল তোমাদের পুরোনো মভ রঙের গাড়ি। মোড়ের বেঁটে মোটা লাল ডাকবাক্সটা তার কালো টুপিপরা মাথা নেড়ে নি:শব্দে চিৎকার করে বলল, 'হ্যাপি মোটোরিং মাদমোয়াজেল, হ্যাপি মোটোরিং!' বাড়ির চূড়া থেকে শ্বেতপাথরের পরিটা পুব থেকে পশ্চিমে মাথা ঘুরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত একবার দেখে নিল—কোনো বিপদ আছে কি না। যত দূরেই যাও, সে তোমাকে ঠিক চোখে চোখে রাখে।

যদিও একটু টাল খাচ্ছিল তোমার গাড়ি, তবু বলি, তুমি অনেকটা শিখে গেছ। আর ক-দিন পরেই তুমি তোমার গাড়ি একা চালিয়ে নিয়ে যাবে।

চোখ বুজে দেখলুম, দূরে রাসবিহারীর জংশনে ট্র্যাফিকের লাল আলোয় থেমে আছ তুমি।

—থেমেছিলে? নাকি অপেক্ষা করেছিলে? দেখো, একদিন আমি ঠিক রাস্তার মাঝখানে দু-হাত, দু-দিকে ছড়িয়ে দাঁড়াব তোমাদের ওই মভ রঙের মোটরগাড়িটার মুখোমুখি। চেঁচিয়ে হয়তো বলব, 'বাঁচাও,' কিংবা হয়তো বলব, 'মারো আমাকে।' কুয়াশায় বা ঝড়ে বা বৃষ্টিপাতে কোনোদিন সেই সুসময় দেখা দিলে, তখন আর ওই দুই শব্দের আলাদা মানে নেই।

৮

ফেব্রুয়ারি। কলকাতার এবারের শীত শেষ হয়ে এল। বাতাসে চোরা গরম। রাস্তায় খুব ধুলো উড়ছে। চারদিকেই রাগি ও বিরক্ত মানুষের মুখ।

বিদায়ী শীতের সম্মানে একদিন স্কুল কামাই করা গেল। 'ম্যাটিনি'তে বেলেল্লা একটা হিন্দি ছবি দেখলুম। আমি আর তুলসী। বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি। লবিতে দাঁড়িয়ে তুলসী হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরছিল। বললুম, 'তোর জমবে না কিছুই। তোর হাতে জল দাঁড়ায় না।' অসময়ে বৃষ্টি, তবু রাস্তায় জল জমে গেল। ট্রাম-বাস বন্ধ। হাতে স্যাণ্ডেল, কাপড় গুটিয়ে দুজনে ছপ করে জলে নামলুম। হঠাৎ অকারণে খুশি গলায় তুলসী বলল, 'পৃথিবী জায়গাটা মন্দ নয়, কী বলিস?'

পাড়ার চেনা ডাক্তার ধরে একদিন 'টি এ বি সি' দিয়ে দিল। দু-দিন জ্বরে পড়ে রইলুম। মা কাছাকাছি ঘুরঘুর করে গেল, শোনা যায় বার বার। এমন ভাব—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস, হতভাগা ছেলে, এবার পেয়েছি তোকে। তৃতীয় দিনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলুম। সকালেই দেখি, মা বাক্স খুলে কবেকার পুরোনো লালপেড়ে গরদের শাড়িটা বের করে পরেছে। 'কী ব্যাপার?' মা অপ্রস্তুত মুখে একটু হাসল, 'কাল রাতে একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি।' মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোর জ্বরটাও সারল। কালীঘাটে একটু পুজো দিয়ে আসি।'

আমি আর গিরিজা হালদার স্কুল থেকে একসঙ্গে বেরোলুম একদিন। হালদার গলা নামিয়ে বলল, 'আমার জীবনে একটা ট্র্যাজেডি আছে মশাই। আপনাকে বলব একদিন।' পরমুহূর্তেই রুমাল বের করে বলল, 'গরম পড়ে গেল।' রেস্টুরেন্টে বসলুম দুজনে, গিরিজা হালদার কাটলেট খেল না, আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দুটো টোস্ট। আমার মশাই নিরামিষ। দেখেন-না হিন্দুর বিধবারা কতদিন বাঁচে।' হালদার প্রাণায়াম-টানায়াম করে। দমবন্ধ করে একগ্লাস জল খেয়ে মুখ মুছে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লক্ষ করেছেন কলকাতায় অনেকদিন কিছুই ঘটছে না! না লাঠিচার্জ, না গোলাগুলি, না কারফিউ। তেমন বড়ো বড়ো একটা মিছিলও দেখছি না বহুকাল। লোকগুলো মরে গেছে, কী বলেন?' অন্যমনস্কভাবে বললুম, 'হুঁ।' হালদার টেবিলে আঙুল বাজিয়ে গুনগুন করল, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে...'

দূর গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপর উড়োজাহাজের বিষণ্ণ শব্দ। অন্যমনে সাড়া দিই —'যাই।'

রাতে হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসলুম, 'মা, ও মা, তুমি আমায় ডাকলে?' মা জেগে উঠে অবাক গলায় বলল, 'না তো'। বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র পড়ে বলল, 'ঘুমো।' চৌকির শব্দ করে পাশ ফিরল মা, বলল, 'বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না রে!' আমি নি:শব্দে হাসলুম, 'না তো!'

তারপর অনেকক্ষণ জেগে থাকি। মারও ঘুম আসে না। বলে, 'সারাদিন কী যে, করিস! ঘুরে ঘুরে আত্মীয়স্বজনদের একটু খোঁজখবরও তো নিতে হয়! আমি মরলে আর কেউ তোকে চিনবেই না। দেখলেও ভাববে কে না কে!' মার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, 'বুঝতেও পারি না, কে বেঁচে আছে, আর কে মরে গেছে। একটু খোঁজ নিস।' জবাব দিই, 'কে, কোথায় থাকে মা?' মা আস্তে আস্তে বলে যায়, 'কেন, মাঝেরহাটে তোর রাঙাকাকিমা, কাঁচড়াপাড়ায় সোনাভাই...', শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মনে পড়ে, ছুটির এক দুপুরে বসেছিলুম ছোটো একটা চায়ের দোকানে। চারটে টেবিল, প্রতি টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার, আর সবুজ পর্দাঅলা দুটো কেবিন খালি পড়ে আছে। মাছি ওড়ার শব্দ। দেয়ালে ভয়ংকর সব যুবতীদের ছবিঅলা ক্যালেণ্ডার। দুপুরের ঝিমঝিম ভাবের মধ্যে অনেকক্ষণ একা বসেছিলুম। এ-সময়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন সাদা চাদর গায়ে বুড়ো এক ভদ্রলোক। চোখে চোখ পড়তেই আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলুম। বড়ো দয়ালু ওঁর চোখ। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম, উনি মনে মনে বললেন, 'এই যে, কী খবর?' তটস্থ আমি তৎক্ষণাৎ মনে মনে উত্তর দিলুম, 'এই যে, সব ভালো তো?' পরমুহূর্তেই উনি চোখ সরিয়ে নিলেন, গিয়ে বসলেন কোণের একটা চেয়ারে, পত্রিকা খুলে মুখ আড়াল করে নিলেন। আমি টেবিলের কাছে আমার অন্ধকার ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম। সেই ভাবটুকু তারপর কেটে গিয়েছিল, যখন সদ্য ঘুম-থেকে-ওঠা বাচ্চা বয় খালি গায়ে হাই তুলতে তুলতে এসে চা দিয়ে গেল।

একদিন স্কুলে এল টেলিফোন। 'শিগগির বাড়িতে আসুন।' শরীর হিম হয়ে এল। রিসিভার নামিয়ে রাখলুম আস্তে আস্তে। দীর্ঘদিন ধরে যেন, এরকম একটি আহ্বানের-ই ভয় ছিল আমার। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে 'মা' এই শব্দ বেজে উঠেছিল। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আমি এসে দেখলুম, ঘরে চার-পাঁচজন পাড়াপড়শি, বালিশে মার নিভন্ত মুখ, আধখোলা চোখ, ভয়ংকর লাল ঠোঁট ফ্যাকাশে। ডাক্তার ব্লাড প্রেশারের পারদের দিকে চেয়ে আছে। বলল।... 'তাড়াতাড়ি করুন।' বুঝতে না পেরে আমি চারদিকে চেয়ে বললুম, 'কী?' আবার কে যেন বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন।' আমি বুঝতে পারলুম না, বাচ্চা ছেলের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কী?' বাড়িওয়ালার বউ আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে বলল, 'যা তারকেশ্বরে মানত করে আয়!'

পরদিন। আমি তারকেশ্বর থেকে ফিরছিলুম। ভিড়ের ট্রেন। আমি বসবার জায়গা পাইনি। ট্রেন থামছে। প্রতিবার আমি মফস্সল লোকের মতো নিজেকেই জিজ্ঞেস করছি, 'এটা কি হাওড়া? এই কি হাওড়া?' অনেক ঘাড়, অনেক মাথার জঙ্গল সামনে, আমি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করছিলুম। হঠাৎ এক ঝলক তেতো জলে ভেসে গেল মুখ, কষ বেয়ে জামা-কাপড় ভাসিয়ে দিল, 'এটা কি হাওড়া'—আবার এই প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখি চোখের সামনে পড়ছে কালো চাদর, ঝড়ের মতো ছুটেছে ট্রেন, অথচ যেন বাতাস লাগছে না। পড়ে যাচ্ছি, কয়েকটা হাত আমাকে ধরল। টের পেলুম, আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে পৃথিবীর সব শব্দ—যেন আমি আবার মায়ের কোলের সেই শিশু রম—এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। তবু সেই আধো-চেতনার মধ্যে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'আপনারা সবাই শুনুন। আমি রমেন। আমার মায়ের বড়ো অসুখ। দু-দিন আমি তাই কিছুই খাইনি।' আমি বলতে চাইছিলুম, 'আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের সকলের কাছে অপরাধী।' আমার প্রাণপণে বলবার ইচ্ছে হয়েছিল, 'আমি আজ আপনাদের ইচ্ছাশক্তিগুলি ভিক্ষা চাই। আপনাদের আশীর্বাদগুলি ভিক্ষা চাই।' ট্রেনের মেঝেয় ঘোর অন্ধকারের ভেতরে দুটো সাদা পা। যেন চেনা! মুখ দেখা যায় না, তবু বুঝলুম সেই বুড়ো ভদ্রলোক; আজও তার চোখ কথা বলছিল। 'আমি তোমার জন্যই এসেছি রমেন। তুমি ভাগ্যবান। চলে এসো।' আমি কাঁদছিলুম, 'আমার মার বড়ো অসুখ। আমার বাবা বিদেশে পড়ে আছে।' সহজে উত্তর দিল না তার চোখ, বলল, 'জীবন ও মৃত্যুই কিছু লোকের দেখাশোনা করে; কিছু লোককে দেখে ভাগ্য; কিছু লোককে ধর্ম এসে নিয়ে যায়।'

ভালো হয়ে গেলে মা একদিন চিন্তিত মুখে বলল, 'চোখে ভালো দেখি না। কিন্তু মনে হচ্ছে তুই বড়ো রোগা হয়ে গেছিস!' হাসলুম, 'কই?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলল, 'আর কর্তার সার্টিফিকেটটা? সেটা পেলি না!'

৯

তখন বিকেল। পাকিস্তানি হাই-কমিশনারের অফিস থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাটের দিকে যাব, এমন সময় হঠাৎ দেখি—তুমি! শিকড়সুদ্ধু আমার ডালপালা নাড়া খেয়ে গেল।

বলতে কী, স্কুটারের পেছনের সিটে তোমাকে মানায় না। এত খোলামেলা আর এত ভিড়ের মধ্যে।

দেখলুম সবুজ রুমালে ঘিরেছ মুখ, আজ নীল শাড়ি পরেছিলে, স্কুটারের পেছনের সিটে তুমি জড়সড়ো, টালমাটাল। চওড়া পুরুষের কাঁধ আঁকড়ে ধরে হাসছিলে ভয়-পাওয়া হাসি—'পড়ে গেলু—উ-উম।'

তারপর-ই অবহেলায় আমাকে পেছনে ফেলে রেখে ছুটে গেল তোমাদের স্কুটার। যেতে যেতে আচমকা ঘুরে গেল বাঁয়ে—পড়ো পড়ো হল, পড়ে গেল না। তোমরা গেলে পার্কস্ট্রিটের দিকে।

আমি গড়িয়াহাট রোড ধরলুম। অপরাহ্ণের আলোয় ফুটপাথে আমার দীর্ঘ ছায়ার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে অচেনা মানুষ। তাদের ছায়া ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। সামনেই ট্র্যাফিক পুলিশের উত্তোলিত হাত, আর গাড়ির মিছিল দাঁড়িয়ে আছে। একজন হকার আমাকে উদ্দেশ করে ধীরগম্ভীর গলায় হাঁকল, 'গেঞ্জি...!' এসব কিছুই আমি তেমন খেয়াল করলুম না। আমার মন গুনগুন করছিল, কেন তুমি কোনোদিন-ই লক্ষ করলে না আমায়? 'হায়, আমি যে-আছি তুমি তা জানোই না!'

রাতে ঘুম না এলে জেগে থাকি, মাঝে মাঝে বড়ো সাধ হয়, তুমি এসে একদিন বলবে, 'আমাকে চাও?'

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আমি শান্ত চোখে চেয়ে বলব, 'চাই না।'

কীট

একদিন নীলা চলে গেল।

একদিন-না-একদিন চলে যাওয়ার কথাই ছিল নীলার। তাই না-যাওয়া এবং যাওয়ার মধ্যে খুব একটা তফাত হল না। সুবোধ নিজেই গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে নীলাকে গাড়িতে তুলে দিতে। বিদায়-মুহূর্তে, স্বামী-স্ত্রীর যেমন কথা হয় তেমন কিছুই হল না। রুমাল উড়ল না, চোখের জল পড়ল না, এমনকী গাড়ি যখন ছেড়ে যাচ্ছে তখন জানলায় নীলার উৎসুক মুখও দেখা গেল না।

নীলা গেল তার বাপের বাড়ি মধুপুরে। সেখানেই থাকবে, না আর কোথাও যাবে, তার কিছুই জানল না সুবোধ। শুধু জানল নীলার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই; অনেকদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এরকমটাই হবে। খুব শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল ব্যাপারটা।

খুব যে খারাপ লাগল সুবোধের—তা নয়। ভালোও লাগল না অবশ্য। তার সম্মানের পক্ষে, পৌরুষের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই ভালো নয়। কত লোকের কত জিজ্ঞাসাই যে এখন তার ঘরে উঁকি মারবে, তা ভাবতেও ভয় লাগা উচিত। তবু সব ভেবেও সুবোধের মন শান্তই রইল। খুবই শান্ত। বাসে জানলার ধারের বসবার জায়গায় গঙ্গার সুন্দর হাওয়া এসে লাগছিল। এখন বসন্তকাল। কলকাতায় চোরা-গরম শুরু হয়ে গেছে। বাতাসটুকু বড়ো ভালো লাগল সুবোধের। লোহার প্রকান্ড জালের মধ্যে দিয়ে সে উৎসুক চোখে গঙ্গার ঘোলা রূপ, নৌকো, জাহাজের মাস্তুল আর কলকাতার প্রকৃতিশূন্য আকাশরেখায় প্রকান্ড বাড়িগুলোর জ্যামিতিক শীর্ষগুলি দেখল। মনোযোগ দিয়ে দেখল, দেখায় কোনো অন্যমনস্কতা এল না। ভালোই লাগল তার। এমন অলসভাবে আয়েশের সঙ্গে অনেককাল কিছু দেখেনি সে। বিয়ের পর থেকেই তার মন ব্যস্ত ছিল, গত দশ বছর ধরে সেই ব্যস্ততা, সেই উৎকণ্ঠা আর বিষণ্ণতা নিয়েই সে সবকিছু দেখেছে। আর দশ বছর পর সেই ব্যস্ততা হঠাৎ কেটে গিয়েছে। বড়ো স্বাভাবিক লাগছে সব কিছু। বহুকালের চেনা পুরোনো কলকাতার হারানো চেহারাটি হঠাৎ তার চোখে আবার ফিরে এসেছে আজ।

অনেকক্ষণ ধরে চলল বাস। ট্রাফিকের লাল বাতি, মন্থরগতি ট্রাম, রাস্তা পেরোনো মানুষের বাধা। সময় লাগল, কিন্তু অস্থির হল না সুবোধ। কোনোখানে পৌঁছোনোর কোনো তাড়া নেই বলে, জানলার বাইরে তাকিয়ে ঘিঞ্জি ফুটপাথ, দোকানের সাইনবোর্ড, দো-তলা বাড়ির জানলায় কোনো দৃশ্য—কত কী দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে রইল।

সন্ধের মুখে ঘরে এসে তালা খুলল সে। বাতি জ্বালল, জামাকাপড় ছাড়ল, হাতমুখ ধুল, চুল আঁচড়াল, তারপর একখানা চেয়ার টেনে জানলার পাশে বসে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে দেখার কিছু নেই। ঢাকুরিয়া বড়ো ম্যাড়মেড়ে জায়গা, প্রায় আট বছরের টানা বসবাসে এ-জায়গার সব রহস্য নষ্ট হয়ে গেছে। চেনাশুনোও বেড়েছে অনেক। এবার জায়গাটা ছাড়া দরকার। দু-এক মাসের মধ্যেই। যতদিন নীলার বাপের

বাড়ি থাকাটা লোকের চোখে স্বাভাবিক দেখায় ততদিন-ই নিরুদবেগে থাকতে পারে সুবোধ। তারপর অচেনা একটা পাড়ায় তাকে উঠে যেতে হবে।

ঘরের দিকে চেয়ে দেখল সুবোধ। জিনিসপত্র বেশি কিছু নিয়ে যায়নি নীলা, কেবল তার নিজস্ব জিনিসগুলি ছাড়া। তাই ঘরটা যেমন ছিল, প্রায় তেমনই আছে। কেবল আলনায় নীলার শাড়িগুলোর রঙের বাহার দেখা যাচ্ছে না, আয়নার টেবিলে রূপটানের শিশি-কৌটোগুলোও নেই। তাই তফাতটা খুব চোখে পড়ে না। যেমন নীলার থাকা এবং না-থাকার মধ্যে নিজের মনের তফাতটাও সে ধরতে পারছে না।

না, ব্যাপারটা মোটেই ভালো হল না। গভীরভাবে ভাবলে এর মধ্যে লজ্জার-ঘেন্নার অনেক কিছু খুঁটিনাটি তার লক্ষে পড়বে। মন-খারাপ হওয়ার মতো অনেক স্মৃতি। তবু কী-এক রহস্যময় কারণে মনটা হালকাই লাগছিল সুবোধের। জানলার কাছে বসে রইল, সিগারেট খেল। নীলা থাকলে এখানে বসেই এক কাপ চা পাওয়া যেত। সেটাই কেবল হচ্ছে না। মাত্র এক কাপ চায়ের তফাত। তবে চা করার একটা লোক রাখলেই তো তফাতটুকু বুজে যায়। ভেবে একটু হাসল সুবোধ। হাতঘড়িতে প্রায় আটটা বাজল। তাদের রান্নার লোক নেই, নীলাই রাঁধত। সুবোধ ভেবেছিল হোটেলে খেয়ে আসবে। তারপর ভাবল, হোটেলে খেতে গেলে তফাতটুকু আরও বেশি মনে পড়বে। তাই সে ঠিক করল রান্নার চেষ্টা করলেই হয়।

রান্নাঘরে একটা প্রেশার কুকার ছিল। কেরোসিনের স্টোভে সেইটেতে ভাতে ভাত রান্না করে খেল সুবোধ। দেখল এই সামান্য রান্নাটুকুতেই সমস্ত রান্নাঘরটা সে ওলট-পালট করে দিয়েছে। আবার সেই তফাত! সুবোধ আপনমনে হাসল। তারপর বিছানা ঝাড়ল, মশারি টাঙাল, বাতি নেভাল—এইসব কাজ-ই ছিল নীলার। শুয়ে শুয়ে সে অনেকক্ষণ মশারির মধ্যে সিগারেট খেল সাবধানে। ঘুম এল না। নীলা মাঝরাতে পৌঁছোবে আসানসোলে। সেখানে ওর জামাইবাবুকে খবর দেওয়া আছে, ওকে নামিয়ে নেবে। কয়েকদিন পরে যাবে মধুপুরে। নীলার এখন বোধ হয় সুখের সময়। ঘুরে ঘুরে বেড়াবে খুব। এখন এই রাত এগারোটায় নীলা কোথায়? কী করছে নীলা? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। কাল থেকে তার ঝরঝরে একার জীবন শুরু হবে। মাত্র ছত্রিশ বছর তার বয়েস, এখন নতুন করে সবকিছুই শুরু করা যায়। সময় আছে।

সকালে ঘুম ভাঙলে তার মনে পড়ল সারারাত সে অস্বস্তিকর সব স্বপ্ন দেখেছে। অধিকাংশ স্বপ্নেই নীলা ছিল। একটা স্বপ্নে সে দেখল—সে অফিস থেকে ফিরে এসেছে। এসে দেখছে ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সে দরজার কড়া না নেড়ে দরজার গায়ে কান পাতল। ভেতরে নীলা আর একজন পুরুষ কথা বলছে। মৃদু স্বরে কথা, সে ভালো বুঝতে পারছে না, প্রাণপণে শোনার চেষ্টা করল সে। বুঝল কথাবার্তার ধরন খুব-ই অন্তরঙ্গ। ভয়ংকর রেগে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল সুবোধ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার হাত এত দুর্বল লাগছিল যে, মোটেই শব্দ হল না। ভেতরে কথাবার্তা তেমনিই চলতে লাগলে, সে চিৎকার করে নীলাকে ডাকল—দরজা খোলো। বলতে গিয়ে সে টের পেল, সে মোটেই চিৎকার করতে পারছে না। 'দরজা খোলো'—বলতে গিয়ে সে ফিসফিস করে বলছে 'জোরে কথা বলো।' এরকম বার বার হতে লাগল। এত হতাশ লাগল তার, যে ইচ্ছে করছিল দরজার সামনেই সে আত্মহত্যা করে। ভাবতে ভাবতে সে একই সঙ্গে চিৎকার করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। অবশেষে দরজায় মৃদু শব্দ হল, থেমে গেল ভেতরের অন্তরঙ্গ কথা, তারপর হঠাৎ দরজা খুলে গেল। বিশাল শরীরঅলা একজন পুরুষ দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল। চমকে উঠল সুবোধ। চেনা লোক—মনোমোহন। তার অনেকদিন আগেরকার বন্ধু। হায় ঈশ্বর! মনোমোহন কোথা থেকে কী করে যে এল। রাগে-দুঃখে-ঘেন্নায় লাফিয়ে উঠে মনোমোহনের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করল সুবোধ। কিন্তু পারল না। পা আটকে যাচ্ছিল, যেন একহাঁটু জল ভেঙে সে দৌড়োবার চেষ্টা করছে। মনোমোহন দু-তিন লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে পিছু ফিরে দেখল, নীলা অসংবৃত শাড়ি পরে দরজায় দাঁড়িয়ে নিস্পৃহ মুখে, তার খোলা চুলের ভেতরে আঙুল দিয়ে জট ছাড়াচ্ছে। কাকে যে, আক্রমণ করবে সুবোধ, তা সে নিজে বুঝতে পারছিল না। রাগ-দুঃখ-ঘেন্নার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র একটা আনন্দকেও সে টের পাচ্ছিল। পাওয়া গেছে, নীলাকে এতদিনে সুবিধেমতো পাওয়া গেছে। এইরকম স্বপ্ন আরও দেখেছে সে, রাতে। কখনো নীলাকে

অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখা গেল, কখনো-বা দেখা গেল নীলা এরোপ্লেনে বা নৌকোয় দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে।

সকালের উজ্জ্বল আলোয় জেগে উঠে সুবোধ স্বপ্নগুলোর কথা ভেবে সামান্য জ্বালা অনুভব করল বুকে। বস্তুত নীলার সঙ্গে কারও প্রেম ছিল, এটা এখনও পর্যন্ত প্রমাণসাপেক্ষ। মনোমোহনের স্বপ্নটা একেবারেই বাজে। কারণ নীলার সঙ্গে তার বিয়ের অনেক আগে থেকেই মনোমোহনের সঙ্গে পরিচয়। মনোমোহনের সঙ্গে আর দেখা হয় না সুবোধের। মনোমোহন বোধ হয় এখন পুলিশে চাকরি করে—তার ঘর-সংসার আছে, সে নিরীহ মানুষ। স্বপ্নে যে কত অঘটন ঘটে!

তবু বুকে-মনে কোথাও একটু জ্বালার ভাব ছিলই সুবোধের। স্টোভ জ্বেলে সে চা করল। চা-টা তেমন জমল না, লিকার পাতলা হয়েছে, চিনি বেশি। সেই চা খেয়ে সকালবেলাটা কাটাল সে। ঝি এসে বাসন-কোসন মেজে দিয়ে গেছে, তবু নিজে আজ আর রান্না করবে না সুবোধ। আজ ছুটির দিন—রবিবার। দুপুরে গিয়ে কোনো হোটেলে খেয়ে আসবে। সকালবেলাটায় সে ঘরের কোথায় কী আছে, তা ঘুরে ঘুরে দেখল। এখন সবকিছু তাকেই দেখতে হবে। নিজেকে নিজেই চালাতে হবে তার। ব্যাপারটা যে খুব সুবিধেজনক হবে না—তা বোঝা যাচ্ছিল। বিয়ের আগে সে ছিল মা, বোন, বউদিদের ওপর নির্ভরশীল। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই গড়পাড়ের সেই যৌথসংসার ছেড়ে চলে এল, ঢাকুরিয়ায় নীলাকে নিয়ে। কখনো সে একা থাকেনি বিশেষ। যে কয়েকবার নীলা একটু বেশিদিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছে, সে কয়েকবারই মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে সুবোধ। কাজেই এখন একা একা সংসারের মতো কিছু চালানো তার পক্ষে মুশকিল। মাকেও আর আনা যায় না—বাতে, অম্বলে এই বুড়োবয়সে মা বড়ো জবুথবু হয়ে গেছে। তা ছাড়া মাকে আনলেও স্থায়ীভাবে আনা যায় না, গড়পাড়ের সংসার ছেড়ে, মা এখানে থাকতেও চাইবে না বেশিদিন। এর ওপর আছে মায়ের অনুসন্ধানী চোখ—এক লহমায় বুঝে নেবে যে, নীলা আর আসবে না।

নীলা আর আসবে না ভাবতেই, সকালবেলায় একটু কষ্ট হল সুবোধের। কষ্টটা নিতান্তই অভ্যাসজনিত। দশ বছর একসঙ্গে বসবাস করার অভ্যাসের ফল। নীলা না থাকলে হরেকরকমের অসুবিধে। সেই অসুবিধেটুকু বাদ দিলে মনটা বেশ তাজা লাগল তার। বেলা বাড়লে রাতের স্বপ্নগুলোর মধ্যে, একমাত্র মনোমোহনের স্বপ্নটা ছাড়া আর কোনো স্বপ্নই তার মনে থাকল না। মনোমোহনের সঙ্গে নীলার কিছুই ছিল না—সুবোধ জানে। তবু স্বপ্নটার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য একটা কিছু আছে বলেই তার মনে হচ্ছিল। হয়তো এই ঘরে, তার এই সংসারের মধ্যে থেকেও নীলা কখনো ঠিক পুরোপুরি সুবিধের ছিল না। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই সুবোধের এইরকম ধারণা শুরু হয়। গড়পাড়ের বাড়িতে বাচ্চা ছেলে-মেয়ের অভাব ছিল না। দুই দাদার গোটাপাঁচেক ছেলে-মেয়ে। তাদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি তেমন পাকেনি, তাদের কাছে সে প্রায়ই গোপনে জিজ্ঞেস করত, সে অফিসে চলে গেলে নীলা কী কী করে, বিকেলে ছাদে যায় কি না, নীলার নামে কোনো চিঠি এসেছিল কি না। বস্তুত কেন যে, সেসব জিজ্ঞেস করত সুবোধ তা স্পষ্টভাবে নিজে আজও জানে না। বাপের বাড়ির কোনো লোক এসে নীলার খোঁজ করলে সে বিরক্ত হত। কখনো-কখনো ঠাট্টার ছলে সে নীলাকে জিজ্ঞেসও করেছে বিয়ের আগে নীলার জীবনে কে কে পুরুষ এসেছে। সুবোধের মনের গতি তখনও ধরতে পারেনি নীলা, তাই ঠাট্টা করেই উত্তর দিত—ছিল তো, সে তোমার চেয়ে অনেক ভালো। ঠাট্টা জেনেও মনে মনে ম্লান হয়ে যেত সুবোধ। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই বাড়িতে একটা গন্ডগোল শুরু হল মেজদাকে নিয়ে। মেজদার কারখানায় গন্ডগোল হয়ে লক-আউট হয়ে গেল। ছ-মাস পরে কারখানাটা হাতবদল হয়ে গেল। মেজদা পুরোপুরি বেকার তখন। লোকটা ছিল বরাবরই একটু বন্য ধরনের, হইচই করা মাথা-মোটা গোঁয়ার মানুষ। চাকরি গেলে এসব লোকের সচরাচর যা-হয় তাই হল। বাংলা মদ খেয়ে রাত করে বাসায় ফিরত। গোলমাল বা চেঁচামেচি করত না, কিন্তু মাঝে মাঝেই কান্নাকাটি করত অনেক রাত পর্যন্ত। তিন ঘরের ছোট্ট বাসাটায় ঠাসাঠাসি লোকজনের মধ্যে ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল। মেজদার মদ খাওয়ার স্বভাব ছিলই, কিন্তু আগে মাত্রা রেখে খেত, পুজো-পার্বণ বা অন্য উপলক্ষে বেশি খাওয়া হয়ে

গেলে বাসায় ফিরত না। কিন্তু চাকরি যাওয়ার পর, লোকটাকে রোজই মাত্রায় বেশিই খেতে হত, আর বাসা ছাড়া অন্য জায়গাও ছিল না তার। প্রতিরাত্রেই মেজদাকে গালাগাল করত সবাই, মা বলত—ওকে রাতে ঘরে ঢুকতে দিস না। বউদি সামলাত বটে, কিন্তু কিছুদিন পর বউদিরও ধৈর্য থাকল না। কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে গেল বউদি। সে-সময়ে সত্যিই মুশকিল হল মেজদাকে নিয়ে। তাকে সামলানোর লোক কেউ রইল না। মাঝে মাঝে সদরের বাইরেই সারারাত শুয়ে থাকত মেজদা। দরজা খুলত না কেউই। সে-সময়ে এক বৃষ্টির রাতে নীলা উঠে গিয়ে মেজদাকে দরজা খুলে দিয়েছিল। সুবোধ জেগে থাকলে নীলাকে এ-কাজ করতে দিত না। যখন জাগল তখন নীলা উঠে গিয়ে দরজা খুলছে। রাগে, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে নীলাকে ধরল সুবোধ— 'কোথায় গিয়েছিলে?' নীলা দুর্বল গলায় উত্তর দিল—'মেজদাকে দরজা খুলে দিতে।' ভীষণ রেগে গিয়ে সুবোধ চেঁচিয়ে বলল—'কী দরকার তোমার? মাতাল, লোফার, লুম্পেন ওই ছোটোলোকটার কাছাকাছি তুমি কেন গিয়েছিলে? সে কেন তোমার গায়ে হাত দিল?' নীলা এবার অবাক হয়ে বলল—'গায়ে হাত দিল। কই, না তো!' সুবোধ তবু চেঁচিয়ে বলল—'আমি নিজে দেখেছি সে, তোমার হাত ধরে আছে।' অন্ধকারে নীলার মুখের রং দেখা গেল না, নীলা একটু চুপ করে থেকে বলল—'চেঁচিয়ো না। বিছানায় চলো।' বলে দরজায় খিল দিল নীলা। সুবোধের সমস্ত শরীর জ্বলে গেল। সে বলল—'কেন গিয়েছিলে? তোমাকে আমি বারণ করিনি ওই লোফারটার কাছাকাছি কখনো যাবে না?' নীলা সামান্য হাঁফধরা গলায় বলল—'দরজা খুলে না দিলে, উনি সারারাত বৃষ্টিতে ভিজতেন।' সুবোধ ছিটকে উঠল—'তাতে কী হত! মাতালের সর্দি লাগে না। কিন্তু তাকে তুমি প্রশ্রয় দাও কেন? এ-বাসায় তার আপনজন কেউ নেই? লোফারটা তোমার হাত...।' সামান্য কঠিন হল এবার নীলার গলা—'তুমি নিজে দেখেছ?' বাস্তবিক সুবোধ কিছুই দেখেনি, সে উঠে দেখেছে নীলা ঘরে ফিরে আসছে, তবু কেন যেন তার মনে হয়েছিল ওরকম কিছু একটা হয়েছে। তাই সে গলার তেজ বজায় রেখে বলল—'হ্যাঁ, দেখেছি।' নীলা আস্তে আস্তে বলল—'উনি মাতাল অবস্থাতেও চিনতে পেরে আমায় বললেন—'তোমাকে কষ্ট দিলাম বউমা।' আমার হাতে ওঁর হাত লাগেওনি। সত্যিই কি তুমি নিজে দেখেছ? সুবোধের আর তেমন কিছু বলার ছিল না, তবু সে খানিকক্ষণ গোঁ গোঁ করল। সারারাত ঘুমের মধ্যেও ছটফট করল। জ্বালা-যন্ত্রণা-হিংস্রতার এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি। হাতের কাছেই নীলা, তবু কেন নীলাকে দূরের বলে মনে হচ্ছে কে জানে! পরদিন থেকে ব্যাপারটা অন্য চেহারা নিল। রাতে সুবোধের চিৎকার সবাই শুনেছিল। সম্ভবত হাত ধরার ব্যাপারটা বিশ্বাস করে নিয়েই মা আর বড়দা কিছু বলেছিল মেজদাকে। মেজদার সম্বন্ধে তখন ওরকম কোনো ব্যাপারই অবিশ্বাস্য ছিল না। সুস্থ অবস্থায় সম্ভবত মেজদাও বুঝতে পারছিল না, ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল কি না। তাই পরদিন থেকেই মেজদা কেমন মিইয়ে গেল। দিনের বেলাতে আর বাসায় থাকতই না। নীলা সুবোধকে এ-ব্যাপারে সরাসরি দায়ী করেনি, কিন্তু তখন থেকেই আলাদা বাসা করার জন্য সুবোধকে বলতে শুরু করে নীলা। তাই বিয়ের দু-বছরের মাথায় সুবোধ আলাদা হয়ে এল।

তবু শান্তি ছিল না সুবোধের। যাতায়াতের পথে দেখত রকে বসে পাড়ার ছেলেরা মেয়েদের টিটকিরি দিচ্ছে, পথেঘাটে দেখত সুন্দর পোশাক পরে সুপুরুষ মানুষেরা যাচ্ছে, কখনো-বা বন্ধুদের কাছে শুনত চরিত্রহীনতার নানা রংদার গল্প। সঙ্গে সঙ্গেই নীলার কথা মনে পড়ত সুবোধের। পৃথিবীতে এত পুরুষমানুষের ভিড় তার পছন্দ হত না। তার ইচ্ছে হত, নীলাকে সে সম্পূর্ণ পুরুষশূন্য কোনো এলাকায় নিয়ে গিয়ে বসবাস করে। অফিসে বেরিয়ে বোধ হয় সে অনেকবার মাঝপথে বাস থেকে নেমে পড়েছে। মনে বিষের যন্ত্রণা। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে চুপি চুপি ফিরে এসেছে বাসায়। নি:সাড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছে দোতলায়, দরজায় কান পেতে ভেতরে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে কি না শুনতে চেষ্টা করেছে। তারপর আস্তে আস্তে দরজায় কড়া নেড়েছে। প্রায়ই দরজা খুলে নীলা অবাক হত—'এ কী, তুমি!' খুব চালাকের মতো হাসত সুবোধ, বলত—'দুর, রোজ অফিস করতে ভালো লাগে? চলো আজ একটা ম্যাটিনি শো দেখে আসি।'

শেষের দিকে নীলা হয়তো কিছু টের পেয়েছিল। আর তাকে দেখে অবাক হত না। শক্ত মুখ আর ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে একদিন বলেছিল—'চৌকির তলাটলাগুলো ভালো করে দেখে নাও।'

ধরা পড়ে মনে মনে রেগে যেত সুবোধ। নিজের সঙ্গে নিজেই বিজনে ঝগড়া করত—'কিছু একটা না হলে আমার মনে এরকম সন্দেহ আসছে কেন! আমার মন বলছে কিছু একটা আছেই। বাইরে থেকে আর কতটুকু বোঝা যায়!'

তবু নীলা চোখের জল ফেলেনি কোনোদিন। ঝগড়া করেনি। কেবল দিনে দিনে আরও গম্ভীর, শীতল, কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। সুবোধের ধরাছোঁয়ার বাইরেই চলে যাচ্ছিল নীলা। বছর চারেক আগে পেটে বাচ্চা এল তার। তখন আরও রুক্ষ, আরও কঠিন দেখাল নীলাকে। হাসপাতালে যাওয়ার কয়েকদিন আগে, সে খুব শান্ত গলায় একদিন সুবোধকে বলেছিল—'শুনেছি মেয়ের মুখে বাপের ছাপ থাকে, আমার যেন মেয়ে হয়।' সুবোধ অবাক হয়ে বলল—'কেন?' নীলা মৃদু হেসে বলল—'তাহলে প্রমাণ থাকবে যে, সে ঠিক বাপের মেয়ে। মুখের আদল তো চুরি করা যায় না।' মেয়েটা বাঁচেনি। বড়ো রোগা দুর্বল শরীর নিয়ে জন্মেছিল। আটদিন পর মারা গেল। মুখের আদল তখনও স্পষ্ট হয়নি। কোথায় যেন, একটা কাঁটা এখনও খচ করে বেঁধে সুবোধের। নীলা কথাটা যে কেন বলেছিল?

তারপর থেকেই সুবোধ জানত যে, নীলা চলে যাবে। আজ কিংবা কাল। আজ-কাল করে করেও বছর তিনেক কেটে গেল। খুব অশান্তি কিংবা ঝগড়াঝাঁটি কিছুই হয়নি তাদের মধ্যে। বাইরে শান্তই ছিল তারা। ভেতরে ভেতরে বাঁধ তুলে দিল কেবল। অবশেষে নীলা চলে গেল কাল।

সারাসকাল কাটল নির্জনতায়, ঘরের মধ্যে! একরকম ভালোই লাগছিল সুবোধের। দশ বছরের উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, রাগ—এখন আর তেমন অনুভব করা যায় না। কোনো দুঃখও বোধ করে না সে! সন্দেহ হয় নীলাকে সে কোনোদিন ভালোবেসেছিল কি না। সে বুঝতে পারে না, ভালো না বেসে থাকলে নীলার প্রতি ওরকম অদ্ভুত আগ্রহই বা তার কেন ছিল? গত দশবছরে নীলার কথা সে যত ভেবেছে তত আর কারও কথা নয়।

দুপুরের দিকে ঘরে তালা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বিয়ের আগে যেমন হঠকারী দায়িত্বহীন সুন্দর সময় সে কাটিয়েছে, সেরকমই সুন্দর সময় আবার ফিরে এসেছে আজ। বাধাবন্ধনহীন। মনটা ফুরফুরে রঙিন একটা রুমালের মতো উড়ছে। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়স তার, সামনে এখনও দীর্ঘ জীবন—দায়দায়িত্বহীন তার চাকরিটা মাঝারি গোছের। উঁচু থাকের কেরানি। তাদের দুজনের মোটামুটি চলে যেত। এবার একা তার ভালোই চলবে। নীলা টাকা চাইবে না বলেই মনে হয়। চাইলেও দিয়ে দেওয়া যাবে। মোটামুটি নীলার ভাবনা থেকে মুক্তিই পেয়েছে সে। এবার পুরোনো আড্ডাগুলোয় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। এবারে গ্রীষ্মে প্রতিটি ফুটবল খেলাই দেখবে সে। রাতের শোয়ে দেখবে সিনেমা। ছুটি পেলেই পাড়ি দেবে কাশ্মীর কিংবা হরিদ্বারে, দক্ষিণ ভারত দেখে আসবে। এবার থেকে সে মাঝেমধ্যে একটু মদ খাবে। খারাপ মেয়েমানুষদের কাছে যায়নি কোনোদিন, এবার একবার যাবে। আর দেখে আসবে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। 'মুক্তি—মুক্তি'—তার মন নেচে উঠল।

হোটেলে খেয়ে আর ঘরে ফিরল না সুবোধ। সিনেমায় গেল। দামি টিকিটে বাজে বই দেখে বেরিয়ে গেল কলেজ স্ট্রিটে। ঘিঞ্জি পুরোনো একটা চায়ের দোকানে আট-নয় বছর আগেও তাদের জমজমাটি আড্ডা ছিল। সেখানে পর পর কয়েক কাপ চা খেয়ে সন্ধে কাটিয়ে দিল সুবোধ। পুরোনো বন্ধুদের কারোরই দেখা পেল না। বেরিয়ে পড়ল আবার।

সন্ধে সাতটা। কোথায় যাওয়া যায়?

অনেকদিন আগে সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে শখ করে মদ খেয়েছে সুবোধ। সঙ্গীছাড়া কোনোদিন খায়নি। মদের দোকানগুলোকে সে ভয় পায়। তবু আজ একটু খেতে ইচ্ছে করছিল তার। উত্তেজনার বড়ো অভাব বোধ করছিল সে।

বাসে, ট্রামে ভিড় ছিল বলে, সে হেঁটে হেঁটে এসপ্ল্যানেডে এল। অনেক মদের দোকানের আশপাশে ঘুরে দেখল। বেশি বাতি, বেশি লোকজন, হইচই তার পছন্দ নয়। অনেকগুলো দেখে সে, গলিঘুঁজির মধ্যে একটা ছোট্ট দোকান পছন্দ করে ঢুকল। ভেতরে আলো কম, দু-চারজন লোক বসে আছে এদিক-ওদিক। কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে—আবছা আলোয় তাদের মুখ বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েগুলোর দিকে বেশি তাকাল না সুবোধ। ফাঁকা একটা টেবিলে দেওয়াল ঘেঁষে বসল। বেয়ারা এলে একসঙ্গে তিন পেগ হুইস্কির হুকুম করল সে।

বেশিক্ষণ লাগল না। অনভ্যাসের মদ তার মাথায় ঠেলা মারতে থাকে। আস্তে আস্তে গুলিয়ে যায় চিন্তাভাবনা, শরীরের মধ্যে একটা অবোধ কষ্ট হতে থাকে, পা দুটো ভারী হয়ে ঝিনঝিন করে। এই তো বেশ নেশা হচ্ছে—ভেবে সুবোধ কাউন্টারের কাছে দাঁড়ানো একটি মেয়ের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি পরিচিতার মতো হাসে। সুবোধ হেসে তার উত্তর দেয়। পরমুহূর্তেই গ্লাসে চুমুক দিয়ে চোখ তুলে, সে দেখে মেয়েটি তার উলটোদিকের চেয়ারে বসে আছে। মেয়েটি কালো, মোটা থলথলে বয়স ত্রিশের এদিক-ওদিক। মেয়েটি বলে—'বাব্বা:, তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু খাওয়াও তো।'

কোনো কোনো বন্ধুর কাছে এদের কথা শুনেছে সুবোধ। তাই অবাক হয় না। মেয়েটির জন্যও এক পেগের হুকুম দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে—তোমার ঘর কোথায়?

—কাছেই। যাবে?

—মন্দ কী?

—তবে আরও দু-পেগের কথা বলে দাও। তাড়াতাড়ি বলো। এরপর বন্ধ হয়ে যাবে।

সুবোধ আরও দু পেগের কথা বলে দিয়ে হাসল—মদ খাও কেন?

—তুমি খাও কেন?

—আমার বউ চলে গেছে।

'আমারও স্বামী চলে গেছে।' —বলেই মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে বলে—'শোনো, ঘরে যেতে কিন্তু ট্যাক্সি করতে হবে। হেঁটে যেতে নেশা থাকে না।'

'ট্যাক্সি!' হা: হা:। বলে হাসল সুবোধ। তার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। বলল—আমার বউয়ের গল্প তোমাকে শোনাব আজ—

—খুব ছেনাল ছিল?

—না না। ছেনাল নয় তবে অন্যরকম—

—চলে গেল কেন?

—সেটাই তো গল্প।

—ওরকম আকছার হচ্ছে। তোমার বউয়ের দুঃখ আমি ভুলিয়ে দেব।

—দুঃখ! বড়ো অবাক হল সুবোধ। দুঃখের কোনো ব্যাপার-ই তো নয় নীলার চলে-যাওয়াটা! তবু নেশার ঘোরে এখন তার মনটা হু-হু করে উঠল। দুঃখিত মনে সে মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, খুব দুঃখের গল্প—

—কেটে যাবে। বিলটা মিটিয়ে দাও।

বিল মেটাল সুবোধ। তারপরও গোটা ত্রিশেক টাকা রইল ব্যাগে। মেয়েটা আড়চোখে দেখে বলল—তুমি কি আমার ঘরে সারারাত থাকবে?

মন্দ কী? সুবোধ হাসল।

—ত্রিশ টাকায় হবে না কিন্তু।

—হবে না?

—হয়! বলো-না, এই বাজারে...ত্রিশ টাকায় ঘণ্টা দুই, তার বেশি না।

—না। ত্রিশ টাকায় সারারাত।

—পাগল।

—তবে কেটে পড়ো। আমি কেরানির বেশি কিছু না।

দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি। গ্লাস নি:শেষ করে আঁচলে মুখ মুছল। বলল—মদ খাওয়ালে, ভালোবাসলে, ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

—কেটে পড়ো।

—ঠিক আছে। চলো। ত্রিশ টাকাতেই হবে, আহা তোমার বউ চলে গেছে—না? ঠিক আছে, চলো তো দেখি, তোমার বউ ভালো না, আমি ভালো। বলতে বলতে সুবোধকে হাত ধরে টেনে তুলল মেয়েটা।

ট্যাক্সিতে সুবোধ মেয়েটির কাঁধে মাথা রেখেছিল। সস্তা প্রসাধন তার তেলের বিশ্রী গন্ধ। তবু মুখ সরিয়ে নিতে তার ইচ্ছে করছিল না। মেয়েটি ট্যাক্সিওয়ালাকে নানা জটিল পথে নিয়ে যেতে বলেছে। কথা আর কথায় বুক ভরে আসছিল সুবোধের। সে অনর্গল কথা বলছিল—নীলার কথা, কাল রাতের স্বপ্নের কথা, মেজদার কথা, মরা মেয়েটার কথা। কখনো সে বলছিল, সে এবার বেড়াতে যাবে হরিদ্বারে, যাবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, ফুটবল ম্যাচ দেখবে। একা একাই থাকবে সে। মেয়েটি কোনো কথাতেই কান দিল না। শুধু মাঝে মাঝে বলল—'শুয়ে পোড়ো-না বাপু গায়ের ওপর। পুরুষমানুষগুলো যা ন্যাতানো হয়, একটু দুঃখ-টু:খ হলেই গড়িয়ে পড়ে।' কথাগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারছিল না সুবোধ! দুঃখ! দুঃখ কীসের! মেয়েটি জানেই না, তার মন রঙিন একখানা রুমালের মতো উড়ছে।

ট্যাক্সি যেখানে থামল, সে জায়গাটা সুবোধ চিনল না। শুধু টের পেল গোলকধাঁধার মতো খুব জটিল প্রকান্ড একটা বাড়ির মধ্যে সে ঢুকে যাচ্ছে। অনেক সিঁড়ি, সরু বারান্দা, আবার সিঁড়ি—বিচিত্র অচেনা লোকজন, মাতাল, বেশ্যা, ফড়ের গা ঘেঁষে মেয়েটি তাকে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে নীলার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে। অথচ, জানে না দুঃখই নেই আসলে। ভেবে সে হাসল—'ভালো জায়গায় থাকো তুমি—কী যেন নাম তোমার?'

মেয়েটি বলল—'অনিলা'।

হাসল সুবোধ—'চালাকি হচ্ছে'?

—কেন?

—আমার বউয়ের নাম তো নীলা।

—ওমা! তাই নাকি! বলোনি তো?

—বলিনি?

—না। মাইরি...

—চালাকি হচ্ছে? অ্যাঁ।

মেয়েটি হাসে—সত্যিই আমি অনিলা। তোমার বউয়ের উলটো। দেখো প্রমাণ পাবে। খুব সুন্দরী ছিল তোমার বউ? ফর্সা?

—না। কালোই। মন্দ না।

—খুব কালো?

—না। শ্যামবর্ণ। এই আমার গায়ের রং।

—ওমা। তুমি তো ফর্সাই?

—যা:।

হাসল সুবোধ। লজ্জায়।

ঘরখানা ভালোই। বসতে ঘেন্না হয় না। পরিষ্কার বিছানাটাই আগে চোখে পড়ল সুবোধের। ভারী মাথা নিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বলল—মদ খেয়ে কিছু হয় না। উত্তেজনা লাগছে না।

—আর খাবে!

—না। পয়সা নেই।

—পয়সা না থাক, ঘড়ি আংটি আছে। জমা রেখে খেতে পারো। পরে পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে।

—না। আর খেলে ঘুম পাবে, বমিও হবে।

—তবে থাক।

সুবোধ মেয়েটিকে অনাবৃত হতে দেখছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হল, জিজ্ঞেস করল—'আজ কি তোমার আর খদ্দের আছে? তাড়াতাড়ি করছ কেন?

মেয়েটি হাসল—আছে। কিন্তু তাতে তোমার কী? তোমাকে আলাদা বিছানা করে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। তুমি টেরও পাবে না।

—পাব না?

—না।

মেয়েটি কাছে আসে। আস্তে আস্তে উঠে বসে সুবোধ—তুমি তো অনিলা!

—হুঁ।

—দুর। তাহলে হবে না।

বলে হাই তোলে সুবোধ।

—কেন?

সুবোধ উত্তর দেয় না! অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে থাকে। নীলা! নীলা এখন কোথায়? তার মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খায়। পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ পুরুষ। তার মধ্যে নীলা একা কোথায় চলে গেল? কী করছে এখন নীলা?

মেয়েটি বলে—'আমার দিকে তাকাও। দ্যাখো-না আমাকে।

সুবোধ গোরুর মতো নিরীহ চোখে তাকায়। হাসে। বলে—দুর। তোমার দ্বারা হবে না।

—কেন?

—তুমি তো পরিষ্কার মেয়ে। কিচ্ছু লুকোনো নেই তোমার। তোমাকে একটুও সন্দেহ হয় না।

—বা:। তা তুমি চাও কী?

—সন্দেহ করতে।

বলতে বলতে হাসে সুবোধ। হেসে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

দূরত্ব

মন্দার টেবিলের ওপর শুয়েছিল। থার্ড পিরিয়ড তার অফ। মাথার নীচে হাত, হাতের নীচে টেবিলের শক্ত কাঠ। বুকের ওপর ফ্যান ঘুরছে। শরীরটা ভালো নেই ক-দিন। সর্দি। ফ্যানের হাওয়াটা তার ভালো লাগছিল না। কিন্তু বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে ঠিক। শার্টের গলার বোতামটা আটকে সে শুয়েছিল। ক্রমে ঘুম এসে গেল। আর 'ঘুম' মানেই স্বপ্ন, কখনো স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয় না মন্দার।

স্বপ্নের মধ্যে দেখল তার বউ অঞ্জলিকে। খুব ভিড়ের একটা ডবলডেকার থেকে নামবার চেষ্টা করছে অঞ্জলি। অঞ্জলির কোলে একটা কাঁথা-জড়ানো আঁতুড়ের বাচ্চা। নীচের মানুষরা অঞ্জলিকে ঠেলে ওঠবার চেষ্টা করছে, পেছনের মানুষরা নামবার জন্য অঞ্জলিকে ধাক্কা দিচ্ছে, চারদিকের লোকেরা অঞ্জলিকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, সরিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা মারছে, তার মুখখানা কাঁদো কাঁদো, কোলের বাচ্চাটা 'ট্যাঁ ট্যাঁ' করে কাঁদছে, কোনোদিকেই যেতে পারছে না সে। নামতেও না, উঠতেও না, বাচ্চাটা অঞ্জলির শরীর ভাসিয়ে বমি করে দিল, পায়খানা করল, পেচ্ছাপ করছে। চারদিকে রাগি, বিরক্ত, ব্যস্ত মানুষরা চেঁচাচ্ছে, গাল দিচ্ছে, যেন বাচ্চাসুদ্ধু অঞ্জলি জাহান্নামে যাক, না গেলে তারাই পাঠাবে। ঘুমের মধ্যেই মন্দার ভিড় ঠেলে অঞ্জলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আকুলভাবে। কিন্তু প্রতিটি লোক-ই পাথর। কাউকে ঠেলে সরাতে পারছে না মন্দার। সে চেঁচিয়ে বলছিল—আমি কিন্তু নেমে পড়েছি অঞ্জলি, তোমাকেও নামতে হবে। নামো, শিগগির নামো, বাস ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই স্বর এত দুর্বল যে, ফিসফিসের মতো শোনা গেল। ক্রুদ্ধ কনডাক্টর ডবল ঘণ্টি বাজিয়ে দিচ্ছে...অঞ্জলির কী-যে হবে!

দুঃস্বপ্ন। চোখ খুলে মন্দার বুকের ওপর ঘুরন্ত পাখাটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়।

অঞ্জলি এখন আর তার ঠিক বউ নয়। মাস ছয়েক আগে মন্দার মামলা দায়ের করেছিল। আপোশের মামলা। সেপারেশন হয়ে গেছে। অঞ্জলি যখন চলে যায় তখন, তার পেটে মাস দুয়েকের বাচ্চা। এতদিনে বোধ হয় বাচ্চা হয়েছে, মন্দার খবর রাখে না। দেখেনি। ছেলে না মেয়ে, তা জানতে ইচ্ছেও হয়নি। কারণ, বাচ্চাটা তার নয়।

বিয়ের সাতদিনের মধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারল মন্দার। তখন-ই মাস দুয়েকের বাচ্চা পেটে অঞ্জলির। তা ছাড়া অঞ্জলির ব্যবহারটাও ছিল খাপছাড়া। কথার উত্তর দিতে চাইত না, ভালোবাসার সময়গুলিতে কাঁটা হয়ে থাকত। তবু দিন সাতেক ধরে অঞ্জলিকে ভালোবেসেছিল মন্দার। মেয়েদের সংস্পর্শহীন জীবনে অঞ্জলি ছিল প্রথম রহস্য। দিন সাতেকের মধ্যেই বাড়িতে অঞ্জলিকে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। মন্দারের কানে কথাটা তোলে তার ছোটোবোন। শুনে মন্দারের জীবনে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। অঞ্জলি অস্বীকার করেনি। মন্দার সোজা গিয়ে যখন অঞ্জলির বাবার সঙ্গে দেখা করে, তখন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধটি কেঁদে ফেলেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন—'ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দরকার

ছিল, আমি সেটুকুর জন্য তোমাকে এই নোংরামিতে টেনে নামিয়েছি। ওকে তুমি ফেরত দেবে জানতাম। যদি একটি কথা রাখো, ওর ছোটোবোনের বিয়ে আর দু-মাস বাদে, সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু এই ক-টা দিন কথাটা প্রকাশ কোরো না। মামলা তারপর দায়ের কোরো। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা আমরা লড়ব না।'

অঞ্জলি ফেরত গেল বিয়ের দশ দিনের মাথায়। দু-মাস অপেক্ষা করে মামলা আনে মন্দার। অঞ্জলি লড়ল না, ছেড়ে দিল। অঞ্জলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বিয়ের পর আট মাস কী ন-মাস কেটে গেছে। মন্দার এখনও কেমন বেকুবের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশ ফিরে শুতেই দেখা যায়, বইয়ের আলমারি। আলমারির ওপরেই উইপোকার আঁকাবাঁকা বাসা। সেদিকে চেয়ে থেকে সে স্বপ্নটা কেন দেখল, তা মনে মনে নাড়াচাড়া করল একটু। আসলে স্বপ্নের তো মানে থাকে না। আর এ তো ঠিকই যে, অঞ্জলির কথা সে এখনও ভুলে যায়নি। এসব কি ভোলা যায়?

আজ মঙ্গলবার। আজই তার দুটো ক্লাস। একটা সেকেণ্ড পিরিয়ডে নিয়েছে, আর একটা ফিফথ পিরিয়ডে নেওয়ার কথা। এ-সময়টায় কলেজে ক্লাস বেশি থাকে না। 'পি ইউ'-তে এখনও ছেলে ভরতি হয়নি, 'পার্ট টু' বেরিয়ে গেছে। সপ্তাহে দু-দিন ছুটি থাকে তার, অন্য দিন একটা দুটো ক্লাস নেয়, বাকি সময়টা শুয়ে থাকে। কেউ কিছু বলে না। সকলেই জেনে গেছে, মন্দার চ্যাটার্জির ডিভোর্স হয়ে গেছে, তার মন ভালো না, সে একটু অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে কলেজে আসে। এসব ক্ষেত্রে একটু-আধটু স্বেচ্ছাচার সবাই মেনে নেয়। মন্দার টেবিলে উঠে শুয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। থার্ড পিরিয়ড চলছে, ঘরে কেউ নেই, মন্দার একা। আবার ঘুমোতে তার ইচ্ছে করছিল না। ওই ঘটনার পর কয়েকটা দিন, খুবই অস্বাভাবিক বোধ করেছিল ঠিকই। বোধহয় তার সাময়িক একটা মাথা খারাপের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। 'সময়', সময়ের মতো এমন সান্ত্বনাকারী আর কেউ নেই। মন্দারের মনে সময়ের স্রোত তার পলির আস্তরণ দিয়ে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ ওই দুঃস্বপ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেল মন্দার। তারপর ছেলেদের খবর পাঠাল, ফিফথ পিরিয়ডের ক্লাসটা আজ সে করবে না। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি নেই, বাইরে একটা চমকানো রোদ স্থির জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে মন্দারের জন্য কিছু নেই। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে, এতদিনে তার একটা বাচ্চা হতে পারত। আর তাহলে এখন মন্দার এই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সেই শিশুটির কাছেই ফিরে যেত হয়তো-বা সেই শিশুশরীরের গন্ধটি শ্বাসে টেনে নিতে।

এতবড়ো জোচ্চুরি যে টেকে না, তা কি অঞ্জলি জানত না? তার বাবাও কি জানত না? তবে তারা খামোখা কেন ওই কান্ড করল? কেবল একটু সিঁদুরের জন্য কেউ কি একটা লোকের সারাজীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে? কীরকম বোকামি এটা? দু-মাসের বাচ্চা পেটে লুকিয়ে রেখে বিয়ে—ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

স্বপ্নে দেখা অঞ্জলির অসহায় ব্যথাতুর মুখখানার প্রতি যে সমবেদনা জন্মলাভ করেছিল, তা ঝরে গেল। জাগ্রত মন্দারের ভেতরটা হঠাৎ আক্রোশে, রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রামে-বাসে অচল আধুলি পেয়ে ঠকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। কিছু করার থাকে না। অঞ্জলি আজও তার নামে সিঁদুর পরে কি না কে জানে?

মন্দার বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। গরমের দুপুর রাস্তা ফাঁকা। সে ট্যাক্সিটায় বসে ঘাড় এলিয়ে স্বপ্নটার কথা না ভেবে পারে না। ভিড়ের ভেতর একটা ডবলডেকার থেকে নামতে পারছে না অঞ্জলি, কোলের বাচ্চাটা তার সারাশরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীরের অভ্যন্তরীণ ময়লায়, ক্বাথে। নিষ্ঠুর মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলছে, ধাক্কা দিচ্ছে, গাল এবং অভিশাপ দিচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনো মানে হয় না। অঞ্জলির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। দেখা হওয়ার কথাও নয়। এখন সে কি তার প্রেমিকের ঘর করছে? কে জানে! স্বপ্নে মন্দার অঞ্জলিকে সেই ভিড় থেকে, অপমান লাঞ্ছনা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। জাগ্রত মন্দার কোনোদিনই সেই চেষ্টা করবে না।

ট্যাক্সিওয়ালাটা খোঁচায়। কেবলই ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—'কোথায় যাবেন?'

মন্দার বিরক্ত হয়ে বলে—'সোজা চলুন, বলে দেব।'

কিছুক্ষণ দিক ঠিক করতে সময় গেল। কলকাতার কত অল্প জায়গা চেনে মন্দার! তার চেনা মানুষের সংখ্যাও কত কম। এখন এই ট্যাক্সিতে বসে কারও কথাই তার মনে পড়ে না, যার কাছে যাওয়া যায়। কোনো জায়গাও ভেবে পায় না সে, যেখানে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসে থাকবে। বাসায় ফেরার কোনো অর্থ নেই। সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের গাদাগুচ্ছের বইতে আকীর্ণ ঘরখানা বড্ড রসকষহীন। গত কয়েকমাস সেই বই প্রায় ছোঁয়নি। থিসিসের কিছু পাতা লেখা হয়েছিল, পড়ে আছে। ঘরে কেবল বিছানাটাই মন্দারের প্রিয়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, শুয়েই থাকে মন্দার। ঘুমোয়, ভাবে, সিগারেট খায়। আজকাল কেউ ঘরে ঢোকে না ভয়ে।

ট্যাক্সিটা কিছুক্ষণ ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক ঘোরাল সে। তারপর অচেনা রাস্তায় এসে পড়ায় চিন্তিতভাবে এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে গেল।

কোথায় নেমেছে তা বুঝতে পারল না, তবু এ তো কলকাতাই! ঘুরেফিরে ডেরায় ফিরে যাওয়া যাবে। ভয় নেই। কিছুক্ষণ হাঁটলে বোধ হয় ভালোই লাগবে।

অচেনা রাস্তা ধরে আন্দাজে সে হাঁটে। বুঝতে পারে, চৌরঙ্গির কাছাকাছি অঞ্চল। নির্জন পাড়া, গাছের ছায়া পড়ে আছে, বাড়িগুলো নি:ঝুম। কয়েকটা দামি বিদেশি গাড়ি এধারে-ওধারে পড়ে আছে। মন্দার চমকি রোদে কিছুক্ষণ হাঁটে। ভালো লাগে না, কেন ভালো লাগে না, তা বুঝতে পারে না। রোদ বড্ড বেশি। গরম লাগে, ঘাম হয়। শরীরের শ্রম, মনের ভার লাঘবে কাজ করে না। 'মন' জিনিসটা বড়ো ভয়ানক।

আসলে সে বুঝতে পারে, একবার অঞ্জলির সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। গত ছ-মাস ধরে বন্ধনমুক্ত মন্দার সুখী নয়। এই সুখী না হওয়ার কারণ সে খুঁজে পায় না, পাচ্ছে না। সে ঠকে গিয়েছিল বলে আক্রোশ? তাকে একটা চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঘৃণা? সে অঞ্জলিকে ছুঁয়েছিল, ভালোবেসেছিল বলে বিবমিষা? উত্তরটা অঞ্জলির কাছে আর একবার না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডবলডেকারের পাদানির ভিড়ে অঞ্জলিকে স্বপ্নে দেখার কোনো মানে না থাক, গত ছ-মাস মন্দার যে সুখী নয় এটা সত্য। ভয়ংকর সত্য। বিস্মৃতির পলি পড়েছে মনে, ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে সে, এবং এইভাবেই একদিন হয়তো-বা সে দার্শনিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান নেই। সে আবার বিয়ে করবে ঠিকই। মেয়ে দেখা হয়েছে। সামনের শ্রাবণে, সে খুবই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান থেকে তার নতুন স্ত্রীকে তুলে আনবে। কিন্তু তবু অসুখীই থেকে যাবে। অঞ্জলির কাছে একটা রহস্য গোপন রয়ে গেছে।

অঞ্জলি দেখতে ভালো, অন্যদিকে খুবই সাধারণ। বি এ, পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল। খালি গলায় গাইতে পারত। রং চাপা, মাথায় গভীর চুল, ভীরু চাউনি ছিল। আর তেমন কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের সাতদিন বাদে এক রাত্রিতে প্রায় উন্মাদ মন্দার জিজ্ঞেস করেছিল—'তুমি প্রেগন্যান্ট?'

অঞ্জলি ভীষণ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুটো হাত সামনে তুলে, ভীরু, খুব ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিল—আমার বাবা এই বিয়ে জোর করে দিয়েছেন, আমি চাইনি—

—তুমি প্রেগন্যান্ট কি না বলো।

—হ্যাঁ।

—মাই গুডনেস!

অঞ্জলি তবু কাঁদেনি, কেবল ভয় পেয়েছিল। কী হবে তা অঞ্জলি বোধ হয় জানত। মন্দার যখন অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, তখন ঘরে অঞ্জলির বাক্স গোছানোর শব্দ পেয়েছিল। অর্থাৎ অঞ্জলি ধরেই নিয়েছিল চলে যেতে হবে। মানুষ বরাবর এই 'সরে-যাওয়া'টা বিশ্বাস করে।

ক্লান্ত মন্দার আবার একটা ফুটপাথের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা খায়। গাছের তলায় কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপর অন্যমনে বসে ভাঁড়টা শেষ করে। অঞ্জলির কাছে যাওয়াটা ভারি বিশ্রী হবে। ভাঁড়টা

ছুড়ে ফেলে দেয় সে। অঞ্জলির বাড়িতে টেলিফোন নেই।

আবার একটা ট্যাক্সি নেয় মন্দার। এবার সে উত্তর কলকাতার একটা কলেজের ঠিকানা বলে ড্রাইভারকে। তারপর চোখ বুজে পড়ে থাকে। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার কোনো মানে নেই। তবু এখন একটা কিছু বড়ো দরকার মন্দারের। কী যে দরকার তা ঠিক জানে না। নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্বপরিচয় নেই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পারিবারিক যোগাযোগে।

নন্দিনীকে পেতে একটুও কষ্ট হল না। ক্লাস ছিল না বলে, কমনরুমে আড্ডা দিচ্ছিল। বেয়ারা ডেকে দিয়ে গেল।

মন্দারকে দেখে নন্দিনী ভীষণ অবাক। লোকটা কী ভীষণ নির্লজ্জ! সামনের শ্রাবণে বিয়ে, তবু দ্যাখো তার আগেই কেমন দেখা করতে এসেছে!

—আপনি?

—আমি মন্দার...

—জানি তো!

—একটু দরকারে এলাম, ক-টা কথা বলতে।

—কী কথা?

—আমার প্রথমা স্ত্রীর সম্পর্কে।

—সেও তো জানি।

—ওঃ।

—আর কিছু?

—না, আর কিছু নয়। ভেবেছিলাম বুঝি তোমাকে আমাদের বাসা থেকে কিছু জানানো হয়নি।

—আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমি ভাবি না।

মন্দার নন্দিনীকে একটু দেখে। চোখা চেহারার মেয়ে। খুব বুদ্ধি আছে মনে হয়। 'বুদ্ধি' ছাড়া অন্য কোনো জলুস নেই। রং ফর্সা, লম্বাটে মুখ, ছোটো নাক। আলগা সৌন্দর্য কিছু নেই।

মন্দার বলল—'কিছু মনে করলে না তো!'

নন্দিনী হাসে—এই কথা বলার জন্য আসার কোনো দরকার ছিল না। আজকাল চড়া রোদ হয়।

—ট্যাক্সিতে এসেছি।

—অযথা খরচ।

—আমার খুব একা লাগছিল।

নন্দিনী একটু মাথা নীচু করে ভাবল। নন্দিনীর সঙ্গে মন্দারের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল পাত্রী দেখতে গিয়ে। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে, তবু এতদূর মন্দার না করলেও পারত। তার লজ্জা করছিল।

নন্দিনী মুখ তুলে আস্তে বলল—আমার এখন অফ পিরিয়ড চলছে, শেষ ক্লাসটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের—ওটা তো না করলেও চলবে।

—না করলেও চলবে কেন?

নন্দিনী একটু হেসে বলে—'পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফেল করব না।'

মন্দারও একটু হাসে। বলে—তাহলে তো তোমার ছুটিই এখন?

—মনে করলেই ছুটি।

—কোথায় যাবে?

—আমি কী জানি? যদি কেউ নিয়ে যেতে চায়।

খুবই চালু মেয়ে তার ভাবী বউ। এত চালু মন্দার ভাবেনি। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ও খুব কথা বলে। বেশ বুদ্ধির কথা, চটপট কথার জবাব দিতে পারে, রসিকতা করতে জানে, সাধারণ লজ্জা-সংকোচ ওর নেই।

পাত্রী দেখতে গিয়ে এতটা লক্ষ করেনি মন্দার। তখন অভিভাবকদের সামনে হয়তো অন্যরকম হয়েছিল। একে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছিল না মন্দারের। কথা নয়, চুপচাপ পাশে বসে থাকবে, এমন একজন সঙ্গী দরকার তার। যার মন খুব গভীর, যার স্পর্শকাতরতা খুব প্রখর। যে 'কথা' ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে।

মন্দার ঘড়িটা দেখে বলল—'আমার চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ থাক। অন্য কোনোদিন আসব।'

একটু হতাশ হয় নন্দিনী। বলে—আসার তো দরকার ছিল না।

—ছিল। সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝব না কেন?

—আমি নিজেই বুঝি না।

বলে মন্দার কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

মাত্র গোটা চারেক টাকা পকেটে আছে। তবু মন্দার আবার ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। খানিকদূর হেঁটে পেয়েও গেল একটা। দক্ষিণদিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে আবার ঘাড় এলিয়ে চোখ বোজে সে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা দেখতে পায়। সেই ডবলডেকারের পাদানি, ভিড়, টালমাটাল অঞ্জলি, কোলে শিশু।

অঞ্জলিদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল মন্দার। ভাড়া দিতে গিয়ে পকেট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। টাকা আর খুচরো যা ছিল, সব দিয়েও পনেরো পয়সা কম হল। ট্যাক্সিওয়ালা হেসে সেটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

দরজা খুললেন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ। অঞ্জলির বাবা। খুলে ভারি অবাক হলেন।

—বাবাজীবন, তুমি?

—আমিই।

—এসো এসো।

মন্দার ঘরে ঢোকে। অঞ্জলির মা নেই। ভাইরা, বউ নিয়ে আলাদা থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িটা একটু অগোছালো।

'বসবে না?' বুড়ো তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

মন্দার বসে। জিজ্ঞেস করে—কী খবর?

—খবর আর কী? কোনোরকম।

বুড়ো গলাখাঁকারি দেয়।

—আমি অঞ্জলির খবর জানতে চাইছি।

বুড়োর ঠিক বিশ্বাস হয় না। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়! বলে—সে ভেতরের ঘরে আছে।

মন্দার চুপ করে থাকে।

বুড়ো খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করেন—কী চাও মন্দার? ওকে কিছু বলবে?

—হুঁ।

—যাও-না, নিজেই চলে যাও ভেতরে। ডাকলেই সাড়া পাবে।

সাত দিনের জন্য এ-বাড়িটা তার শ্বশুরবাড়ি ছিল, এই সুন্দর বৃদ্ধটি ছিলেন তার শ্বশুর। বাড়িটা মন্দারের চেনা। একটু সংকোচ হচ্ছিল, তবু মন্দার উঠল।

বৃদ্ধ বলে—'ভেতরে বাঁ-দিকের ঘরে আছে।'

মন্দার যায়।

দরজা খোলা। অঞ্জলি শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে একটা পুঁটলির মতো বাচ্চা তুলতুল করে। সে ঘুমোচ্ছে।

মন্দার ঘরে পা দিতেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চমকে উঠল কি না, কে জানে! অবাক হল খুব। উঠে বসল খুব ধীরে। কোনো প্রশ্ন করল না। কেবল বাচ্চাটাকে একটা হাত বাড়িয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। চোখে ভয়। মন্দার হাসে। জিজ্ঞেস করে—কবে হল?

—আজ আট দিন।

—ভালো আছ?

—না। খুব কষ্ট গেছে। আমার শরীরে রক্ত ছিল না।

বলে শ্বাস ফেলল অঞ্জলি—খুব কষ্ট গেছে। বিকারের মতো হয়েছিল। তুমি বোসো। ওই চেয়ার টেনে নাও। কিছু বলবে?

—বলব।

—কী?

—আমি ভীষণ অসুখী।

—হওয়ার কথাই। এখন কী করতে চাও?

—কয়েকটা ভাইটাল প্রশ্ন করব।

—করো।

—তোমার প্রেমিকটি কে?

বিস্ময়ে চোখ বড়ো করে অঞ্জলি বলে—প্রেমিক?

—ওই বাচ্চাটার বাবার কথা বলছি।

—সে আমার প্রেমিক হবে কেন? তাকে তো আমি ভালোবাসতাম না, সেও আমাকে বাসত না।

—তাহলে এটা কী করে হল?

—হয়ে গেল। কতকিছু এমনিই হয়ে যায় যা ঠিক বুঝতেই পারা যায় না।

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল। ভুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সে করতে চায়নি। এই প্রশ্ন করতে সে আসেনি। তবে কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন?

সে বলল—তুমি ওর বাবাকে বিয়ে করবে না?

'বিয়ে'! ভারি অবাক হয় অঞ্জলি, বলে—'তা কি সম্ভব? সে কোথায় চলে গেছে! তা ছাড়া আমি তা করতে যাব কেন? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।'

এও ভুল প্রশ্ন। মন্দার বুঝতে পারে। এবং তারপর সে আবার একটা ভুল প্রশ্ন করে—তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও?

—না। তুমি অনেক দিয়েছ।

—কী দিয়েছি?

—এই বাচ্চাটার একটা পরিচয়।

মন্দার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও কি আমার বাচ্চা হিসেবেই চালু থাকবে নাকি?

—যদি তুমি অনুমতি দাও।

মন্দার একটু ভেবে বলে—'থাকুক।'

অঞ্জলি খুশি হল। বলল—'আমি জানতাম, তুমি আপত্তি করবে না।'

—আমি বিয়ে করছি অঞ্জলি।

—জানি। করাই উচিত।

তবু সঠিক প্রসঙ্গটা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দার। এসব কথা নয়, এর চেয়ে জরুরি কী একটা বলবার আছে তার। বুঝতে পারছে না। খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাই সে বেকুবের মতো বসে থাকে।

—তোমার শরীরে রক্ত নেই?

—না। কিছু খেতে পারতাম না গত কয়েকমাস। বাচ্চাটা তখন আমার শরীর শুষে খেয়েছে। ওর দোষ নেই। বাঁচতে তো ওকেই হবে। শরীরটা তাই গেছে।

—তোমার অসুখটা কেমন?

—বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ দুর্বল।

—তুমি শুয়ে থাকো বরং। শুয়ে শুয়ে কথা বলো।

—তাই কী হয়! বলে বসে বসে অঞ্জলি একটু কাঁদে, বলে— 'শ্বশুরবাড়িতে এসেছ, তোমাকে কেউ আদরযত্ন করার নেই। দ্যাখো তো কী কান্ডটা!'

মন্দার চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি তক্ষুনি নিজের ভুল সংশোধন করে বলে—'অবশ্য এখন তো আর শ্বশুরবাড়ি এটা নয়, আমার-ই ভুল।'

মন্দার একটু দুঃখ পায়। অঞ্জলির মুখটা ফোলা ফোলা, শরীরও তাই। বোধহয় শরীরে জল এসে গেছে ওর।

মন্দার জিজ্ঞেস করে—তোমার বাচ্চাটা কেমন হয়েছে?

—ভালো আর কই! আমার শরীর থেকেই তো ওর শরীর! একটা খারাপ হলে আর একটা ভালো হবে কী করে?

কিন্তু কী কথা বলতে এসেছে মন্দার? মনে পড়ছে না, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ এসব সাধারণ কথা নয়; এ ছাড়া আর একটা কী কথা যেন! মন্দার চুপ করে বসে থাকে। ভাবে। অঞ্জলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সেই ভীতু ভাব। বোধহয় সবসময়ে নিজের অপরাধের কথা ভাবে ও, আর সবসময়ে ভয় পায় তার অপরাধের প্রতিফল কোনো না কোনো দিক থেকে আসবেই।

মন্দার জিজ্ঞেস করল—'এসব জানাজানির পর তোমার অবস্থা নিশ্চয়ই বেশ খারাপ?'

অঞ্জলি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—'তা জেনে কী হবে?'

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল মাত্র।

সেই শ্বাসের শব্দে অঞ্জলি তার দিকে তাকাল, জলভরা চোখ। বলল—'আমি খুব একা। আমার কেউ নেই।'

—জানি।

—তুমি ভীষণ দয়ালু। তোমার তুলনা নেই। তুমি আমার ওপর রাগ করতে চাইছ, কিন্তু পারছ না।

মন্দার একটু চমকায়। কথাটা সত্য। সে অঞ্জলির ওপর রাগ, ঘৃণা সবই প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তার মনের মধ্যে কিছুতেই রাগের সেই ঝড়টা ওঠে না। উঠলে ভালো হত বোধহয়। মন্দার আবার একটা শ্বাস ফেলে।

বাইরে থেকে অঞ্জলির বাবার গলা পাওয়া যায়—'মন্দার!'

মন্দার মুখ ফিরিয়ে ভারি অবাক হয়। সুন্দর বৃদ্ধটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে চায়ের কাপ। মন্দারের চোখে চোখ পড়তেই লাজুক মুখে বলে—'বাড়িতে কাজের লোক নেই তাই...'

মন্দার বিস্মিতভাবে বলে—'নিজেই করলেন?'

—আমার অভ্যাস আছে। আঁতুড়ঘরে বসে খেতে ঘেন্না করে না তো বাবা! তুমি না-হয় বাইরের ঘরে এসো।

—আমি কিছু খাব না।

—খাবে না? বলে বুড়োমানুষ ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। সাধাসাধি করতে বোধহয় তারা ভয় পায়। মন্দারকে তাদের ভীষণ ভয়।

যেন-বা বুড়ো জানত যে, মন্দার এবাড়ির খাবার খাবে না, তাই মাথা নীচু করে বলে—'আচ্ছা, তাহলে বরং থাক।'

অঞ্জলি অবাক হয়ে তার বাবার দিকে চেয়েছিল। মন্দারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—'কলেজ থেকে এলে তো?'

—হুঁ!

—খিদে পায়নি?

অঞ্জলি চুপ করে থাকে। কিছু বলার নেই। তারা অপরাধীর মতো মন্দারের দিকে চেয়ে আছে। জোর করে খাওয়াবে এমন সম্পর্ক নয়।

অসহ্য। মন্দার উঠে গিয়ে বুড়োর হাত থেকে প্লেট আর কাপ নিয়ে বলে—'ঠিক আছে। খাচ্ছি।'

বাপ-বেটিতে খুব অবাক হয়। তারা একটুও আশা করেনি এটা।

বুড়ো চলে গেল। মন্দার অঞ্জলিকে বলে—'এসব ফর্মালিটির দরকার ছিল না'। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—'ডিভোর্স জিনিসটা বাবা বোঝেন না। সেকেলে মানুষ। ওঁর কাছে এখনও তুমি জামাই, বরাবর তাই থাকবে। ওঁদের মন থেকে এসব সংস্কার তুলে ফেলা ভারি মুশকিল।'

মন্দার উত্তর দেয় না।

অঞ্জলি নিজে থেকেই আবার বলে—বাবার আর দোষ কী! আমি নিজেও মন থেকে সম্পর্ক তুলে দিতে পারিনি। স্বামী জিনিসটা যে মেয়েদের কাছে কী!

—ওসব কথা থাক।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলে—থাকবে কেন! এখন তো আর আমার ভয় নেই। এইবেলা বলতে সুবিধে। আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবও না।

—কী বলতে চাও?

—সংস্কারের কথা। মেয়েলি সংস্কার। মন্ত্র, সিঁদুর, যজ্ঞ—এসব কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। তুমি আমার কেউ না, তবু মনে হয়, কেবলই মনে হয়...অঞ্জলি চুপ করে থাকে। একটু কাঁদে বুঝি!

মন্দার তাড়াতাড়ি বলে—অঞ্জলি, তোমাকে আমি কী একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ কথাটা খুবই জরুরি।

—বলো।

—বললাম তো, মনে পড়ছে না।

—একটু বসে থাকো, মনে পড়বে। যদি ঘেন্না না করে তবে, খাবারটা খেয়ে নাও।

চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে মনে পড়ে যাবে।

মন্দার অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। অঞ্জলি তার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে যেন বোঝবার চেষ্টা করে।

মন্দার একটু আধটু খুঁটে খায়, চায়ে চুমুক দেয়। মনে পড়ে না।

—তুমি কি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাবো?

অঞ্জলি আচমকা জিজ্ঞেস করে।

—ভাবি।

—কেন ভাবো?

—তুমি আমার ওপর বড্ড অন্যায় করেছিলে যে।

—সে তো ঠিকই।

—তাই ভুলতে পারি না। মানুষ ভালোবাসার কথা সহজে ভোলে; প্রতিশোধের কথাটা ভুলতে পারে না।

—আমি এত অসহায় যে, আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কিছু নেই তোমার! আমি তো শেষ হয়েই গেছি।

—কিন্তু আমার তো শোধ নেওয়া হয়নি!

—কী শোধ নেবে বলো?

—কী জানি ভেবেই তো পাচ্ছি না।

—হায় গো, কী কষ্ট!

—খুব কষ্ট। দুপুরে কলেজে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি।

—কীরকম দুঃস্বপ্ন?

'ভীষণ খারাপ।' —বলে মন্দার চুপ করে স্বপ্নের দৃশ্যটা মনে মনে দেখে। ডবল-ডেকারে পাদানিতে অঞ্জলি, কোলে বাচ্চা, চারদিকে আক্রমণকারী মানুষ। কিছুতেই অঞ্জলির কাছে পৌঁছোতে পারছে না মন্দার।

'বলবে না?' অঞ্জলি বলে।

মন্দার শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—অঞ্জলি, আমি হয়তো শ্রাবণে বিয়ে করব। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। তাতে কি তুমি দুঃখ পাবে?

—পাব। তবে এটা আশা করছিলাম বলে সয়ে নেওয়া যাবে।

—শোনো, আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসব, এরকম বসে থাকব একটু দূরে, কথা বলব। কিছু মনে করবে না তো?

—মনে করব! কী যে, বলো! তুমি আসবে ভাবতেই কী ভীষণ ভালো লাগছে!

—আসব। কী তোমাকে বলতে চাই তা যতদিন না মনে পড়ছে ততদিন আসতেই হবে।

—এসো। যখন খুশি।

—আসব। অঞ্জলি, ততদিন তুমি ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।

অঞ্জলি চুপ করে থাকে।

—চারদিকে বিশ্রী মানুষজন, তারা তোমাকে ঠেলবে, ধাক্কাবে, ফেলে দেবে, চারদিকে বিপদ।

—কী বলছ?

—খুব বিপদ তোমার। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কি তুমি বাস থেকে নামতে পারবে? আমি যে কিছুতেই তোমার কাছে যেতে পারছি না!

—তুমি কী বলছ?

—সেইটাই তো বুঝতে পারছি না অঞ্জলি! একটু সময় লাগবে। তোমার বাচ্চাটা কী ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে।

অকারণ প্রশ্ন। মন্দারের জেনে কোনো লাভ নেই। সে বসে রইল। মনে পড়ছে না। কতদিনে মনে পড়বে তার কোনো ঠিক নেই।

যতদিন না পড়ে, ততদিন বসে থাকা ছাড়া, অপেক্ষা করা ছাড়া, পরস্পরের মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকা ছাড়া মানুষের আর কী করার আছে?

হাওয়া বদলের চিঠি

বুধুয়াকে তোমার মনে আছে কি না জানি না। মনে না থাকার কথা নয়, বছরখানেক আগে, সে আমাদের কলকাতার বাসায় চাকরি করত। গোলগাল গাল, গোপাল গোপাল চেহারা, মাত্র দু-মাস চাকরি করেছিল আমাদের বাসায়, শেষে মায়ের জন্য মন কেমন করছে বলে কেঁদে-কেটে চলে গেল। যে দু-মাস ছিল, তাইতেই বড়ো ভালো লেগেছিল বুধুয়াকে, তুমি ওকে অকর্মা মনে করতে বটে, কিন্তু আমি ওকে পুষ্যি নিতেও রাজি ছিলুম। তুমি ভুলে গেছ কি? কাল হঠাৎ সেই বুধুয়া এসে হাজির। এখানে দেওঘরের কাছাকাছিই যে ওর বাড়ি তা আমার মনেও ছিল না, হঠাৎ দেখে চিনতেও পারিনি, এখন ওর বাড়ের বয়স —তাই মাথায় একটু লম্বা হয়েছে, একটু রোগাও, শুধু মুখের মিষ্টি হাসিটুকু এখনও কী করে যেন শুদ্ধ রেখেছে। আমি যে এসেছি তা জানত না, একদিন বিকেলে যখন বেড়াচ্ছিলুম তখন নাকি দেখেছে আমাকে। তখন ভয়ে এসে কথা বলেনি; খোঁজখবর নিয়ে তবে বাসায় এসেছে। বুদ্ধি দ্যাখো, একেবারে শুধু হাতে আসেনি, বৈদ্যনাথের পুজো দিয়ে প্রসাদি প্যাঁড়া এনেছে কিছু আর শালপাতার ঠোঙায় এনেছে ওর মায়ের হাতের তৈরি করা করমচার আচার। জিজ্ঞেস করলুম, 'প্যাঁড়া আনলি যদি, তবে প্রসাদি আনলি কেন?' অনেকক্ষণ লাজুক মুখে হেসে মাথা নীচু করে যা বলল, তার অর্থ দাঁড়ায় যে, এমনি আনলে যদি আমি না নিতে চাই সেই ভয়ে প্রসাদ করে এনেছে—প্রসাদ তো আর ফিরিয়ে দিতে পারব না। কেমন মাথা খেলিয়েছে দেখেছ? শমীক আর খুকু কেমন আছে জানতে চাইল। যখন জিজ্ঞেস করল দেওঘরে কেন এসেছি, তখন একটু মুশকিলে পড়লুম—কী জবাব দিই! তখন ও নিজেই বলল যে, আমার চাকর হরিয়ার কাছে নাকি শুনেছে যে, আমার অসুখ। আমি ওকে বোঝালুম যে, সে তেমন কিছু নয়, একদিন অফিস যেতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম রাস্তায়, তাই দেখেশুনে ডাক্তার বলেছে একটু ঘুরে আসতে, ও চুপ করে শুনল তারপর ব্যথিত মুখে বসে রইল। তখন আমিই ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করলুম। সিনেমাহলের কাছে পান-সিগারেটের দোকান দিয়েছে—দোকান ভালো চলে, আর শহরের একটু দূরেই ওর গ্রাম—সেখানে খেতি-গৃহস্থী দেখাশোনা করে ওর মা আর ভাই। খুব লাজুক মুখে জানাল যে, কলকাতায় আমাদের বাসায় থাকবার সময় সে বলেছিল বিয়ে করেনি—সেটা মিথ্যে কথা। বিয়ে করেছে দশ বছর বয়সে, এখন পনেরো—কিন্তু এখনো গাওনা হয়নি। আরও নানা কথা বলল, বারান্দায় মেঝের ওপর আমার পায়ের কাছটিতে বসে, আমি ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলুম। অধিকাংশই ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা, বারবার বলল বুড়ো হলে ও কোনো আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে থাকবে, সংসারে নাকি ওর খুব একটা স্পৃহা নেই। ওর চেহারার মধ্যে এমন একটা সরল সত্যনিষ্ঠার ছাপ আছে যে কথাগুলোকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তুমি সঙ্গে আসোনি কেন সেকথাও জিজ্ঞেস করল, আরও বলল, আমার কোনো কাজকর্ম করে দেবার দরকার থাকলে ও করে দেবে। এ সময়ে বাজার করে হরিয়া ফিরে এলে,

তখন আমাকে ছেড়ে দুজনে দেশওয়ালি ভাষায় নিজেদের মধ্যে খানিক গল্প করল। যাওয়ার সময় বলে গেল যে, ওর গ্রামে একজন গুনিন লোক আছে যে ঝাড়ফুঁক করে, টোটকা ওষুধ দেয়। অনেকের রোগ সে নাকি সারিয়েছে। যদি আমার আপত্তি না থাকে তবে সে একবার সেই গুনিনকে ডেকে এনে দেখাবে, আমি হেসে বললুম—আনিস লোকটাকে, আলাপ করে দেখব। রোগ কিছু নেই, তবু এখানে এসে নতুন ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বুধুয়ার বোধহয় ধারণা আমার অসুখটা শক্ত ধরনের তাই সে যাওয়ার সময় মাথা ঝাঁকিয়ে বারবার ভরসা দিয়ে বলে গেল যে, অনেক শক্ত রোগ সেই গুনিন সারিয়েছে।

বুধুয়া চলে গেলে অনেকক্ষণ একা একা বসে ভাবলুম। বুধুয়ার ধারণা যে ভুল তা মনে হচ্ছিল না। কখনো বলিনি তোমাকে, যেদিন অফিসে যেতে গিয়ে বাসের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম সেদিনটায় প্রথমে মনে হয়েছিল নিশ্চিত এটা করোনারির অ্যাটাক। জ্ঞান ফিরে এলে মনে হয়েছিল আমি হয়তো তিন-চারদিন বা আরও বেশি অজ্ঞান হয়েছিলুম। ক্রমে যখন বুঝতে পারলুম যে এটা ব্লাড প্রেশার এবং মাত্র ঘণ্টা দেড়েক আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলুম তখন আমার ভয় কেটে যাওয়া উচিত ছিল। ডাক্তারও অভয় দিচ্ছিল—আমার বয়স মাত্র তেতাল্লিশ, স্বাস্থ্য ভালো—ভয় কী? এখনও একটা জীবন সামনে পড়ে আছে। কিন্তু কেন জানি না ওর পর থেকে মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেল। আগে তো কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনি—রাস্তায়, ট্রামে-বাসে সব লোক দিব্যি চলাফেরা করছে, মাঝখান থেকে হঠাৎ আমিই অজ্ঞান হয়ে গেলাম কেন? এইসব ভেবে ভেবে কয়েকদিন নিজেকে খুব দুর্বল আর অসহায় মনে হতে লাগল। এতকাল কখনো খুব গুরুত্ব দিয়ে বয়স হয়ে যাওয়ার কথা ভাবিনি, মরার কথা ভাবিনি। এবার ভাবতে লাগলুম। ভেবে দেখলুম দুটোর কোনোটাকেই তো আমি এড়াতে পারব না! কলকাতায় হাঁপ ধরে গেল। মনে হল বহুকাল কলকাতার বাইরে যাইনি, এতদিন একজায়গায় থেকে মনটা নিস্তেজ, আর নানা বাজে ভাবনার বাসা হয়ে উঠেছে। তাই তোমাকে একদিন বলেছিলাম—চলো বাইরে কোথাও থেকে দু-চারদিন বেড়িয়ে আসি। তুমি অবাক হয়ে বললে—ও মা! ভূতের মুখে রামনাম! এতদিন তো উলটো গেয়েছ। শুনে একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলুম। বাস্তবিক অফিসে আমার ছুটি জমে জমে পচে গেল, বেড়িয়ে আসা দূরের কথা, একদিন ছুটি নিয়ে বসে থাকতেও ইচ্ছে হয়নি। বেড়াতেই বা কোথায় যাব! কিন্তু কলকাতা কয়েকদিনেই অসহ্য হয়ে গেল। দু-একদিন শমীক আর খুকুকে স্কুল থেকে ছুটি করিয়ে নিয়ে গড়ের মাঠে গিয়ে হুড়োহুড়ি ছুটাছুটি করলাম, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, দক্ষিণেশ্বর নিয়ে গেলুম—ওরাও বাবার কান্ডকারখানা দেখে অবাক। কিন্তু এভাবেও আমার বিষণ্ণতা কাটল না। মনে হল দূরে কোথাও যাওয়া একান্ত দরকার আর যেতে হবে একলা। একলা হলেই নিজের মনটাকে সুবিধে-মতো পাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে তার কোথায় কোন কাঁটাটা বিঁধে আছে। শুধু তোমাকে নিয়ে আসা যায় না, তাহলে শমীক আর খুকুকে কে দেখবে? ওদের নিয়ে এলে আবার স্কুল কামাই হয়। একা আসতে প্রথমটায় খারাপ লাগছিল, এখানে এসে কয়েকদিন ভীষণ মন খারাপ লাগল—আগের চিঠিতে সেসব জানাইনি। এমনকী তিনদিন পর একদিন ফিরে যাওয়ার জন্য সব বাঁধাছাঁদা করে ট্রেনে পর্যন্ত উঠে পড়েছিলুম। মধুপুরে ট্রেন থামতে মনে হল বড্ড নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা—তা ছাড়া সন্দেহ হল কলকাতায় গেলেই সেই বিশ্রী ভাবনাগুলো আবার ঘাড়ে চেপে বসবে। মধুপুরেই নেমে পড়া গেল, কিন্তু দেওঘরেও ফিরতে ইচ্ছে হল; ওখানে না থেকে হরিয়াকে দেওঘরে ফেরত পাঠিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। সাতদিন ধরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনো লক্ষ্য স্থির ছিল না, সহযাত্রীদের কাছে যে জায়গার নাম শুনেছি সে-জায়গারই টিকিট কেটেছি পরদিন। ভালো করে খাওয়া হয়নি, শোয়া হয়নি, গালে দাড়ি বেড়ে গেছে, শরীর পথের ধকলে দুর্বল তবু এই সাতদিনে মনের জড়তা কেটে গেল, তাজা লাগল নিজেকে, দেওঘর ফিরেছি দিন চারেক হল। এখন আর খারাপ লাগছিল না। তোমাদের কথা খুব একটা মনে পড়ছিল না।

শুধু বুধুয়া এসে মনটা খারাপ করে দিয়ে গেল। সেই যে ওকে কবে একটু ভালোবেসেছিলুম, ও আসায় সেই ভালোবাসার জায়গায় আবার হাত পড়ে গেল। কাল থেকে আবার তোমাদের কথা তাই ভীষণ মনে

পড়ছে। বুধুয়া না এলে এটা হত না। বুধুয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারটার সম্পর্ক হয়তো তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। আমিও পারছি না, কেবল মনে হচ্ছে—কীরকম অস্পষ্ট একটা যোগাযোগ হয়েছিল।

আজ তোমাকে কোনো চিঠি লেখবার কথা ছিল না। এই তো তিনদিন হয় তোমাকে চিঠি লিখেছি, এখনও জবাব দাওনি, কিংবা হয়তো তোমার চিঠিও এখন মাঝপথে। তবু লিখতে বসেছি, মনে হচ্ছে তোমাকে কী একটা বিষয় যেন জানাবার আছে, যা রহস্যময় যা অস্পষ্ট। ভয় পেয়ো না—এ তেমন কিছু নয়। আজ বিকেল থেকে মনটা ডানা মেলেছে, উড়ছে, কোনো ঠাঁই ছুঁতে চাইছে না। বিকেলে আকাশ ঘনঘোর করে এল, বেড়াতে গিয়েছিলুম, মেঘ দেখে বৃষ্টি আসবার আগেই ঘরে ফিরে এলুম, তারপর ইজিচেয়ারে রোজকার মতো না বসে দরজার চৌকাঠের পাশটিতে বসে রইলুম চুপ করে। বৃষ্টি এল। ঘন মেঘের স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে চারধারে, বর্ষার ব্যাং ডাকছে, ঝরঝর জলের শব্দ হয়ে যেতে লাগল। আর কোনো শব্দ নেই। সামনে বাগানে ফুলগাছগুলো, পাতাবাহারের গাছগুলো অঝোর জলধারায় ভিজে যাচ্ছিল। আমার ছোট্ট বাগানটায় বৃষ্টির সে কী মাতামাতি! জলে, মাটিতে, ঘাসে, গাছের পাতায়, ফুলে কেমন যেন একধরনের গভীর ভালোবাসার খেলা চলছিল। দেখতে দেখতে কেমন করে যেন বাগানের গাছপালা, ফুল, লতাপাতার মতো আমি আকণ্ঠ পান করছিলুম সেই বৃষ্টির জীবনীশক্তি। মন ভরে যাচ্ছিল। ঠিক হয়তো বোঝাতে পারব না, কিন্তু সেই অবিরাম জলধারার দিকে চেয়ে থেকে মনে হচ্ছিল আমার হয়তো উদ্ভিদের মতোই শাখা, কান্ড বা শিকড় গোছের কোনো গোপন প্রত্যঙ্গ আছে যা দিয়ে আমি বৃষ্টি থেকে সেই জীবনীশক্তি আহরণ করছিলুম। ক্রমে রাত হয়ে এলে যখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না তখন ঘরে এসে এইমাত্র বসলুম ছোটো বাতিটি জ্বালিয়ে তোমাকে চিঠি লিখব বলে।

এখনও জলের ঝরে পড়বার শব্দ, ব্যাঙের অবিরাম ডাক শুনতে পাচ্ছি। তুমি হয়তো ঠিক বুঝতে চাইবে না, কিন্তু এখানে আসবার পর যতবার রাত্রিতে বৃষ্টির শব্দ শুনেছি আমি, ততবার মনে হয়েছে যে, আমার একটা পূর্বজন্ম ছিল। কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না এ জন্মেই আমার শুরু ও শেষ। রহস্যেরকথা যে বলেছিলুম তা এই। বোধহয় এইসব অনুভূতির কোনো মূল্য নেই। না থাক, তবু আমার কাছে আজ বৃষ্টি যে প্রিয়, ঘাস ফুল মাটি যে তার কারণ হয়ে থাক এই রহস্যময় অনুভূতিগুলি। আমি কখনো এ রহস্যের অবসান চাইব না।

দেখো, বৃষ্টি এসেছে বলেই আমার বাগানের গাছগুলোর ওরকম আনন্দ, তারা বাহু মেলে শিকড়-ছেঁড়া কাঁপনে কাঁপছে। এই যে ব্যাঙের ডাক, জলের শব্দ শুনছি তাতেও কেমন এক আনন্দের সুর লেগেছে। মনে হয় আবহমান কাল থেকে আমাদের এই বৃক্ষলতাগুল্ম, ওই আপাততুচ্ছ ব্যাংগুলো এই বৃষ্টিকে পৃথিবীতে ডেকে আনছে। তাই বৃষ্টির ভিতরে কেমন একটা ভালোবাসার গন্ধ হয়েছে। এ না হলে ও হয় না, ও না হলে এ হয় না, ভেবে দেখলে, আমরা সবাই যেন এরকম একটা নক্ষত্রের মধ্যে রয়েছি।

লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে চিঠিটার সুর কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। এভাবে কেউ বউকে চিঠি লেখে? কী করে জানব? বরাবর তুমি আমার হাতের কাছেই ছিলে, চিঠি লেখবার দরকার হয়নি তো কখনো। মনে হচ্ছে চিঠির শেষে এবার ঘর-সংসারের কথা কিছু লেখা দরকার। তুমি কেমন আছ আমাকে ছেড়ে তা জানতে ইচ্ছে করছে। শমীক আর খুকু বরাবর আমাকে একটু গম্ভীর বলে জানে, বড়ো একটা কাছে ঘেঁষে না। ভাবছি এবার ফিরে গিয়ে ওদের সঙ্গে একটু বেশি করে মিশব। কী বলো?

তোমার একজোড়া চিঠি পেলুম আজ। দ্বিতীয়টা এক্সপ্রেসে এসে প্রথমটাকে ধরেছে। বুঝতে পারছি আমার চিঠি পেয়ে একটু অস্থির হয়েছ। আরও বোঝা যাচ্ছে যে, আমার শরীরের জন্য তোমার উৎকণ্ঠা তেমন নেই,

যতটা আমার মানসিক অবস্থার জন্য আছে। সন্দেহ হচ্ছে কি যে আমার মাথায় কেমন যেন একটু...? সন্দেহ মাঝে মাঝে আমারও হয়। এতকাল সেই বাসে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমার কাছে সবটাই ছিল একটা খেলার মাঠের মতো—যেখানে দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট দিনের আলোয় আমার প্রতিপক্ষ সব খেলোয়াড়কেই দেখতে পাচ্ছি, সহযোগীদেরও চিনে নিচ্ছি। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসবার পর থেকে দেখছি দিনের আলোয় সেই মাঠ যতটা স্পষ্ট মনে হয়েছিল এখন আর ততটা নয়। সেই মাঠে যেন এক নিস্তেজ শেষবেলার আলো পড়েছে, বহুদূর—প্রায় সীমারেখাহীন হয়ে বিস্তৃত হয়েছে সেই মাঠ, দূরে দূরে অস্পষ্ট চেহারা নিয়ে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে—তাদের চেনা যাচ্ছে না। সব কেমন যেন পালটে গেল।

তুমি ঠাট্টার ছলে প্রশ্ন করেছ আমি কবি হয়ে যাচ্ছি কিনা। তুমি তো গোঁড়া ঈশ্বরবিশ্বাসী, তুমি কি বিশ্বাস করো না যে ঈশ্বর সবকিছুর এবং এমনকী নিজেরও সৃষ্টিকর্তা? তাঁর চেয়ে বেশি কল্পনাপ্রবণ প্রকাশক্ষমতা আর কার থাকতে পারে, তাঁর চেয়ে বড়ো কবি কে? আর যেহেতু তাঁর সেই আনন্দময় কবিসত্তা থেকে আমাদের আত্মা সৃষ্টি হয়েছে বলে আমাদের জনমত রয়েছে, সেই হেতু আমাদের সকলেরই কিছু পরিমাণে কবি হওয়া বাধ্যতামূলক। কোনো মানুষ, কোনো বৃক্ষ, কোনো পশু কবি নয়? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কী জানো? আমি যে ইজিচেয়ারে শুয়ে নানা কথা ভাবলুম আমার সেই সব চিন্তাভাবনার ঢেউ ইজিচেয়ারটা ধরে রেখে দিল—ঠিক টেপরেকর্ডারের মতো। অন্য কেউ যখন এসে সেই ইজিচেয়ারে বসবে তখন ইজিচেয়ারটা সেই ঢেউগুলি বিকিরণ করবে তার বোধ ও বুদ্ধির ভিতর। চমকে উঠো না—ইজিচেয়ারটাকে ওরকম ভাবতে যদি অস্বস্তি হয় তবে সে-জায়গায় বাতাস, মাটি, জল কিংবা শূন্যতা ভেবে নিতে পারো। যেমন হোক এই ধরনের কোনো মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যদি আমার গভীর ও গোপন ভাবনাচিন্তা ও বোধ অন্যের ভিতরে সঞ্চারিত হত। যদি আমাদের আবেগ অনুভূতিগুলি এভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে না হত তবে আমরা কাউকে কবি বলতুম না, বুঝতুম যে এক ভয়ংকর, উন্মত্ত ও দুর্বার কল্পনাশক্তি থেকে আমাদের সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে বলে আমরা সকলেই কিছু কিছু কবি। কাল রাত্রেও অনিদ্রা পেয়ে বসেছিল, মাঝে মাঝে ওইটাই বড়ো যন্ত্রণা দেয়! কেমন পিপাসা, ভয়, উৎকণ্ঠার এক সংমিশ্রণে শুয়েছিলুম গভীর রাত অবধি। তখন বৃষ্টি থেমে জ্যোৎস্না ফুটেছে বাইরে, শুনলুম কুকুর কাঁদছে চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে। শিউরে উঠে একবার হরিয়াকে ডাকতে গেলুম, কিন্তু ডাকা হল না। চোখ বুজে আমি শুনতে পেলুম কুকুরের সেই কান্নার সঙ্গে ডানা-ঝাপটানোর প্রাণপণ শব্দ উঠছে। অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলুম—বোধ হল সবটাই মনের ভুল—কেউ কাঁদছে না, কেউই উড়ে যেতে চাইছে না। তারপর ক্রমে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলুম অকারণ চোখের জলে চোখ ভরে আসছে। যেন আমি আর ঘরে নেই, নিশিরাতের পরি আমাকে উড়িয়ে এনেছে, শুইয়ে দিয়ে গেছে শিশিরে ভেজা মাঠের ওপর ম্লান জ্যোৎস্নার ভিতরে। চোখ চেয়ে দেখব দুটো সাদা হাঁস মলিন জ্যোৎস্নাকে গায়ে মেখে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সীমারেখা ছেড়ে দূর নক্ষত্রমন্ডলীর দিকে, কিংবা আরও দূরে, যার কোনো সীমারেখা নেই এমন সমুদ্রের সন্ধানে তারা চলেছে—আর কখনো ফিরে আসবে না। হাঁসের ঘর ভেঙে রক্তমাখা মুখে, গায়ের পালক ঝেড়ে কুকুরটা তাই এসেছে মাঠে দূরতম সেইসব হাঁসের সন্ধানে, তারপর চাঁদ ও শূন্যতা দেখে কাঁদছে। আমার চোখের ওপর গভীর স্বপ্নের সেই খেলা চলল অনেকক্ষণ।

জানি এ চিঠি পেলে তুমি হয়তো আরও অস্থির হয়ে পড়বে। কিন্তু আর তোমার মতো বিশ্বস্ত কেউ নেই যাকে এসব লেখা যায়। সবকিছুই ভাগ করে নেওয়ার কথা ছিল আমাদের, তাই আমিও চাই আমার অস্থিরতার এইটুকু তোমার ভেতরে সঞ্চারিত হোক।

আজ সকালে চিঠিটা শেষ করিনি, ভেবেছিলাম বিকেলে করব। তাই করছি। আজ বিকেলে বুধুয়া এসেছিল তার সেই গুনিনকে নিয়ে। গুনিনকে যেমন কল্পনা করেছিলুম তেমন নয়, অর্থাৎ তার একহাতে ঝাঁটা অন্যহাতে সরষেপোড়া নেই এবং চোখ রক্তবর্ণও নয়। নিরীহ ভালোমানুষের মতো চেহারা, কথাবার্তায় মনে হয় বেশ কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে। বয়সও তার অল্প, বোধ হয় তিরিশ। 'আপনি' না 'তুমি' কোনটা বলব

তা নিয়ে একটু গোলে পড়লুম, শেষে 'আপনি'ই বলতে লাগলুম। সে একসময় অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল—আপনার অসুখটা তো মনের!

বললুম—কী করে বুঝলেন?

হেসে বলল—বোঝা যায়। আপনার চোখ সেকথাই বলছে। তারপর আবার খানিক চেয়ে থেকে বলল—আপনার ছেলে-মেয়ে দুটি এবং আপনার স্ত্রী আপনাকে খুবই ভালোবাসে, কিন্তু আমার মনে হয় তারা আপনার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না।

বোঝো কান্ড! তোমরা তো নিশ্চিন্তে আছ, কিন্তু এদিকে তোমাদের মনের কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। একটু চমকে উঠেছিলুম, তবু হাসিমুখে জিজ্ঞেস করি—আমার দুই ছেলে-মেয়ে আর একটি স্ত্রী কী করে বুঝলেন? মন্ত্রবলে নাকি?

আবার হাসল—না, বুধুয়া বলছিল আমাকে।

মনে মনেই হো হো করে হাসলাম। এরা কি তোমাকে বন্ধ্যা মনে করে? বুধুয়া চলে আসার পরও তো এক বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে যদি আর একটি হত সে কি হিসেবের বাইরে থাকত। না:, এ পৃথিবীতে হঠযোগ, মন্ত্র-তন্ত্র এসব কিছুই নেই দেখছি! না থাকলে তো আমারই মুশকিল, কেন-না আমাকে অবিলম্বে এই ধরনের একটা আশ্রয় পেতেই হবে, নইলে সেই পুরোনো ভাবনাচিন্তাগুলো আবার এসে কামড়ে ধরবে।

গুনিন বলল—বুধুয়া আপনার কথা সবই বলেছে আমাকে। ও আপনাকে খুব ভালোবাসে। বুধুয়া লজ্জায় মুখ লুকোল, আমি একটু হাসলুম, কিছু বললুম না। গুনিন খানিকক্ষণ আবার চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল—মনের যে অশান্তি রয়েছে তা সাধারণত কামনা-বাসনা থেকে আসে। আপনি বড়ো বেশি চান।

মিথ্যে বলব না, এসব পুরোনো কথায় একটু বিরক্ত হয়েছিলুম, বললুম—কামনা-বাসনা ছাড়া মানুষ হয় না।

সে তেমনি শান্ত গলায় বলল—কিন্তু আপনি চান আরও বেশি। আপনি সুখের চেয়েও বেশি কিছু চান, সে হল শান্তি সন্তোষ। এটাই পাওয়া সবচেয়ে কঠিন, এ চাওয়াই সবচেয়ে বড়ো চাওয়া।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলুম।

সে বলল—আপনি ঈশ্বরে মন দিন। তাঁর দয়া পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি দয়া করেন।

হেসে বলি—ঈশ্বরের দয়াকে বিশ্বাস কী করে করব? ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই যে!

সে কিছুক্ষণ ভেবে বলল—আপনার প্রিয়জন আছেন জানি, কিন্তু আপনি তাঁদের কতটা ভালোবাসেন? তাঁদের জন্য প্রাণ দিতে পারেন?

একটু হকচকিয়ে গিয়ে থমকে একটু ভেবে বললুম—বোধহয় পারি। তোমাদের তিনজনের মুখ ভেবে নিয়ে 'পারি' বলতে ভালোই লাগছিল—যেন সত্যিই পারি।

লোকটা একবার একটু ধোঁয়াটে ভাবে বলল—ভালো করে ভেবে দেখবেন। যদি সত্যিই পারেন এবং ভালোবাসার জন্যেই পারেন তবে আপনি সব অশান্তি কাটিয়ে উঠবেন।

এরপর ওরা চলে গেল। সাইকোথেরাপির এই গ্রাম্য চেষ্টা দেখে খুব হাসলুম নিজেই।

এবার চিঠি শেষ করি। খুকুকে বোলো ওর কাঁচা হাতের লেখা চিঠিটা পেয়েছি। কিন্তু ওর ভাষাটাও তোমার বলে মনে হল, সে লিখেছে—'বাপি, তুমি অত ভেবো না।' তুমি ওদের কিছু বোলো না, দোহাই, ওরা যা চায় তাই লিখুক। আমি ওদের মনটাকে স্পষ্ট ধরতে চাই।

ধারোয়া নদীর ধার তুমি তো দেখোনি! কী সুন্দর! উপত্যকার মতো বহুদূর পর্যন্ত ঢালু হয়ে নেমে গেছে। মাটি শুকনো, গেরুয়া রঙের। কোথাও মাটি রক্তের মতো লাল। মস্ত পাথরের চাঁই মাটিতে গাঁথা। বিকেলের দিকটায় অসহ্য নির্জনতা। হাঁটছি তো হাঁটছিই। শেষবেলার আলোয় আমার মস্ত ছায়াটা কত দীর্ঘ হয়ে

হারিয়ে যাচ্ছে। ছায়াটার পিছু পিছু হাঁটছিলাম। যদি আমার ছায়াটার কোনো ইচ্ছাশক্তি থেকে থাকে, যদি থাকে নিজস্ব সত্তা তো নিয়ে যাক আমায় যেখানে তার খুশি। এও এক খেলা। ছায়াটা সব বন্ধুরতা অবলীলায় পার হয়। মস্ত পাথরের চাঙড়, গর্ত, গাছপালা কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না। শরীরী আমার পক্ষে তো তা সম্ভব নয়। শরীরটা যে মস্ত বাধা।

এলোপাথাড়ি হাঁটতে হাঁটতে হাঁফ ধরে গেল। নদীর ধার পর্যন্ত পৌঁছোতে সন্ধে লেগে গেল প্রায়। নদীর ধারে চুপটি করে বসে রইলাম। একটুখানি আলো আর বাকি আছে মাত্র। খুব একটুখানি। চারধারের গাছপালা, মাঠ, নদীর জল তৃষ্ণার্তের মতো সেই শেষ আলোটুকু শুষে নিচ্ছে। দেখতে দেখতে পৃথিবীকে বড্ড অনিত্য বলে মনে হয়। দিনটা যে গেল, এইভাবে রোজ যায়। থাকে না তো। একটা স্থির সূর্য যদি কেউ আকাশে লাগিয়ে রাখত, তবে কি আমাদের দিন যেত না? বয়স বাড়ত না! যেমন ছিলাম সবাই, তেমনি চিরকাল থেকে যেতাম! ওই যে গতিময় ধারোয়ার জল বয়ে যাচ্ছে, ওর মধ্যেও সেই অনিত্যতার কথা। বয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। আজ যে এক কোষ জল বয়ে গেল, সে গেল চিরকালের মতোই। ধারোয়া বেয়ে সে আর কোনোদিনই যাবে না এক গতিপথে।

মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অস্থিরতা ছিল না। প্রকান্ড আকাশের তলায়। ধারোয়ার মস্ত উপত্যকায় বসে থেকে একরকমের মহৎ বিষণ্ণতা টের পাচ্ছিলাম। চলে যাওয়াটাই অমোঘ।

নদীর ধার বেয়ে একটা লোক উঠে এল। ঝোপেঝাড়ে কী যেন খুঁজছে। কোনো বুনো লতাপাতা হবে। তার গায়ে একটা হাফহাতা পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি, বেশ তেজস্বী চেহারা। দেহাতিই হবে।

সেই ভেবে লোকটাকে ডেকে বললুম—ক্যা ঢুঁড় রহে হৈ জি?

লোকটা এক পলক তাকিয়ে একটু হাসল। কাছে এসে বলল—আপনাকে দেখেছি এখানে কয়েকদিন। বাঙালি তো?

বললুম—আজ্ঞে। আপনি এখানেই থাকেন?

বহুদিন হয়ে গেল। ছেচল্লিশ সালের পর থেকেই।

বসল, অনেকক্ষণ, দু-পক্ষের পরিচয় হল। বেশ লোকটা। পঞ্চাশের ওপর বয়স, কিন্তু সেটা উনি না বললে কিছুতেই বুঝতে পারতুম না, একদম ছেলেমানুষি চেহারা। চাউনিতে এখনও বেশ একটা জীবনীশক্তি। কথায় কথায় বললেন—বয়েস কমানোর ওষুধ জানি না। সারাদিন খাটি, ঘুরি, ঘুমোই মাত্র চারঘণ্টা। আহার, নিরামিষ ডালভাত স্বপাকে।

লোকটা ধার্মিক। তার ইষ্টদেবের আশ্রমে থাকেন। তাঁর কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন। একসময়ে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, নিজের গাড়িটাড়ি ছিল, লম্বা বেতন পেতেন। সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন, কোনো ক্ষোভ নেই।

জিজ্ঞেস করলুম—ঘর-সংসারের কথা ভাবেন না? চলে কীসে?

উনি বললেন—সংসারের সবাই তো এখানেই, ভাবব কেন? ভাবছ তুমি চলবে কীসে, ভাববার তুমি কে? ভাববার যিনি, ভাবছেন তিনি, ভাবো তুমি তাঁকে। এই ছোট্ট ছড়াটা বলে হাসলেন।

রাত হয়ে গিয়েছিল, উনি অন্ধকার রাস্তায় আমাকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন, আমি ডেকে একটু বসালাম। উনি চা খান না, অন্যের বাড়িতে আহার্য গ্রহণ করেন না। কী দিয়ে আপ্যায়ন করি! ভারি কাঠখোট্টা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে, এ লোকটা।

যাওয়ার আগে লোকটা হঠাৎ বলল—কোনো অসুবিধে নেই তো।

না, না। বেশ আছি।

লোকটা চারদিক ঘুরে ঘুরে ঘরদোর দেখল। বলল—আপনি মশাই ঘোরতর স্ত্রৈণ লোক তো, স্ত্রীকে ছেড়ে একা এখানে এসেছেন কেন?

প্রশ্নটা চেপে গিয়ে বললাম—কী করে বুঝলেন যে আমি স্ত্রৈণ?

ঘরদোরের অবস্থা দেখে, ছাড়া জামাকাপড় গুছিয়ে রাখার অভ্যাস নেই, বিছানায় ঢাকনা দেননি, গেঞ্জি কাচা নয়। লক্ষণ দেখলে চেনা যায়। বোধ হয় আপনি একটু ভাবুক মানুষও। বলে তিনি ভারি চকচকে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আবার ছড়া বললেন—অর্জনে পটু, সাশ্রয়ী কাজে, সুন্দরে সমাপন, এই দেখেই বুঝবি রে তার যোগ্যতা কেমন।

বেশ লাগল লোকটাকে, এখানে আসার পর থেকে কেমন একটি-দুটি সহজ দার্শনিকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। শিখছি। কলকাতায় এরকম মানুষ বড়ো একটা পাই না।

আমার পালে মৃত্যুর হাওয়া লেগেছে। তরতর করে ভাটিয়ে যাচ্ছে নৌকো। কাল বিকেলে একটা মৃত্যু দেখলুম।

আমার উঠোনের ধারে একটু বারান্দা আছে। তার কোলে একটা তারাফুলের মরা ঝোপ। একটা মাকড়সা জাল ফেঁদে বসে থাকে, রোজ দেখি। পোকামাকড় পড়লেই জাল নড়ে ওঠে। মাকড়সাটা জালের কাঁপুনি টের পায়। তারপর নির্ভুল লম্বা লম্বা আটটা পায়ে দুলে দুলে হেঁটে এসে পোকা ধরে। বিকেলে ওই বারান্দায় বসে মাকড়সার জালটা দেখছিলুম। হরিয়া একবাটি মুড়ি তেল দিয়ে মেখে দিয়ে গেছে, বসে খাচ্ছি। হঠাৎ ভাবলুম, মাকড়সাটাকে নিয়ে একটু খেলা করি। একটা মুড়ির দানা তার জালে ছুড়ে দিলুম, মুড়িটা আঠালো জালে পড়ে আটকে গেল। কাঁপুনি টের পেল মাকড়সা, একটু চুপ করে থেকে লম্বা পায়ে ধীরে হেঁটে এল। শুঁকল, দেখল। তারপর একটা লাথি মেরে মুড়ির দানাটা ফেলে দিল জাল থেকে। আবার ফিরে গেল জালের মাঝখানটিতে, ধৈর্য ধরে বসে রইল জেলেদের মতো। আবার মুড়ি ছুড়ে মারলুম। আবার উঠে এল। দেখল, শুঁকল, লাথি মেরে মুড়ি ফেলে দিয়ে জালটাকে পরিষ্কার করে চলে গেল। বার বার এই কান্ড। বেশ খেলাটা। মাকড়সারা যে মুড়ি-টুড়ি খায় না তা বুঝতে পারলুম কাল, খায় না কেন বলো তো?

সে যাকগে, অনেকক্ষণ ধরে মাকড়সার জালে মুড়ি ছোড়বার খেলা খেলে ক্লান্ত লাগছিল। হঠাৎ ইচ্ছে হল দেখি, রক্তমাংসের গন্ধ পেলে খায় কিনা। উঠোনের একধারে বিশাল হিংস্র চেহারার পিঁপড়ে দেখেছি। তাদের মস্ত মাথা, মিশমিশে কালো। তখনও দু-একটা ঘোরাফেরা করছিল উঠোনে। রান্নাঘর থেকে চিমটে এনে তাদের একটাকে ধরে জালে ছেড়ে দিলুম। মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, বেড়াতে যাব, তাই আর ফলাফলের অপেক্ষা করিনি। ফিরে এসে দেখি মস্ত পিঁপড়েটা জালের কেন্দ্রে মাকড়সাটার খুব কাছেই মরে আটকে আছে। শরীরটা অর্ধেক খাওয়া।

মনটা সেই থেকে খারাপ। কেবলই ভাবছি, এ পাপ আমাকে কি স্পর্শ করবে?

পালে মৃত্যুর হাওয়া লেগেছে, নৌকো ভাটিয়ে যাচ্ছে। উজানেরও হাওয়া আছে, বাইলে উজানেও যাওয়া যায়। আমি পারছি না। এবার চিঠিতে লিখেছ আমাকে ফিরে যেতে। ভুলে যাও কেন যে আমি হাওয়া বদল করতে এসেছি। এখনও হাওয়া-বদল শেষ হয়নি তো। মৃত্যুর হাওয়ার বদলে জীবনের হাওয়া লাগুক।

আজ ঘুম পাচ্ছে। এ চিঠিটা আবার কাল শেষ করব।

ঘুম থেকে উঠেই দেখি, কী সুন্দর ভোরের আলোটি! দিন আসছে, তারই আবাহনে আকাশ-মর্ত্য জুড়ে কী মহাআয়োজন! আকাশে মেঘ ছিল না, ধুলো-ধোঁয়া ছিল না, গাছগাছালি শান্ত, বাতাস মৃদু। রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি যেন পিঁপড়েদের জগতে চলে যাচ্ছি। লক্ষ পিঁপড়ে আমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন? কিন্তু ভোরে ঘুম ভাঙল কুটুস একটা কামড়ে। উঠে দেখলুম। পিঁপড়ে নয়, বড্ড ছারপোকা।

বেশ লাগছিল ভোরটা। কী বলব, এত সুন্দর দৃশ্যটা একা দেখছি। মনটা খাঁ-খাঁ করছে। কাকে যেন ডেকে দেখালে ভালো হত। আমরা একা কিছু উপভোগ করতে পারি না। ভালো লাগে না। বেঁচে থাকতে গেলে একজন প্রিয় মানুষ চাই। সে কি তুমি? বুঝতে পারি না। কিন্তু কাউকে বড্ড দরকার। এক বুক কথা জমে আছে।

মাকড়সার ক্ষুধা কী ভয়ংকর। আজ দেখি আধ-খাওয়া পিঁপড়েটার দেহাবশেষ নেই। মনটা বড়ো অস্থির লাগছে, কী করলুম! এই নিষ্ঠুরতা কি আমাকে মানায়!

দুপুরে জানলার পাশে জারুলগাছের ছায়া কোলে করে বসে আছি। কী একা, কী গভীর চারদিক! মনে হচ্ছে, আমার কে আছে! আমার কে আছে!

কোল জুড়ে জারুলের ছায়া, জীবনে যা-কিছু জড়ো করেছি দু-হাতে, সবই আঁকড়ে ধরে আছি, সেসব কি ছায়ার মতো?

অথচ পৃথিবী কী গভীর। কত কোটি বছরের জীবনযাপনের সব চিহ্ন নিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বাতাসে তার প্রাচীনতার ঘ্রাণ। সব প্রাচীন সময়, সব প্রাচীন বাতাস আজও রয়ে গেছে। আমার চারধারে। এসব থেকেই জন্মেছি, এসবেই লয় পাব। কোলে জারুলের ছায়া পড়ে, আলো দোলে। কিছুই ক্ষণিক নয়। সব কিছুই জন্মেছিল পৃথিবীর সঙ্গে।

জলে চোখ ভেসে গেল। স্মৃতিভ্রংশের মতো বসে থাকি। কোথা থেকেই বা এসেছি। ফিরে যাবই বা কোথায়।

সেই হাফহাতা পাঞ্জাবি-পরা মানুষটা আসবে। উৎকণ্ঠ অপেক্ষা করছি। আমরা দুজনে উপত্যকা পেরিয়ে যাব। ওদিকে একটা ঘাসজমি, তারপর গাছগাছালি। যাব। ফিরব কি? কে জানে?

ভেবো না। পৃথিবীতে কেউই খুব জরুরি নয়। যে যতই জরুরি ভাবুক নিজেকে, বা প্রিয়জনকে, তবু দেখো, তাকে ছাড়াও চলে যায়। কিছু অসুবিধে নেই। ছুটি দেবে? একবার দেখি হাওয়াটা পালটাতে পারি কি না!

অপেক্ষা

মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জানলার চৌকাঠে। দু-হাতে ধরে আছে জানলার শিক, শিকের ফাঁকে মুখ গলানো। তার বাবা ফিরতে দেরি করছে। বাবা ফিরলে তারা সবাই দোকানে যাবে। আজ ফ্রক কেনা হবে পুজোর। কিন্তু বাবা ফিরছে না।

পাঁচ বছরের মেয়ে, সব কথা কইতে পারে। হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—ক-টা বাজে মা?

মেয়ের মা সেলাই-মেশিন থেকে মুখ তুলে ঘড়ি দেখে। সাতটা, মানুষটা এত দেরি কখনো করে না। বড্ড মেয়ে-ন্যাওটা। বউ-ন্যাংলা মানুষ, অফিসের পর আড্ডা-টাড্ডা দেয় না বড়ো একটা। দিলেও আগেভাগে বলে যায় ফিরতে দেরি হবে। সরকারি অফিস, তাই ছুটি-টুটির ধার ধারে না, অফিসের ভিড় ভাঙার আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার ওপর আজ পুজোর কেনাকাটা করতে যাওয়ার কথা। দেরি হওয়ার কারণ নেই। তবু সাতটা বেজে গেল, মানুষটা আসছে না।

মেয়ের মার বয়স মোটে ছাব্বিশ, ছয় বছর হল বিয়ে হয়েছে। দেখতে-শুনতে আজও বেশ ভালো। পাতলা দিঘল গড়নের যুবতি, এখনও কত সাধ-আহ্লাদ। মেয়ের বাবারও বয়স ত্রিশের মধ্যেই। ভালো স্বাস্থ্য, সাবধানি, সংসারী এবং সঞ্চয়ী পুরুষ। সংসার সুখেরই!

তারা দু-বেলা ভাত খায় এই আকালের দিনেও। তবু কেন সাতটা বেজে গেল। সময়ের চোরাস্রোত কেন বয়ে গেল হু হু করে?

মেয়ের মা সারাদিন সেলাই করেছে। মেয়ের বাবার বড়ো শখ হয়েছে ফতুয়া পরবে। পরশু চার গজ পাতলা লংক্লথ কিনে এনেছে। দুটো ফতুয়া সেলাই করতে করতে চোখ ঝাপসা, মাথা টিপ টিপ, মেশিনটা সরিয়ে রাখে বউ মানুষটা। মন ভালো লাগে না। দুশ্চিন্তা হচ্ছে বড়ো। সাতটার মধ্যে না আসার কথা নয়।

মেয়ে আজকাল ইস্কুলে যায়। তাই মেয়ের মা সারাদিন একাভোগা। কী করে, কী করে, কী করে! ঘুরে-ফিরে ঘর সাজায়। বিছানার কভার পালটায়, জানলার পর্দা পালটায়, সেলাই করে। উল বোনে, একশোবার ঘরের আসবাব এধার থেকে ওধার করে।

আজও সারাদিন সাজিয়েছে, তারা আর বেশিদিন এই ফ্ল্যাটে থাকবে না। গড়িয়ার দিকে একটু জমি কেনা হয়েছে। বিল্ডিং মেটিরিয়ালের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে। বাড়ি উঠলে তারা নিজেদের বাড়িতে উঠে যাবে। কথা আছে, বাড়ি হলে সামনে শখের বাগান করবে বউটি, স্টিলের আলমারি করবে, ভগবান আর একটু সুদিন করলে গ্যাসের উনুন আর একটি সস্তার রেফ্রিজারেটারও হবে তাদের। মেয়ের বাবার শখ টেপরেকর্ডারের, আর ডাইনিং টেবিলের। তাও হয়ে যাবে। সাশ্রয় করে চললে সবই পাওয়া যায়। কিন্তু সাতটা বাজে। সময় বয়ে যাচ্ছে।

মেয়ের মা রান্নাঘরে আসে। দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। দেরির একটাই মানে হয়। কিন্তু মানেটা ভাবতে চায় না বউ মানুষটি। সে ঢাকনা খুলে দেখে রুটিগুলো শক্ত হয়ে গেল কিনা। সে এলে আবার একটু গরম করে ঘি মাখিয়ে কচুর ডালনার সঙ্গে দেবে। চায়ের জলটা কি বসাবে এখুনি? হাতে কেটলি নিয়ে ভাবে বউটি। জনতা স্টোভের সলতে উসকে দিয়ে দেশলাই ধরাতে গিয়েও কী ভেবে রেখে দেয়। জল বেশি ফুটলে চায়ের স্বাদ হয় না। এসেই তো পড়বে এক্ষুনি, তখন চাপাবে।

মেয়ে আবার চেঁচায়—ক-টা বাজল মা?

বুকটা ধক করে ওঠে। ঘড়ি না দেখেই বউটি উত্তর দেয়—ক-টা আর! এই তো সাড়ে ছ-টা।

মিথ্যে কথা, প্রকৃত হিসেবে, সাতটা পেরিয়ে গেছে।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। বউটি নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলল।

না সে নয়। ওপরতলার লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

বাবা আসছে না কেন? মেয়ের প্রশ্ন।

এল বলে। তুই বেণিটা বেঁধে নে না ততক্ষণে।

বাবা আসুক।

আচ্ছা বাপ-ন্যাওটা মেয়ে যা হোক!

কেন আসছে না বাবা?

রাস্তাঘাটে আটকে আছে বুঝি! আজকাল বাসে-ট্রামে বুঝি সহজে ওঠা যায়!

রোজ তো আসে।

আজও আসবে।

বিশ্বাস। বিশ্বাসের জোরেই বউটি হাত-মুখ ধুয়ে এসে পরিপাটি করে চুল বাঁধল। সিঁদুরটা একটু বেশিই ঢালল সিঁথিতে। ইদানীং বাজে সিঁদুরে চুল উঠে যায় আর মাথা চুলকোয় বলে সিঁদুরটা কমই লাগাত। আজ কম দিল না। একটু ফাউণ্ডেশন ক্রিম ঘষল মুখে। লিপস্টিক বোলাল। সূক্ষ্ম কাজলও টানল একটু। ঘড়ির দিকে চাইল না।

সকালের রাঁধা তরিতরকারি জ্বাল না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই যখন স্টোভ জ্বেলে জ্বাল দিতে বসল তখনই সে টের পেল, গায়ে পায়ে একটা কাঁপুনি আর শীত। শরীর বশে থাকছে না। ভয়? নাকি পেটে একটা শত্তুর এল?

কিন্তু রাত থেমে থাকল না। গড়াতে লাগল সময়। একসময়ে বউটির ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে ঘড়িটাকে আছাড় মেরে বন্ধ করে দিয়ে আসে। কারণ আটটাও বেজে গেল? মানুষটা ফেরেনি।

লুকিয়ে আছে কোথাও? ভয় দেখাচ্ছে না তো?

জানলায় দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত হয়েছে শিশুটি। তার খিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে। বউটি পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে একবার ঘুরে এল। ও ফ্ল্যাটের কর্তা ফিরেছে। ও বাড়ির বউ শুনেটুনে বলে—রাত তো বেশি হয়নি, সাড়ে আটটা। আর একটু দেখুন, তারপর না হয় আমার কর্তাকে খোঁজ নিতে পাঠাব। শুনলুম, কারা মিছিল-টিছিল বের করেছে, রাস্তা খুব জ্যাম।

আশ্বাস পেয়ে বউটি ফিরে আসে। কিন্তু ঘরে এসে শান্ত বা স্থির থাকতে পারে না। কেবলই ছটফট করে। ঘড়ির কাঁটা এক মুহূর্ত থেমে থাকছে না যে। বউটি বার দুই বাথরুমে ঘুরে এল। মেয়েকে খাওয়াতে বসে বারবার চোখে আসা জল মুছল আঁচলে। তাঁর বয়স বেশি নয়। মাত্র ছ-বছর হল বিয়ে হয়েছে। একটা জীবন পড়ে আছে সামনে।

ঘড়ির কাঁটা জলস্রোতের মতো বয়ে চলেছে। কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, বারবার ওপরে উঠে আসে, আরও ওপরে উঠে যায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ নেমে আসে, নেমে যায়। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। সময় যাচ্ছে বয়ে।

শিশু মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোবার আগে ক্ষীণ কণ্ঠে একবার বলে—মা, বাবা—

বাক্যটা শেষ করে না। বউটি আগ্রহে ঝুঁকে শোনবার চেষ্টা করে বাক্যটি। শিশুরা তো ভগবান, ওদের কথা অনেক সময় ফলে যায়। কিন্তু শিশু মেয়েটি বাক্যটা শেষ করে না। বউটির বুক কাঁপে।

এবার বউটি একা। জানলার পাশে। শিকের ফাঁকে চেপে রাখা মুখ চোখের জলে ভাসে। ন-টা বেজে গেল বুঝি। বউটি আস্তে আস্তে বুঝতে পারে, তার মানুষটা আর আসবে না। অমন মানুষটার নানা চিহ্ন তার মনে পড়ে। কথা বলার সময় ওপরের ঠোঁটটা বাঁদিকে একটু বাঁক খায়, লোকটার দাঁত একটু উঁচু, গাল ভাঙা, কপালের ডানদিকে একটা আঁচিল, সাবধানি ভীতু এবং খুঁতখুঁতে মানুষ। বড্ড মেয়ে-ন্যাওটা আর বউ-ন্যাংলা এমনিতে এসব মনে পড়ে না, কিন্তু এখন বড্ড মনে পড়ছে। বউটা হাপুস হয়ে কাঁদতে থাকে।

সদর খোলা ছিল। সিঁড়িতেও শব্দ হয়নি।

অন্ধকার ঘরের ভিতর একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায়! প্রশ্ন করে—এ কী, সব অন্ধকার কেন?

চমকে ওঠে বউটি, বুঝতে পারে, মানুষটা ফিরেছে।

কী হয়েছিল শুনি!

আর বোলো না, সত্যকে মনে আছে।

কে সত্য?

কোন্নগরের। আমার বুজুম ফ্রেণ্ড। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেল। খবর পেয়ে অফিস থেকে গিয়েছিলুম। মনটা যে কী খারাপ লাগছে।

বউটি আলো জ্বালে, ঘরদোর আবার হেসে ওঠে! তারা খাওয়া-দাওয়া সারে। হাসে গল্প করে।

মানুষটা বারবারই তার মৃত বন্ধুর কথা বলে। বউটি বলে, আহা গো!

কিন্তু বউটি তবু সুখীই বোধ করে। কারণ তার মানুষটা ফিরেছে। মানুষটা বেঁচে আছে।

কার্যকারণ

রাত দুটোয় জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি সিগারেট জ্বাললুম। নি:সাড় ঘুমে অচেতন আমার বউ সোনামন তা জানতেও পারল না। সারাবিকেল আমার সিগারেটের প্যাকেট লুকোনো ছিল তার হাতব্যাগে। খেয়াল করেনি সোনামন, বিছানায় যাওয়ার আগে অবহেলায় সে আমাদের দুই বালিশের ফাঁকে রেখেছিল ব্যাগটা আমি তা দেখে রেখেছিলাম।

বিয়ের একমাস আগে আমার গ্যাস্ট্রিকের ব্যথাটা বেড়ে গেল খুব। ব্যথা লুকিয়ে আমি ঘুরে বেড়াতাম। পেট আর বুকের মাঝখানে একটা বিন্দুতে ব্যথাটা প্রথমে শুরু হত। ফুলের কলির মতো। তারপরেই ছিল তার আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলে দেওয়া। কিছু খেলেই কমে যেত। তারপর আবার গোড়া থেকে সে শুরু করত। সোনামন যখন রাস্তায় আমার পাশে হাঁটত, ট্যাক্সিতে ঢলে পড়ত আমার কাঁধে, কিংবা রেস্টুরেন্টে বসে চাপা ঠোঁটের হাসিটি হাসতে হাসতে চায়ে চিনি মেশাত তখন আমি বুক-জোড়া টক জল আর কামড়ে-ধরা ব্যথাটা গিলে রেখে অনায়াসে হাসতাম, কথা বলতাম। ওকে টের পেতে দিতাম না। শুধু মাঝে মাঝে সোনামন চমকে উঠে বলত—তোমাকে অত সাদা দেখাচ্ছে কেন মানিকসোনা (আমরা পরস্পরকে নানা নামে ডাকি)? আমি শান্ত গলায় উত্তর দিতাম—বোধহয় আলোর জন্য। ও বিশ্বাস করত না। বলত—আলো না, তোমাকে কেমন ক্লান্তও দেখাচ্ছে! কী হয়েছে! আমি হাসতাম। হেসেই ধরিয়ে নিতাম সিগারেট। ওই সময়টুকুর মধ্যেই আমি কৌশলে সোনামনকে অন্য কোনো বিষয়ে নিয়ে যেতাম নিজেকে আড়াল করে। আমি কখনো লক্ষই করতাম না, আমি কত সিগারেট খাই। সোনামনের সঙ্গে জীবনে প্রথম এবং একমাত্র প্রেম করার সময়ে আমি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। কেন-না দেখা হলে বা দেখা হওয়ার আগের কিছুটা সময়ে আমার শরীর কাঁপত, স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ত প্রবল। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে নেওয়া আমার ছিল প্রিয় অভ্যাস। বিবাদে, আনন্দে, কিংবা উত্তেজনায় আমার কেবলই ছিল সিগারেট আর সিগারেট। সিগারেটের চেয়ে স্বাদু কিছুই ছিল না।

বিয়ের একমাস আগে আমরা একটা ইতর ট্যাক্সিওয়ালার পাল্লায় পড়েছিলাম। গঙ্গার ধার থেকে সে আমাদের ঘুরপথে নিয়ে যাচ্ছিল। জোড়া ছেলে-মেয়ে উঠলে ওটা তাদের অভ্যাস। আমি তাকে রেড রোড দিয়ে বালিগঞ্জের পথ বললাম, সে আমাদের অন্যমনস্ক দেখে সোজা উঠে এল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে। পর পর সে অবাধ্যতা করে যাচ্ছিল। গাড়িতে তার মুখের সামনে লাগানো ছোট্ট আয়নাটায় আমি তার রুক্ষ মুখে বিচ্ছিরি একটু হাসিও দেখতে পেয়েছিলাম।—আমি ড্রাইভারকে লক্ষ করছি দেখে সোনামন রাগ করে বলল—তুমি কেবল ওইদিকেই চেয়ে আছ। ওখানে কী! আমি তোমার ডানপাশে। আমি মৃদু হেসে সোনামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ওর কথা শুনছিলাম। কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল আয়নার দিকে। নির্জন গুরুসদয় রোডে গাড়ি ঢুকলে আমি শান্ত গলায় ড্রাইভারকে থামতে বললাম। ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট আর জিভের

শব্দ করল। সোনামন আমার হাত আঁকড়ে বলল, এখানে কেন? আমি হেসে বসলাম—বাকিটুকু হেঁটে যাব, সোনামন। বিয়ের আগে একটু পয়সা বাঁচাই।

সোনামন নেমে ফুটপাথে দাঁড়াতেই আমি ট্যাক্সিটা ঘুরে ড্রাইভারের দরজায় গিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেললাম। কী করছিলাম তা আমার খেয়াল ছিল না। আঠাশ-উনত্রিশ বছর বয়সের শক্ত কাঠামোর ড্রাইভারটা মুখে একটু রাগ দেখাবার চেষ্টা করল। তারপরই আমার মাথার ভিতরে অস্বচ্ছ একটা ধোঁয়ার কুন্ডলী পাকিয়ে উঠেছিল। তাকে গাড়ির বনেটের ওপর চিতপাত করে ফেলে আমি একনাগাড়ে অনেকক্ষণ মেরে গেলাম। নির্জন রাস্তাতেও লোকজন ছুটে আসছিল। প্রথম ভ্যাবাচ্যাকার ভাবটা সামলে নিয়ে সোনামনই প্রথম ছুটে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল দু-হাতে—মানিকসোনা, এই মানিকসোনা...ওগো...পায়ে পড়ি। আমি সোনামনের কান্নার শব্দও শুনতে পেলাম।

কলকাতার লোকেরা এমনিতেই ট্যাক্সিওয়ালাদের পছন্দ করে না। তার ওপর আমার সঙ্গে সুন্দর একটি মেয়ে রয়েছে। কাজেই ট্যাক্সিওয়ালাকেই আরও কিছু মারমুখো লোকের ভিড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে আমি সোনামনকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। অভ্যাসমতোই আমার স্বয়ংক্রিয় হাত সিগারেট ধরিয়ে নিল। অনেককাল আমি কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে যাইনি। আমার রক্ত ঠাণ্ডা। তবু কী করে যে ব্যাপারটা হয়ে গেল। আমার ছেলেবেলায় শেখা ঘুসি মারার কৌশল আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। অনেককাল আর আমার দুই হাত মারধরে ব্যবহৃত হয়নি।

চুপচাপ অনেকটা হেঁটে যাওয়ার পর হঠাৎ সোনামন তখনও তার কিছুটা ধরা গলায় বলল—তুমি যে এমন রাগতে পারো জানতুম না।

লজ্জা পেলাম। গম্ভীর মুখে শুধু বললাম—হুঁ।

সোনামন হঠাৎ বলল—তুমি অত সিগারেট খাও বলেই নার্ভ অত ইরিটেটেড হয়।

অবাক গলায় বললাম—দুর!

সে মাথা নাড়ল—ঠিকই বলছি। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে তুমি যখন সিগারেট কিনতে গেলে আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে, তখন আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলেছিলাম যেন সে তোমার কথা না শোনে, যেন একটু ঘুরে ঘুরে যায়। আমি মফসসলের মেয়ে, ট্যাক্সিতে চড়ে কলকাতা দেখতে আমার ভালো লাগে।

দাঁড়িয়ে পড়ে আমি বললাম—সত্যি বলছ?

—সত্যি। সে মাথা নাড়ল—কে জানত তুমি রেগে গিয়ে ওই কান্ড করে বসবে মানিকসোনা। আমি তোমাকে বলবার সময়ই পেলাম না। তার আগেই তুমি মারতে শুরু করেছ। মাগো! ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল!

অনেকক্ষণ চুপ করে হাঁটতে হাঁটতে আমি শুধু বললাম—ট্যাক্সির ভাড়াটা দেওয়া হল না।

একথা ঠিক যে, উত্তেজনা বেশি হলে আমার ব্যথা বাড়ে। গলা-বুক জুড়ে বিষাক্ত টক জল কলকল করতে থাকে। কোনো কিছুতেই তখন আর স্বস্তি পাওয়া যায় না। ওই উত্তেজনার পর সেই বিকেলে আমার ব্যথা বাড়তে লাগল। যখন সুইন-হো স্ট্রিটে আমার ছোট্ট একটেরে ঘরটার তালা খুলছি তখনও আমার মনে হচ্ছে একটু বমি হয়ে গেলে স্বস্তি পাব। সঙ্গে সোনামন না থাকলে বাথরুমে গিয়ে আমি তাই করতুম। কিন্তু পাছে তার কাছে আমার অসুখ ধরা পড়ে যায়, আর সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে আমি সামান্য কষ্টে আমার যন্ত্রণা চেপে রাখলাম। কিন্তু যে ভালোবাসে তার কাছে গোপন করা বড়ো শক্ত। আমাকে ঘিরে সোনামনের সমস্ত অনুভূতিগুলি বড়ো সচেতন। অনেক সময় সোনামন ঠিকঠাক বলে দেয় আমি কী ভাবছি। কিংবা আমার মনমেজাজ কখন, কেমন থাকে বা থাকতে পারে তাও মাত্র আট-ন মাসের পরিচয়ে সে বুঝে গেছে! নির্জন রাস্তা তোমার ভালো লাগে, না গো? ওঃ, তোমার হাই উঠছে, একটু চা খাবে, না? অনেকক্ষণ খাওনি। তুমি খোলা জায়গায় প্রায়ই আমার মুখ আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করো, যাতে কেউ না আমার মুখ দেখতে পায়, তাই না, বলো! ইস কী বোকা! সোনামন এরকম অজস্র বলে যায়। ধরা পড়ে গিয়ে আমি আর

লজ্জা পাই না। তবু আমি বহুদিন আমার ব্যথাটার কথা গোপন রাখতে পেরেছিলাম। সেদিন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমি প্রবল ব্যথাটাকে কষ্টে চেপে রাখছিলাম। আমার ঘরে যখন সোনামন আসে তখন আমি দরজা দু-হাট খোলা রাখি, মাঝখানে একটা টেবিল, তার দু-ধারে বসি দুজনে যাতে খারাপ কেউ না ভাবে। সেরকমভাবেই বসেছিলাম দুজনে। কথা হচ্ছিল। আমার ব্যথাটার চরিত্র এই যে, শরীর কুঁজো আর কুঁকড়ে রাখলে সামান্য স্বস্তি লাগে। সাধারণত আমি সোজা এবং সহজভাবে বসি। সেদিন আমার শরীর দু-বার কী তিনবার ঝাঁকুনি দিয়ে কুঁকড়ে গেল। ভেবেছিলাম অত সামান্য অস্বাভাবিকতা ও লক্ষ করবে না। কিন্তু তিনবারের বার ও কথা থামিয়ে চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি হাসছিলাম। ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তোমার শরীর ভালো নেই।

প্রশ্ন নয়, ঘোষণা।

শরীর সহজ করে নিয়ে হেসে বলি—কোথায় কী! শরীর ঠিক আছে।

ও মাথা নাড়ল—বাজে বোকো না। তোমার ব্যাপারে আমি বোকা নই। সব বুঝি।

কী বোঝো।

তোমার একটা কিছু যন্ত্রণা হচ্ছে।

কই!

হচ্ছে, আমি জানি। তোমার মুখ আবার সাদা দেখাচ্ছে। তুমি লুকোচ্ছ।

হাসলাম—বেশ! কিন্তু বলো তো কোথায় যন্ত্রণা?

ও একটু থমকে গেল। দাঁতে সামান্য ঠোঁট চেপে রেখে বলল—বলব?

মাথা নাড়লাম—বলো।

ও আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ওর চোখে আমার এলানো শরীরের সব ভঙ্গি খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে ও আমার পেট দেখিয়ে দিল—ওইখানে।

না। আমি মাথা নাড়লাম—ঠিক পেটে নয়, তবে কাছাকাছি। আন্দাজ করে বলো।

কিন্তু এই লুকোচুরির খেলা খেলল না সোনামন। আমার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বলল—কোথায় ব্যথা জানবার দরকার নেই। এখন চলো তো।

কোথায়?

ডাক্তারের কাছে।

বহুকাল, প্রায় সেই ছেলেবেলার পর থেকেই কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়নি। বড়ো লজ্জা করছিল। কিন্তু সোনামন শুনল না, জোর করে নিয়ে গিয়ে প্রথম যে ডাক্তারখানা পাওয়া গেল সেখানেই এক বুড়োসুড়ো ডাক্তারের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে। কানে কানে শুধু বলে দিল—দেখো, ডাক্তারকে আবার বোলো না যেন, আমার ব্যথাটা কোথায় বলুন তো!

রোগা একটা হাড়-জিরজিরে ছেলে বুড়ো ডাক্তারের সামনে মা কালীর মতো জিব বের করে দাঁড়িয়েছিল। তার দিক থেকে একবার আড়চোখ তুলে ডাক্তার আমাকে প্রশ্ন করলেন—কী?

সোনামনকে খ্যাপানোর জন্যেই আমি ভেবেচিন্তে ধীরেসুস্থে কেটে কেটে বললাম—আজ আমি একটা ট্যাক্সির ভাড়া দিইনি ডাক্তারবাবু। তার ওপর ট্যাক্সিওয়ালাকে আমি খুব মেরেওছিলাম।

ডাক্তার হাঁ করে তাকালেন। পিঠে সোনামনের একটা চিমটি টের পেলাম। ধীরে-সুস্থে আমি ডান হাতটা এগিয়ে দিলাম ডাক্তারের সামনে, বললাম—দেখুন ডাক্তারবাবু, ট্যাক্সিওয়ালাটার দাঁতে লেগে আঙুলটা অনেকখানি কেটে গেছে। মানুষের দাঁত বড়ো বিষাক্ত। এর জন্যে একটা ওষুধ দিন।

আমাকে ঠেলে সরিয়ে তখন সোনামন লালচে লাজুক মুখে এগিয়ে এল—না ডাক্তারবাবু, ওর কথা শুনবেন না...ইত্যাদি।

দুটি পাগল প্রেমিক-প্রেমিকার পাল্লায় পড়ে আসল ব্যাপারটা বুঝতে ডাক্তারবাবুর অনেকটা সময় এবং ধৈর্য গেল। তারপরও ব্যাপারটা চট করে মিটল না। ডাক্তার অনেক কিছু পরীক্ষা করতে চাইলেন। সোনামনের পাল্লায় পড়ে দু-চারদিন ধরে সেইসব ক্লান্তিকর পরীক্ষা আমাকে দিতে হচ্ছিল। কিন্তু সারাক্ষণ আমার মন অন্য কথা বলছিল। বুঝতে পারছিলাম যে, এসব কিছুই নয়; আসলে সারাজীবন ধরে আমি যে কিছু কিছু অন্যায় করেছি এ সবই তার প্রতিক্রিয়া। সবচেয়ে কাছাকাছি কারণটা হচ্ছে ট্যাক্সির ভাড়া না দেওয়া এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে ওই মার। অবশেষে রোগ ধরা পড়ল—হাইপার অ্যাসিডিটি। গালভরা চমৎকার নামটি শুনে আমি খুশি হলাম, সোনামন হল না।

ডাক্তার আমার ব্যাপারে তাকে কিছু কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। পাড়ার একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে আমি মাঝে মাঝে চা খেতাম। সেইখানে এক বিকেলে দোকানভরতি লোকের সামনে সোনামন দোকানদারকে বোঝাল আমার কী বিশ্রী একটা অসুখ হয়েছে। আর চা কত খারাপ! এরপর থেকে আমি চা চাইলে সে যেন আমাকে এক কাপ করে দুধ দেয়। দোকানদারকে কথা দিতে হল।

তারপর চলল গয়লার খোঁজ যে রোজ সকালবেলায় আমার ঘরের সামনে গোরু নিয়ে এসে দুধ দুইয়ে দিয়ে যাবে। আমি আপত্তি করলাম—রোজ সকালে উঠে আমি গোরুর মুখ দেখতে পারব না। কিন্তু সোনামন শুনল না।

যে হোটেলটায় আমি খেতাম সেখানে গিয়েও সোনামন আমার খাবারে ঝাল-মশলার ওপর একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে এল। আর আমার ঘরের টেবিলটা ভরে উঠল বিস্কুটের টিন আর ওষুধের বাক্সে। আর সেই থেকেই আমার সিগারেট হাতছাড়া হয়ে সোনামনের হাতব্যাগে ঢুকে গেল। বিয়ের একমাস আগে থেকেই।

বহুদিন হল, প্রায় চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স থেকেই আমি বাড়ি আর মা-বাবাকে ছেড়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখনো পড়ার জন্য, কখনো চাকরির জন্য। নি:সঙ্গ জীবন আমার একরকম প্রিয় ছিল। সেইখানেই পড়ল ডাকাত। সোনামন বিকেলে ফিরে যাওয়ার সময়ে রোজ দিব্যি দিয়ে যেত—রাত্রে যেন দুটোর বেশি সিগারেট না খাই। ও চলে গেলে দীর্ঘ অপরাহ্ণ আর রাত-জোড়া নি:সঙ্গতায় সিগারেট ছাড়া তাই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক করে উঠত! তবু খেতাম না। ওর দিব্যি মনে পড়ত। একটু হেসে আমি আমার প্রিয় সিগারেটে আগুন না জ্বেলে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম।

আস্তে আস্তে ব্যথাটা কমে যেতে লাগল। দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই আর ব্যথার চিহ্ন ছিল না। টক জলের স্বাদ মুছে গেল বুক আর জিভ থেকে। চেহারা ফিরল একটু। আর সোনামনের মুখে বাচ্চা লুডো-খেলুড়ির ছক্কা-ফেলার মতো ছেলেমানুষি হাসি ফুটে উঠল। তবু মাঝে মাঝে আমার দুর্বোধ্যভাবে মনে হত আমার অসুখের কারণ কেবলমাত্র সিগারেট কিংবা অনিয়ম নয়। কেন-না অনিয়ম এবং সিগারেটেরও আবার কারণ রয়েছে। এইরকম অনুসন্ধান করে যেতে থাকলে হয়তো দেখা যাবে আমার প্রস্তরীভূত মূল অন্যায়গুলিকে। সেই ট্যাক্সির ব্যাপারটা আমার প্রায়ই খুব মনে পড়ত। সোনামনকে আমি দু-একবার বলতে গিয়েও সামলে গেছি। কেন-না ও হয়তো ব্যাপারটায় নিজের দোষ মনে করে দুঃখ পাবে।

বিয়ের পর দু-মাস কেটে গেছে। আমার অসুখ নেই। নি:সঙ্গতা নেই। সোনামন যত্ন করে রেঁধে দেয় মশলা আর ঝাল ছাড়া খাবার। কম সিগারেট। আমার সমস্ত শরীরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে স্বাস্থ্যের সুলক্ষণ। আর আমাকে নিজের কাছ থেকে পালাতে হয় না বন্ধুদের বিকারগ্রস্ত ভিড়ে কিংবা আড্ডায়। খিদে মেটাবার আলসেমিতে যখন-তখন চায়ের কাপ টেনে বসতে হয় না। আমি সুন্দরভাবে বেঁচে আছি। জানি, অলক্ষ্যে অজান্তে কখন সোনামনের গভীর উষ্ণ অন্ধকারে চলে গেছে আমার বীজ। ওই বৃক্ষ থেকে পাকা ফলের মতো বোঁটা ছিঁড়ে শিগগিরই একদিন নেমে আসবে আমার প্রিয় আত্মজরা। আমি জানি। আমি তা জানি। তবু আজ রাত দুটোয় আমি সোনামনকে ঘুমন্ত একা বিছানায় রেখে চুরি-করা সিগারেট জ্বেলে এসে জানলায় দাঁড়ালাম। হায় ঈশ্বর! আমি কীভাবে বলব! সোনামনকে আমি কীভাবে বলব!

ট্যাক্সিওয়ালাটা জানে যে, একটা রাস্তায় দুর্ঘটনার জন্য তার ফাঁসি হবে না। কিন্তু পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি তার ট্যাক্সির নম্বর মনে রেখেছি। কিন্তু আমি জানি তাতে লাভ নেই। আমি তাকে আর ছুঁতেও পারি না।

পরশুদিনই আমি তাকে আর একবার দেখলাম। এক পলকের জন্য। সুইন-হো স্ট্রিটের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে আমরা এখন যে ছোট্ট বাসাটায় আছি তা বাস রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে। একটু নির্জন চওড়া রাস্তা। বড়োলোকদের পাড়া। বিকেলে আমি ফিরছিলাম। সারামন সোনামনের নাম ধরে ডাকছিল। মনে পড়ছিল দরজা খুলে নিয়ে সোনামন কেমন লঘু পায়ে আমার আক্রমণ থেকে সরে দাঁড়াবে। চলে যাবে ছোট্ট ফ্ল্যাটটার কোণে কোণে। অনেকক্ষণের সেই ক্লান্তিহীন হুটোপাটি। সেসময়ে সোনামন তার ঘন শ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে বলবে—মোটেই তিনটে না মশাই, তুমি আজ পাঁচটা সিগারেট খেয়েছ সারাদিন। ভুরভুর করছে গন্ধ। ভাবতে ভাবতে আমি অন্যমনে ফুটপাথ থেকে পা বাড়িয়েছি রাস্তা পার হওয়ার জন্য। অভ্যাসমতো ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম। মোড় থেকে ধীরে ধীরে আসছে একটা ট্যাক্সি। ওটা আসার অনেক আগেই পেরিয়ে যাব মনে করে যখন আমি রাস্তার মাঝামাঝি তখনই হঠাৎ মোটর ইঞ্জিনের তীব্র শব্দ হয়েছিল। হর্ন বাজেনি। হতচকিত আমি দেখলাম। পাগলাটে খ্যাপা ট্যাক্সিটা বাঘের মতো লাফিয়ে চলে এল। বৃথাই আমি একটি হাত তুলে আমার অসহায়তা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কেন-না ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি সে কী চায়। সময় ছিল না। একদম সময় ছিল না। শুধু শেষ চেষ্টায় আমি খুব জোরে শূন্যে লাফিয়ে উঠলাম! ট্যাক্সির নীচু বনেটটায় আমার পায়ের জুতোর ঠক করে শব্দ হল। আমাকে পাকিয়ে ছুড়ে একধারে ফেলে রেখে গাড়িটা তার তীব্র গতি বজায় রেখে বেরিয়ে গেল। খুব সামান্য এক পলকেরও ভগ্নাংশ সময়ের জন্য আমি ড্রাইভারের রুক্ষ মুখটা দেখতে পেলাম, অস্বচ্ছভাবে শুনতে পেলাম তার চাপা গলার গালাগাল—শালা...

উঠে দাঁড়াবার পরও অনেকক্ষণ আমার সামনে শূন্য রাস্তাটাকে বড়ো বেশি শূন্য বলে মনে হয়েছিল। চারপাশ খুব নির্জন এবং শীতল—যেন কিছুই ঘটেনি। পুরোনো অভ্যাসমতো আমি সিগারেটের প্যাকেটের জন্য পকেটে হাত বাড়ালাম। সোনামনের মুখ মনে পড়ল। আমি যাতে নিরাপদ থাকি সেইজন্যেই আমার সিগারেট কেড়ে নিয়েছে সোনামন। সে চায় আমি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকি, কোনো অসুখ, সামান্য অসুখও যেন না থাকে তার মানিকসোনার।

রাত দুটোর নির্জন রাস্তার দিকে চেয়ে আমার সেই একদিনের চেনা ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—ভাই ট্যাক্সিওয়ালা, তুমি কি জানো আমার সোনামন চায় যে, আমি আরও দীর্ঘকাল নিরাপদে বেঁচে থাকি?

তবু আমি জানি এই ঘরে আমার সোনামনের সতর্ক যত্নের বাইরে খোলা রাস্তায় আমাকে যেতে হবে। কলকাতার রাস্তার গলিতে হাঁটাপথে কোথাও না কোথাও পছন্দমতো জায়গায় সে আমাকে পেয়ে যাবে। হয়তো সারাদিন ধরে তার ট্যাক্সি ওঁত পেতে অপেক্ষা করে থাকবে গলির মোড়ে, অফিসের পাশেই কোনো চোরা গলিতে, হয়তো বা সে আমার পিছু নিয়ে ফিরবে দীর্ঘ পথ। তারপর একদিন দেখা হবে। সে তো জানেও না কে আমার সোনামন, কিংবা কীরকম আমাদের ভালোবাসা! জানেও না সোনামনের শরীর জুড়ে আমাদের সন্তান আসবে শিগগিরই একদিন! সে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে আমাকে জানে যে, আমি অন্যায়কারী, সে জানে আমি তাকে একদিন মেরেছিলাম। তাই বহু খুঁজে খুঁজে সে আমার চলাফেরার পথ বের করেছে। এখন কেবল সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে।

পরিপূর্ণ শান্ত আমার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে আমার চুরি-করা প্রিয় স্বাদু সিগারেট ধরিয়ে সামান্য অন্যমনে অনিশ্চয়ভাবে আমি মৃত্যুর কথা ভাবছিলাম। তিনমাস আগে সেরে-যাওয়া বুক ও পেটের মাঝখানের সেই ব্যথাটা আস্তে আস্তে ফুলের কলির মতো ফুটে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

যতীনবাবুর চাকর

যতীনবাবু পানুকে খুব ভালো করে চেনেন না, একথা ঠিক। যতীনবাবুর দোষ নেই, তাঁর মেলা লোকলশকর, মেলাই মুনিষ, দারোয়ান, চাকরবাকর। এর মধ্যে পানু কোনজন তা তাঁর না জানার হক আছে। তবে কিনা যতীনবাবুর দুটো কুকুর, সাতটা গাই, গোটা সাতেক ছাগল, পঞ্চান্নটা হাঁস, সত্তরটা মুরগি, সতেরোটা খরগোশ, সাতটা পোষা পাখি আর যতীনবাবুর প্রায় একশো বছর বয়েসি দিদিমা কুসুম দাসী পানুকে ভালোই চেনে। তবে তারা আরও অনেককে চেনে, আবার পানুকেও চেনে।

পানু যদি বলে, 'আমি যতীনবাবুর চাকর' তাহলে কথাটা মিথ্যেও হয় না, আবার সত্যিও হয় না। মাস গেলে পানু যে আশিটা টাকা মাইনে পায় তা যতীনবাবুর তহবিল থেকেই আসে। দু-বেলা পানু যে পাহাড়প্রমাণ ভাত পেটের মধ্যে সাঁদ করায় তাও বটে যতীনবাবুরই ভাত, তবু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, পানু হল গে চাকরের চাকর। যতীনবাবু তাকে চেনেন না, তার মাথার ওপর ছড়িও ঘোরান না। তাকে হুকুম তামিল করতে হয় সত্যরামের। সত্যরাম এ বাড়ির যত চাকরবাকর আর কাজের লোকের ছড়িদার। সত্যরামের যা দাপট তা কহতব্য নয়। সত্যরামও বটে যতীনবাবুর এক চাকরই, কিন্তু সেকথা মনে আনাও পাপ। সে এখন যতীনবাবুর মেলা মেলা টাকা রোজ ছানাঘাঁটা করে, কাকে রাখবে, কাকে ফেলবে তাও সে-ই ঠিক করে, সে-ই বাজার সরকার, খাজাঞ্চি, আরও কত কী। পানু শুধু জানে, যতীনবাবু নন, তার মাথার ওপর সত্যরাম। তার মরা-বাঁচা সত্যরামের হাতে, সুতরাং সে হল গে যতীনবাবুর চাকরের চাকর।

এ বাড়িতে পানু ঢুকেছিল ছুঁচ হয়ে। তবে ছুঁচই রয়ে গেছে, ফাল আর হওয়া হয়নি। সেই ছুঁচ হয়ে ঢোকাটাও এক বৃত্তান্ত। পানু তখনও তো চাকর হয়নি। বাপ বেঁচে। গরিব বটে, তবে বাপ খাটত-পিটত, পানু আলায়-বালায় ঘুরে দিব্যি হেসেখেলে ছিল। পানুর তখন বয়সের জোয়ারে চেহারাখানাও এমন পাকিয়ে দরকচা মেরে যায়নি। ভারি মিঠে করে বাঁশি বাজাতে পারত। ইচ্ছে ছিল যাত্রাপার্টিতে ভিড়ে যাবে। গুণীর খুব কদর যাত্রার দলে। সেই সময়ে সে পড়ল গন্ধবাবুর খপ্পরে। সে আর এক বৃত্তান্ত। গন্ধবাবুর মেয়ে হল পারুল। গেছো মেয়েছেলে যাকে বলে। জামা ছেড়ে শাড়ি ধরার বয়সের ফাঁকেই দু-দু-বার দুটো ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ফের ফেরত আসে। কোনো কোনো মেয়ে থাকে এরকম, যাকে শেষ অবধি সামলে ওঠা যায় না। স্বজাত স্বঘরের একটি যেমন-তেমন পাত্র তখন গন্ধবাবুর খুব দরকার। নইলে মানসম্মান থাকে না।

তা গন্ধবাবুর মানইজ্জত বড়ো কমও তো নয়। উনি ছিলেন যতীনবাবুর তেলকলের ম্যানেজার। গোঁসাইগঞ্জের হাটে গন্ধবাবু পাকড়াও করলেন পানুকে। দু-চার কথার পরই ধাঁ করে কাজের কথা পেড়ে ফেললেন। বেশ হেঁকেই বললেন, পারুলকে যদি বিয়ে করো তবে আখের গুছিয়ে দেব। চাই কী আজই কাজে লেগে যেতে পারো।

গায়ে খুব গন্ধ মাখতেন বলে লোকটার ওই নাম। আসল নাম রাখাল-টাখাল কিছু হবে। তবে গন্ধবাবু বললে দশখানা গাঁয়ের লোক চেনে। বাড়ি এসে যখন পানু তার বাপকে কথাটা বলল তখন বাবা লাফিয়ে উঠে বলল, আরিব্বাস, এ তো লটারি জিতেছিস। কালই গিয়ে কাজে লেগে যা। মেয়েটার একটু বদনাম আছে বটে, তা বিয়ের পর দু-চার ঘা দিলেই সারবেখন।

পানু অগত্যা কাজে লেগে পড়ল। তেলকলের কাজ গতরের খাটুনি। তবে হবু শ্বশুর মাথার ওপর ছিল বলে ভরসাও ছিল। দিন ফিরবে।

কিন্তু ফ্যাসাদটা বাঁধাল পারুলই। চোত মাসে কাজে লেগেছিল পানু আর জ্যৈষ্ঠে পারুল ফের পালাল। এবার গেল এক ঠিকাদারের সঙ্গে। গিয়ে যে কোন গাড্ডায় পড়ল কে জানে, আর ফিরল না।

গন্ধবাবু তারপর থেকেই পানুর ওপর বিগড়ে গেলেন। না, তা বলে তাড়িয়ে দিলেন না। তবে আগের মতো 'এসো, বোসো'-ও আর করলেন না। পানু চাকরি করে, গন্ধবাবু ম্যানেজারি করেন, কারও সঙ্গে কারও অন্য কোনো সম্পর্ক থাকল না।

সেই সময়ে যতীনবাবুর বাড়িতে কাজের লোকের টান পড়ায় সত্যরাম এসে তেলকল থেকে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল। সেই কয়েকজনের মধ্যে পানু একজন। গন্ধবাবু ফিরেও তাকালেন না।

পানুর একটু দুঃখ হয়েছিল বই কী। পারুলের জন্য তাকে দেগে রাখা হয়েছিল বটে কিন্তু গন্ধবাবুর আরও মেয়ে ছিল। পারুলের ছোটো বকুল, তার ছোটো টগর। কিন্তু তাদের কোনো গন্ডগোল নেই। কই তাদের একজনের সঙ্গেও তো বিয়েটা লাগাতে পারত পানুর। গন্ধবাবু সেদিক দিয়ে গেলেন না।

গন্ধবাবু আর বেঁচে নেই। তার পরিবার কোথায় কীরকম আছে-টাছে তাও জানে না পানু। তার সে-সময় নেই। যতীনবাবুর বাড়িতে পাহাড়প্রমাণ কাজ। সত্যরাম আবার কারও বসে থাকা পছন্দ করে না।

যতীনবাবুর দুটো মহল। একটা অন্দর আর একটা বার। অন্দরমহলে যারা যাতায়াত করে তারা সত্যরামের পেয়ারের লোক। পানুর কপালে সত্যরামের নেক-নজর জোটেনি। সে বাইরের লোক। বাইরে থেকে ভিতরটা কিছুই দেখা যায় না, তবে আন্দাজ করা যায়। মোটা মোটা দেয়াল, চিক-ফেলা বারান্দা, পর্দা-ফেলা জানলার ওই যে বিশাল তিনতলা অন্দরমহল ওটা হল রাজার পুরী। ওখানে নরম বিছানা, আতরের সুবাস, পায়েস, রসগোল্লার ছড়াছড়ি। আর সোনাদানা টাকাপয়সার পাহাড়।

এই বাইরের মহল আর অন্দরমহলের মাঝামাঝি একখানা একটেরে দালান আছে। আগে ঠাকুরদালানই ছিল, এখন নতুন ঠাকুরদালান হয়েছে দক্ষিণদিকে। এই দালানের একখানা ঘরে যতীনবাবুর দিদিমা থাকে। তিন কুলে কেউ আর নেই বলে বুড়ি যতীনবাবুর কাছে এসে পড়েছিল কোনোকালে। যতীনবাবু ফেলেননি, আবার তেমন মাথায় করেও রাখেননি। গরিব আত্মীয় বড়ো বালাই। তার ওপর বুড়ি তাঁর আপন দিদিমাও নয়, মায়ের মাসি।

খুনখুনে বুড়ি কুসুম দাসী একদিন পানুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, দিবি দাদা, একখান ডাব পেড়ে?

পানু তখন নতুন। কিছু জানে না। কোথা থেকে ডাব পেড়ে দেবে তাও বুঝতে পারছে না। হাঁ করে চেয়ে রইল।

বুড়ি বলল, আমি যতীনের দিদিমা, যা ওই পুবের ঘরের পিছনে যে গাছগুলো আছে সেখান থেকে একটা পেড়ে আন। আজ একাদশী।

যতীনবাবুর দিদিমা! পানুর চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। তক্ষুনি গিয়ে তরতরিয়ে গাছে উঠে একটার জায়গায় চারটে পেড়ে আনল।

কুসুম দাসী খুব খুশি। কত আশীর্বাদ করল। ফলে আজ পানুর রাজাগজা হওয়ার কথা। সে তো হয়ইনি সে, তার ওপর ডাব পাড়ার জন্য সত্যরাম এই মারে কী সেই মারে। তবে সে যা-ই হোক, সেই থেকে বুড়ির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল পানুর। যতীনবাবুর দিদিমার অবস্থা যে তার চেয়ে খুব বেশি ভালো নয়, তা বুঝতে পানুর দেরি হয়নি। তবে বুড়ি মানুষ ভালো। দায়ে পড়লে মানুষের স্বভাব ভালো হয়ে পড়ে, তারা

ভারি নরম নরম হয় আর লোকদের ভক্তিমান্য করতে শুরু করে, এ পানু অনেক দেখেছে। যতীনবাবুর দিদিমাও সেই হিসেবেই ভালো। পানুকে খুব ডাকখোঁজ করে, এটা-সেটা জোগাড় করে দিতে বলে, আর লোভও দেখায়, 'তোর বে হোক, আমার এক ছড়া তিন ভরির মটরদানা হার আছে, তোর বউকে দেব।'

পানু হাসে। মটরদানা হারখানা আর দিদিমাকে হাতছাড়া করতে হবে না ইহজন্মে। পারুল সটকে পড়ার পর থেকেই পানু জানে, এই ঢনঢনে কপালে বে আর নেই।

খড় কুচোতে বসে, কিংবা চুন আর বালি দিয়ে ঝামায় ঘসে কুয়োপাড়ের শ্যাওলা তুলতে তুলতে, কিংবা পুকুরধারে পাটায় বাবুদের পেল্লায় পেল্লায় মশারি কাচতে কাচতে জীবনটার ওপর যেমন ঘেন্না আসে, তেমনি আবার শিউলি ফুটলে, নলেনগুড় জ্বালের গন্ধ বেরোলে বা কোকিল আচমকা ডেকে উঠলে মনটা ভারি খুশি খুশি হয়ে ওঠে। জীবনটায় আর একটা খুশির তুফান লাগতে পারত যদি সত্যরাম তার ওপর খুশি থাকত। কিন্তু সেটাই কিছুতেই হয়ে উঠল না। এক-একজন থাকে, বেশ আছে, দোষঘাট কিছু করেনি, তবু তার ওপর কেউই যেন খুশি হয় না। তাকে দেখলেই মুখ ব্যাজার করে ফেলে। পানুরও হয়েছে তাই। পানুর বাপ মারা গেল এই তো সেদিন। খবর পেয়ে পানুর তেমন কিছু বুক-তোলপাড় হল না। গরিবদের তেমন আঠা থাকে না কিনা। বাপের সঙ্গে পানুরও বহুকাল ছাড়কাট হয়ে গেছে। তবু খবর পেলে যেতে হয়, তাই গেল। গিয়ে দেখল, দেড় বিঘে জমি আর খোড়ো ঘরসমেত বাস্তুটা জুড়ে থাবা গেড়ে আছে তার ছোটোভাই কানু। রাগি কুকুর যেমন লোক দেখলেই গরগর করতে থাকে, তেমনি তাকে দেখেও কানু কেমন যেন গরগর করতে থাকল। বুঝি ভেবেছিল পানু বাপের সম্পত্তির ভাগ চাইবে। চাওয়ার কথা মনেই হয়নি পানুর। সে বড়োলোকের চাকর, নজর একটু উঁচু হয়েছে। দেড় বিঘে জমি আর নড়বড়ে খোড়ো ঘরের ভাগ চাইবার মতো ছোটোনজর তার আর নেই। সেকথা কানুকে বুঝিয়েও বলল সে, তবু কানু গরগরানিটা থামাল না। বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার বেশ ফাঁদানো সংসার। এখানে ভাগিদার জুটলে তার বিপদ। সে তো আর সুখে নেই। তবে ছোঁড়াটা বরাবরই খারাপ ছিল। মদ-টদ খায়। জুয়া খেলে, বউকে ধরে পেটায়, বাপকেও ঝাড় দিত মাঝে মাঝে।

পানু ফিরে আসার পর সত্যরাম একদিন তাকে পা দাবাতে ডেকে পাঠাল। সত্যরামের পা দাবানো এক মস্ত সম্মানের ব্যাপার। যে-সে সত্যরামের পায়ে হাত ছোঁয়াতে পারে না। যারা পারে তাদের নির্ঘাত দশ-বিশ টাকা বেতন বেড়ে যায়। আর তারা নেক-নজরেও থাকে।

পানুর ভারি আহ্লাদ হয়েছিল সত্যরামের ডাক পেয়ে। কিন্তু পা দাবাবে কী, হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই সত্যরাম কঁকিয়ে উঠে বলল, ওরে থাম থাম, কী লোহার হাত রে বাবা। কড়া পড়ে যে এক্কেবারে শিরিস-কাগজ বানিয়েছিস। আমার নরম শরীর, ওই কেঠো হাত চলবে না।

তা কথাটা সত্যি বটে। পানুর হাত আর হাত নেই। থাবা হয়ে গেছে। মনের দুঃখে সে সত্যরামের ঘর থেকে ফিরে এল। কপালটা খুলি খুলি করেও খুলল না। সত্যরামও চাকর বটে, কিন্তু বড়ো চাকর! সর ননি দুধ ঘি খেয়ে আর গতর না খাটিয়ে সে ইদানীং ভারি নাদুসনুদুস হয়েছে। মুখখানায় আহ্লাদী ভাব। তিন আঙুলে তিনখানা সোনার আংটি। এমন এঁটে বসে গেছে যে, স্যাকরা ডেকে না খোলালে আর খুলবে না। তার পা দাবাতে গেলে পানুকে সাতদিন হাত দুখানা তেলে ভিজিয়ে নরম করে নিতে হবে।

এইসব নানা কথা নিয়ে ভাবে পানু! আর কাজ করে। আর খায়। আর ঘুমোয়। আর ভাবে।

ওদিকে যতীনবাবুর কারবার বাড়ছে, টাকা বাড়ছে, লোক বাড়ছে। ক্রমে ক্রমে চারদিকটা বেশ ফলাও হয়ে উঠেছে। দুখানা গাড়ি কিনলেন যতীনবাবু। বারবাড়ির উঠোনে একখানা দোতলা তুলে ফেললেন। পাঞ্জাব থেকে দুটো বিশাল গাই এল।

কিন্তু পানু যে কে সে-ই! তবে একথাও ঠিক, যতীনবাবুর উন্নতি যত হয় ততই পানু খুশি হতে থাকে। শত হলেও মনিব তো। যতীনবাবুর রংখানা দিন দিন ফর্সা হয়েছে, চোখ দুখানা থেকে দু-বাটি মধুর মতো সুখ থিকথিক করছে। মুখখানায় সর্বদা যেন হাসি-হাসি ভাব। আগে একজন পাইক সর্বদা ঘুরত। আজকাল

দুজন। দু-নম্বর পাইকটার চেহারা কাবলিওলাদের হার মানায়। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, তেমনি বিশাল বুকখানা। আর চোখ দুখানায় দোফলা ছুরির ধার। যত টাকা বাড়ছে যতীনবাবুর ততই শত্রু বাড়ছে। তাই বাড়ছে পাইক। নতুন পাইকটার হাতে একটা দোনলা বন্দুকও থাকে। দেখে ভারি ভক্তি-শ্রদ্ধা হল পানুর।

দুপুরবেলা বারবাড়ির বারান্দায় তারা ছ-জন বাইরের চাকর খেতে বসে। সত্যরামের পেয়ারের লোকদের জন্য ভিতরে দরদালানে ভিন্ন ব্যবস্থা। তা হোক, পানুর কোনো দুঃখ নেই। যতীনবাবুর বাড়িতে ভাতটা নিয়ে হিসেব করা হয় না। যত পারো খাও। ভাতটা বেশ চেপেই নেয় সকলে। ভাতের মাথায় একটা গর্ত করতে হয়, তাতে বড়ো হাতা দিয়ে হড়হড় করে ডাল ঢেলে দিয়ে যায় হরিহর। একটু ঘ্যাঁট মতো থাকে সঙ্গে। পরে চুনো বা ছোটো মাছের একখানা ঝোল। বাড়িতে ভোজ হলে অবশ্য তাদের কপাল ফেরে। আর যতীনবাবুর বাড়িতে ভোজ লেগেই আছে।

খেতে বসে আজ নলিনীকান্ত পানুর কানে কানে বলল, নতুন পাইকটার বৃত্তান্ত শুনছ! সাতখানা খুন করে এয়েছে।

পানু শুনে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়, বলিস কী?

নোনাপুকুরের বটকেষ্ট কাপালিকের কাছে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। পুলিশ গিয়ে ধরে। বটকেষ্টর বড়ো ভক্ত হল যতীনবাবু। তার কথায় ওঠে-বসে। বটকেষ্ট যতীনবাবুকে হুকুম দিল পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ছাড়িয়ে এনে পাইকের চাকরিতে বহাল করতে। যতীনবাবুও কাঁচাখেকো খুনিটাকে এনে রেখেছে। রোজ দুটো করে মুরগি, ডজন ডজন ডিম ওড়াচ্ছে আর বন্দুক নিয়ে গোঁফ মুচড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভগবান বলে কিছু নেই বুঝলে?

পানু মাথা নেড়ে বলল, সে আমি অনেক আগেই বুঝেছি।

বলাই দাঁতের ফাঁক থেকে একটা মাছের কাঁটা টেনে বের করার চেষ্টা করতে করতে বলল, তবে দীনু পাইক আসায় সত্যরামের বাজার খারাপ। কর্তাবাবু দীনুকে চোখে হারাচ্ছেন আজকাল।

একথা সকলের মনে ধরল। তারা কেউ সত্যরামের পেয়ারের লোক নয়। সত্যরামকে তারা কখনো ঘাঁটায় না এবং মুখে যথেষ্ট খাতির দেখায়। নইলে সত্যরাম যেদিন খুশি ঘাড় ধরে যে-কাউকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। দিয়েছেও কতককে। তবে তারা ছ-জন যে টিকে আছে তার কারণ, তারা কাজের লোক, প্রাণপণে খাটে।

পানু মাথা নেড়ে বলল, কথাটা বড়ো ভয়ের হল।

বলাই বলল, কেন ভয়ের কী? দিক না বন্দুকটা সত্যরামের ইয়েতে ঢুকিয়ে। আমি তো হরির লুট দেব।

পানু লেবুপাতা ডলে শেষ কয়েকটা গরাস গপাগপ মুখে চালান দেওয়ার ফাঁকে বলল, সত্যরামের কিছু হলে দীনু পাইক যদি আমাদের মাথার ওপর বসে তাহলে তো দিনেদুপুরে হাতে মাথা কাটবে।

ফটিক গতকালই সত্যরামের হাতে জুতোপেটা খেয়েছে হাট থেকে তামাক আনেনি বলে। সে বলল, আগে তো সত্যরামের ব্যবস্থা হোক, পরে দীনুকে নিয়ে ভাবা যাবে।

কেষ্ট এতক্ষণ কিছু বলেনি। একটা মস্ত লঙ্কা নুনে মেখে একটু একটু করে খেয়ে শিসোচ্ছিল। লঙ্কায় আর একখানা চাটন দিয়ে বলল, খবর তো রাখো না। দীনু পাইক এমনি আসেনি। খবর হয়েছে এ বাড়িতে ডাকাত পড়বে। এত টাকা, ডাকাত না পড়ে পারে!

পাঁচুর সঙ্গে শ্রীপতি এতক্ষণ নীচু গলায় দাক্ষী নামে একটা নতুন ঝিকে নিয়ে রসের কথা বলছিল। দাক্ষীর বয়স কাঁচা, দেখতেও ভালো। পাঁচু আর শ্রীপতিরও বয়স কম। দাক্ষী অন্দরমহলের ঝি। বাইরে বড়ো একটা আসে না। তবে দোতলার জানলা বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে বেপর্দা হাঁ করে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। পাঁচুর সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়েছে। মেয়েটার ভাইয়ের বড়ো অসুখ। টিবি। সারাক্ষণ ভাইটার কথা ভাবে। পাঁচু বলল, কিছু টাকা জমলে ভাবছি ওকে দেব।

শ্রীপতি মুখখানা উদাস করে বলল, ওটাকায় কী হবে? ক-টাকাই বা তুই পাস? ওটাকা তো সাগরে শিশির। অত মজে যাস না বাপ। সত্যরাম টের পেলে ছাল ছাড়িয়ে নেবে।

সবাই যে-যার থালা নিয়ে ঘিরে পুকুরধারে মাজতে বসল।

খেয়ে উঠে পানু একটু চিন্তিতভাবে ঘরে এল। দীনু পাইককে নিয়ে তার যেন খুব চিন্তা হচ্ছে।

যদিও কোনোদিন কথাবার্তা হয়নি এমনকী চোখাচোখিও ভালো করে নয় এবং তার নামও যদিও জানেন না তবু যতীনবাবুর প্রতি একটা দুর্বলতা আছে পানুর। শত হলেও মনিব। খুব ইচ্ছে হয় পানুর, একদিন গিয়ে যতীনবাবুকে বলে, আজ্ঞে আমি আপনার চাকর, আমার নাম পানু।

যতীনবাবু হয়তো ভারি অবাক হয়ে বলবেন, ও তাই নাকি? বা! বেশ, বেশ।

ওইটুকুই যথেষ্ট। পানু আর বেশি কিছু চায় না। যতীনবাবু কেমন লোক তা জানে না পানু। কেমন আর হবেন, ভালোই হবেন বোধ হয়। ভগবান যাঁকে এমন ঢেলে দেন, লক্ষ্মী যাঁর ঘরে এমন উথালপাতাল তিনি কি আর খারাপ লোক? তা এই যতীনবাবুর জন্য পানুর এখন একটু চিন্তা হচ্ছে। দীনু পাইকের মতো খুনে লোককে নিয়ে ঘোরাফেরা কি ঠিক হচ্ছে কর্তাবাবুর!

বটকেষ্ট কাপালিকের নাম হল গে কালিকানন্দ। তার সাধন-নামে কেউ অবশ্য তাকে ডাকে না। সবাই তার পুরোনো নামই বজায় রেখেছে। লোকে বলে, সে তার একটা বউকে কুয়োয় ফেলে মেরেছে, আর একটাকে গলায় ফাঁস দিয়ে। দু-বারই আত্মহত্যা বলে পার পেয়ে যায় বটকেষ্ট। নোনাপুকুরের শ্মশানে এখন তার সাধনপীঠ। খুব রবরবা। লোক যে সুবিধের নয় ঠিকই, কিন্তু পানু এও জানে, লোক ভালো হলে কাপালিকের চলে না। দুনিয়ার আর সব লোকের প্রতি পানুর যে মনোভাব, বটকেষ্টর প্রতিও তাই। মনোভাবটা ভয়ের। এ বাড়িতে যখন আসে তখন তার জন্য খাসি কাটা হয়, দিশি মদের বোতল আসে আর বাড়িটা কেমন ছমছম করতে থাকে। করবেই। বটকেষ্টর সঙ্গে দেড়শো ভূত সবসময়ে ঘুরে বেড়ায়। ভূতের গায়ের বোঁটকা গন্ধে বাড়ি একেবারে 'ম ম' করতে থাকে। যতীনবাবু বিশ্বাস করেন, তাঁর যে অবস্থার এত উন্নতি তা ওই বটকেষ্টর জন্য।

তা হবে। পানু অতশত জানে না। কী থেকে কী হয় তা সে কী জানে। বটকেষ্টর ভূতেদেরও সে খুব ভক্তিমান্য করে এবং ভয় খায়।

খাওয়ার পর তবু উবু হয়ে বসে কুয়োতলায় শ্যাওলা ঘষে তুলছিল পানু। শীতকাল। রোদ পশ্চিমে হেলেছে।

সেই রোদে একটা ছায়া পড়ল তার গায়ে।

পানু মুখ তুলে যা দেখল তাতে ফের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। সামনে দীনু পাইক দাঁড়িয়ে। বুকের মধ্যে কেমন একটা গুড়গুড় শব্দ উঠল। হাত-পা সব ঠাণ্ডা মেরে যেতে লাগল।

দীনু খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, অ্যাই, তুই গোবরার কানু মন্ডলের ভাই না?

পানু ভারি চমকে গেল। সে গোবরা গাঁয়ের কানু মন্ডলের ভাই বটে, কিন্তু সেকথা বেশি লোক জানে না। জানার কথাও নয়। দীনু পাইকের মতো মস্ত লোকের কানে যে কথাটা গেছে এইতেই সে অবাক। পানু ভারি বিগলিত হয়ে বলল, আজ্ঞে।

তোর নাম পানু?

যে আজ্ঞে।

পানু লক্ষ করল, দীনু পাইকের পরনে একটা ফর্সা পায়জামা, গায়ে খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি, তার ওপর জহর-কোট। আড়েদিঘে আলিসান লোকটা বোধ হয় খালি হাতে মোষের ঘাড় ভেঙে দিতে পারে। দীনু পাইক তার বাঘা গলায় গড়গড় শব্দ তুলে বলল, সেদিন গোবরায় গিয়ে কানু মন্ডলকে ভয় দেখিয়ে এসেছিস?

পানুর এক গাল মাছি। কানুকে কেন, সে তো মশা-মাছিকেও ভয় দেখানোর এলেম রাখে না। সবেগে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না। লোকটা কিছুক্ষণ খুনিয়া চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, কানু মন্ডল আমার ইয়ার। বুঝেছিস কথাটা?

যে আজ্ঞে।

ওর জমিবাড়ির ওপর তোর কোনো হক নেই। আছে?

পানু সভয়ে মাথা নেড়ে বলল, ভাগ তো চাইনি।

আলবত চেয়েছিস।

আজ্ঞে না।

লোকটা আবার কিছুক্ষণ রক্ত-জল-করা চোখে তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে বলল, তা ভালো কথা। সাতদিনের মধ্যে গোবরায় গিয়ে কাগজে সইসাবুদ টিপছাপ দিয়ে আসবি।

খুব ভয়ে ভয়ে পানু জিজ্ঞেস করল, কীসের কাগজপত্র আজ্ঞে?

তোর অত খতেনে কী দরকার? যা বলছি তাই করবি। বেশি ট্যাঁ-ফোঁ করলে বিপদ আছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চোখের পলকে দীনু পাইক হাওয়া হয়ে গেল।

পানু তার ভেজা হাতে কপালটা মুছল। দোতলার জানলা থেকে দাক্ষী নামে নতুন ঝিটা তাকে হাঁ করে দেখছে। দেখছে আরও অনেকেই। দীনু পাইক চলে যাওয়ার পরই পাঁচু, শ্রীপতি, বলাই এসে জুটল।

কী ব্যাপার গো পানুদাদা, দীনু পাইক তোমার ওপর তম্বি করে গেল কেন?

পানু কী আর বলবে, ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছু করিনি, ভাগ-টাগও চাইনি।

কীসের ভাগ? কী করোনি?

পানু মাথা নেড়ে বলল, সে অনেক কথা রে ভাই। তবে আমিও ব্যাপারটা ভালো বুঝছি না।

সবাই মিলে ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ তুমুল কথাবার্তা হল। পাঁচু বলল, ও যা বলছে তাই করো গো পানুদা। পৈতৃক প্রাণটার দাম অনেক বেশি।

পানু শুধু বলল, হুঁ।

রাত্রিবেলা পানু ভালো করে খেতে পারল না। এত তেষ্টা পাচ্ছিল যে ঘটি-ঘটি জল খেয়ে খিদের বারোটা বেজে গেল। রাত্রিবেলা ঘুমও হল না ভালো। ঘন ঘন পেচ্ছাপ চেপে যেতে লাগল। দীনু পাইক যে কানুর বন্ধু তা কে জানত। আর কানুই বা কেন দীনুকে তার পেছনে লাগাল তাও বুঝে ওঠা ভার।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবল পানু। মাথাটা গরম হয়ে গেল।

সকালবেলায় যতীনবাবু তার পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পানু সে-সময়ে পুকুরধারে চাদর কাচছে। এমন সময় সত্যরামের পেয়ারের লোক মুকুন্দ এসে বলল, ওরে তোর তলব হয়েছে।

সত্যরাম তার ঘরে নরম সাদা বিছানায় বসা। দেয়ালে হরেক ক্যালেণ্ডার। একখানা পেল্লায় লোহার আলমারি। ইস্তক টেবিল-চেয়ার। কে বলবে চাকরের ঘর! তা সে যত বড়ো চাকরই হোক।

তবে কিনা পরিষ্কার ঘরখানা যেমন হাসছে, সত্যরামের মুখে কিন্তু তেমন হাসি হাসি ভাব নেই। ভারি ব্যাজার মুখ। তাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী রে, ওই ডাকাতটার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল? ষড় করছিস নাকি?

পানু আগাপাশতলা অবাক হয়ে বলল, ষড়? কীসের ষড়? ভন্ডটা যে আমাকে শাসাচ্ছিল।

শাসাচ্ছিল? কেন রে আহাম্মক, করেছিসটা কী?

সেইটেই তো ভাবছি। ভেবে ভেবে কিছু ঠিক পাচ্ছি না।

খোলসা করে বল।

খোলসা করেই বা বলি কী। কপালটাই আজ্ঞে আমার খারাপ।

দীনু পাইক তো আর যাকে-তাকে শাসায় না। তার কাছে তুই তো পিঁপড়ে। কিছু গুরুচরণ করে থাকলে ঝেড়ে কেশে ফ্যাল।

পানু উবু হয়ে বসল। তারপর খানিক ভাবল। পারুল না সটকালে আজ তার তেলকলটার ম্যানেজার হওয়ার কথা। গন্ধবাবু সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সত্যরাম বা দীনু পাইক কেউই তাকে পেত না। স্বয়ং যতীনবাবুর সঙ্গে সে রোজ মুখোমুখি কথা বলতে পারত। কত বড়ো সম্মান।

চোখে জল আসছিল পানুর। মায়ের পেটের ভাই হয়ে কানু কিনা বিনা দোষে পেছনে গুণ্ডা লাগাল!

সত্যরাম তার দিকে চোখা নজরে চেয়ে থেকে বলল, দ্যাখ, তোদের কিন্তু আমিই একরকম বাঁচিয়ে-বর্তিয়ে রেখেছি। দুবেলা খেতে জুটছে, ট্যাঁক গরম-করা পয়সা জুটছে। এমন আরামে সাতটা গাঁয়ে ঘুরে দেখে আয় আর কেউ আছে কিনা। তোদের মতো মনিষ্যির পক্ষে কি এটা কম হল?

তা আজ্ঞে ঠিক।

তাই বলছি, ওই ডাকাতটার সঙ্গে ষড় করে আমার পিছনে লাগার মতলব যদি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আখেরে ভালো হবে না। বেশি কথা কী, কালকেই সকালে বাবুকে বলে ঘাড় ধাক্কা দেব।

পানু মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে আমি যথার্থই পিঁপড়ে। দীনু পাইক আমার সঙ্গে ষড় করার লোক নয়। তবে আমার ভাই কানুর সঙ্গে ওর ভাব আছে। বোধহয় মদ বা জুয়ার আড্ডায় ভাব হয়েছিল। তাই আমাকে শাসাচ্ছিল বাপের সম্পত্তি যা আছে সব যেন লেখাপড়া করে কানুকে ছেড়ে দিয়ে আসি।

তোরও আবার বাপের সম্পত্তি আছে নাকি? এ যে গোরুর গাড়ির হেডলাইটের বৃত্তান্ত। তা কত কী আছে?

শুনলে হাসবেন। দেড় বিঘে জমি আর দুটো খোড়োঘর।

শুনে কিন্তু সত্যরাম হাসল না। বলল, তা তুই কী বললি ডাকাতটাকে?

কী আর বলব। রাজি হতে হল।

সত্যরাম কথাটা বোধহয় মনে মনে ওজন করে দেখল। তারপর বলল, তোর বাড়ি তো গোবরায়।

আজ্ঞে মাইল তিনেক হবে উত্তরদিকে।

চিনি।

আজ্ঞে সবাই চেনে। গোবরার বেগুন খুব নামকরা।

সত্যরাম খিঁচিয়ে উঠে বলল, বেগুনটাই চিনলে। আর কিছু দেখলে না।

কী দেখব আজ্ঞে।

দেখোনি খেতখামারের ওপর দিয়ে আমিনবাবুরা শেকল টেনে মাপজোক করছে?

তা দেখেছি বটে।

আহাম্মক কোথাকার। ওখানে বিরাট কারখানা হবে। জমির দাম হু হু করে বাড়ছে। চাষের জমি সব গাপ করে বড়ো বড়ো বাড়ি হবে।

পানুর গালে হাত, আজ্ঞে তা তো জানতুম না। কানু বলেওনি।

দেড় বিঘেতে কত কাঠা হয় জানিস?

তা জানি।

এক-এক কাঠার দাম যদি ঠেলে দশ হাজারে ওঠে তবে কানুর ট্যাঁকে কত আসবে তার আন্দাজ আছে?

পানুর চোখ কপালে, উরে বাবা!

সাধে কি আর দেড় বিঘের জন্য দীনু পাইক তোকে শাসায়?

গুহ্য কথা আছে না! যতীনবাবু থলিভর্তি টাকা নিয়ে রোজ গোবরায় আনাগোনা করছেন। আজও গেলেন একটু আগে। গোবরার জমি এখন সোনা।

পানুর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। কথা সরছিল না মুখে।

সত্যরাম করুণার স্বরে বলল, যা, কাজ করগে যা। ভেবেচিন্তে একটা কিছু মাথায় এলে বলবখন তোকে।

দীনু পাইক যে মোটে সাতদিন সময় দিয়েছে। কাগজপত্র সব তৈরি। গিয়ে টিপছাপটা দিলেই হয়।

সত্যরাম উদার গলায় বলল, জাতসাপে ধরলে তো আর বাঁচন নেই রে। টিপছাপ দিতে হলে দিবি। তবে একেবারে ফাঁকিতে পড়তে যাবি কেন? দু-চার হাজার চেয়ে বসবি।

যদি মারে?

মরবি তো বটেই। তোর আবার ওয়ারিশও নেই যে তুই মরলে কেউ দাবিদার দাঁড়াবে। না:, তোর কপালটাই খারাপ দেখছি।

পানু উঠল। সত্যরামের মুখ-চোখে দুশ্চিন্তার ছাপটা তার ভালো লাগছে না।

সত্যরাম যেমনই হোক, পানুর মতো লোকের পুঁটিমাছের পরান তো ওরই হাতের তেলোয় দাপাচ্ছে। মারলে ওই মারবে, রাখলে ওই রাখবে। কিন্তু ওরও যদি বাঁচন-মরণের সমস্যা দেখা দেয় তো ঘোর বিপদের কথা।

পানু পুকুরপাড়ে গিয়ে আজ খুব গতর নেড়ে কাপড় কাচল। কাজে মন থাকলে, শরীর ব্যস্ত থাকলে দুশ্চিন্তা একটু কম হয়।

বিকেলের দিকটায় সত্যরামের একটু ছুটি হয়। ঘণ্টাটাক একটু নিজের মনে থাকতে পারে সাঁঝবেলাটায়। সত্যরাম এ সময়ে সিদ্ধি খায় আর শাকরেদদের নিয়ে ঘরে বসে কূটকচালি করে।

পানু চাদরটা জড়িয়ে বাঁশবন পার হয়ে কালীবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। আরতিটা দেখে আসবে। আর ওই সঙ্গে মায়ের কাছে একটু মানসিকও করে আসবে। সাতে নেই পাঁচ নেই মা, তবে কেন আজ আমার এমন বিপদ।

আনমনা ছিল, তাই লোকটাকে দেখতে পায়নি পানু।

দাদা!

পানুর পিলে কেঁপে গেল। দু-বার 'আঁ আঁ' করল মুখ দিয়ে। পথ আটকে কানু দাঁড়িয়ে।

দাদা, ভয় পেলে নাকি? আরে আমি কানু।

পানুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। বলল ক্কী? ক্কী? ক্কী চাস তুই?

তোমার সঙ্গে কথা আছে। আড়ালে চলো।

পানু মাথা নেড়ে বলল, ও বাবা, আড়ালে আমি যাচ্ছি না।

কানু অবাক হয়ে বলল, অত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক?

পানু দু-পা পিছিয়ে বলল, আমি চললুম। যা বলার চিঠি লিখে জানাস।

কানু বেকুবের মতো দাদার দিকে চেয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার বলো তো! আমি যে ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এলুম।

কী বিপদ?

দীনু গুণ্ডা যে আমাকে ভিটেছাড়া করতে চাইছে।

অ্যাঁ। তা সে তোর পেয়ারের লোক, তা—

কী যে বলো দাদা, তার ঠিক নেই। কে, কার পেয়ারের লোক? গোবরায় বলে কী সব কলকারখানা হবে টবে, সেই শুনে সবাই জমির দাম চড়িয়ে বসে আছে। সেই কবে জুয়া খেলতে গিয়ে পঞ্চাশটা টাকা ধার নিয়েছিলুম সেই সুবাদে দীনু শালা গিয়ে নানারকম গাইতে লাগল। তোমার মনিবেরও সাট আছে এর মধ্যে।

দীনু কী বলছে?

বলছে, হাজারটা টাকা নগদ দিচ্ছি ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যা। নইলে ঘরে আগুন দিয়ে বেগুনপোড়াকরে ছাড়ব। সব তোমাকে বলা যায় না, শালা দীনু আমার কিছু গুপ্ত কথাও জানে। আমার বড়ো খারাপ সময় পড়েছে।

পানু আতঙ্কিত হয়ে বলল, তা আমার কাছে কেন? আমি কী করব?

বলছিলুম কী এ সময়টায় তুমি যদি তোমার ভাগেরটা না ছাড়ো তাহলে দীনু শালা মুশকিলে পড়বে!

ও বাবা, সাতদিন সময় দিয়েছে। তার মধ্যে লেখাপড়া না করে দিলে ঘাড় নামিয়ে দেবে।

বলো কী, তোমাকেও ধরেছিল এর মধ্যে? তুমি যে আমার দাদা তাতো তার জানার কথা নয়।

পানু বলল, জেনেছে। তা ছাড়া আমাকে তো বলল, আমি গিয়ে নাকি তোকে ভাগের জন্য ভয় দেখিয়েছি।

কানু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। বলল, সব্বনাশ। আমার ভরসা তো ছিলে তুমি। এখন তুমিও যদি লিখে দাও তাহলে তো দীনু শালা আমার ঘাড় ধরে আদায় করে নেবে। তোমার কথা গেয়ে একটু ভজঘট পাকানোর তালে ছিলুম যে।

পানু একটু ভাবল। তারপর হালছাড়া গলায় বলল, তা আর কী করা যাবে! প্রাণটা তো আগে! শুনেছি গুণ্ডোটা মেলা খুনখারাবি করেছে।

তা করেছে।

ওরকম লোকের সঙ্গে কি লাগা ভালো?

কানু একথাটার জবাব দিল না। উবু হয়ে বসে চাদরের খুঁটে চোখ মুছল। বেশ কাহিল দেখাচ্ছিল তাকে। গরগরানিটাও আর নেই। দায় পড়লে মানুষের স্বভাব ভালো হয়ে পড়ে। কানুকেও কেমন যেন ভালোমানুষের মতো দেখাচ্ছে। কেঁদেকেটে চোখ লাল করে ফেলল কানু। তারপর মুখ তুলে ধরা গলায় বলল, মায়ের দিব্যি কেটে বলছি দাদা, যদি দীনু গুণ্ডাকে ঠেকাতে পারো তবে জমি বেচে যা পাব অর্ধেক তোমার। এখনই সাত হাজার করে কাঠার দর উঠছে। আমাদের জমির পাশ দিয়ে রাস্তা হচ্ছে বলে দর আরও বেশি।

সত্যরাম বলছিল কাঠা নাকি দশ হাজার।

আর ছ-মাস পরে তাই হবে। যদি ততদিন ধরে রাখা যায়।

পানু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

বাঁশবনের ভিতরে কুয়াশা আর অন্ধকারে একটু শব্দ উঠল। কে যেন সাবধানি পায়ে আসছে বা যাচ্ছে। বাঁশপাতায় খড়মড় শব্দ উঠছে।

কানু সপাৎ করে উঠে দাঁড়াল।

পানু বলল, কে?

কে যেন দৌড়ে পালাচ্ছে ওধারে।

কানু সভয়ে বলল, কে গো দাদা?

পানু মাথা নেড়ে বলল, বুঝতে পারছি না। আবছা মনে হল একটা মেয়েছেলে। দাঁড়া দেখছি।

আমি আর দাঁড়াব না। ফিরতে দেরি হয়ে যাবে তার ওপর দীনু শালা দেখতে পেলে বিপদ ঘটাবে। কাল-পরশু একবার আসবখন।

কানু চলে গেল।

পানু বাঁশবনের ভিতরে একটু চেয়ে রইল। মরা আলোর ঝুঁঝকো মায়ার ভিতর সে একটা খয়েরি ডুরে শাড়ির আভাস দেখেছে। মেয়েছেলেটা দৌড়ে বেশি দূর যায়নি। কথা শুনছিল আড়ি পেতে। কথা যে শেষ হয়েছে তা জানে না। ফের আসবে।

পানু সন্তর্পণে এগোল। মস্ত একটা শিমুলগাছ আছে ভিতরবাগে। আর যতদূর ধারণা, ওখানে গা-ঢাকা দিয়েছে।

পানু তাড়াহুড়ো করল না। বরং বেশ গুনগুন করে রামপ্রসাদি ভাঁজতে ভাঁজতে শুঁড়িপথ ধরে দুলকি চালে এগোল। শিমুলগাছটার ডানধার বরাবর হয়ে আচমকা গোঁত্তা মেরে ঢুকে গেল বাঁশবনে। তারপর একদম মুখোমুখি।

মেয়েটা নড়ারও সময় পেলে না। একটু হাঁফাচ্ছিল।

তুমি! অ্যাঁ! তুমি তো দাক্ষী!

বছর সতেরো-আঠেরোর মেয়েটা সভয়ে চেয়ে রইল পানুর দিকে।

এখানে কী করছিলে শুনি?

দাক্ষী হাঁফসানো গলায় বলে, কী করব? নিজের ইচ্ছেয় এসেছি নাকি?

তবে?

তোমরা সবাই যাকে ভয় পাও সেই দুনুই তো ধরে এনেছে আমাকে।

ধরে এনেছে মানে?

মানে চুলের মুঠি ধরেই একরকম টেনে বার করে এনেছে। আমার বাবার পেটে লাথি মেরেছিল। কী জানি কেমন আছে বাপটা। ভাইয়ের টিবি বলে বাবা টাকা নিয়েছিল। ধার। শোধ হয়নি।

বটে। তা এখানে কী করছিলে?

রাক্ষসটা যে আমাকে এবাড়িতে রেখেছে চারদিকে নজর রাখবার জন্য। কোথায় টাকাপয়সা গয়নাগাটি, কে কেমন, এসব খবর নিতে। আজ সকালে ডেকে পাঠিয়ে তোমার ওপর নজর রাখতে বলল।

ক্কেন ক্কেন?

তোমার কাছে কেউ আসে কিনা, কী কথা হয় সব খবর দিতে বলেছে। নইলে তো বুঝতেই পারছ।

পানু ভয়ে এবং শীতে কাঁপছিল। রীতিমতো হি-হি কাঁপুনি। কাঁপা গলাতেই বলল, বড্ড শীত করছে।

আমারও।

তা তোমাকে ধরে এনে ও কী করতে চায়?

মেয়েটা করুণ গলায় বলল, এখনও খারাপ কিছু করেনি। তবে কপালে যা আছে হবে। খারাপই হবে। হয়তো নিজে কিছুদিন কাছে রাখবে, তারপর গোহাটার গোরুর মতো বেচে দেবে। বাজারের মেয়ে হওয়া ছাড়া ভগবান আর আমার কপালে কী লিখেছেন?

ও বাবা!

শোনো। সাঁপুই গাঁ চেনো?

চিনি। কাছেই।

সেখানে গোপাল দাসের বাড়ি। আমার বাবা। কেমন আছে আমার বাপটা একটু খবর এনে দেবে? পেটে লাথিটা লেগে বড়ো কাতরাচ্ছিল।

তা দেখবখন চেষ্টা করে।

যদি এনে দাও খবরটা তাহলে আজকের কথা আমি গুণ্ডাটাকে বলব না বুঝলে?

বুঝেছি।

কানুর মতো এ মেয়েটাও কাঁদল। বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। কাঁদতে কাঁদতে ধরাগলায় বলল, আমি তো গেছিই, নিজের জন্য আর ভাবছি না। বাপটা ভাইটার কী যে হবে।

পানু মৃদু স্বরে বলল, হিম পড়ছে। ঘরে যাও। বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে লোকে নানারকম সন্দেহ করতে পারে। যাও।

যাচ্ছি।

মেয়েটা চলে গেলে বাঁশবনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পানু। হাত-পায়ের কাঁপুনি কমেছে, কিন্তু ভয়টা তার শরীরকে একেবারে কাঠ করে রেখেছে। কিছুক্ষণ পানু নড়তে পারল না। বাঁশবনের ভিতর দিয়ে কারা আসছে। টর্চ জ্বলছে মাঝে মাঝে। কথা কইছে। যতীনবাবু হবে না। যতীনবাবু তো গেছেন হাওয়াগাড়ি চেপে। তাইতেই ফিরবেন।

পানু কয়েক পা এগোল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল। যতীনবাবুই। সঙ্গে বিভীষণ দীনু পাইক এবং আরও ক-জন। জমিজমা বিষয়-আশয়ের কথাই হচ্ছে।

পানু আর এগোল না। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে এল ঘরে।

ঘটনাটা ঘটল একটু বেশি রাতে। খেতে যাবে বলে ছয় চাকর তৈরি হচ্ছে। পাঁচু গাড়ু নিয়ে মাঠে গেছে। শ্রীপতি রান্নাঘর সেরে এসে হাত-মুখ ধুচ্ছে। কেষ্ট টেমির আলোয় গোপালভাঁড় পড়ে শোনাচ্ছে সবাইকে! বেশ একটা ফুর্তির ভাব।

হঠাৎ দীনু এসে ঘরে ঢুকল। বিশাল চেহারাখানা যেন ঘর ভরে দাঁড়াল।

পানুর দিকে রক্তজল করা চোখে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, কে এসেছিল তোর কাছে?

পানু থতোমতো খেয়ে বলল, কই!

জিব টেনে বের করে দেব। কে এসেছিল?

পানুর মাথাটা টাল খেল। দাক্ষীই কি বলে দিল শেষে? কথা দিয়েছিল বলব না।

পানু মাটির দিকে চেয়ে বলল, কানু।

বটে! পরামর্শ হল ভাইয়ের সঙ্গে?

হঠাৎ পানু একটু হাসল, বলল, দু-ভাইয়ে ঠিক করলুম জমিটা আমরা হাতছাড়া করছি না।

বটে! বলে একটা বাঘা গর্জন ছাড়ল দীনু।

পানু চমকাল না। উঠে দাঁড়াল। দাক্ষী কথা রাখেনি। সেইটে তার মনে বড়ো বাজছে। খিদেটা পেট থেকে খাঁ খাঁ করে উঠে আসছে বুকে। মনে পড়ছে, পারুল তাকে বিয়ে করবে না বলে সটকে পড়েছিল কার সঙ্গে। সব মিলেমিশে আজ পানুর মাথাটা বড়ো গোলমাল।

সে একেবারে সমানে সমানে দীনুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি বড়ো বেচাল লোক হে। বড়ো পাপী। খুন করো, মেয়েমানুষকে ধরে আনো, লোকের জমিজমা কেড়ে নাও...

কথাটা শেষ হল না। দীনু একখানা থাপ্পড় তুলল। একেবারে আকাশসমান উঁচু।

পানু যতীনবাবুর বাড়ির বড়ো বড়ো মশারি আর কাপড় কাচে, খড় কুচোয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কলপাড়ের শ্যাওলা তোলে, জন্মের শোধ ভাতের পাহাড় সাঁদ করায় ভিতরে। তার হাত-পা পাকিয়ে দড়ির মতো হয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু ভারি পোক্ত শরীর। শীতে গ্রীষ্মে রোদে জলে একেবারে সই। কোদাল কুড়ুলে তার চমৎকার হাত। মাঝারি মাপের পাটের দড়ি কতবার দায়ের অভাবে টেনে ছিঁড়েছে।

দীনুর চড়টা নামবার আগেই থাবড়াটা পানু কষাল।

সে এমন থাবড়া যা আর কহতব্য নয়।

দীনু পাইক চড়টা নিরীহভাবে নামিয়ে নিজের গালে হাত বোলাতে লাগল অবাক হয়ে। মুখে কথা নেই, এত অবাক।

পানু সামনে দাঁড়িয়েই রইল। বলল, আমরা বাবুর পেয়ারের চাকর নই, বুঝলে? খেটে খাই। আমাদের প্রাণের ভয় থাকলে চলে না।

দীনু দাঁতে দাঁত ঘষটাল। তারপর পটাং করে গায়ের গরম চাদরখানা খুলে ফেলে দিয়ে দুটো মুগুরের মতো হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল পানুকে।

তারপর কী থেকে যে কী হল তা পানু বলতে পারবে না। কিন্তু লড়াটা বেশিক্ষণ চলেনি। একসময়ে সে দেখল, দেখে খুবই অবাক হল যে, সে অর্থাৎ পানু, দীনু পাইককে উপুড় করে ফেলে তার চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা চৌকাঠে ঠুকছে আর বলছে, মর, মর, মরে যা।

শ্রীপতি পাঁচুরা এসে না ছাড়ালে দীনুকে মরতেই হত।

তবে মরার চেয়ে খুব কম হল না। দীনুকে গো-গাড়িতে তিন মাইল দূরের হাসপাতালে পাঠাতে হল রাত্রেই।

চাকরি যাবে। জেলও খাটতে হবে। সবই জানে পানু। ঘরে বসে সে বুটের শব্দের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার চারদিকে পাঁচজন বাইরের চাকর। মুখ গম্ভীর, কথা নেই।

ঠিক এই সময়ে সত্যরামকে সঙ্গে নিয়ে যতীনবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।

তটস্থ হয়ে সকলে উঠে দাঁড়াল।

যতীনবাবুর মুখখানা গম্ভীর। সকলের দিকে একে একে চেয়ে দেখে সত্যরামকে জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কোনজন?

আজ্ঞে এই যে। বলে সত্যরাম তাড়াতাড়ি পানুকে দেখিয়ে দিল।

যতীনবাবু কাশ্মীরি শালের ভিতর থেকে তাঁর ডান হাতখানা বের করলেন। ঘরে হ্যারিকেনের আলো, তা সে আলোতেও হিরের আংটি ঝিকিয়ে উঠল। আর কী ফর্সা হাত।

সেই হাতে নিজের থুতনিটা খামোখা একটু চুলকোলেন যতীনবাবু। তারপর বললেন, ও। তারপর চারদিকটায় ঘুম-ঘুম চোখে একটু তাকিয়ে নিয়ে সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, এ ঘরটায় একটা বিশ্রী গন্ধ, তাই না?

সত্যরাম বিনয়ের গলায় বলল, আজ্ঞে। ছোটোলোকদের ঘর তো—

যতীনবাবু তাঁর হিরের ঝলকানি তুলে এবার গলা চুলকোলেন। তারপর বললেন, আজ বড়ো ঠাণ্ডা, তাই না সত্যরাম?

আজ্ঞে, বেজায়।

যতীনবাবু যেন কথা খুঁজে পাচ্ছেন না এমনভাবে চারদিকে চাইতে লাগলেন। ঘরখানাই যেন দেখছেন। সামনে ছ-জন বশংবদ চাকর বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে।

যতীনবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, সত্যরাম, ওর নাম কী?

আজ্ঞে পানু। এমনিতে খারাপ নয়। কাজ ভালোই করে। বিশ্বাসী।

কতদিন আমার কাজ করছে?

আজ্ঞে তা বছর পাঁচেক হবে বোধ হয়।

যতীনবাবু একটু কাশলেন। এইসব হীন চাকরদের সঙ্গে তিনি কখনো কথা বলেননি।

কীভাবে বলবেন তা বোধ হয় ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাই অসহায়ের মতো সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, ওর কি আমাকে কিছু বলবার আছে সত্যরাম? ও কথা বলছে না কেন?

সত্যরাম শশব্যস্তে বলল, বলবে আবার কী আজ্ঞে? কথাটথা তো বিশেষ বলতে শেখেনি। ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় খায়। ওরে ও পানু, বাবুকে কিছু বলবি?

পানু মাথা নাড়ল। তার কিছু বলার নেই।

ও কত মাইনে পায় সত্যরাম?

আজ্ঞে, আশি টাকা। এ বাজারে কম নয়। খায়ও মেলা। হরেদরে পাঁচ সাতশোই পড়ে যায় আজ্ঞে।

যতীনবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরের চালের দিকে চেয়ে বললেন, পুলিশ অবশ্য আসবে। ও পুলিশকে কী বলবে সত্যরাম?

সত্যরাম শশব্যস্তে পানুর দিকে চেয়ে বলল, ওরে ও ডাকাত, বাবুর কথাটা কানে গেছে নাকি?

পানু মাথা নাড়ল। গেছে।

একটা কিছু বলবি তো।

পানু মেঝের দিকে চেয়ে রইল। কথা বলল না।

যতীনবাবু একটা হাই তোলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বাতাসটা কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি কানের ফুটোয় আঙুল দিয়ে একটু নাড়া দিলেন। তারপর পানুর দিকে চেয়ে বললেন, আমার বড়ো বিপদ হে।

পানুর সঙ্গে মনিবের এই প্রথম চোখাচোখি। পানুর অবশ্য ভয়ডর কেটে গেছে। ভক্তিমান্যর ভাবটাও আর নেই। তবে যতীনবাবুর ভয়টা কীসের তা সে ভালো বুঝতে পারল না।

যতীনবাবু তাঁর নাকের ডগাটা চেপে ধরলেন একটু। তারপর বললেন, পুলিশ অনেক কথা জানতে চাইবে বাপু। দীনু যে আমার চাকর ছিল সেকথাটা ওদের বলা ঠিক হবে না। ওর নামে হুলিয়া আছে। তা, ইয়ে আমি বলছিলুম কি তোমাকে আমি পাইক করে নিচ্ছি। তিনশো টাকা—কী বলিস রে সত্যরাম, তিনশো কি কম হচ্ছে?

আজ্ঞে না।

আর অন্য সবাইকেও ত্রিশ টাকা করে বাড়িয়ে দিস।

যে আজ্ঞে।

যতীনবাবু পানুর দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে আমি দেখব। তুমিও একটু আমাকে দেখো। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে বোলো দীনুকে এ বাড়িতে কখনো দেখোনি। ও ডাকাতি করতে ঢুকেছিল, তুমি রুখেছ। মনে থাকবে কথাটা?

পানু জবাব দিল না। চেয়ে রইল।

যতীনবাবু আঙুলের হিরের ঝলকানি তুলে কপাল থেকে একটা মশা তাড়ালেন। কাহিল গলায় বললেন, বটকেষ্ট বলেছিল, দীনুর হাতে কবচ আছে, যমেও নাকি ওর সঙ্গে এঁটে ওঠে না। তা দেখছি তুমি যমের ওপর দিয়ে যাও। আমিও একটু শক্তপোক্ত লোক খুঁজছি। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। টাকাপয়সা নিয়ে চলাফেরার বড়ো বিপদ আজকাল।

জীবনে প্রথম মনিবের সঙ্গে কথা বলল পানু। কিন্তু যেমনটি বলার কথা তেমনটি তার মুখ দিয়ে বেরোল না। পেট থেকে যেন আপনা-আপনিই বেরিয়ে এল, আজ্ঞে, বাবুমশাই, চাকর হয়ে আর থাকা চলে না।

যতীনবাবু ভারি অবাক! কেন?

আজ্ঞে, চাকর হয়ে থাকলে নিজেকে ঠিকমতো চেনা যায় না কিনা।

যতীনবাবু একটু অপ্রস্তুত। হিরেসুদ্ধ হাতটা শালে চাপা দিয়ে বললেন, তোমার বোধ হয় খুব অযত্ন হয়েছে এ বাড়িতে?

আজ্ঞে তাতে ভালোই হয়েছে। ভগবান ভালোই করেন। তবে আমার আর চাকর হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমি বাড়ি যাব।

যতীনবাবুর ফর্সা মুখটা একটু লাল হল। সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, ওকে পাঁচশো করেই দিস রে সত্যরাম। আর চাকরের মতো নয়, বাড়ির ছেলের মতোই থাকবে।

যে আজ্ঞে।

পানু একটু হাসল, তারপর চাকরের পক্ষে বেমানান গলায় বলল, আজ্ঞে না বাবুমশাই।

আপনার অনেক নুন খেয়েছি। পুলিশকে যা বলার বলবখন। ও নিয়ে ভাববেন না। আমার কিছু টাকা জমেছে। দেশে গিয়ে ঘর তুলব। দু-ভাইয়ে থাকব।

যতীনবাবুর হিরে আবার চমকাল। উনি হাঁটু চুলকোলেন।

পানু বলল, টাকাপয়সা না বাবুমশাই, তবে একটা জিনিস চাই। দাক্ষী যদি রাজি থাকে তবে ওকে নিয়ে যাব। বে করব।

যতীনবাবু অবাক হয়ে সত্যরামের দিকে তাকালেন, দাক্ষী কে?

নতুন একটা ঝি আজ্ঞে। ভারি কাঁদুনে। সারাদিন কাঁদে।

যতীনবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, একে বিয়ে করতে রাজি হবে?
খুব হবে আজ্ঞে। ওর বাপ রাজি হবে।

ভোরবেলা কুয়াশায় মাখা খেতের ভিতর দিয়ে আগুপিছু দুটি প্রাণী এগিয়ে চলেছে। দুজনেরই বগলে পুঁটুলি।
মাঝে মাঝে ফিরে চাইছিল পানু। ছুঁড়িটা পিছিয়ে পড়ছে বারবার।
দাক্ষী চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল লজ্জায়। মরণ। গুণ্ডাটা তাকাচ্ছে দেখো, যেন গিলে খাবে।
দুজনেরই আজ মনে হচ্ছে, আকাশটা কত বড়ো। পৃথিবীটা কী বিশাল। আর বেঁচে থাকাটা কত ভালো!

সংলাপ

পেটে গ্যাস হয়, বুঝলেন! খুব গ্যাস হয়।

সেটা খুব টের পাচ্ছি। গত পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শ দেড়েক ঢেকুর তুললেন।

দেড়শো! না মশাই, দুশোর বেশি। কী থেকে যে গ্যাস শালা জন্মায় সেটাই ধরতে পারছি না। সেই দুপুরে পাবদা মাছের ঝোল দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েছি সেটাও গিয়ে পেটের মধ্যে গ্যাস সিলিণ্ডার হয়ে গেড়ে বসে আছে।

আজ পাবদা কিনেছিলেন বুঝি? ভালো পাবদার কাছে কিছু লাগে না।

যা বলেছেন। আমাদের বাজারে সুকুমার বলে যে মাছওয়ালাটি আছে সে-ই একটু ভালো জিনিস রাখে। আর সবাই তো কাটা পোনা চিতিয়ে বসে আছে। নয়তো আড়-বোয়াল-তেলাপিয়া।

কত করে নিল?

সেটা আর জিজ্ঞেস করবেন না। দামের কথা মুখে আনাই পাপ। অবিশ্বাস্য মশাই, অবিশ্বাস্য। তবে বাবার বয়স হয়েছে। ক-দিন ধরেই জিজ্ঞেস করছিলেন, হ্যাঁ রে, বাজারে পাবদা ওঠে না? তাই আনা।

আপনার বাবা তো পুলিশে ছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ, অ্যাডিশনাল ডি এস পি।

বড়ো পোস্ট।

হ্যাঁ, তা বড়োই।

বাড়িটা তো আপনার বাবারই করা, তাই না? দিব্যি বাড়ি।

হ্যাঁ, তা মন্দ নয়।

এ বাজারে কলকাতায় ওবাড়ি হেসেখেলে বিশ-পঁচিশ লাখ দাঁড়াবে।

হ্যাঁ, পঁচিশ লাখ অফার পেয়েছি।

অফার মানে? বাড়িটা বেচবেন নাকি?

আরে না মশাই, বাড়ি বেচে যাব কোথায়? তবে অনেকে আছে-না, ভালো বাড়ি দেখলেই একটা দর হেঁকে বসে, সেরকম-ই ব্যাপার।

তবু ভালো। আমি ভাবলাম বেচার তোড়জোড় চলছে বুঝি। আজকাল প্রোমোটারের যা দৌরাত্ম্য!

সে তো বটেই। তবে ভাবছি বাবা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন তো আর বাড়ি প্রোমোটারকে দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু বাবা মারা গেলেই সেই সাবেক সমস্যা। তিন ভাইয়ে ভাগাভাগি। আর বাড়িটাও এমন প্ল্যানে তৈরি যে, ভাগজোখ হয় না। তখন প্রোমোটারকে না দিয়ে বোধ হয় উপায় থাকবে না।

সে তখন ভাববেন। আপনার এক ভাই পলিটিক্স করত-না?

আমার বড়দা। ইলেকশনেও দাঁড়িয়েছিল।

আর মেজো-জন?

ছোড়দা তো? তিনি ইনকাম ট্যাক্সের উকিল।

মেলা পয়সা, না?

দেদার পয়সা। সব মাড়োয়ারি ক্লায়েন্ট।

সব একসঙ্গেই আছেন তো?

পাগল নাকি? বড়দা গড়িয়ায় বাড়ি হাঁকিয়েছে সেই কবে। মেজদা ফ্ল্যাট কিনেছে ভবানীপুরে। আমিই পৈতৃক বাড়িতে পড়ে আছি।

আপনি তো ব্যাচেলার, আলাদা বাড়িতে থাকার দরকারটাই বা কী?

দরকার নেই ঠিক-ই। কিন্তু দায়দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে কিনা। এই ধরুন, দাদারা সটকে পড়ল, কেউ বাপ-মায়ের দায়িত্ব নিল না। কিন্তু আমি ব্যাচেলার বলেই সটকাতে পারলুম না।

বয়েস কত হল?

প্রায় চল্লিশ।

এমন কিছু বয়স নয় কিন্তু।

বলেন কী? আমার তো সবসময়ে মনে হয় বুড়ো হয়ে গেছি।

বিয়েটা হল না কেন?

কপালে নেই বলে। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই অগামার্কা, ছাত্র ভালো ছিলুম না। চাকরিও ভালো জোটেনি।

একটা সিন্ধি কোম্পানিতে আছেন-না আপনি?

আছি বটে, তবে না থাকার মতোই। অপমানজনক বেতন, হাড়ভাঙা খাটনি। কোনোরকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায় আর কী!

তাহলে সংসারটা কি বাবার টাকায় চলে?

চললে তো হতই। কিন্তু ওটা আমিই চালিয়ে নিচ্ছি। বেতনের টাকা সবটাই খরচ হয়ে যায়। তা যাক। আমার আছেই বা কে, খাবেই বা কে?

দাদারা কিছু দেয় না?

না:। আমিও চাই না, তারাও দেয় না।

আপনি তো তাহলে স্কেপগোট, বলির পাঁঠা।

তা বলতে পারেন। তবে অত হিসেব-টিসেব করে কীই বা হবে? চলে তো যাচ্ছে। অসুখ-বিসুখ বা মোটা খরচের পাল্লায় পড়লে অবশ্য বিপদ ঘটবে।

বাবা কিছু দিতে পারেন তো! আফটার অল পুলিশের চাকরি করেছেন, হাতে ভালোই থাকার কথা।

আছেও। কিন্তু দেন না। তাঁর সাফ কথা, এতদিন তোমাদের প্রতিপালন করেছি, এখন তোমাদের কর্তব্য মা-বাবার প্রতিপালন করা। এই নিয়েই দাদাদের সঙ্গে খিটিমিটি।

তারা পালিয়ে বাঁচলেন তো!

পালানোর-ই কথা। আজকাল তো পালানোই রেওয়াজ।

আপনিই পারলেন না তাহলে?

পালানোর কী আছে? ওরা বউ-বাচ্চার ভবিষ্যৎ ভেবে পালিয়েছে, আমার তো সে-বালাই নেই।

বিয়েটা করলেন না কেন মশাই? লাভ অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার ছিল নাকি?

সত্যি কথা শুনতে চান?

আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

লাভ অ্যাফেয়ার বললে বাড়াবাড়ি হবে। একটা মেয়ের প্রতি একটু সফটনেস ছিল। কিন্তু কথাটা তাকে মুখ ফুটে জানাতে পারিনি।

ও, তাহলে আর লাভ অ্যাফেয়ার কী হল?

দুঃখের কথা হল, পরে আমার এক খুড়তুতো বোনের কাছে জানতে পারি যে, সেই মেয়েটারও নাকি আমার প্রতি সফটনেস ছিল। সেও কখনো বলতে পারেনি।

এঃ হে:, এ যে, খুব-ই দুঃখের ব্যাপার। মেয়েটার কি বিয়ে হয়ে গেছে?

তা হবে-না? সে এখন ছেলেপুলের মা, ঘোর সংসারী।

তার তো হিল্লে হয়ে গেল, আপনার তো হল না।

হিল্লে আর কী? জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তো? সে কেটে যাবে।

মা বিয়ে দিতে চান না?

আগে চাইতেন। তবে দুই বউমার কাছ থেকে যা ব্যবহার পেয়েছেন তাতে বোধ হয় আগ্রহ কমে গেছে। আর আমারও তো বয়স হল।

বয়সের চেয়েও বড়োকথা হল, আপনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা ভালো কথা নয়। ঠিক কত বয়স হল বলুন তো?

আটত্রিশ পূর্ণ হয়ে উনচল্লিশ চলছে।

সাহেবরা তো এই বয়সেই বিয়ে করে। চল্লিশে তাদের জীবন শুরু।

সাহেবরা সব ব্যাপারেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে, তাদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়?

আহা, তারাও তো রক্তমাংসের মানুষ। তাদেরও জরা-ব্যাধি আছে।

তা আছে। তবু তুলনা হয় না। জীবনকে ওরা ভোগ করতে জানে। আর আমরা জীবনটা কাটিয়ে দিই মাত্র।

বেড়াতে-টেড়াতে যান-না?

না, বেড়ানোর যা-খরচ। শখ-আহ্লাদ বলতে কিছুই নেই। আগে ময়দানে ফুটবল খেলা দেখতে যেতুম। এখন আর ইচ্ছে হয় না। সময় পেলে একটু-আধটু টি.ভি. দেখি। ব্যস। পাড়ার একটা ক্লাবে একটু যাতায়াত আছে। সামান্য সোশ্যাল ওয়ার্ক করি।

সোশ্যাল ওয়ার্ক করা তো খুব ভালো।

মন দিয়ে করলে তো ভালোই। আমি করি সময় কাটানোর জন্য।

কীরকম সোশ্যাল ওয়ার্ক? বন্যাত্রাণ, খরাত্রাণ ওসব নাকি?

সেসবও আছে। তা ছাড়া সাক্ষরতা অভিযান, রক্তদান, অ্যান্টিসোশ্যালদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা —এইরকম আর কী।

ভালো ভালো। তবে অ্যান্টিসোশ্যালদের সঙ্গে লাগাটা আবার বিপজ্জনক। এটা তো ওদেরই যুগ কিনা। পুলিশ, প্রশাসন সবই ওদের হাতে।

যা বলেছেন। ভালো করে না বুঝেসুঝে আমিও বড্ড বিপদে পড়ে গেছি।

তাই নাকি? কী ব্যাপার?

টাপু বলে একটা ছেলে আছে আমাদের পাড়ায়। ভালো ছেলে। সে একজন অ্যান্টিসোশ্যালের পাল্লায় পড়ে বখে যাচ্ছিল। তার বাবা এসে ক্লাবে কেঁদে পড়ে। আমরাও ভালো করে না ভেবেচিন্তে অ্যাকশনে নেমে পড়ি। কিন্তু তার ফল দাঁড়ায় মারাত্মক। সেই অ্যান্টিসোশ্যালটা—তার নাম টিপু—দলবল নিয়ে এসে ক্লাবে বোমাবাজি করে গেল এই তো, মাত্র দিন পনেরো আগে এক সন্ধেবেলা।

সর্বনাশ! কেউ মার্ডার হয়নি তো?

না। তবে দুজনের সপ্লিন্টার ইনজুরি হয়েছে।

বেঁচে গেছেন তাহলে।

না মশাই, বাঁচা অত সোজা নয়। শাসিয়ে গেছে সবাইকে দেখে নেবে।

ও বাবা, তাহলে তো আপনি বিপদের মধ্যেই আছেন।

তা আছি।

পুলিশ অ্যাকশন নেয়নি?

রুটিন মাফিক নিয়েছে। ওদের কেউ ভয় পায় না আজকাল।

সেই টাপু ছেলেটার কী অবস্থা?

পালিয়েছে।

তাকে ফেরাতে পারবেন মনে হয়?

বলতে পারি না। সবাইকে তো ফেরানো যায় না। সৎপথে থাকার আকর্ষণ আজকাল কমে যাচ্ছে। ইয়াং জেনারেশন আজকাল একটু গা গরম করতে চায় বোধহয়।

এ-ব্যাপারে আপনাদের নেক্সট লাইন অফ অ্যাকশন কী?

সবাই ভয় পেয়ে গেছে। অ্যাকশনে কেউ যেতে চাইছে না।

তাহলে আপনারা রণে ভঙ্গ দিলেন বলুন?

একরকম তাই। বোমা-পিস্তলের সঙ্গে লড়াই করব কী করে?

তাই তো বলছিলুম মশাই, অ্যান্টিসোশ্যালদের সঙ্গে লাগা বিপজ্জনক।

খুবই বিপজ্জনক। সেই ঘটনার পরে থেকে টেনশনে আমার গ্যাস আর অম্বল বেড়ে গেছে।

শুনেছি টেনশনে গ্যাস-অম্বল বাড়ে।

আমারও বেড়েছে। রাতে শুয়ে দুশো-আড়াইশো ঢেকুর ওঠে।

আর ওসবের মধ্যে যাবেন না।

ইচ্ছে করে কি যাই? একটা ঘটনা থেকে নানা ঘটনার ফ্যাঁকড়া বেরোয় যে!

কীরকম?

টাপুর মা এসে আমাকে ধরে পড়েছিল সেদিন। বলল, দেখ বাবা, ওই টিপু আর ওর দলবল আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে। তুই একটা কিছু কর। মহিলাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে, আমার মতো ভীতুকে দিয়ে কিছু হওয়ার নয়। অগত্যা বললাম, আচ্ছা চেষ্টা করব।

চেষ্টা করেননি তো!

ঠিক চেষ্টা করেছি বলা যায় না। তবে টিপুর হদিশ করতে শুরু করি।

ও বাবা! আপনি তো সাংঘাতিক লোক!

কী করব বলুন? ভদ্রমহিলা এমন কান্নাকাটি করলেন যে, কিছু না করেও থাকা যায় না।

হদিশ পেলেন নাকি?

পেলুম। পাশেই পালপাড়ার একটা ছেলে খবর দিল, ওদের বাড়ির কাছে একটা রং ঝালাইয়ের দোকানের পেছনে থাকে। হাইড আউট।

মশাই, শুনে যে আমারই বুক ধড়ফড় করছে।

আমারও করছিল।

যাননি তো?

না যাওয়ারই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঘাড়ে ভূত চাপলে যা হয়।

গেলেন?

একটু রাতের দিকে গেলুম।

বলেন কী?

সেই তো বলছি। গ্রহের ফের। তবে কপাল ভালো যে, টিপুকে বেশি খুঁজতে হয়নি। রাত এগারোটা হবে তখন, টিপু মাল খেয়ে ফেরার পথে পান-সিগারেটের দোকানে সিগারেট ধরাচ্ছিল।

কী করলেন?

গিয়ে বললুম, কাজটা ঠিক করছ না হে টিপু। এসব করা ভালো নয়।

এভাবে বললে কি কাজ হয়?

হল না তো! টিপু একটা খিস্তি করে কোমর থেকে একটা ছোরা বের করল। দোধার ছোরা। প্রকান্ড ফলাটা একেবারে ঝকঝক করছিল।

সর্বনাশ! পালালেন তো?

না। পালিয়ে যাব কোথায়? যাওয়ার কি জায়গা আছে?

তাহলে কী করলেন?

সে আর বলবেন না। আপনি কি দৈব মানেন?

খুব মানি মশাই, খুব মানি। এই যুগে বেঁচে থাকার-ই যা সমস্যা, 'দৈব' না মেনে উপায় আছে?

ঠিক তাই, দৈব ছাড়া আর কী বলি বলুন? নিতান্তই টাপুর মায়ের চোখের জল সইতে না পেরে আহাম্মকের মতো টিপুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সৎপথে ফেরাতে গিয়েছিলুম। কাজটা যে কতবড়ো ভুল হয়েছিল, তা আগে বুঝতে পারিনি।

অতি খাঁটি কথা মশাই। কাজটা করা আপনার মোটেই ঠিক হয়নি। তারপর হলটা কী সেইটে বলুন।

আজ্ঞে কী যে হল তা কি আমি জানি। ছোরা দেখে আর টিপুর রক্ত-জলকরা চাউনিতে আমার তখন শরীরে স্তম্ভন। এত ভয় খেয়ে গেছি যে, হাত-পা যেন কাঠ। ভগবানকে জীবনে ডাকিনি কখনো। আসলে ডাকার কথা মনেই থাকে না। সেই অবস্থাতেও মনে পড়ল না। টিপু ব্যাধের মতোই এগিয়ে এল। কিন্তু তারপর কী যে হয়ে গেল, কিছু মাথায় ঢুকল না।

কী হল?

সেইটেই তো বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বর্ণনা দেওয়ার ভাষাটাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। টিপু এগিয়ে এসে ছোরা বাগিয়ে ধরে পেটে বা বুকে ঢুকিয়ে দেয় আর কী! ওদের তো মায়া-দয়া নেই। কিন্তু কী যে হল, হঠাৎ টিপু যেন পায়ে পা জড়িয়ে, যেন নিজেকেই নিজে ল্যাং মেরে একটা পুঁটুলির মতো দলা পাকিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। একেবারে আমার পায়ের গোড়ায়।

বলেন কী?

দৈব ছাড়া আর কী বলি বলুন। অবিশ্বাসেরও কিছু নেই। নিজের চোখে দেখা।

তারপর?

পড়ে গিয়ে টিপু কেমন যেন ছটফট করতে লাগল, গলায় গোঙানির আওয়াজ। মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে আমি যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম। নড়তেও পারছি না। পানের দোকানিটা নেমে এসে টিপুর মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে বলছিল, এর শরীরে কি কিছু আছে? দিনরাত চুল্লু টানছে, পাতা খাচ্ছে। শালা এবার মরবে।

জোর বেঁচে গেছেন তাহলে! দৈব ছাড়া এ আর কিছু নয়।

ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা ব্যাপারটা চাউর হল অন্যরকম।

সেটা আবার কী?

আর বলবেন না মশাই। লোকের মুখে মুখে রটে গেল আমিই নাকি টিপুকে মেরে পাট করে দিয়েছি। বুঝুন কান্ড। আমার গায়ে না আছে জোর, না আছে মনে সেই সাহস। কিন্তু লোকে তা বুঝলে তো! সে এমন কান্ড যে, টিপুর দলের একটা ছেলেও সাহস করে আমার কাছে এগিয়ে এল না। আমিও আর দাঁড়াইনি। তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই আমাকে নিয়ে পাড়ায় হইচই। এমনকী

থানার দারোগা পর্যন্ত এসে আমাকে হিরো বানিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। বললেন, আপনার জন্যই টিপুকে ধরা গেল।

তারপর কী হল মশাই?

টাপু বাড়ি ফিরে গেল। আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল, আপনার জন্যই টিপুর খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়েছি, নইলে ওরা আমাকে শেষ করে দিত।

তাহলে আপনি এখন হিরো?

কাকতালীয় ঘটনা আর কাকে বলে! যেভাবে আমাকে হিরো বানানো শুরু হয়েছিল তাতে আমার ভয় হল, এবার টিপুর দলের ছেলেরা না আমার ওপর চড়াও হয়। মানুষের প্রাণের স্থায়িত্ব কী বলুন? একটা গুলি বা ছুরি-ছোরা, নিদেন একখানা আধলা ইটেও কাজ হয়ে যায়।

তা তো ঠিকই। তা সেরকম কিছু হয়েছিল নাকি?

না মশাই। বরং টিপুর এক শাগরেদ এসে দেখা করে মাপটাপ চেয়ে গেল। বলল, টিপুটা ইদানীং বড়ো বাড়াবাড়ি করছিল। আমরা তো তাকত দেখাতে লাইনে নামিনি দাদা, এসেছি রুজি-রোজগার করতে। আর টিপু হতে চায় রবিনহুড।

বা:, তাহলে তো আপনার আর কোনো সমস্যাই রইল না।

সমস্যা! সমস্যার কী শেষ আছে? একটা যায় তো আর একটা আসে।

সেটা আবার কীরকম?

আছে মশাই, আছে। হিরো হওয়ার হ্যাপাও বড়ো কম নয়। মিনি মাগনা হিরো বনে গেছি বটে, কিন্তু ফ্যাঁকড়াও আছে।

ঝেড়ে কাশুন-না মশাই।

এই ধরুন, আগে কেউ পাড়ায় আমার দিকে ফিরেও চাইত না, আজকাল সবাই তাকায়, পথে বেরোলে জানলায়, বারান্দায় উঁকিঝুঁকি শুরু হয়, নাগরিক কমিটি থেকে আমাকে চেয়ারম্যান করার কথা উঠেছে। এইসব নানা উদ্ভট কান্ড। তারপরও গোদের ওপর বিষফোঁড়া আছে।

সেটা কী?

টাপুর মা এসে আমার মাকে ধরেছে, টাপুর দিদি—এই ধরুন বাইশ-তেইশ বছর বয়েস হবে—তাকে ছোটোবউমা করে নিতে। বর্ণ-গোত্র সব নাকি ঠিকঠাক আছে।

বলেন কী মশাই? একথা আগে বলতে হয়। এ তো দারুণ খবর!

না মশাই, না। মোটেই ভালো খবর নয়। বয়সের তফাতটা লক্ষ করেছেন? তার ওপর আমি তো একরকম বুড়োই। একা-বোকা, থেকে-থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন কি আর ঝুটঝামেলা ভালো লাগে?

রিফিউজ করলেন নাকি?

হ্যাঁ, খুব কঠোরভাবেই রিফিউজ করলাম। টাপুর মাকে বললাম, আপনারা মোহের বশে এ-প্রস্তাব করেছেন। ভালো করে ভেবে দেখবেন কাজটা ঠিক হবে না।

আপনার চরিত্রটি বেশ দৃঢ়।

না মশাই, একেবারেই না। বরং আমি অতিশয় দুর্বলচিত্ত। ভেবে দেখলাম দুর্বলচিত্ত লোকদের দাম্পত্যজীবনে না যাওয়াই ভালো। তা ছাড়া, ওরা আমড়াকে আম ভেবে বসে আছে কিনা। আমি তো আসলে হিরো নই, জিরো।

তাহলে ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেল নাকি?

মিটলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত।

মেটেনি তাহলে?

না, বললাম না, সব ঘটনা থেকেই ফ্যাঁকড়া বেরোয়।

তা এখানে আবার ফ্যাঁকড়া কী বেরোল?

টাপুর দিদি নন্দনাই হল ফ্যাঁকড়া। একদিন সে সোজা আমার ঘরে এসে হাজির। দুই চোখ জলে ভরা, ঠোঁট কাঁপছে।

বাস রে, এ যে, উত্তম-সুচিত্রা।

বাইরে থেকে এরকম মনে হয়। আমার যে, তখন কী অবস্থা তা বোঝাতে পারব না।

মেয়েটা দেখতে কেমন মশাই?

ভালোই। রং তেমন ফর্সা নয় কিন্তু মুখে-চোখে শ্রী আছে। পাড়ায় ভালো মেয়ে বলে নামও আছে।

তাহলে পিছোচ্ছেন কেন?

ওই যে বললাম, বুড়ো হয়ে গেছি। এখন কি কেঁচেগণ্ডূষ করা যায়?

তা মেয়েটা বলল কী?

তেমন যে কিছু বলল, তা নয়। গলা কাঁপছিল। শুধু বলল, 'আমি কি খারাপ? তবে কেন আপনি'—ব্যস ওই পর্যন্তই। বাক্যটা শেষ অবধি করতে পারেনি।

তা আপনি কী করলেন?

মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা তো বিশেষ বলিনি কখনো। ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।

কিছুই বললেন না?

তেমন কিছু বলতে পেরেছি বলে মনে হয় না। একটু আমতা আমতা করে বললুম, 'তুমি তো ভালো মেয়ে। তবে কেন আমাকে'—ব্যস, বাক্যটা আমিও শেষ করতে পারিনি।

ওঃ, আপনার পেটে পেটে এত? এরকম মাখো-মাখো ব্যাপারখানা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন? আপনি তো খুনি লোক মশাই।

কী যে বলেন। মাখো-মাখো ব্যাপারটা মোটেই নয়। নন্দনা এসে ও-কথা বলে যাওয়ার পর থেকে আমার ঘুম গেছে, খাওয়া গেছে, দুশ্চিন্তায় আধমরা অবস্থা। আর পেটে ফাঁপা ভাব। কী-যে অসোয়াস্তি।

গ্যাসের মেলা ওষুধ আছে মশাই। ওর জন্য চিন্তা নেই। আগে বলুন, সিদ্ধান্তটা কী নিলেন?

ওই যে বললুম, গ্যাসে এমন কাহিল হয়ে পড়েছি যে, আর ওসব নিয়ে এগোতে ভরসা হচ্ছে না। তবে মা ইদানীং দেখছি আদাজল খেয়ে লেগেছে। বড্ড বিপদ যাচ্ছে মশাই।

কীসের বিপদ?

একটা মিথ্যে জিনিসকে সবাই মিলে সত্যি করে তুলছে, এটা ভালো হচ্ছে না।

মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে কেন?

মিথ্যে নয়? গুণ্ডাটা নিজেই কেতরে পড়ল আর হিরো বনলাম আমি!

আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ঘটনাটা তত মিথ্যে নয়। আপনি চেপে যাচ্ছেন।

বলেন কী? আমার কি গুণ্ডার সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা আছে?

কিছু বলা যায় না। কখনো-কখনো কাপুরুষও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আর আপনি সত্যিকারের কাপুরুষ হলে, মাঝরাত্তিরে গিয়ে টিপুর ডেরায় হানা দিতেন না।

ওই যে বললুম, কাজটা আহাম্মকি হয়েছিল।

আপনাকে তত আহাম্মক বলে মনে হচ্ছে না। ঘটনাটা বলেই ফেলুন-না। আমি তো আর পুলিশের লোক নই।

কী যে বলেন।

বলুন-না মশাই, লজ্জা পাচ্ছেন কেন?

আসলে কী জানেন, ঘটনার সময়ে আমি এমন বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিলাম যে, সত্যিকারের কী ঘটেছিল তা আমি নিজেও জানি না।

এই তো এবার মাল বেরোচ্ছে। টিপুর মতো গুণ্ডা আপনাকে ছোরা মারতে এসে হঠাৎ কনভালশন হয়ে ঢলে পড়বে এমন ঘটনা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ওইটেই মুশকিল। আমার যেটুকু মনে পড়ছে তাই বলেছি। বাকিটা আমার স্মৃতিতে নেই।

তাহলে মশাই, বলতেই হবে, আপনি টিপুর চেয়েও অনেক বেশি ডেনজারাস লোক।

ছি: ছি:, কী যে বলেন। জীবনে আমি মারপিট করিনি।

প্রয়োজন পড়েনি বলে করেননি। কিন্তু এলিমেন্টটা আপনার ভেতরে ছিলই।

আপনি কী বলতে চান, আমার ভেতরে একজন অচেনা আমি আছে?

সকলের ভেতরেই থাকে।

কী জানি মশাই। লোকে বলছেও বটে যে, আমার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অনেকেই নাকি দেখেছে, আমি টিপুকে পেটাচ্ছি। আর হাসপাতালের ডাক্তাররাও টিপুর ইনজুরির রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তো চিন্তার কথা।

কীসের চিন্তা?

এই যে আমার ভেতরে একজন হিংস্র, নিষ্ঠুর, অ্যাগ্রেসিভ লোক লুকিয়ে রয়েছে এ কি চিন্তার কথা নয়? বেশ ভয়েরই ব্যাপার।

তা ভয় পেলে একজন পাহারাদার বসালেই তো হয়।

পাহারাদার? সে আবার কী?

সবচেয়ে ভালো পাহারাদার তো নন্দনাই হতে পারে।

যা:, কী যে বলেন। আপনি কি মনে করেন বিয়ে মানুষের কোনো উপকার করে? আমার তো ও-কথা ভাবলে পেটে গ্যাস বেড়ে যায়। দেখলেন-না কতগুলো ঢেকুর তুললাম! আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে।

আচ্ছা, টিপুর অবস্থা এখন কীরকম?

যতদূর জানি, পুলিশ-পাহারায় হাসপাতালে রাখা হয়েছে তাকে। খুব সিরিয়াস কিছু নয়।

আচ্ছা মশাই, টিপুর কি নন্দনার ওপরেও একটা নজর ছিল?

কী করে বুঝলেন মশাই, জানি না। কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। ছিল।

বুঝতে বেশি মাথা ঘামাতে হয়নি। টাপুকে হাত করার পেছনে হয়তো ওটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

তাই হবে। নন্দনার মাও ঠারেঠোরে কথাটা আমাকে জানিয়েছেন। নন্দনা নাকি টিপুর ভয়ে কিছুদিন মামার বাড়িতে গিয়ে পালিয়ে ছিল।

তাহলে আপনার কি এখন উচিত নয়, নন্দনাকে এই ভয়ের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া?

আমার কী গরজ?

গরজ আছে বই কি। অসহায় অবলা নারীকে রক্ষা করাই তো পুরুষের ধর্ম, টিপু সেরে উঠলে যে নন্দনার আবার বিপদ!

তা নন্দনা আর কাউকে বিয়ে করলেই তো পারে।

সেটা দ্বিচারণা হবে না? তার যে আপনাকে পছন্দ।

দূর আমি বুড়ো গ্যাসের রুগি, কম বেতনের অপদার্থ লোক। আমার মধ্যে কী দেখল বলুন তো?

সেটা নন্দনাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?

করে কী লাভ? যা বলবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রেম তো একটা ইমোশনাল অ্যাকসেস। ওর কোনো জোরালো ভিত নেই।

আপনার কপালে কী আছে জানেন?

কী?

বয়েস হলে বিড়বিড় করে কথা কওয়া, উদ্ভট উদ্ভট সব কান্ড করা, বাতিক আর বায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়া—যা ব্যাচেলারদের হয় আর কি। তা ছাড়া দাদারা ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বাড়ি দখল করবে, হাতের-পাতের যা-কিছু হাতিয়ে নেবে। আরও বুড়ো হলে আপনাকে গিয়ে উঠতে হবে বৃদ্ধাশ্রমে। বউ যেমনই হোক, ঝগড়াঝাঁটি করুক, মুখনাড়া দিক, কিন্তু তবু সে পুরুষকে ঠিক সামলে রাখে।

হুম।

কথাটা ঠিক বলেছি?

খুব বেঠিকও বলেননি। ব্যাচেলারদের ওরকম-ই হয়ে থাকে।

তাহলে?

একটু ভাবি।

ভাবুন কিন্তু বেশি নয়। ভাবতে সময় নিলে হাউসফুল হয়ে যাবে। নন্দনাই কি পড়ে থাকবে ভেবেছেন? আগেরটির বেলায় যা হয়েছিল, এর বেলায়ও তাই হবে।

আপনি বড্ড ভয় দেখান তো!

ভয় দেখাচ্ছি না, সৎ পরামর্শ দিচ্ছি। আজকের দিনটা ভাবুন। ভেবে কাল সকালেই নন্দনাকে জানিয়ে দিন যে, আপনি তাকেই বিয়ে করবেন।

কাল সকালেই?

কাল সকালেই। কিংবা আজ রাতেই। কিংবা এক্ষুনি গিয়ে চোখ বুজে বলে ফেলুন গে। যান।

আচ্ছা, তাহলে চলি মশাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু পা চালিয়েই যান।

দুর্ঘটনা

ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে অংশু যখন নানা ব্যথা-বেদনা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াতে পারল তখনও ধাঁধার ভাবটা তার যায়নি। সাধারণত দুর্ঘটনায় পড়লে খুব জোরালো ধাক্কায় মনের ক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বাপর কিছু মনে পড়ে না। মন যুক্তিহীন আচরণ করতে থাকে। তবে এ স্মৃতিভ্রংশ নয়। অংশু জানে।

নিজের ছোট্ট প্রিয় ফিয়াট গাড়িটার ছয় ছত্রখান চেহারাটা অংশু খুব মন দিয়েই দেখল। যাকে বলা যায় টোটাল ডিজইন্টিগ্রেশন। চেসিস ছাড়া কিছু আস্ত নেই বা যথাস্থানেও নেই। একটা দরজা উপুড় হয়ে পড়ে আছে ঢালু জমির ঘাসের ওপর। দরজার একপ্রান্ত দিয়ে একজোড়া ভারি সুন্দর পা ও গোলাপি সালোয়ারের প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। আঙুলে রুপোর চুটকি, নখে পালিশ।

নীচু হতে খুব কষ্ট হচ্ছিল অংশুর। কোমরটার জখম বোধ হয় বেশ গভীর। তার বয়স বিয়াল্লিশ। এ বয়সে এ ব্যথা সহজে সারবার নয়। তবু নীচু হয়ে অংশু দরজাটা তোলবার চেষ্টা করল। প্রথমবারে পারল না। দ্বিতীয় চেষ্টায় পারল।

অংশুর ভেতরে কোনো শব্দ এমনিতেই ছিল না। দরজার তলার দৃশ্যটা দেখে তার ভেতরটা যেন আরও নিস্তব্ধ ও চিন্তাশূন্য হয়ে গেল। রাণু বেশি যন্ত্রণা পায়নি নিশ্চয়ই। মাথাটা তুবড়ে গেছে। পিছন থেকে। মৃত্যু ঘটেছে তৎক্ষণাৎ।

অংশু দরজাটা ছেড়ে দিলে সেটা ফের রাণুর ওপর ধর্ষণকারীর মতো চেপে বসে যায়। অংশু হাইওয়ের দিকে মুখ তুলে তাকায়। হাইওয়ের এই অংশটা খুবই নির্জন। টানা লম্বা রাস্তার দু-দিকটাই ফাঁকা। তবু দুর্ঘটনার গন্ধে লোক জুটবেই। এখনও জমেনি। একটু পর পর দু-দুটো লরি ঝড়ের বেগে চলে গেল।

তার গাড়িটাকে মেরেছে একটা লরি। তার দোষ সে লরিটাকে ওভারটেক করার চেষ্টা করেছিল। কয়েকবার চেষ্টা করেও প্রথমদিকে পারেনি। লরিটা সাইড দিচ্ছিল না। কতরকমের বদমাশ ড্রাইভার থাকে। অংশুর সন্দেহ লরিওয়ালা তার গাড়ির আয়নায় সামনের সিটে বসা অংশুর পাশে রাণুকে দেখছিল। রাণু তো দেখবার মতোই। মেয়েছেলে দেখলে কিছু কিছু পুরুষ অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দেয়। লরির ড্রাইভার সম্ভবত সেরকমই একজন। বহুক্ষণ ধরে লরিটা অংশুর পথ আটকে রেখে যাচ্ছিল। কখনো খুব স্পিড দিচ্ছিল, কখনো ঢিলাঢালাভাবে এগোচ্ছিল।

ঠিক এই জায়গাটাতেই অংশু একটু ফাঁক পেতে অত্যন্ত তীব্র গতিতে লরিটাকে পাশ কাটাচ্ছিল। না কাটালেও ক্ষতি ছিল না। তবে রাণু বারবার বলছিল, উঃ! সামনের লরিটার ডিজেলের ধোঁয়া আমার একদম সহ্য হচ্ছে না। ওটাকে কাটাও তো। তাই কাটাচ্ছিল অংশু। তবে এসময়ে সে একটা মারাত্মক ভুল করে। ড্রাইভারের কেবিনটা সমান্তরালে চলে আসতেই অংশু বাঁদিকে চেয়ে একটু নীচু হয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে গাল দিয়েছিল, এই শুয়ারকা বাচ্চা; মাজাকি হো রহা হ্যায়?

ড্রাইভারটা কোন দেশি তা বলা শক্ত। লরিওয়ালাদের কোনো দেশ থাকে কি? বিশেষ করে দূরপাল্লার লরিওয়ালাদের? অংশু দীর্ঘকাল হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এইসব লরিওয়ালা যে-দেশেরই হোক চন্ডীগড় থেকে ডিব্রুগড় বা দিল্লি থেকে বাঙ্গালোর ট্রিপ মেরে মেরে এদের গা থেকে প্রাদেশিকতা মুছে গেছে, এদের দেশ, ঘর সব এখন এক লরির প্রশস্ত কেবিন। ফিয়াটের ঘাতক লরিওয়ালার মুখটায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল, মুখখানা ছিল প্রকান্ড, মাথায় বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল, রোমশ হাত। একবার জানালা দিয়ে তাকাল ছোট্ট ফিয়াটের দিকে। তারপর আচমকা লরিটা ডানদিকে ঘেঁষতে শুরু করল অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে। অংশু তখনও পুরোপুরি কাটাতে পারেনি, পিছোনোরও উপায় নেই।

কী হচ্ছে তা বুঝবার আগেই রাণুর দিকটায় লরিটা প্রথম ধাক্কা মারে। সেটা এমন কিছু গুরুতর ছিল না। অংশু সামলে দিতে পারত। রাণু একটা তীব্র চিৎকার করে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাও পারত অংশু। কিন্তু লরিটা রসিকতা করছিল না। টাটার সেই অতিকায় হেভি ডিউটি ট্রাক অংশুর দেওয়া গালাগালটা ফেরত দিল দ্বিতীয় ধাক্কায়। সেটা ঠিক ধাক্কাও নয়। রোড রোলার যেমন থান ইট ভেঙে চেপে বসিয়ে দেয় রাস্তায় অবিকল সেইভাবে পিষে দিল প্রায়।

অংশু নিজের ট্রাউজারের ভেজা ভাবটা টের পেল এতক্ষণে। না, রক্ত নয়। গাড়িটা যখন তাকে আর রাণুকে গর্ভে নিয়ে চক্কর খেয়েছিল তখন অংশুর পেচ্ছাপ হয়ে যায়। অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে একটা। অংশুর একটু গা ঘিনঘিন করল।

বলতে কী এই গা ঘিনঘিন করাটাই দুর্ঘটনার পর অংশুর প্রথম প্রতিক্রিয়া। এ ছাড়া তার মন সম্পূর্ণ ফাঁকা, সুখ-দুঃখশূন্য।

একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে অংশু তার গাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে সরে এল। নীচের দিকে ঢালু জমি গড়িয়ে গিয়ে একটা চওড়া নালায় শেষ হয়েছে। নালাটা জলে ভরতি। দুটো ছাগল নির্বিকারভাবে আগাছা চিবোতে চিবোতে উঠে আসছে। অংশু একটা গাছের তলায় ছায়ায় বসল। কিছু করা উচিত। কিন্তু কী তা সে স্থির করতে পারছিল না।

একটা সমস্যা অবশ্যই রাণু। বেশ বড়োরকমের সমস্যা। বেঁচে থাকলে রাণুর সমস্যা হত না। যেমন করেই হোক নানারকম অনভিপ্রেত প্রশ্ন তারা দুজন মিলে এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু রাণু এখন মৃত। অর্থাৎ নিরেট একটি বোঝা বা ভারমাত্র। অংশুর গাড়িতে তার উপস্থিতি নিয়ে যাবতীয় প্রশ্নের জবাব অংশুকে একাই দিতে হবে। রাণুর বদলে যদি সে নিজে মারা যেত বা দুজনেই, তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। সে মরে রাণু বেঁচে থাকলে রাণু শুধু ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়লেই হত। দুজনে মরলে অবশ্য প্রশ্ন উঠত কিন্তু জবাবদিহি করার কিছু ছিল না।

অবশ্য এসব সমস্যা খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে না অংশু। তার ফাঁকা অভ্যন্তরে কিছু গুঞ্জন উঠছে মাত্র। বেকুব এবং রাগি এক লরিওয়ালা যে কী ঘটিয়ে গেল তা সে নিজেও জানে না। তবে প্রতিশোধটা সে বড়ো বেশি নিয়েছে। দূরপাল্লার লরি ড্রাইভারদের এত আত্মসম্মানবোধ থাকার কথা নয়। 'শুয়ার কি বাচ্চা' বা ওই ধরনের গালাগাল তাদের কাছে জলভাতের শামিল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এত বড়ো প্রতিশোধের পেছনে কারণ একটাই। দূরপাল্লার নারীবর্জিত দৌড়ে লোকটার ভিতরে একটা পুঞ্জিভূত যৌনকাতরতা ছিল। সেটাকে উসকে দিয়েছিল রাণু। আর সেই বেসামাল কাম থেকে এসেছিল ক্রোধ। ক্রোধ থেকে হিংসা। ইন্ধন ছিল অংশুর নিতান্তই বহুব্যবহৃত এবং বিষহীন একটি গালাগাল।

একটু দূর থেকে অংশু ধ্বংসস্তূপটা দেখতে পাচ্ছে। রাণুর পা দুটো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। অংশুর মনে হচ্ছিল, তার এখান থেকে অবিলম্বে সরে পড়া উচিত। কিন্তু কাজটা খুব বাস্তববুদ্ধিসম্মত হবে না। ওই ধ্বংসস্তূপ হাজারটা আঙুল তুলে তাকে নির্দেশ করবে, চিহ্নিত করবে।

হাইওয়ের ওপর পাঁচ-সাতজন লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু-তিনটে গাড়ি এবং লরিও থামল। ঢালু বেয়ে উঠে আসছে কাছাকাছি গ্রামের কিছু লোক। তাদের ভয়, বিস্ময় ও কাতরতার স্বাভাবিক উক্তিগুলি শুনতে

পায় অংশু।

একজন স্যুটপরা বয়স্ক ভদ্রলোক অংশুর সামনে এসে দাঁড়ায়। অংশু চোখ ভালো করে তোলে না। এক পলক তাকিয়ে মুখটা নামিয়ে রাখে।

লোকটা জিজ্ঞেস করে, গাড়ি কে চালাচ্ছিল? আপনি?

হ্যাঁ। বলেই অংশু টের পায় তার গলার স্বর ভাঙা এবং বিকৃত। কেমন কেটে যাচ্ছে।

কী করে হল বলুন তো!

লরি। ফের গলার স্বরে একটা কাঁপুনি টের পায় অংশু।

ভদ্রমহিলা...! বলে ভদ্রলোক কথাটাকে ভাসমান রাখেন।

অংশু গলা খাঁকারি দেয়। এতক্ষণে সে শরীরেও কাঁপুনিটা টের পাচ্ছে। বলে, কী অবস্থা?

ভালো নয়। হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে।

অংশু নড়ে না। মাটির দিকে চেয়ে থাকে।

আপনার ইনজুরি কীরকম?

কিছু বলতে তো হবে! শেষ অবধি সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে পারল অংশু। দয়াপরবশ একজনের গাড়ি হাসপাতালে পৌঁছে দিল তাদের। তাকে ও মৃত রাণুকে।

ডিসিজড-এর নাম?

রাণু সরকার।

ঠিকানা?

ম্যাকওয়ে অ্যাণ্ড কোম্পানি। সিক্সটিন...

এটা তো অফিসের ঠিকানা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হোম অ্যাড্রেস?

দেখুন, উনি ছিলেন, আমার কলিগ। আমরা একটা প্ল্যান্ট ভিজিট করতে যাচ্ছিলাম অন অফিসিয়াল স্ট্যাটাস। ওঁর হোম অ্যাড্রেসটা আমার জানা নেই।

অফিসে নিশ্চয়ই আছে!

আছে। বলে হাঁফ ছাড়ল অংশু।

আপনিও তো বেশ ইনজিয়োরড, না?

একটু তো লাগবেই। অত বড়ো অ্যাক্সিডেন্ট।

আপনি কি ভরতি হবেন না?

না। তার দরকার নেই। ওয়ান টেটভ্যাক উইল বি এনাফ। আমি কি যেতে পারি এখন?

কোথায় যাবেন?

বাড়ি। আমার একটু রেস্ট দরকার।

পুলিশ এনকোয়ারি হবে, জানেন তো!

জানি।

অংশু আরও কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে বেরিয়ে এল। রিকশা ধরল একটা।

সমীরণের বাগানবাড়িটা ভারি ছিমছাম, নির্জন, সুন্দর। বিশাল বাগানে অনেক পাখি ডাকছে। অংশু স্নান করেছে। প্যান্ট, আণ্ডারওয়্যার ধুয়ে রোদে শুকোতে দিয়েছে। একটা মস্ত তোয়ালে জড়িয়ে বসে আছে বারান্দায় বেতের চেয়ারে। দু-কাপ চা খেয়েছে সে। শরীর বা মনের অস্থিরতার কোনো উপশম ঘটেনি।

সমীরণের বাগানবাড়িটা মোটামুটিভাবে ফুর্তিরই জায়গা। সমীরণ নিজে তার মেয়েমানুষদের নিয়ে এখানে আসে মাঝে মাঝে। সুতরাং এখানে একটি বার আছে। অংশু মদ খায় না। সে আর রাণু এসে বড়োজোর চা বা কফি খেয়েছে, মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত সেঁটেছে, তারপর একটা শোয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। সেই আসঙ্গই ছিল মদ।

আজ দু-কাপ চায়ের পরও তার অন্য কিছু প্রয়োজন বলে মনে হল।

অংশু ডাকল, বিশু।

বিশু এলে বলল, কী আছে তোমাদের বলো তো! হুইস্কি বা ব্র্যাণ্ডি!

সব আছে।

একটু ব্র্যাণ্ডি দাও তো। সোডা মিশিয়ে কিন্তু।

বিশু চলে গেল। অংশু পাখির ডাক শুনতে লাগল। পাখি, অনেক পাখি।

বারান্দার সামনেই একটা ঢ্যাঙা লোহার ফ্রেমে শেকল বাঁধা একটা দোলনা ঝুলে আছে। তারা দু-জনে—অর্থাৎ অংশু আর রাণু যে দোলনায় চড়ত তা নয়। তবে মাঝে মাঝে রাণু গিয়ে বসত ওখানে। সে বসত পা মুড়ে। হাতে থাকত স্কেচের প্যাড আর পেনসিল। অনেক পাখির স্কেচ করেছিল।

ওর ব্যাগটা কোথায় গেল? ভেবে অংশু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে। তারপর ভাবে, যেখানেই থাক তাতে কী আর যায়-আসে? ভেবে ফের গা ছেড়ে দিল সে।

ব্র্যাণ্ডিতে প্রথম চুমুক দিয়ে তার খুব ভালো লাগল না। এর আগে এক-আধবার সে সামান্য খেয়েছে। কোনোবারই ভালো লাগেনি বলে অভ্যাস করেনি। আজ ভালো না লাগা সত্ত্বেও সে ধীরে ধীরে, জোর করে পুরোটা খেয়ে নিতে পারল। বেশি নয় অবশ্য। এক পেগ হবে।

মাথাটা একটু কেমন লাগছে কি?

অংশু চোখ বুজে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

খাবেন না স্যার! লাঞ্চ রেডি।

অংশু একটু চমকে ওঠে। সামান্য সেই চমকে শরীরটা নড়তেই কোমর থেকে ব্যথাটা হিড়িক দিয়ে উঠে আসে মেরুদন্ড বেয়ে। স্পাইনাল কর্ডে যদি লেগে থাকে তবে ভয় রয়ে গেল। হাড়ের দিকেও একটা ব্যথা মাথাচাড়া দিচ্ছে। যদি স্পণ্ডিলাইটিসের মতো কলার নিতে হয়?

আজ স্যার দিদিমণি এলেন না?

ডাইনিং হল-এর দিকে যেতে যেতে অংশু বলল, না।

আপনি কি স্যার অসুস্থ?

অংশু একটা শ্বাস ফেলে বলল, একটু চোট হয়েছে। তেমন কিছু নয়।

গাড়িও আনেননি আজ স্যার।

সার্ভিসিং-এ গেছে।

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অংশুর রাগ হচ্ছিল না। কারণ, এসব সৌজন্যমূলক প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশু তো আর জেরা করছে না। জবাব দেওয়াই উচিত। চেপে গেলে সন্দেহের বীজ বপন করা হবে।

অংশু প্রকৃত মুশকিলে পড়ল খেতে বসে। চমৎকার সরু চালের সাদা গরম ভাত, কাঞ্চনবর্ণ মুরগির কারি, ধোঁয়া-ওঠা ডাল, মুচমুচে আলু ভাজা, মাছের ফ্রাই, চাটনি দেখে আজ তার বারবার ওয়াক আসছিল। এতক্ষণে রাণুকে কাটাছেঁড়া করা হচ্ছে কি? নাকি ঠাণ্ডা ঘরে ফেলে রেখেছে। ওর সৎকারেরই বা কী হবে? কে এসে নেবে ডেডবডি? ওর স্বামী? কিন্তু ওই বডির কিছু দায়িত্ব তো অংশুরও আছে। অংশু তো কম ভোগ করেনি ওই শরীর, যতদিন জ্যান্ত ছিল।

অংশু বিস্তর নাড়াঘাঁটা করে সব ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়ল।

খেলেন না স্যার?

আজ পারছি না। একটা পান আনো তো বিশু। জর্দা দিয়ে।

এসব খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য প্রতি রবিবার অংশুকে পঞ্চাশটা করে টাকা দিতে হয়। আজ আবার এক পেগ মদের দাম আছে। খরচটা আপাতত বেঁচে যাচ্ছে অংশুর। সামনের রবিবার সে অবশ্যই আসছে না।

বারান্দায় যেতে গিয়েই হলঘরের টেলিফোনটা নজরে পড়ল তার। একটু থমকাল সে। তাদের কলকাতার বাড়িতেও টেলিফোন আছে। কথা বলবে কি, একটু ইতস্তত করে অংশু। তারপর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয়, বলবে। বলাই উচিত। ফিরলে সকলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনার কথা বলতে তার ভীষণ অস্বস্তি হবে। মুখ না দেখেই বলে দেওয়া ভালো। বলতে যখন হবেই।

কিছুক্ষণের চেষ্টায় সে বাড়ির লাইন পেল। ধরল তার বোন রীতা।

শোন, আজ একটা বিচ্ছিরি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

অ্যাক্সিডেন্ট—বলে রীতা একটা আর্তনাদ করে উঠল ওধারে।

শোন, ডোন্ট বি নার্ভাস। আমার কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি?

আমার কিছু হয়নি, তবে গাড়িটা গেছে। আর...

আর কী?

আমার সঙ্গে আমার একজন কলিগ ছিল। তার অবস্থা ভীষণ খারাপ।

বাঁচবে না?

বোধ হয় না।

সে কী?

চেঁচাস না। ঠাণ্ডা হয়ে শোন। আমি ব্যাণ্ডেল থেকে কথা বলছি।

ব্যাণ্ডেল থেকে? ব্যাণ্ডেল থেকে কেন? তুমি তো প্ল্যান্টে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ। প্ল্যান্টেই ভদ্রমহিলা ধরলেন আমাকে। ব্যাণ্ডেলে ওঁর কে একজন আত্মীয় থাকেন গুরুতর অসুস্থ। আমাকে একটু পৌঁছে দিতে বললেন।

ভদ্রমহিলা! কে গো?

আমাদের পাবলিসিটি অফিসার। রাণু সরকার।

তুমি ব্যাণ্ডেল গেলে পৌঁছে দিতে?

কী আর করব। ট্রেনের নাকি আজ কী সব গন্ডগোল ছিল হাওড়ায়, তাই।

ট্রেনের গন্ডগোল। তাহলে কী হবে। মা আর বউদি যে বড়দার সঙ্গে তারকেশ্বর গেল।

তারকেশ্বর। ও গড! অংশু হাল ছেড়ে দিল প্রায়।

কী বলছ?

অংশু মনে মনে নিজেকে বলল, ইডিয়ট, এর চেয়ে ঢের বেশি চক্করে পড়েও দুনিয়ায় চালাক লোকেরা বেরিয়ে আসে। তুমি কি গাড়ল? চালাও, চালিয়ে যাও।

অংশু একটু ধীর স্বরে বলল, ট্রেনের গন্ডগোল ছিল কিনা তা তো আমার জানার কথা নয়। ভদ্রমহিলা বলছিলেন, তাই ধরে নিয়েছি আছে।

ব্যাণ্ডেলে কোথায় আছ তুমি এখন? কোথা থেকে কথা বলছ?

অংশু এত মিথ্যে কথা একসঙ্গে জীবনে বলেনি। একটু ঢোঁক গিলে বলল, হাসপাতালের কাছ থেকে।

ভদ্রমহিলার কীরকম লেগেছে?

মাথাটা থেঁতলে গেছে।

উঃ মাগো!

একটু চুপ করে থেকে রীতা বলল, কী হয়েছিল মেজদা?
লরি। একটা লরি এসে মেরেছিল বাঁদিকে।
বাঁচার কোনো চান্স নেই?
না।
গাড়িটা?
গেছে। একদম গেছে।
তুমি তাহলে কী করে ফিরবে?
দেখছি। ফেরার জন্য চিন্তা নেই। পারব।
শোনো মেজদা, ছোড়দা একটু আড্ডা মারতে বেরিয়েছে সকালে। ও ফিরলে তোমাকে গিয়ে তুলে আনবে। ও ওর গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছে। নইলে আমিই চলে যেতাম—
না, তার দরকার নেই।
বাবাকে বলব তো?
বলিস। তবে আগে বলিস যে আমার কিছু হয়নি।
সত্যিই হয়নি তো?
হলে কি আর ফোন করতে পারতাম?
তুমি কখন ফিরবে?
রাণুর একটা ভালোমন্দ খবর পেলেই। ছাড়ছি। ভাবিস না।
তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো।
অংশু ফোন রেখে দিল। শোয়ার ঘরে এসে সে দরজা বন্ধ করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। শরীরের ভার আর বহন করা যাচ্ছে না।
বিছানাটা নরম ফোম রবারের। ভারি নরম। এই বিছানাতেই সে আর রাণু—। কিন্তু রাণুর স্মৃতি তাকে একটুও তাড়া করছে না। তবে এতক্ষণে দুর্ঘটনার পুরো ভয়াবহতা সে একা ঘরে স্মরণ করতে পারল। ওইরকম ভাবে চুরমার হয়ে যাওয়া একটা গাড়ির ভিতরে থেকেও কী করে সে বেঁচে গেল সেটা এখনও ভেবে পাচ্ছে না সে। বাঁচলেও এমন আস্ত অবস্থায় তো কিছুতেই নয় তবু আশ্চর্য কিছু ব্যথা-বেদনা নিয়ে সে বেঁচেই আছে। ভাবতেই শিউরে উঠল সে। তার শরীর থেকে রক্তপাতও হয়েছে সামান্য। মাত্র চার জায়গায় ছড়ে বা চিরে গেছে, জামাকাপড় অবশ্য ছিঁড়েছে কিন্তু তা ব্যবহারের অযোগ্য নয়। এত বড়ো একটা অ্যাক্সিডেন্ট যাতে রাণু তৎক্ষণাৎ মারা গেল, ফিয়াটটা হয়ে গেল খন্ড খন্ড, তাতে পড়েও সে এমন ফুলবাবুটির মতো অক্ষত, অনাহত রয়ে গেল কেন?
ক-দিন আগেই রিপ্লের 'বিলিভ ইট আর নট'-এ সে পড়েছিল একজন লোক মোটরগাড়িতে লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় একটা ট্রেন এসে সেটার ওপর পড়ল এবং প্রায় ছশো মিটার মোটরগাড়িটাকে থ্যাঁতলাতে থ্যাঁতলাতে পিষে দলা পাকিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে। আশ্চর্য এই যে, মোটরচালক সামান্য কিছু কাটা-ছেঁড়া নিয়ে তা সত্ত্বেও দিব্যি বেঁচে গিয়েছিল, হাসপাতালে পর্যন্ত ভরতি হতে হয়নি। অংশুর ব্যাপারটাও তাই নয় কি?
এ বাড়িতে যে এত পাখি ডাকে তা আগে কখনো লক্ষ করেনি অংশু। আজ সঙ্গে রাণু নেই বলেই বোধ হয় করল। পাখিদের গন্ডগোলেই বোধহয় তার ঘুম এল না। শরৎকালের দিব্যি মনোরম আবহাওয়াটি ছিল আজ। ভারহীন কিছু মেঘ পায়চারি করে ফিরছে আকাশে। এবার বাদলাটা গেছে খুব। তাই চারদিকটা ধোয়া-মোছা চমৎকার। কিন্তু এমন মনোরম আবহাওয়া পেয়েও তার ঘুম এল না এক ফোঁটা। অবশ্য তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পেটে ভাত পড়েনি, রাণু মারা গেছে, ঘুম আসার কথাও তো নয়। তবু চুপচাপ চোখ বুজে অংশু পাখিদের গন্ডগোল শুনতে লাগল।

ঘুম তো নয়ই, একে বিশ্রামও বলে না। মন প্রশান্ত না থাকলে বিশ্রাম ব্যাপারটাও একটা শক্ত ব্যায়াম মাত্র। এই বিশ্রামের ব্যায়ামটা তাকে করতে হচ্ছে একটাই মাত্র কারণে। তার প্যান্ট এখনও শুকোয়নি। না শুকোলে বেরোবে কী করে?

নিজের ফিয়াট গাড়িটার কথা শুয়ে শুয়ে ভাবল অংশু। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিন্তু চমৎকার অবস্থায় ছিল কেনার সময়। তার হাতে সেট হয়ে গিয়েছিল। ইনশিয়োর করা আছে, কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে অংশু। তবে গাড়িটা আর ফিরবে না। পার্টসগুলো চুরি হয়ে যাবে অ্যাক্সিডেন্ট স্পট থেকে। চাকা, ব্যাটারি।

অংশু ফের উঠে হলঘরে বসে। খুবই কষ্টে। তারপর থানায় ফোন করে।

আপনারা অ্যাক্সিডেন্ট স্পট-এ কোনো পাহারা রেখেছেন?

না স্যার।

একটু পাহারা রাখলে ভালো হত না? পার্টস চুরি যাবে যে!

আমাদের লোক বড্ড কম।

তাহলে?

কিছু করার নেই স্যার। চুরি যাওয়ার হলে এতক্ষণে হয়ে গেছে।

হোপলেস। বলে অংশু ফোন রেখে দেয়।

ট্রাউজার এখনও শুকোয়নি। কোমরের কাছে বেশ ভেজা। তবু অংশু প্যান্ট পরে নেয়, জামা গায়ে দেয়, বিশুকে একটা রিকশা আনতে বলে বারান্দায় বসে পাখির ডাক শোনে।

রাত আটটা নাগাদ যখন বাড়ি ফিরল অংশু তখন সে অনেকটাই বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত, হা-ক্লান্ত। তবে বিপর্যয়ের ভাবটা সে ইচ্ছে করেই একটু বাড়িয়ে তুলেছিল। যাতে বেশি প্রশ্নের জবাব দিতে না হয়।

বাইরের ঘরেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল সবাই। পারিবারিক ডাক্তারও তৈরি হয়েছিলেন। সে বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র মা এসে তাকে প্রথম ধরল।

একটি প্রশ্নেরই জবাব দিতে হল তাকে।

মেয়েটা কি মারা গেছে?

হ্যাঁ।

ইশ।

ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ দিলেন। নাড়ি-টাড়ি দেখলেন একটু। তারপর ঘুমের হাতে ছেড়ে দিলেন।

অংশু ঘুমোল। প্রচন্ড গভীর টানা ঘুম। পরের দিনটাও পড়ে থাকতে হল বিছানায়। মাঝে মাঝে অফিস এবং থানা থেকে ফোন এল বাড়িতে। ভাগ্য ভালো যে, তাকে ফোন ধরতে হল না। সে অসুস্থ, শয্যাগত এবং আণ্ডার সেডেশন, সুতরাং জবাব দেওয়ার দায় নেই। বাড়ির লোকেরা সারাদিন প্রায় নি:শব্দে রইল।

কিন্তু এই অবস্থা তো স্থায়ী হবে না। তাকে জাগতে হবে এবং মুখোমুখি হতে হবে সকলের। অনেক প্রশ্ন আছে ওদের। সংগত প্রশ্ন, বিপজ্জনক প্রশ্ন। প্রশ্ন করবে পুলিশ, প্রশ্ন করবে অফিসের সহকর্মীরা। একটু নিটোল, ছিদ্রহীন মিথ্যে গল্প বানানো খুব সহজ হবে না। কোনো মিথ্যেই তো ছিদ্রহীন নয়।

চোখ খুলতেই লজ্জা করছিল অংশুর। আলপনার মুখ শুকনো, চোখ সজল। মুখ দেখে মনে হয়, সারারাত তার পাশে বসে জেগে কাটিয়েছে। তার ছোটো ভাই অ্যাক্সিডেন্ট স্পট থেকে ঘুরে এসেছে, এটাও সে টুকরো-টাকরা কথা থেকে টের পেল। থানা পুলিশ ইনশিয়োরেন্স সবই সে সামলাচ্ছে।

পরের রাত্রিটাও গভীর ঘুমে কেটে গেল অংশুর। জাগল বেলায়। আলপনা তার গায়ে মৃদু নাড়া দিয়ে বলল, তোমার অফিস থেকে ফোন এসেছে। জরুরি দরকার।

কে ফোন করেছে?

ডিরেক্টর নিজে। আধ ঘণ্টা পর আবার ফোন করবে।

অংশু চুপচাপ চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে পর্দা উঠছে রঙ্গমঞ্চের। হাজার জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে থাকবে। সে রঙ্গমঞ্চে একা।

আধ ঘণ্টা পরই ফোনটা এল।

অংশু?

বলছি।

কেমন আছ?

একটু ভালো।

বেলা বারোটায় একবার অফিসে আসতে পারবে?

পারব।

আজ মিসেস সরকারের ডেডবডি রিলিজ করেছে সকালে। সোজা অফিসে আসছে। এখান থেকেই ক্রিমেশনে নিয়ে যাবে।

অফিসের সিঁড়িতে তারা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে লরি, লরির ওপর খাটে রাণু শুয়ে আছে। অফিস থেকে বিশাল একটা টায়ারের আকৃতির মালা দেওয়া হয়েছে তার বুকের ওপর।

প্রতীকটা চমৎকার। এক লরি মেরে দিয়ে গেছে রাণুকে। আর এক লরির ওপর এখন সে শোয়া। বুকে ফুলের চাকা। চমৎকার।

এতগুলো লোকের এই সমবেত নিস্তব্ধতা ভারি অস্বস্তিকর। অংশুর অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। লরিটা চলে যাচ্ছে না কেন? কেন চলে যাচ্ছে না?

ডিরেক্টর চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিং সিক অংশু?

একটু।

স্বাভাবিক। ইট ওয়াজ এ গ্রেট শক। মিসেস সরকারের হাজব্যাণ্ড আর বাচ্চাকে আনতে গাড়ি পাঠানো হয়েছে। দে আর বিয়িং লেট।

অংশু বুকের দুটো বোতাম খুলে ফেলল। স্টানস পালটাল পায়ের। তারপর একটা গাড়ি এসে থামল লরিটার পেছনে।

অংশু স্থির হয় এবার। পেছনের দরজাটা খুলে একজন রোগা ও পাগলাটে চেহারার লোক নেমে আসে। পরনে পায়জামা, হ্যাণ্ডলুমের খয়েরি পাঞ্জাবি। চুল বড়ো বড়ো। সামান্য দাড়ি আছে। চুল, দাড়ি কাঁচা-পাকা, কিন্তু লোকটার বয়স খুব বেশি নয়, পঁয়ত্রিশ-টঁয়ত্রিশ হবে। অংশুর বাঁ-পাশ থেকে কে যেন চাপাস্বরে বলে উঠল, এ রাসক্যাল। ডাউনরাইট রাসক্যাল।

লোকটার পেছনে একটা বাচ্চা নেমে এল। নীল প্যান্ট, সাদা জামা। বেশ রোগা। বছর পাঁচেকের বেশি বয়স নয়। মুখটায় কেমন ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। চোখে ভয়।

নিস্তব্ধতা ভাঙল আচমকা। নিখুঁত একটা বিদ্যুৎগতি ছুঁচের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। কানে হাতচাপা দিয়ে অংশু একটা কাতর শব্দ করল, উঃ!

ছেলেটাকে কে যেন লরির ওপর তুলে দিয়েছে। রোগা, হাড্ডিসার, হতভম্ব ছেলেটা আর কোনো শব্দ বা কথা খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু তীক্ষ্ণ পাখির স্বরে ডাকছে, মা...মা...মা...মা...

অংশু ধীরে ধীরে বসে পড়তে থাকে। দু-হাতে প্রাণপণে বন্ধ করে থাকতে চেষ্টা করে শ্রবণ। কিন্তু সব প্রতিরোধ ভেঙে সেই তীক্ষ্ণ পাখির ডাক তার ভেতরে সূচিমুখ হয়ে ঢুকে যায়। লন্ডভন্ড করে দিতে থাকে তার অভ্যন্তর। মা...মা...মা...মা...

অংশু মাথা নাড়ে। শব্দটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে সে। তবু দম আটকে আসতে থাকে। সে হাত তুলে বলতে চেষ্টা করে, ডেকো না! ওভাবে ডেকো না! আমি পারছি না...

কিন্তু কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না অংশু। দু-হাতে কান চেপে সে অভিভূতের মতো চেয়ে থাকে। একটা শব্দের বুলেট বারবার এসে বিদ্ধ করে তাকে। ঝাঁঝরা করে দিতে থাকে।

বন্দুকবাজ

পল্টনের একটাই গুণ ছিল। সে খুব ভালো বন্দুকবাজ। বন্দুক বলতে আসল জিনিস নয়, হাওয়া-বন্দুক। চিড়িয়া, বাঘ এমনকী ইঁদুর মারার যন্ত্রও সেটা নয়। তবে অল্প পাল্লায় চাঁদমারি করা যায় বেশ, আর পল্টনের হাওয়া-বন্দুকটা ছিল ভালো। তার জমিদার দাদু জার্মানি থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন।

জীবনটাকে প্রথম খাট্টা বানিয়ে ছাড়ল ইস্কুলের মাস্টাররা, আর বাবা। দিনরাত কেবল পড় পড়। শেষমেশ 'পড় পড়' শব্দটা তার কানে আরশোলার মতো ফড়ফড় করে বেড়াত, মাথার মধ্যে ফরর, ফরর করত।

বন্দুকবাজ ছিল তখন থেকেই।

দাদুর জামিদারি বাবা বিফলে দিল! তারপর থেকে শুখা ভদ্রলোক তারা। নিমপাতা দিয়ে ভাত খায়।

বাবা কেবল হুড়ো দেয় তখন—মানুষ হ। দাঁড়া। নইলে মরবি।

পল্টন জানে, বাবা এখন ছেলের মধ্যে তাগদ চায়। বাপ নিজে সুপুত্র ছিল না। তবে খারাপ দোষও কিছু নেই। চটপট বড়োলোক হতে গিয়ে ফটাফট টাকা বেরিয়ে গেল। জমি গেল। বাড়িটা রইল শুধু। তা সে বাড়িরও ছুরত কিছু নেই। রংচটা দাদের দাগ সর্বাঙ্গে।

পল্টনের মাথায় পড়া ঢোকে না, বাপের হুড়ো খেয়ে বই মুখে হরবখত ঘ্যাঙর ঘ্যাং করত বটে, কিন্তু মা সরস্বতীর পায়ের ছাপ পড়ত না মাথার ঘিলুতে। তবে বন্দুকের নিশানা ছিল ওয়া: ওয়া। বিশ হাত দূর থেকে উলটো করে ধরা পেনসিলের শিস উড়িয়ে দিত একবারে। টান করে সুতো বাঁধো, পল্টন বিশ হাত দূর থেকে ছররা মেরে ছিঁড়ে দেবে। কোনো কাজে লাগে না গুণটা। কিন্তু আছে। অচল সিকি যেমন পকেটে পড়ে থাকে।

তার পথে বরাবরই নানান মাপের গাড্ডা। কখনো ছোটো কখনো বড়ো। ক্লাস নাইনে সে প্রেমে পড়ল গার্লস স্কুলের পপির সঙ্গে। পপি পড়েনি। পড়াটা পল্টনের একতরফা। না পড়ে উপায়ই বা কী? হুবহু মেমসাহেবের মতো দেখতে পপি, তেমনি সাজগোজ তার, আর রাজহাঁসের মতো অহংকারী সে। পুরো গঞ্জের যুবজন ঢেউ খেয়ে গেল।

পপি কখনো বিনা ঘটনায় রাস্তায় হাঁটতে পারত না। রোজ কিছু না কিছু ঘটবেই। এক ছোকরা স্রেফ হিরো বনতে গিয়ে বাগি সিপাহির মতো দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পপির চোখ টানতে গিয়েছিল। দুটো ঠ্যাং বরবাদ।

আর একজন স্রেফ পপির জন্য গার্লস স্কুলের পুকুরে তেত্রিশ ঘণ্টা সাঁতরাল। নিউমোনিয়া হয়ে সে যায় যায়।

আর একজন কেবল পপির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর পেটে ছুরি চালিয়ে দিল। একজন জেল, অন্যজন হাসপাতালে গেল।

অনেকে গান শিখতে লাগল, ফুটবল খেলতে লাগল, ছবি আঁকতে লাগল, গল্প বা কবিতা লিখতে লাগল, সব পপির জন্য।

পপি কী ভালোবাসে, কী পছন্দ করে তা তো কারও জানা ছিল না।

পল্টনের আর কিছু নেই, বন্দুক আছে। এক বাজিকর বাজি দেখিয়ে মাতা মেরির আশীর্বাদ পেয়েছিল। গল্পটা জানত পল্টন। বাজিতে যদি হয় তো বন্দুকে হবে না কেন? পল্টন গিয়ে ডালিমের সেলুনে চুল ছাঁটল সেদিন, সবচেয়ে ভালো হাফ প্যান্ট আর শার্টটা পরল। আজ জুতোও পরল যা সে কদাচিৎ পরে।

আমতলার রাস্তা দিয়ে পপি ইস্কুলে যাচ্ছে। সঙ্গে হরেক কিসিমের ফুরফুরে মেয়ে। সব ডগমগ। আর আড়াল-আবডালে, আগে-পিছে ছোকরারা নানা কায়দা করে চোখ টানার চেষ্টা করছে।

পল্টন ঠিক করল, দেখাবে। পপির বাঁ বুকের ওপরে সাঁটা ইস্কুলের মেটাল ব্যাজ। বেশ ছোটো ব্যাজ। পল্টন আমগাছের আড়াল থেকে বন্দুক তাক করল। বেশ শক্ত কাজ। প্রথম, পপি চলছে। দ্বিতীয়, তার চারদিকে বিস্তর চেলি চামুন্ডী। কিন্তু বন্দুকবাজ পল্টন তো আর কাঁচা হাতের লোক নয়। সে ব্যাজটাকে ভালোমতো নিরিখ করে ঘোড়া টিপে দিল। ব্যাজটাকে টিপে দিয়ে লোহার গুলি লাফিয়ে উঠে পপির পা ছুঁল ভয়ে। কিন্তু ফসকায়নি।

কিন্তু পপির চোখের সামনে রুস্তম বনবার সাধ যারা এতকাল ধরে পুষছে তারা ছাড়বে কেন?

পপির লাগেনি, অলৌকিক হাতের টিপ পল্টনের। টিনের ব্যাজটা টোল খেয়ে গেছে। কিন্তু তখন কে শোনে তার কথা। ভুলটা কোথায় হয়েছে বোঝবার আগেই তার মাথা থেকে সিকি চুল খামচে তুলে নিল ছোকরারা, পেট-ফাটানো লাথি চালাল, নাক থ্যাবড়া করে দিল ঘুসিতে। তিনটে দাঁত নড়বড়।

প্রথমে ভয় খেলেও মার দেখে খুব হেসেছিল পপি আর তার বান্ধবীরা।

বন্দুকটা সেই গোলমালেও বেঁচে গিয়েছিল। সেটার ওপর কেউ কেন কে জানে আক্রোশ দেখায়নি।

মারে শেষ হল না। ইস্কুলে খবর হল। পরদিনই তার বাবার কাছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট গেল ইস্কুল থেকে। ব্যথা-বেদনার শরীরের ওপর বাবা আর এক দফা চালাল। সেই রাতেই বন্দুক ঘাড়ে রাস্তা মাপল পল্টন। একটু খুঁড়িয়ে, ককিয়ে, মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে।

ভোর হল শহরতলিতে। লেভেল ক্রসিং-এ একটা ফাঁকা গুমটি ঘর পেয়ে শুয়ে পড়েছিল পল্টন। ভোর হল প্রচন্ড খিদেয় পিপাসায়। ভোর হল ভয়ে।

কিন্তু ভোর তো হল!

পল্টন ভারী শহরে ঢুকে চারদিক দেখে। বাবার সঙ্গে বহুবার এসেছে, তখন খারাপ লাগেনি। এখন মনে হল, ই বাবা, এখানে আবার না জানি কী হবে! কিন্তু ডরপোকের ইজ্জত নেই। সঙ্গে বন্দুক তো আছে এখনও। প্রথমে পল্টন তার আংটি বেচল। তারপর খেল পেটভরে।

বাজারের কাছে বন্দুক হাতে ঘোরাঘুরি করার সময় বহু লোক তাকে ফিরে ফিরে দেখতে থাকে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে পিছুও নেয়। একটা ছেলের হাতে আধ-খাওয়া জিলিপি। পল্টন তাকে বলল, জিলিপিটা ধরে দাঁড়া।

ছেলেটা দাঁড়ায়। বিশ হাত দূর থেকে পল্টন বন্দুক মারে, জিলিপি পড়ে যায়।

ছেলেটা কেঁদে ওঠে বটে, কিন্তু বহু লোক তাকে শাবাশ দিতে থাকে!

তো পল্টনের পয়লা কাম সাফা, এ কাজটা হল সবচেয়ে শক্ত কাজ। ঢোকা। ঢুকে পড়া। পল্টন পয়লা গুলিতেই শহরে ঢোকার রাস্তা করে নিল।

সে জোগাড় করল আলপিন, ছুরি, টম্যাটো, আলু, সুতো আর যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস আছে। ছুরির মাথায় টম্যাটো গেঁথে, সুতো ঝুলিয়ে, আলপিনের ডগা লক্ষ করে সে দমাদম বন্দুক মারে। একটা তাস দাঁড় করিয়ে যেকোনো ফোঁটায় গুলি লাগায় দশ-বিশ হাত দূর থেকে। গুলি ফসকায় না। মোমবাতির শিখা নিভিয়ে দেয়, উড়ন্ত মার্বেল ছটকে দেয়।

দিনে দেড় দু-টাকা রোজগার দাঁড়াল। কোই পরোয়া নেই। একটা চালের আড়তে পাহারা দেওয়ার কাজ পেল, সেইখানেই মাথা গোঁজার জায়গা আর দু-বেলা খাওয়া। সারাদিন শহরের এখানে-সেখানে বন্দুকবাজি। তবে ভুলেও সে আর মেয়েদের দিকে তাকায় না। ওপড়ানো জায়গায় ফের চুল গজাতে অনেক সময় লেগেছে।

তো বন্দুক আর পল্টন আছে। আর কী চাই?

আড়তের মালিক চেন্টুবাবুর আসলি বন্দুক আছে। দুটো নল দিয়ে আগুনে সিসে ছটকায়। চেন্টু বলে—চালাবি?

উদাস স্বরে পল্টন বলে—ও বড়ো ভারী জিনিস।

দুর ব্যাটা! অভ্যাস কর।

পল্টন আসল বন্দুকের খদ্দের নয়। সে কোনোদিন পাখি মারেনি, বাঘ মারেনি, বেড়াল পর্যন্ত নয়। জীবজন্তু মারতে বড়ো কষ্ট হয়। আসল বন্দুকে তার তবে কাজ কী?

কিছুদিন যায়। হাওয়া-বন্দুকের খেল শহরে পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন আর কিছু না দেখালে লোকে তাকাবে কেন?

খুব ভাবে পল্টন। সে চিত হয়ে, উপুড় হয়ে, হেঁটমুন্ডু হয়ে বহু লক্ষ্যভেদ দেখিয়েছে। কিন্তু তাও তো সব দেখা হয়ে গেছে মানুষের। আর কী বাকি আছে? রাতের বেলা হাওয়া-বন্দুক কোলে নিয়ে পল্টন জেগে বসে আড়ত পাহারা দেয় আর ভাবে। ভাবতে ভাবতে একদিন চেন্টুবাবুকে বলল—বন্দুক ছাড়া আর তো কিছু জানি না। তা বললেন যখন তো দিন আপনার মারণ-কল। চালাই।

পারবি তো?

প্র্যাকটিস তো করি।

চেন্টুবাবু বন্দুক দিলেন। বললেন—গুলির বড়ো দাম। সাবধান, বেশি খরচ করিসনি।

খুবই ভারী বন্দুক, হাওয়া-বন্দুকের পাঁচগুণ। চেন্টুবাবু তাকে নিয়ে এক ছুটির দিনে শহরের বাইরে গেলেন বন্দুক শেখাতে।

সারাদিন দমাদম চাঁদমারি হল। দিনের শেষে চেন্টুবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—তুই শালা একলব্যের বংশ।

মিথ্যেও নয়। আসলি চিজ পয়লা দিন ধরেই পল্টন খেল দেখিয়েছে। পিজবোর্ডে আঁকা গোল টার্গেটের ঠিক মাঝখানে একটার ওপর একটা গুলি পাম্প করে দিয়েছে; এদিক-ওদিক হয়নি। চেন্টুবাবু শূন্যে ঢিল ছুড়েছেন, আর পল্টন সেই ঢিল ছাতু করেছে। তারপর নারকেল পেড়েছে বন্দুকে, বটের ফল পেড়েছে, সর্বশেষে একটা ওলটানো কাচের গ্লাসের ওপর রাখা একটা কমলালেবু ছ্যাঁদা করেছে, গ্লাসটার চোট হয়নি।

শহরে শখের শিকারি কিছু কম নেই। পল্টনের বন্দুকের হাত সবাই জেনে গেল। সেই থেকে সে শিকারি-পার্টির সঙ্গী। ছুটির দিনে কেউ না কেউ এসে বলবেই, চল রে পল্টন।

পল্টন যায়। নিজের হাতে জীবজন্তু সে মারে না। তবে বন্দুক বয়। গুলি ভরে দেয়। সঙ্গে থাকে। কথা কম বলে সে। কেউ চাইলে বন্দুকের নানা ভেলকি দেখায়। চলন্ত জিপ গাড়ি থেকে টার্গেট মারে, ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছন ফিরে লক্ষ্যভেদ করে, হেঁটমুন্ডু হয়ে নিশানায় গুলি লাগায়।

বিশ্বাসবাবু বললেন—তা পাখি মারিস না কেন?

কষ্ট হয় বাবু। পাখির তো বন্দুক নেই। সে উঠে কী চালাবে ?

ব্যাটা ফিলজফার!

পল্টন জানে মারটা উভয় পক্ষেরই হওয়াটা হক্কের। একতরফা ভালো নয়। পাখি বন্দুক চালালে সেও উলটে চালাতে পারত।

চৌধুরি সাহেব বললেন—কিন্তু বাঘ?

বাঘেরও বন্দুক নেই। তা ছাড়া সে তো আমার ঘরে গিয়ে হামলা করেনি। বরং তার জায়গায় এসে আমিই ঝামেলা চালাচ্ছি।

তোর কপালে কষ্ট আছে।

সে জানে পল্টন। কপালে কষ্ট তার নেই তো কার আছে!

অফিসারদের ক্লাবে পল্টন চাকরি পেয়েছে। টেনিস বল কুড়িয়ে দেয়, ঘাস ছাঁটে, গলফের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যায়, মদ ঢেলে দেয়।

একদিন খেয়ালবশে গলফ স্টিক চালিয়ে বহুদূরের গর্তে বল ফেলল।

মিত্র সাহেব বিয়ারের জাগ হাতে রঙিন ছাতার তলায় বসেছিলেন। দেখে বললেন—হোল ইন ওয়ান! আবার মারো তো!

আবার মারে পল্টন এবং এবারও গর্তে বল ফেলে।

সেই থেকে পল্টন একনম্বর গলফ খেলোয়াড়। সেই থেকে সে বিলিয়ার্ডেও সবচেয়ে চৌকস। পল্টন ছাড়া সাহেবদের চলে না। পল্টন ছাড়া ক্লাব অচল।

কাছাকাছি বউ বা প্রেমিকা থাকলে কোনো সাহেবই পল্টনের সঙ্গে বড়ো একটা বিলিয়ার্ড বা গলফ খেলে না।

গুহ সাহেব নতুন এসেছেন। সুন্দরী স্ত্রী।

[গল্পের নিয়মে গুহ সাহেবের স্ত্রী হতে পারত সেই পপি। জীবন তো অনেক সময়ে গল্পের মতই হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গুহ সাহেবের স্ত্রী পপি নয়। অন্য একজন।]

পল্টন বিলিয়ার্ড টেবিলে একা একা বল চালাচালি করছিল। সাহেবরা কেউ আসেনি তখনো।

গুহ সাহেব হাত গুটিয়ে বললেন, হয়ে যাক এক হাত।

হল। হেরে ভূত হয়ে গেলেন গুহ। পল্টন গা লাগিয়েও খেলল না।

পরদিন গলফে সে গুহ সাহেবকে একদম বুরবক বানিয়ে ছাড়ল।

কিন্তু গুহ সাহেব বুরবক হতে পছন্দ করেন না। তিনি বিদেশে বিস্তর গলফ আর বিলিয়ার্ড খেলেছেন। কম্পিটিশনে শুটিং করেছেন। তা ক্রমে ক্রমে তাঁর পল্টনের সঙ্গে একটা অদেখা শত্রুতা গড়ে উঠতে থাকে।

শীতকালে জলায় বাঘ আসে। সেবারও এল। সাহেবরা বন্দুক কাঁধে বাঘ মারতে চললেন। সঙ্গে পল্টন। জঙ্গলে বিটিং হচ্ছে। জঙ্গলের বাইরে দু-সার বন্দুক তৈরি।

পল্টন দূরে একটা গাছতলা বেছে ছায়ায় বসে আছে। বসতে বসতে ঢুলুনি এল। শুয়ে গেল সেইখানেই।

বাঘটা বেরোল বিদ্যুৎশিখার মতো। তারপর ঢেউ হয়ে ছুটতে লাগল খোলা মাঠ দিয়ে, আগুনের মতো উজ্জ্বল শরীরে।

মোট দশখানা বন্দুক গর্জে উঠল দুই সারি থেকে। তারপরেও গর্জাতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, বারুদের গন্ধে বুক ছিঁড়ে যায়।

বাঘটা ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে গেল ধানের খেতে। তার রক্তে মাটি উর্বর হতে লাগল। পল্টন শুয়েছিল টিলার মতো উঁচু জায়গায়। গাছতলায়। সবই ঠিক আছে তার, শুধু তোলা হাঁটুর মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা। তিরবেগে রক্ত বেরোচ্ছে।

যখন সবাই ঘিরে ধরল তাকে সে কাতর স্বরে বলল, শাবাশ। লেগেছে ঠিক লেগেছে। শাবাশ সাহেব।

কাকে বলল কেউ বুঝতে পারল না। তবে মাসখানেক বাদে গুহ সাহেবের স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা আনলেন আদালতে।

সম্পূর্ণতা

ঠিক পুরুষের মতো গলায় একজন বয়স্কা নার্স চেঁচিয়ে ডাকছিল।

অমিতাভ গাঙ্গুলি কে? অমিতাভ গাঙ্গুলি?

বাবার মুখ নোয়ানো। হাতের ওপর থুতনি রেখে বোধহয় চোখ বুজে আছে। ডান গালে স্টিকিং প্লাস্টারে সাঁটা তুলোর ঢিবি। ডাক শুনে মুখ তুলে শমীকের দিকে তাকাল। শমীক উঠে দু-পা এগিয়ে থতোমতো গলায় বলে—এই যে এখানে।

নার্স হাতের কাগজটার দিকে চোখ রেখেই বলে—ক্যান্সার। থার্ড স্টেজ। কিছু করার নেই।

তাহলে? শমীক প্রশ্ন করে।

উত্তর অবশ্য পায় না। নার্স পরের নাম ধরে ডাকছে—নওলকিশোর ওঝা—

বাবা ওঠে।

কী বলল?

শমীক যথার্থ বুদ্ধিমানের মতো বলে—কত ভুলভাল বলে ওরা! এর রোগ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

থার্ড স্টেজ না কী যেন বলছিল! বাবা ধীরে ধীরে বলে।

রোগটা প্রাইমারি স্টেজে আছে আর কী। ওষুধ পড়লেই সারবে।

হাসপাতালের বাইরে এসে শমীক বলে—ট্যাক্সি নেব বাবা?

ট্যাক্সি কেন আবার? তিন নম্বরে উঠে শেয়ালদা চলে যাব।

শেয়ালদার হোটেলে ফিরে বাবা তার প্যান্ট ক্রিজ ঠিক রেখে যত্নে ভাঁজ করল। হ্যাঙারে টাঙাল জামা। লুঙ্গি পরতে পরতে বলল—থার্ড স্টেজ মানে কি প্রাইমারি স্টেজ?

হ্যাঁ।

তবে যে বলছিলি, ওরা ভুলভাল বলছিল!

শমীক অত বুদ্ধি রাখে না। তা ছাড়া তার নিজেরও বুকের ভেতরে একটা কী যেন উথলে পড়ছে। তিনটে বোনের বিয়ে বাকি। দুই ভাই ইস্কুলে পড়ে। তার নিজের বি এ পাস করতে এখনও এক বছর। যদি আদৌ পাস করে। এবং এই অবস্থায় বাবাজি বোধহয় চললেন।

দুই গাল রবারের মতো টেনে হাসল শমীক। বলল—না না। থার্ড স্টেজই বলেছে। তার মানে—

বাবা বিশ্বাস করেছে। কোঁচকানো কপাল হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। বিছানায় পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলল—যদি প্রাইমারি স্টেজই হয় তবে হোটেলের টাকা গুনে এখানে থাকি কেন? আমাদের চা-বাগানে ফিরে যাই চল। দরকারমতো জলপাইগুড়ি কি কুচবিহারে গিয়ে চিকিৎসা করালেই হবে।

ডাক্তারকে বলে নিই।

কালই বল! আমি বরং শিয়ালদায় আজই খোঁজ নিই যদি পরশুর রিজার্ভেশন পাওয়া যায়।

তাড়াহুড়োর কী আছে! এসেছি যখন ট্রিটমেন্টটা করিয়েই যাব। কলকাতার মতো ব্যবস্থা কি মফসসলে হবে?

বাবা ডান গালের তুলোটা একটু চেপে ধরল। শমীক জানে, তুলোয় ঢাকা আছে একটা ঘা। ঘায়ের ভেতর দিয়ে পচন। ক্রমশ গালের মাংস খসে খসে পড়বে। প্রথম ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিল একজন ডেন্টিস্ট। বাবার কশের অকেজো দাঁতটা উপড়ে ফেলে শমীককে আড়ালে ডেকে বললে,—দাঁতটা তুলে বোধ হয় ভালো করলাম না। দেয়ার ইজ সাম পিকিউলিয়ার সোর। একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড়ো ডাক্তার দেখাবেন।

শমীক জিজ্ঞেস করল—কেন?

সন্দেহ হচ্ছে ক্যান্সার।

জলপাইগুড়ির বড়ো ডাক্তারও সেই একই কথা বললেন—কলকাতায় নিয়ে যান। না হলে শিয়োর হওয়া যাবে না।

গাঙ্গুটিয়া চা-বাগান থেকে শমীক তার বাবাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

আজ নিশ্চিত হওয়া গেল। থার্ড স্টেজ মানে প্রাইমারি স্টেজ নয়। শমীক জানে। বাবা জানে না।

পরদিন বাবাকে হোটেল রেখে একা হাসপাতালে গেল শমীক। বহু কষ্টে দেখা করল ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার সব শুনে হাসলেন।

হাসপাতালে রেখে লাভ কী? সারবার হলে নিশ্চয়ই রাখবার চেষ্টা করতাম। যে কয়দিন বাঁচেন আপনার বাবাকে আপনাদের কাছেই রাখুন। যা খেতে চান দিন, যা যা করতে চান সব করতে বলুন। মেক হিম হ্যাপি। হাসপাতালের লোনলিনেস আর ড্রাজারিতে শেষ ক-টা দিন কেন কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখবেন? আমাদের কিছু করার নেই।

আপনি শিয়োর যে এটা ক্যান্সার ?

ডাক্তার হাসলেন—ইচ্ছে করলে আপনি আর কাউকে কনসাল্ট করতে পারেন। ডক্টর মিত্রকে দেখান, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। অবশ্য দেখানোটা সান্ত্বনামাত্র।

রাতে খাওয়ার সময় বাবা অনুযোগ করতে থাকে—এরা একই বিচ্ছিরি খাবার দিচ্ছে, তাও তুই মাছটা ফেলে রাখছিস! ভাত তো কিছুই খেলি না। এখানে বসে সাতদিনে কত রোগা হয়ে গেছিস। ভালো করে খা।

বাবা, কাল একজন স্পেশালিস্টের কাছে যাব।

কেন?

ডক্টর মিত্রের খুব নাম। দেখি কী হয়।

প্রাইমারি স্টেজ যখন, অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

দেখানো ভালো।

অসুখটা ওরা কী বলছে? নালি ঘা তো?

তাই।

ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

বাবা তার গলা ভাত আর ঝোল দিয়ে চটকানো কাথের বাটিতে চুমুক দিয়ে বলে—কী খারাপ রান্না এদের। কিচ্ছু গেলা যায় না। তোর মা যে সেদ্ধঝোল রাঁধে তারও কেমন ভালো স্বাদ।

বাবা শমীকের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে করে বলে—কাল তোকে রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের সেই দোকানটায় নিয়ে যাব। কখনো তো খাসনি, দেখিস কেমন ভালো সন্দেশ করে ওরা! আমরা ছাত্রজীবনে দল বেঁধে গিয়ে খেয়ে আসতাম।

গতকাল নার্সটা চেঁচিয়ে বলছিল ‘ক্যান্সার’। বাবা কি সেটা শুনতে পায়নি? বায়োপসি কেন করানো হল, তাও কি বাবা জানে না? নাকি সব জেনেবুঝে বাবাও অভিনয় করে যাচ্ছে!

পরদিন সন্ধেবেলা ডক্টর মিত্রর বিশাল বাইরের ঘরে বাপ-ব্যাটায় বসে আছি। ডাক্তার টেনিস খেলতে গেছেন। আসবেন স্লিপে নাম লিখে বেয়ারার কাছে দিয়ে বসে অপেক্ষা করছেন আরও দশ-বারোজন লোক। বত্রিশ টাকা ফি দিতে পারে এমন কয়েকজন। শমীক বাইরে একবার সিগারেট খেতে বেরিয়েছিল। কী সুন্দর বাড়ি। সিনেমায় এরকম দেখা যায়। সামনে লন, গাড়িবারান্দা, লবি। পেতলের ভাসে সব অদ্ভুত গাছ। লনের ঘাস এদেশের ঘাসই নয়। সিগারেট ধরিয়ে চারদিকটা দেখছিল। সফলতা একেই বলে। কত লোক কত বেশি সুখে আছে।

গায়ের ঘাম তখনও মরেনি, অল্পবয়সি সুন্দর চেহারার এবং হাস্যমুখ ডাক্তারটি চটপটে পায়ে রুগির ঘরে ঢুকে ভেতর দিকের চেম্বারে চলে যেতে যেতে একবার রুগিদের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসে গেলেন। হাসিতে বরাভয়, এবং আত্মবিশ্বাস। শমীকের বুকটা ভরে ওঠে। বাবাকে সে ঠিক জায়গাটিতে নিয়ে এসেছে। এ তো আর হাসপাতালের বাজারি ব্যাপার নয়। এখানে ঠিকমতো পরীক্ষা হবে, বিচক্ষণ ডাক্তার ঘা পরীক্ষা করেই হেসে উঠে বললেন—আরে দুর! এতো সেপটিক কেস।

ব্যাপারটা ঠিক সে রকম হল না! ডাক্তারের চিঠিটা পড়ে মিত্র বাবাকে পরীক্ষা করলেন। বায়োপসির রিপোর্টটাও দেখলেন। মুখে হাসিটা ছিলই, আত্মবিশ্বাসও ছিল। বাবাকে বললেন—বয়স কত?

পঞ্চান্ন।

ছেলে-মেয়ে?

—তিন ছেলে, তিন মেয়ে। এইটি বড়ো।

ডাক্তার শমীকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন—কী করেন?

পড়ি। বি এ।

আর্টস! আমারও খুব ঝোঁক ছিল আর্টস পড়ার। আমার বাবা প্রায় জোর করে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন।

এইসব কথা বললেন ডাক্তার। একটা ছোট্ট চিঠি লিখে দিলেন হাসপাতালের ডাক্তারকে! বললেন—এটা ডক্টর সেনকে দেবেন। প্রেসক্রিপশন যা আছে তাই চলবে।

কিছু করার নেই? খুব আস্তে, প্রায় ডাক্তারের কানে কানে বলে শমীক। ডাক্তার হাসলেন।

রাস্তায় একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় চিঠিটা খুলে দেখল শমীক। লেখা—ডিয়ার ড. সেন, দি কেস ইজ হোপলেস। প্লিজ হেলপ দিস ম্যান। মিত্র।

বাবা শমীকের কাঁধের ওপর দিয়ে চিঠিটা দেখছিল—কী লিখে দিল রে? হোপলেস! হোপলেস ব্যাপারটা কী?

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে শমীক বলে—হোপলেস নয়। লিখেছে হেলপলেস! কলকাতায় আমরা তো কিছু জানি না, তাই লিখেছে। অসহায়।

ও। বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—বত্রিশটা টাকা নিল, কোনো প্রেসক্রিপশন দিল না?

ওই ওষুধই চলবে।

—আর বেশি ছোটাছুটি করিস না। হাসপাতাল, ডাক্তার এত কিছু করছিস কেন?

অসুখ-বিসুখে এসব একটু করতেই হয়।

আমার আর ভালো লাগছে না। যা হবার হবে, চল বাগানে ফিরে যাই।

শমীক মাথা নেড়ে বলে—তাই হবে।

বাবা উজ্জ্বল মুখে বলে—ঠিক তো?

কাল রিজার্ভেশনের চেষ্টা করব। বাস রাস্তায় এসে বাবা বলে—এখন কোথায় যাবি?

কোথায় আর যাব! হোটেলেই ফিরে যাই চল।

বাবা একটু হাসে। বলে—কাছেই গড়িয়াহাটা। চল একটু দোকানপাসার ঘুরে যাই। সস্তায়-গণ্ডায় যদি পাই তো সকলের জন্য একটু জামাকাপড় নিয়ে যাব। পুজোর তো দেরি নেই। কলকাতায় একটু সস্তা হয়।

এখন থাক বাবা। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল!

তোর জন্যই তো। খামোকা আজ বত্রিশটি টাকা দিলি।

ভালো ডাক্তারকে দেখালে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

চল, দোকানটোকান একটু দেখে যাই। গড়িয়াহাটের কাপড়ের দোকানের খুব নাম শুনি।

শমীক অগত্যা রাজি হয়। বাপ-ব্যাটায় হাঁটে গড়িয়াহাটের দিকে। বাবা গালের তুলোটা হাতের তেলোয় একটু চেপে রেখে বলে—কলকাতায় এসে তো কেবল আমাকে নিয়েই হুড়যুদ্ধ করছিস। কাল বেরিয়ে একটু একা একা ঘুরবি, সিনেমা-থিয়েটার দেখবি। তোদের বয়সে কী কেবল রোগের চিন্তা ভালো লাগে! কাল বেরোস।

শমীক উত্তর দিল না।

পরদিন সকালে উঠে বাবা বলল—কলকাতায় যা শব্দ! রাতে ভালো ঘুম হয় না! বাগানে থাকতে থাকতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে নিশুত, নিঝুম না হলে চলে না। তার ওপর আবার ছারপোকা।

শমীক জামাকাপড় পরছিল। একবার রেলের বুকিং অফিসে যাবে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—ঘায়ের ব্যথাটাও হচ্ছিল।

বিশ্রাম নাও।

একা ঘরে কি ভালো লাগবে?

তবে কী করবে?

একটু বেরোব ভাবছি। কলকাতা তো আর আমার অচেনা জায়গা নয়।

শরীর খারাপ। একা বেরোনো কি ঠিক হবে?

বাবা মাথা নেড়ে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—শরীর কিছু খারাপ নয়। বেশ তো আছি। কাছেই যাব, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে। খগেন ওখানে থাকত।

খগেনকাকা! তোমার বন্ধু তো!

ছেলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বাবা বলে—হ্যাঁ। এখন আছে কিনা কে জানে! বিশ বছর খবর জানি না। বেঁচেই নেই হয়তো। আমাদের তো এখন সব যাওয়ার বয়স। একে একে সব রওনা হয়ে পড়ব।

শমীক বলল—খগেনকাকার ওখানে যাবেই যদি তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

বাবা একটু অবাক হয়ে বলে—তুই সঙ্গে যাবি?

না হলে তুমি একা এই ভিড়ে যেতে পারবে নাকি?

বাবা একটু ইতস্তত করে বলে—চল।

মনে মনে হাসে শমীক। খগেনকাকা বাবার কেমন বন্ধু তা সে জানে না। শুধু এইটুকু জানে, বাবা যৌবনবয়সে একটি মেয়েকে এসরাজ শেখাত। সেই মেয়েটির প্রতি এক প্রগাঢ় দুর্বলতা জন্মেছিল। কিন্তু বাবা তাকে বিয়ে করতে পারেনি। বিয়ে করেছিল খগেনকাকা। সে ছিল বড়োলোকের ছেলে। এ ঘটনা বাবা মাকে গল্প করেছিল। মায়ের কাছে তারা শুনেছে। খগেন নামটা শুনেই পূর্বাপর মনে পড়ে গেল।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। বিশাল বাড়ি! সিঁড়িতে এবং দেওয়ালের নীচের দিকে এখনো মার্বেল পাথর দেখা যায়। মস্ত দরজা হাঁ করে আছে। তবে বাড়ির শ্রী দেখলেই বোঝা যায় অবস্থা পড়তির দিকে। রং চটে গেছে, জানালা-দরজার পাল্লা জীর্ণ, ভিতরের চিৎকার-চেঁচামেচিতে বোঝা যায় যে দু-চার ঘর ভাড়াটেও বসেছে।

একজন চাকর গোছের লোক তাদের ওপরে নিয়ে গেল। চিকফেলা বারান্দা, ডানদিকে ঘুরে দরদালান। দরদালানের প্রথম ঘরটায় তাদের বসিয়ে বলল—বাবু এ সময়টায় থাকেন না। গিন্নিমাকে খবর দিচ্ছি।

বাবা একটু ইতস্তত করে বলে—খগেন বেরিয়ে গেছে?

আজ্ঞে।

তাহলে গিন্নিমাকেই বলো, অমিতাভ গাঙ্গুলি এসেছে। একসময়ে তোমার গিন্নিমাকে আমি বাজনা শেখাতাম। বললে হয়তো চিনতে পারবে।

বলেই বাবা শমীকের দিকে চেয়ে হাসে। কুণ্ঠার সঙ্গে বলে—ছাত্রী ছিল।

শমীক সব জানে। তবু ভালোমানুষের মতো বলে—তাই নাকি!

বাবা শ্বাস ফেলে বলে— কতকালের কথা সব, খগেনটা সুদখোর ছিল। সুদেরই কারবার ওদের। কালোয়ারি ব্যাবসাও আছে বটে, তবে টাকা খাটানোটাই ছিল আসল।

এ ঘরটা বেশ বড়ো। পুরোনো আমলের বড়ো মেহগনি টেবিল, আবলুশ কাঠের কালো চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। সূক্ষ্ম সব ফুল, লতাপাতা আর ময়ূরের কাজ করা বার্মা-সেগুনের চেয়ার। চেস্ট অফ ড্রয়ার্সের ওপরে একটা ঢাকনা দেওয়া বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় যে, এটা এসরাজ। পাশে একটা তবলা আর পেতলের ডুগি, গদিমোড়া হয়ে বিড়ের ওপর ঘুমোচ্ছে। বাবা এখনও গাঙ্গুটিয়ায় সন্ধের পর মাঝে মাঝে এসরাজ নিয়ে বসে। শমীক তবলা ঠোকে।

বাবা হঠাৎ আপনমনে মাথা নেড়ে বলল—চিনতে পারবে না বোধহয়!

কে চিনতে পারবে না?

কমলা। কতকালের কথা! বলে বাবা অপ্রতিভ মুখখানা ফিরিয়ে নেয়। গালের তুলোটা হাতের তেলোয় চেপে ধরে। বলে—চেহারাও পালটে গেছে।

নীচের তলায় ভাড়াটেদের গলার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু ওপরতলাটা নিস্তব্ধ। সম্ভবত এ বাড়িতে লোকজন বেশি নেই। একটা ধূপধুনোর গন্ধ আসছিল। একবার একটু পুজোর ঘণ্টা নাড়ার শব্দ এল। বাপ-ব্যাটায় বসে থাকে মুখোমুখি। শমীক বাবার দিকে তাকায় তো বাবা চোখ সরিয়ে নিয়ে দেওয়ালের অস্পষ্ট পুরোনো অয়েলপেইন্টিং দেখতে থাকে। হঠাৎ আপনমনে বলে—নেই-নেই করেও এখনও অনেক আছে। এ বাড়িটার ভ্যালুয়েশনই পাঁচ-সাত লাখ টাকা হবে। অথচ সুদের কারবারির নাকি ভালো হয় না। এরা তবে এত ভালো আছে কী করে?

শমীক একটু হতাশ হয়। পুরোনো প্রেমিকার বাড়িতে বসে আবার এ কীরকম বিষয়ী কথাবার্তা! একটু পরেই সে আসবে, কাঁপা বুক, স্মৃতি আর অধৈর্য নিয়ে বসে থাকার কথা এখন। তেষ্টা পাবে, কথা হারিয়ে যাবে, দৃষ্টি চঞ্চল হবে। এ সময়ে বাড়ির ভ্যালুয়েশনের কথা মনে আসবে কী করে?

বাবা শমীকের দিকে তাকিয়ে বলে—তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

হোক দেরি। শমীক দৃশ্যটা দেখতে চায়। বাবা যদি কণামাত্র খুশি হয়, যদি প্রেমিকাকে দেখে একটুমাত্র জীবনীশক্তি আহরণ করতে পারে, তবে শমীকের বুক ভরে যাবে। সে মুখে বলে—না। দেরি হচ্ছে না।

রিজার্ভেশন যদি না পাস!

পাব না ধরেই নিয়েছি। গাড়িতে যা ভিড়। না পেলে ব্ল্যাকে কিনে নেব।

আবার গুচ্ছের টাকা নষ্ট। কাল কাপড়জামায় অনেক বেরিয়ে গেছে।

শমীক হাসল। আবার বিষয়ী কথা! মুখে বলে—সে তো তোমার জন্যই। অত কিনতে কে বলেছিল?

বাবা অপ্রতিভ হাসে। শমীক দরজার দিকে পাশ ফিরে বসেছিল, বাবার দিকে চেয়ে। বাবার দরজার দিকে মুখ। হঠাৎ দেখল, বাবার মুখটা পালটে গেল। শরীরটায় একটু শিহরণ কি!

শমীক তাকিয়ে মহিলাকে দেখতে পায়। মাথায় অল্প ঘোমটা, ফরসা, সুগোল ভারী চেহারা, মুখখানা প্রতিমার মতো সুশ্রী। তার নিজের মায়ের মতোই বয়স হবে, তবে ইনি অনেক সুখী। মুখে একটু হাসি।

বাবা উঠে দাঁড়ায়। মহিলা এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

চিনতে পেরেছ? বাবা জিজ্ঞেস করে।

ওমা! চিনব না? এই ছেলে বুঝি!

বড়োজন।
বসুন।
বাবা বসে। মহিলাও বসেন একুট দূরে চেয়ারে। সাবধানি গলায় বলেন—কবে আসা হল? গালে ওটা কী?
বাবা গালের তুলোয় হাত চেপে বলে—এর জন্যই আসা। একটা ঘায়ের মতো। ডাক্তার বলেছে, ভয়ের কিছু নয়।
ঘা!
দাঁত তুলে সেপটিক হয়ে গিয়েছিল।
ও।
তোমরা সব কেমন আছ? বহুকাল খবরবার্তা পাই না।
মহিলা হাসেন। বলেন—আপনি সেই চা-বাগানে এখনো আছেন?
হ্যাঁ। ওখানেই জীবন শেষ করে ফেললাম।
মহিলা একাট শ্বাস ফেললেন—জানি সবই।
বাবা একটা গলা খাঁকারি দেয়। বলে—খগেনের কেমন চলছে?
ওই একরকম।
বাবা হেসে বলে—খুব বাবু মানুষ ছিল। সেই কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, আর বত্রিশজোড়া জুতো এখনও চালাচ্ছে? চুলে কলপ-টলপ দেয় না?
মহিলা মুখে আঁচল তুলে হাসি ঢাকেন। মৃদুস্বরে বলেন—কলপের দরকার হয় না। টাক পড়ে গেছে।
পড়ারই কথা। বলে বাবা গম্ভীর হয়ে যায়। এসরাজটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলে—এখনও বাজাও?
মহিলা মাথাটা নুইয়ে দেন। মাথা নাড়েন। না, বাজান না।
বাবা চুপ করে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। হলঘর থেকে দেয়ালঘড়ির শব্দ আসে। চাকর মিষ্টির প্লেট রেখে যায়। গেলাসে জল। চা।
বাবা প্লেটের দিকে চেয়ে বলে—চিবোতে পারি না।
কষ্ট হয়?
হুঁ। আমার পথ্য লিকুইড।
শরবত করে দিই?
না।
মহিলা তবু উঠে যান। বোধহয় শরবতের ফরমাশ দিয়ে এসে আবার বসেন। ঘোমটা খসে গেছে। এখনও কী গহিন কালো চুলের রাশি!
খগেনকে বোলো, আমি এসেছিলাম। কাল বা পরশু ফিরে যাব।
মহিলা চুপ করে থাকেন। শমীক একটা-দুটো মিষ্টি খায়। চা শেষ করে। তারপর উঠে বলে—বাবা, আমি আসি।
—যাবে? বাবা তটস্থ হয়ে বলে—আমিই বা থাকি কেন? খগেন যখন নেই!
মহিলা ঘোমটা আবার মাথায় তুলে শমীককে বলেন—তুমি এখন কোথায় যাবে বাবা?
একটু কাজ ছিল।
আমি ওঁকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। উনি একটু থাকুন এখানে, কেমন?
বাবা অপ্রতিভ হয়। শমীক এটাই চাইছিল। তার সামনে জমবে না ওদের। তার পালানো দরকার এখন। সে মহিলাকে একটা প্রণাম করে বলে—আচ্ছা। বাবার কোনো তাড়া নেই। সারাদিন তো একা।
মহিলা হাসলেন। বললেন—আমারও তাই। একা।
বলেই সামলে গেলেন। হেসে বললেন—ছেলেপুলে নেই তো।

খুব ধীরে শমীক দরদালানে বেরিয়ে আসে। বারান্দা পার হয়। সিঁড়ির মুখে চলে আসে। আর সেইখানে নিস্তব্ধ সিঁড়ির মুখে চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থাকে। কীসের জন্য যেন উন্মুখ উৎকর্ণ হয়ে থাকে। আর হঠাৎ শুনতে পায়, মৃদু একটা সুরের কেঁপে ওঠা। এসরাজ বেজে উঠল।

নিশ্চিন্তে শমীক সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে।

দুপুরে যখন খেতে হোটেলে ফিরেছিল শমীক তখনও বাবা ফেরেনি। শমীক তাই বেরিয়ে পড়ল। মন ভালো ছিল না। এলোপাতাড়ি ঘুরল কেবল। বাবাজি চললেন। গাছের মতো, স্তম্ভের মতো বাবাজি আর থাকবেন না। তিনটে বোনের বিয়ে বাকি, ভাইরা এখনও নাবালক। কিন্তু সে সমস্যার চেয়ে বড়ো হচ্ছে শোক। সংসারের অপরিত্যাজ্য, অবিভাজ্য একজন থাকবে না। লোকটা তার প্রেমিকার বাড়িতে সকালে এসরাজ বাজাতে বসেছিল। জানে না একটা কালো হাত নালি ঘা বেয়ে নেমে যাচ্ছে তার বুকের সুরের উৎসের দিকে। প্রাণঘড়ির কল টিপে বন্ধ করে দেবে। নার্সটা চেঁচিয়ে বলেছিল—ক্যান্সার, থার্ড স্টেজ। কিছু করার নেই। সেকথা বাবা কী শোনেনি! কিংবা ডাক্তার মিত্রের লেখা চিঠিখানায় 'হোপলেস' শব্দটিও কী দেখেনি নিশ্চিতভাবে! বড়ো অবাক লাগে। লোকটা নিশ্চিন্ত মনে এসরাজ বাজাচ্ছিল আজ সকালেও!

ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। এসে দেখল, বাবা খুব নিবিষ্ট মনে স্যুটকেস গোছাচ্ছে। তাকে দেখে আনন্দিত স্বরে বলে—আয়। কোথায় ছিলি!

ঘুরলাম। তুমি দুপুরে ফেরোনি?

না। ছাড়ে নাকি! দুপুরে খাওয়াল। ঝোলভাত মেখে নরম করে দিল, ঘোল-টোল, শরবত, ফলের রস, মধু, কত কী!

শমীক হাসে। বলে—ভালো।

বাবার মুখে একটা রক্তাভা। একটু বুঝি হালকা-পলকা তার মন। একটা হাওয়া এসে মনের ওপরকার সব ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বলল—একটা রাগ শেখাচ্ছিলাম সেই কবে! পুরোটা তখনও তুলতে পারেনি, হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল। আর শেখা হয়নি। আজ সারাদিন সেটা শিখিয়ে দিয়ে এলাম।

অসম্পূর্ণ একটা কাজ সম্পূর্ণ হল।

খগেনকাকার সঙ্গে দেখা হয়নি?

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—না। সে নাকি অনেক রাতে ফেরে। আমি আর বসলাম না। রাত হয়ে যাচ্ছিল।

রিজার্ভেশন পেয়েছি বাবা। কালকের।

পেয়েছ! বা:, নিশ্চিন্ত! বলে বাবা খুব খুশি হয়। বলে—

সবদিক দিয়েই ভালো হল। কী বলিস!

হ্যাঁ, বাবা।

বাবা খুব একরকম উজ্জ্বল হাসে। বিছানার ওপর ছড়ানো নতুন কেনা শাড়ি, প্যান্ট আর শার্টের কাপড়, টুকটাক নানান জিনিসের দিকে মমতাভরে তাকিয়ে থাকে বাবা। বলে—জিনিসগুলো খারাপ কিনিনি, না রে? সবাই খুশি হবে।

শমীক একটু দুষ্টুমি করে বলে কিন্তু অত দামি জিনিস কিনেছ! অত দামি জামাকাপড় তো আমরা কখনো পরি না।

তা হোক, তা হোক। বাবা খুশির গলায় বলে—আমার তো এটাই শেষ পুজোর বাজার। এবারটায় না হয় দামিই দিলাম।

বড়ো চমকে যায় শমীক। একদৃষ্টে বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তবে কী বাবা জানে! জেনেও বাবা স্বাভাবিক আছে? অত আনন্দ। অত খুশির মেজাজ। শমীক মনে মনে বলে, তবে কি জানো বাবা?

বাবা তার দিকে চোখ তুলে চায়। বলে—একটা অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হল, বুঝলে! কমলাকে রাগটা শিখিয়ে এলাম। মনটা বহুকাল ধরে ভার হয়েছিল।

বাবা চুপ করে হাসিমুখে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। শমীক পরিষ্কার বুঝতে পারে, বাবার চোখ নি:শব্দে তার প্রশ্নের জবাব দিল—জানি হে জানি!

তৃতীয় পক্ষ

একদম আনকোরা, টাটকা, নতুন বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল কনিষ্ক গুপ্ত। বউয়ের নাম শম্পা। শম্পার সঙ্গে বিয়ের আগে কখনো দেখা হয়নি গুপ্তর। প্রেম-ট্রেমের প্রশ্নই ওঠে না, এমনকী বিয়ের আগে শম্পাকে চোখেও দেখেনি। একটা ফোটোগ্রাফ অবশ্য পাঠিয়েছিল ওরা কিন্তু গুপ্ত সেটাও স্পর্শ করেনি।

বিয়ের আগে গুপ্তর একটা প্রেম কেঁচে যায়। সে বিয়ে করতে চেয়েছিল মলি নামে এক স্কুল-শিক্ষিকাকে। মলি দেখতে-শুনতে যাই হোক, স্বভাব যেমন ধারাই হয়ে যাক না কেন, গুপ্ত তাকে ভালোবাসত। মলিরও গুপ্তর প্রতি ভালোবাসার অভাব দেখা যায়নি কখনো।

কিন্তু ঠিক মাসছয়েক আগে এক বিকেলে ভিক্টোরিয়ার বাগানে বসে মলি গুপ্তকে একটা সদ্য চেনা চৌকশ ছেলের বিবরণ দিয়েছিল, ছেলেটা নাকি দুর্দান্ত স্মার্ট, আই এ এস দিয়েছে এবং নির্ভুল ইংরিজি গড়গড় করে বলতে পারে। গুপ্ত এর কোনোটাই পারে না। সে একটা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক, কিন্তু অধ্যাপনায় তার একদম সুনাম নেই। বরং ছাত্ররা তার ক্লাস কামাই করে, একবার তার বিরুদ্ধে জয়েন্ট পিটিশনও দিয়েছিল অধ্যক্ষের কাছে।

তাই মলির মুখে এক অচেনা ছেলের চৌকশের বিবরণ শুনে সে একটু নার্ভাস হয়ে যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার পছন্দ নয়। কারণ বরাবর গুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেছে।

ইস্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ার সময়ে একবার সে ইস্কুল-স্পোর্টসে নাম দেয়। একশো মিটার দৌড়ের শুরুতে সে বেশ এগিয়ে গিয়েছিল, অন্তত সেকেণ্ড প্রাইজটা পেতই। হঠাৎ নিজের এই আশু সাফল্য টের পেল সে। বুঝল, সে সেকেণ্ড হতে চলেছে। দৌড়শেষে ফিতেটাও খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু যেই ব্যাপারটা সে টের পেল অমনি তার দুই হাঁটুর একটা হঠাৎ কেন যে আর একটাকে খটাং করে ধাক্কা মারল কে জানে! সেখানেই শেষ নয়। শোধ নিতে অন্য হাঁটুটাও এ হাঁটুকে দিল গুঁতিয়ে। কনিষ্ক গুপ্ত ফিতে ছুঁতে পারল না, দৌড়শেষের কয়েক গজ দূরে নিজের দুই হাঁটুর হাঙ্গামায় জড়িয়ে বস্তার মতো পড়ে গড়াগড়ি খেল।

আর একবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চোদ্দোশো সাল আবৃত্তি করার সময়ে সে এত চমৎকারভাবে কবিতাটির অন্তর্নিহিত ব্যথা ও বেদনাকে কণ্ঠস্বরে প্রক্ষেপ করেছিল যে নিজেই বুঝেছিল, প্রতিযোগিতায় তার ধারে-কাছে কেউ আসতে পারবে না। শ্রোতারাও শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। কবিতার শেষ কয়েকটা লাইনে এসে কনিষ্ক যখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এক সেট রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম পুরস্কারটি তার হাতের নাগালে তখনই হঠাৎ কোথা থেকে এক ভূতুড়ে বিভ্রম এসে তার মাথার ভেতরে জল ঘোলা করে দেয়। শেষ দু-টি লাইন একদম মনে পড়ল না। বারকয়েক তোতলাল সে। তারপর নমস্কার করে লজ্জায় রাঙা মুখ নিয়ে উইংসের আড়ালে চলে এল। একটা সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছিল সেবার।

বড়ো হওয়ার পর একবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রেসের মাঠে গিয়েছিল কনিষ্ক। রেসের কিছুই তার জানা নেই, মহাআনাড়ি যাকে বলে। সে তাই ঠিক করল সব ক-টা রেসের দু-নম্বর ঘোড়ার ওপর একটা করে বাজি খেলবে।

প্রথম তিনটে রেসে খেললও দু-নম্বর ঘোড়ায়। তিনটেতেই দু-নম্বর ঘোড়া হেরে গেল। তখন এক বন্ধু বলল কি আনাড়ির মতো পয়সা নষ্ট করছিস? দেখে-শুনে বাছাই ঘোড়ার ওপর খেল!

একটু দ্বিধায় পড়ে গেল কনিষ্ক। তখন প্রায় পনেরো টাকার মতো লস চলছে। এই দ্বিধাই তার কাল হল। পরের চারটে রেসে সে বাছাই ফেবারিট ঘোড়াগুলোর ওপর বাজি ধরতে লাগল। সব ক-টাতেই হার। কিন্তু শেষ চারটে রেসে প্রতিবার জিতল দু-নম্বর ঘোড়া।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতাকে তাই বড়ো ভয় পায় কনিষ্ক গুপ্ত। মলির মুখে সেই অচেনা পুরুষটির প্রশংসা শুনে সে মনে মনে খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। এতকাল মলিকে নিয়ে তার কোনো ভাবনা ছিল না। খুব সহজ ছিল সম্পর্ক।

ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার জন্য সে পরদিন নিজে থেকেই সেই ছেলেটির প্রসঙ্গ তুলে বলল—মলি, কাল তুমি সুব্রত নামে ছেলেটির কথা বলছিলে, তার কথা শুনতে আমার বেশ লাগছিল। কেমন দেখতে বলো তো?

মেয়েরা গন্ধ পায়। মলি একবার সচকিত হয়ে কনিষ্কের দিকে তাকাল। আর মলির সেই সচকিত ভাবটুকু দেখে কনিষ্কও বেশ সচকিত হয়ে ওঠে। মানুষের দুর্বল গোপনীয় কোনো বিষয়ে স্পর্শ হলে মানুষ ওই রকম চমকে ওঠে। কেমন করে। কিন্তু মলির সে-ভাবটা বেশিক্ষণ রইল না। আসলে সুব্রতর চালচলনে সে এত বেশি মুগ্ধ হয়েছে যে সেকথা কাউকে না বলেই বা থাকে কী করে?

মলি বলল—দেখতে? ধরো ছ-ফুট লম্বা, ছিপছিপে, রং একটু কালো হলেও মুখখানা ভীষণ চালাক। এত সুন্দর হাসে!

কনিষ্ক নিজে পাঁচ ফুট পাঁচ। রোগা, ফ্যাকাশে এবং ভাবুক ধরনের চেহারা। সে আবার ভীষণ অন্যমনস্কও। প্রায় সময়েই এককথার আর এক উত্তর দেয়। মনে মনে নিজের পাশে সুব্রতকে কল্পনা করে সে ঘুমিয়ে গেল।

মলির সঙ্গে সেই থেকে সম্পর্কটা আর স্বাভাবিক রইল না। মাঝখানে এক অচেনা সুব্রত এসে পর্দা ফেলে দিল।

পরের এক মাস কনিষ্ক নানা জ্বলুনিতে জ্বলে গেল মনে মনে। মলি তখন প্রায় সময়েই সুব্রতর সঙ্গে প্রোগ্রাম করে। তবে সে একথা বলত—দেখো, হিংসে কোরো না যেন। কোনো পুরুষই তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় আমার কাছে।

কিন্তু কনিষ্ক সেকথা মানে কী করে? সে যে অনবরত হীনম্মন্যতায় ভুগছে।

তাই একদিন সে তার পরিষ্কার গোটা গোটা হস্তাক্ষরে চিঠি লিখে মলিকে জানিয়ে দিল—আমাদের আর বেশিদূর এগোনো ঠিক নয় মলি। এখানেই দাঁড়ি টেনে দেওয়া উচিত।

চিঠি লিখে সে দু-মাসের ছুটি নিয়ে বাইরে গেল বেড়াতে। এতদিনে বাড়ির লোকেরা তার বিয়ে ঠিক করল। মাত্র পনেরো দিন আগে সে সম্পূর্ণ অদেখা, অচেনা, অজানা শম্পাকে বিয়ে করেছে। বলতে কি, শম্পার সঙ্গে তার প্রথম দেখা শুভদৃষ্টির সময়ে। ভালো করে তাকায়নি কনিষ্ক। তার মনে তখন এক বিদ্রোহ ভাব। সমস্ত পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণা, বিরাগ, ভয়।

গত পনেরো দিন সে যে শম্পার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশেছে তা বলা যায় না। কথাবার্তা হয়েছে, পাশাপাশি এক বিছানায় শুয়েছে, প্রাণপণে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে মেয়েটির প্রতি। কিন্তু তা বলে তার মনে হতাশা ও সন্দেহের ভাবটি যায়নি। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীর সর্বত্র তার চেয়ে বহুগুণে যোগ্যতর লোকেরা ছড়িয়ে আছে। সে একটা হেরো লোক। নিজের সম্পর্কে এইসব জরুরি চিন্তা তাকে এত বেশি ব্যস্ত

রেখেছিল যে, তার কাম তিরোহিত হয়, আগ্রহ কমে যেতে থাকে, শম্পা দেখতে কেমন তাও সে বিচার করে দেখেনি।

কনিষ্কর মা আজ সকালে তাকে ডেকে বললেন—খোকা, বউমা কেন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে রে? তোর কি বউ পছন্দ হয়নি?

কনিষ্ক মুশকিলে পড়ে বলে, তা নয়। আমি তো ভালো ব্যবহারই করি।

শুধু ভালো ব্যবহারেই কী সব মিটে যায় বাবা? পুরোনো কথা ভুলে এবার নতুন করে সব শুরু করে দাও। যাকে ঘরে এনেছ তার দিকটা এবার দেখো। বউ তো ক্রীতদাসী নয়, তার মনের দিকে নজর দিতে হবে।

কী করব মা? আমার হইচই ভালো লাগে না।

হইচই করতে হবে না, আজ বিকেলে বউমাকে নিয়ে বেড়াতে যা।

দ্বিরাগমন সেরে আসবার পর দুজনে মিলে তো কোথাও গেলি না দেখলাম।

অনেক ভেবেচিন্তে প্রস্তাবটা গ্রহণ করল কনিষ্ক। আসলে মলি বা সুব্রতর কথা ভাবার কোনো মানেই হয় না। কেন-না এই নতুন অবস্থায় সে আর পুরোনো সম্পর্কের মধ্যে ফিরে যেতে পারে না।

সিনেমা দেখার কথা ছিল, কিন্তু টিকিট পাওয়া যায়নি। তাই নিছক ঘুরে বেড়ানোর জন্যই দুজনে বেরিয়েছে। কথা আছে, আজ রাতে বড়ো কোনো রেস্টুরেন্টে দুজনে রাতের খাওয়া সেরে একেবারে বাড়ি ফিরবে।

কনিষ্ক ট্যাক্সি নিয়েছিল। টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে খানিকদূর আসতেই শম্পা বলল, শোনো, ট্যাক্সিটা এবার ছেড়ে দাও।

কেন?

ট্যাক্সি করে আমাদের মতো লোক বেড়াতে যায় না। মধ্যবিত্তরা প্রয়োজনে ট্যাক্সি নেয়। বেড়ানোর জন্য ট্যাক্সি ভালো নয়।

তবে কীসে যাবে? ট্রামে-বাসে যা ভিড়!

হোক। তবু ভিড় ভালো। কত মানুষ দেখা যায়।

কনিষ্ক নড়েচড়ে বলে, তুমি কি ভিড় পছন্দ কর? আমি করি না।

—ভিড় নয়, তবে মানুষ পছন্দ করি। ট্যাক্সির ভিতরে নিঝুম হয়ে বসে থাকাটা ভারী একঘেয়ে। কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না।

কনিষ্ক রাসবিহারীর মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

হাঁটতে হাঁটতে শম্পা বলল, তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে শাশুড়ি-মা আমাকে বারণ করেছেন। কিন্তু আমার একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে।

কী?

তুমি এত অহংকারী কেন?

আমি অহংকারী?

নয়?

কনিষ্ক অবাক হয়ে বলে—মোটেই নয় শম্পা। বরং আমি ঠিক উলটোটাই সব সময়ে ভাবি। আমার মনে হয়, আমি বড়ো অপদার্থ পুরুষ।

সে কী! কেন?

আমি তো তেমন স্মার্ট নই। লম্বা-চওড়া নই। আমার ভেতরে হাজার রকমের ডেফিসিয়েন্সি।

শম্পা খুব খিলখিলিয়ে হাসে। বলে—তাই নাকি! তাহলে তো তোমাকে বিয়ে করাটা মস্ত ভুল হল!

হলই তো।

শোনো। ভাবতে গেলে, আমারও হাজারটা ডেফিসিয়েন্সি। নিজের দোষ কোলে করে বসে থাকলে তো জীবনটাই তেতো হয়ে গেল।

শীতকালের বেলা। ক্রিসমাসের ছুটি চলছে। হাজারটা লোক বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। অপরাহ্লের কোমল কবোষ্ণ রোদে আর ছায়ায় অপরূপ হয়ে আছে পথঘাট।

এই আলোয় আজ কনিষ্ক শম্পার মুখশ্রী খুব অকপট চোখে দেখল। তুলনা করে নম্বর দিলে মলি আর শম্পা প্রায় সমান সমান নম্বর পাবে। শম্পার তুলনায় মলি কিছু লম্বা ছিল, কিন্তু সেই রকম আবার মলির চেয়ে শম্পা ফর্সা। মলির শরীরে কিছু বাড়তি মেদ ছিল বলে পেটে ভাঁজ পড়ত। শম্পার সেসব নেই। মলির মুখখানা ছিল গোল ধরনের। শম্পার মুখ লম্বাটে, লাবণ্য শম্পারই বেশি, কারণ সে বয়সে মলির চেয়ে কম করে পাঁচ বছরের ছোটো। বি এ পরীক্ষা দিয়েই তার বিয়ে হয়েছে।

কনিষ্কর কথাটা ভালো লাগল। নিজের দোষ কোলে করে বসে থাকাটা কাজের কথা নয়।

সে বলে, আমাকে তোমার কেমন লাগে?

আগে বলো, আমাকে তোমার কেমন?

শোনো শম্পা, তোমাকে কেমন লাগে তা আমি এখনও ভেবেই দেখিনি।

আচমকা শম্পা বলে—মলিকে তোমার কেমন লাগত?

কনিষ্ক থমকে যায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে, তুমি জানলে কী করে?

তোমার মা বলেছেন।

মা?

—মা সব বলে দিয়েছেন আমাকে। আরও বলেছেন, আমি যেন এসব তোমাকে জিজ্ঞেস না করি।

শ্বাস ফেলে কনিষ্ক বলে, জিজ্ঞেস করে ভালোই করেছ। মলিকে আমার ভালোই লাগত। শুধু শেষদিকে।

শম্পার মুখখানা ভার হয়ে গেল। কনিষ্কর মুখ-চোখও লাল দেখাচ্ছে। সে বড়ো অস্বস্তি বোধ করে বলে, এসব কথা কি ভালো?

শম্পা বলে—ভালো নয়। কিন্তু আমাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে যদি তৃতীয় কোনো লোক নাক গলায় তবে সেই তৃতীয় লোকটাকে জেনে রাখা দরকার।

অবাক হয়ে কনিষ্ক বলে—তুমি তো ভীষণ বুদ্ধিমতী। এত গুছিয়ে কথা বলো কী করে? মাথায় আসে?

শম্পার ভার মুখ হালকা হয়ে গেল। হেসে বলে—যা:।

সত্যি বলছি, তুমি খুব ভালো কথা বলতে পারো। আমি পারি না।

শম্পা বলে, বাপের বাড়িতে আমাকে সবাই কটকটি বলে ডাকত। আমি নাকি ভীষণ কটকট করে কথা বলি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দেশপ্রিয় পার্ক বরাবর এসে গেল। গলার স্কার্ফটি ভালো করে জড়িয়ে শম্পা বলে—একটু চা খেতে পারলে বেশ হত। আজ যা শীত!

কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট। কিন্তু আজ ছুটির দিনে সেখানে বেশ ভিড়। বসার জায়গা নেই।

কনিষ্ক বলে—আর একটু হাঁটি চলো। পোস্ট অফিস ছাড়িয়ে একটু এগোলে বোধহয় গাছতলায় একটা দেশওয়ালি চায়ের দোকান পাওয়া যাবে।

তাই হল। গাছতলার দোকানদার দু-ভাঁড় চা বড়ো যত্নে এগিয়ে দেয়। শম্পা আর কনিষ্ক দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চুমুক দেয়।

কনিষ্ক বলে—কেমন?

বেশ গো।

কনিষ্ক খুশি হয়ে পয়সা মিটিয়ে দেয়। বলে—খিদে পেয়েছে নাকি? কিছু খাবে?

কে খাওয়াবে? আমার তো পোড়া কপাল, কেউ পছন্দ করে না।

কনিষ্ক হেসে বলে—কটকটি, এবার কিন্তু কথা ফেইল করলে।

কেন?

—যে চা খাওয়াল সেই খাবার খাওয়াতে পারে। আর কে খাওয়াবে?

মলির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হল কেন? হঠাৎ শম্পা প্রশ্ন করে।

ঝগড়া! না, ঝগড়া হয়নি তো। ও একটা ছেলের খুব প্রশংসা করত। সেটা আমার সহ্য হত না।

ওমা! তাই নাকি? এসব তো মা আমাকে বলেনি!

মা জানবে কী করে? কনিষ্ক গুপ্ত বলে—মা শুধু জানত, মলির সঙ্গে আমার ভাব।

এখন তুমি মলির কথা খুব ভাবো না? ভাবো, আমার মতো একটা বিচ্ছিরি মেয়ের সঙ্গে কেমন হুট করে বিয়ে হয়ে গেল। সারাটা জীবন কেমন ব্যর্থতায় কাটবে।

কনিষ্ক খুব হতাশার ভাব করে বলে, কতকগুলো ভাবনা আছে যা তাড়ানো যায় না। বিরহ ভোলা যায়, কিন্তু অপমান কী সহজে ভোলে মানুষ? কিংবা ঈর্ষা? হীনম্মন্যতা?

শম্পা মুখখানা করুণ করে বলে, আমাকে একটা কথা বলতে দেবে? ধরো আজ তোমার কাছে আমার খুব একটা দাম নেই। তুমি ভালোবাসতে পারছ না আমাকে। অথচ আমি তোমার কাছে কত সহজলভ্য। কিন্তু দেখো, সুজন নামে একটা ছেলে আছে। তার কাছে শম্পাই হল আকাশ-পাতাল জোড়া চিন্তা। শম্পার জন্য কী জানি সে হয়তো আত্মহত্যার কথা ভাবে। পৃথিবীতে শম্পা ছাড়া বেঁচে থাকা কত কষ্টের সে জানে একমাত্র সুজন। তুমি তা কখনো জানবে না, বুঝবে না। পথিবীটা ঠিক এরকম নিষ্ঠুর।

চোয়াল কঠিন করে কনিষ্ক বলে, সুজন কে?

সে একটা ছেলে। আমাকে ভালোবাসত। কোনোদিন তাকে পাত্তা দিইনি। কিন্তু আজ অনাদরের মাঝখানে থেকে তার কথা খুব মনে হয়।

কনিষ্ক স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে।

সেই রাতে শম্পা আর কনিষ্কর ভালোবাসার মাঝখানে অনেকবার মলি এসে হানা দিল, এল সুজনও। দুজনে এসে এক অদৃশ্য প্রজাপতির দুটি ডানার মতো কাঁপতে লাগল। তাতে বড়ো সুন্দর হল কনিষ্ক ও শম্পার ভালোবাসার নিরালা ঘরটি।

খেলার ছল

মিঠুর গোল গোল মোটামোটা দুটো পায়ের একটা জীবনের বুকের ওপর আর একটা তার শোয়ানো হাতে। তার বুকের ওপর কাত হয়ে শুয়েছে মিঠু, ঘাড়ের কাছে মাথা আর ল্যাভেণ্ডারের গন্ধময় চুল। জীবন কানের ওপর মিঠুর দুরন্ত শ্বাসপ্রশ্বাস আর কবিতা আবৃত্তি শুনতে পাচ্ছিল: 'ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা, তাহারি মাঝারে দেখে আপনার সূর্য-তারা। তারি একধারে আমার ছায়ারে আনি মাঝে মাঝে দুলায়ো তাহারে, তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো কলধ্বনি' ...একটা ছোটো নরম হাতে মিঠু তার বাবার গাল ধরে মুখটা ফিরিয়ে রেখেছে তার দিকে! জীবন অন্যমনস্ক ভাব দেখালেই মুখ-টেনে নিয়ে বলছে 'শোনো-না বাবা!'

মিঠুর ভারী শরীর, নরম তুলতুলে। বুকের ওপর যেখানে মিঠুর পা সে-জায়গাটা অল্প ধরে আসছিল জীবনের। পা-টা একবার সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে মিঠু দাপিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই উঠে এল জীবনের বুকের ওপর, দুই কনুইয়ের ভর রেখে জীবনের মুখের দিকে হেসে হঠাৎ অকারণে ডাকল, 'বাবা!'

'উঁ।'

'তুমি শুনছ না।'

'শুনছি মা-মণি।' জীবন চোখ খুলে তার ছয় বছরের শ্যামবর্ণ মেয়েটির দিকে তাকাল, হঠাৎ তার বুক কানায় কানায় ভরে ওঠে। চুলে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ, চোখে কাজল, মুখে অল্প পাউডারের ছোপ—এত সকালেই মেয়ে সাজিয়েছে অপর্ণা। না সাজালেও মিঠুকে দেখতে খারাপ লাগে না। কী বড়ো বড়ো চোখ, আর কী পাতলা ঠোঁট মিঠুর। জীবন মিঠুকে আবার দু-হাতে আঁকড়ে ধরে বলে, 'তোমার কবিতাটা আবার বলো।' মিঠু সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠে, 'ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' শুনতে শুনতে সকালের গড়িমসির 'ঘুমঘুম' ভাবটা আবার ধীরে ধীরে জীবনকে পেয়ে বসতে থাকে। বলতে কী, সারাদিনের মধ্যে মিঠু আর তার বাবাকে নাগালে পায় না, সকালের এটুকু সময় ছাড়া। তাই এটুকুর মধ্যেই সে পুষিয়ে নেয়। ধামসে, কামড়ে, কবিতা বলে, গান গেয়ে বাবার আদর কেড়ে খায়। জীবনের মাঝে মাঝে বিশ্বাস হতে চায় না যে, এই সুন্দর, সুগন্ধি মেয়েটা তার!

মাঝখানের ঘর থেকে অপর্ণার গলা পাওয়া যাচ্ছিল। চাপা গলা, কিন্তু রাগের ভাব। মিঠু মাথা উঁচু করে মায়ের গলা শোনবার চেষ্টা করে বাবাকে চোখের ইঙ্গিত করে বলল, 'মা!' নি:শব্দে হাসল, 'মা আতরদিকে বকছে। রোজ বকে।' জীবন নিস্পৃহভাবে বলে, 'কেন!' মিঠু মাথা নামিয়ে আনল জীবনের গলার ওপর, তার থোকা থোকা চুলে জীবনের মুখ আচ্ছন্ন করে দিয়ে বলল, 'আতরদি রোজ কাপডিশ ভাঙে, সকালে দেরি করে আসে। মা বলে ওকে ছাড়িয়ে দেবে।' বলতে বলতে টপ করে জীবনের বুক থেকে পিছলে নেমে যায় মিঠু, মশারি তুলে মেঝেয় লাফিয়ে পড়ে। জীবন ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে বলে, 'কোথায় যাচ্ছ মামণি!' দরজার কাছে এক ছুটে পৌঁছে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, 'দাঁড়াও দেখে আসি।'

গোয়েন্দা! এই মেয়েটা তার পুরোপুরি গোয়েন্দা। বাড়ির সমস্ত খবর রাখে, আর সকালে বাবাকে একা পেয়ে চুপিচুপি বলে দেয়। বিশেষত অপর্ণার খবর। মিঠু তার সহজ বুদ্ধিতে বুঝে গেছে যে, বাবা মায়ের খবরটাই বেশি মনোযোগ দিয়ে শোনে। গতকাল তাদের মোটরগাড়িটার জ্বর হয়েছিল কি-না, কিংবা তিন-শো ছিয়ানব্বই নম্বর বাড়িতে কুকুরটার ক-টা বাচ্চা হল, এসব খবরে বেশি কান দেয় না। মিঠুর উলটো হচ্ছে মধু—জীবনের তিন বছর বয়সের ছোটোমেয়ে। সে মায়ের আঁচল ধরা, জীবনকে চেনে বটে, কখনো-সখনো কোলেও আসে কিন্তু থাকতে চায় না। দুই মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে জীবন উঠে সিগারেট ধরাল। মাথা ধরে আছে—কাল রাতের হুইস্কির গন্ধ এখনও যেন, ঢেকুরের সঙ্গে অল্প পাওয়া যাচ্ছে। কেমন ঘুম জড়িয়ে আছে চোখের পাতায়। কিছুতেই মনে পড়ে না কাল রাতে বার থেকে কী করে সে ঘরের বিছানা পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছিল। কোনোদিনই মনে পড়ে না। কাল বিকেলে কারখানা থেকে তার ড্রাইভার তাকে 'বার' পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছিল। বার-এ দেখা হয়েছিল, দুজন চেনা মানুষের সঙ্গে। আচার্য আর মাধবন। তারপর?

মিঠু ছোটোপায়ে দৌড়ে এসে মশারি তুলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের কোলে। হাঁফাচ্ছে। এত বড়ো বড়ো চোখ গোল করে বলল, 'আমাদের বিড়ালটা না-বাবা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকেছিল! মরে কাঠ হয়ে আছে।' একটু অবাক হয়ে জীবন বলল, 'সেকি!' তার হাত ধরে টানতে টানতে মিঠু বলল, 'চলো দেখবে। নইলে এক্ষুনি আতরদি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবে। কৌতূহল ছিল না তবু মিঠুকে এড়াতে পারে না জীবন, তাই হাই তুলে বিছানা ছাড়ল।

ঘরের চারিদিকেই লক্ষ্মীর শ্রী। মেঝেতে পাতা চকচকে লিনোলিয়াম। ওপাশে অপর্ণা আর মিঠু মধুর আলাদা বিছানা। নীচু সুন্দর খাটের ওপর শ্যাওলা রঙের সাদা ফুলতোলা চমৎকার বেডকভার টান টান করে পাতা। মশারি খুলে নেওয়া হয়েছে। ডানদিকে প্রকান্ড বুককেস যার সামনেটা কাচের, বুককেসের ওপর বড়ো একটা হাইফাই রেডিয়ো, তার ঢাকনার অর্গাণ্ডিতে অপর্ণার নিজের হাতের এমব্রয়ডারি, পাশে মানিপ্ল্যান্ট রাখা, লেবু রঙের চিনেমাটির ফুলদানি, সাদা ক্যাবিনেটের ভেতরে রেকর্ড চেঞ্জার মেশিন—কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা নেই। পুবের জানলা খোলা, নীল পাতলা পর্দার ভেতর দিয়ে শরৎকালের হালকা রোদ আর অল্প হিম হাওয়া আসছে। অপর্ণা ঘর বড়ো ভালোবাসে, তা ছাড়া তার রুচি আছে। এর জন্য জীবন কখনো মনে মনে, কখনো প্রকাশ্যে অপর্ণাকে বাহবা দেয়। কোন জায়গায়, কোন জিনিসটা রাখলে সুন্দর দেখায় জীবন তা ভেবেও পায় না। যদিও এসবই জীবনের রোজগারে অর্জিত জিনিস, তবু তার মাঝে মাঝে মনে হয়, এই ঘরদোর এই ফ্ল্যাটবাড়িটার আসল মালিক অপর্ণাই। সারাদিন ঘুরে ঘুরে অপর্ণা বড়ো ভালোবাসা, যত্নে, বড়ো মায়ায় এই সব কিছু সাজিয়ে রাখে। জীবনের সন্দেহ হয়, সে যখন থাকে না, তখন পোষা গৃহপালিতের গায়ে লোকে যেমন হাত রেখে আদর করে, তেমনি অপর্ণা রেডিয়ো, বুককেস, সোফায় বা টেবিলে তার স্নেহশীল সতর্ক হাত রেখে আদর জানায়। তাই জীবন যখনই ঘরে ঢোকে তখনই মনে হয়, এসব জিনিস অপর্ণারই পোষমানা, এসব তার নয়। তাই যখন সে ঘরে চলাফেরা করে বসে বা শুতে যায়, যখন ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খোলে, তখন সে তার নিজের ভেতরে এক ধরনের কুণ্ঠা ও সতর্কতা লক্ষ করে মনে মনে হাসে। বাস্তবিক অপর্ণা হয়তো তার এ-স্বভাব লক্ষ করে না, কিন্ত জীবন জানে, লোকে যেমন তাদের ঘরে ফিরে সহজ খোলামেলা, আরামদায়ক অবস্থা ভোগ করে, সে ঠিক তেমন করে না।

'শিগগির বাবা' বলতে বলতে মিঠু তাকে টেনে আনল মাঝখানের ঘরে। আসলে ঘর নয়, প্যাসেজ। তিনদিকে তিনটে দরজা—একটা রান্নাঘর, অন্যটা বসবার, তৃতীয়টা তাদের শোয়ার ঘরের। তিনকোণা প্যাসেজের একধারে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো ক্রিম রঙের ফ্রিজটা। রাতে যখন প্রায়ই ভীষণ ঘোর অবস্থায় খানিকটা এলোমেলো পায়ে অন্ধকার প্যাসেজটা পার হয় জীবন, তখন সে মাঝে মাঝে ফ্রিজটার কাছে একবার দাঁড়ায়, কোনোদিন ঠাণ্ডা সাদা ফ্রিজটার গায়ে হাত রাখে। মনে হয় ঘুমন্ত সেই ফ্রিজটা তার হাত টের পেয়ে আস্তে জেগে ওঠে, সাড়া দেয়, জীবনের মনে হয় ফ্রিজটা এতক্ষণ যেন, এই আদরটুকুর জন্য

অপেক্ষা করেছিল। এখন, দিনের বেলা সব কিছু অন্যরকম। ফ্রিজটার দুটো দরজা দু-হাট করে খোলা, সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে গম্ভীর মুখে অপর্ণা, তার পিঠে ঝুঁকে মধু, আতর নীচু হয়ে তলার থাকে অন্ধকারে কিছু দেখবার চেষ্টা করছে। জীবন লক্ষ করে, সে এসে দাঁড়াতেই অপর্ণার শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। জীবন অল্প হেসে জিজ্ঞেস করে, 'কী হল!' অপর্ণা ফ্রিজটার দিকে চেয়ে থেকেই জবাব দিল, 'দ্যাখো-না, বেড়ালটা ভেতরে ঢুকে মরে আছে।' জীবন অপর্ণার মুখের খুব সুন্দর কিন্তু একটু নিষ্ঠুর পাথুরে প্রোফাইলের দিকে চেয়ে সহজ গলায় বলে, 'কী করে গেল ভেতরে?' অপর্ণা সামান্য হাসে, 'কী জানি! হয়তো আমিই কখনো যখন ফ্রিজ খুলেছিলুম তখন ঢুকে গেছে। খেয়াল করিনি।' জীবন সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ওরকম ভুল হয়। ওটাকে বের করে ফ্রিজটা ভালো করে ধুয়ে দিয়ো, মরা বেড়াল ভালো নয়।?' 'আচ্ছা।' জীবন চলে যাচ্ছিল বাথরুমের দিকে, হঠাৎ মনে পড়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আর আজ বাজারে যাবে বলেছিলে। ছুটির দিন। যাবে না?' এক ঝলক মুখ ফিরিয়ে জীবনের চোখে চোখ রাখল অপর্ণা, হাসল, 'যাব না কেন? একটা বেড়াল মরেছে বলে। তুমি তৈরি হও-না।' কথাটা ঠিক বুঝল না জীবন, শুধু অপর্ণার ওই এক ঝলক তাকানোর দিকে, ওর সুন্দর ছোটো কপালে সিঁদুরের চারপাশে কোঁকড়ানো চুল, ঈষৎ ফুলে থাকা অভিমানী সুন্দর ঠোঁট, নিখুঁত আর্চ-এর মতো ভ্রূ আর থুতনির চিক্কণতা দেখে হঠাৎ নিজেকে তার বড়ো ভাগ্যবান মনে হল। বড়ো সুন্দর বউ তার। বড়ো সুন্দর অপর্ণা। ছেলেবেলা থেকে অনেকে এরকম বউ পাওয়ার আশায় বড়ো হয়ে ওঠে। ভেবে দেখতে গেলে জীবনের ছেলেবেলা ছিল বড়ো দুরন্ত, বড়ো ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির বড়ো দামাল দিন ছিল তখন। আজ একটা বেড়াল তার ফ্রিজের ভেতরে মরে আছে, আর তখন সেই ছেলেবেলায় যখন ছিল চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, উনানের পাশে ছোটো নোংরা যে চৌখুপি জায়গায় সে চট আর শতরঞ্চির বিছানায় শুত, তখন আর একটা বেড়াল তার মাথার কাছে শুয়ে থাকত সারারাত। 'মিনি' নামে সেই বেড়াল উনিশ-শো পঞ্চাশে চক্রবর্তীদের তিনতলা থেকে দিয়েছিল লাফ। জীবন আজও জানে না, বেড়ালটা আত্মহত্যা করেছিল কি না। সেইসব ছেলেবেলার দিনে জীবন কখনো অপর্ণা বা অপর্ণার মতো সুন্দর অভিজাত বউ-এর কথা ভাবেইনি।

বাথরুমের বড়ো আয়নার কোমর পর্যন্ত, নিজের আকৃতির দিকে চেয়ে মৃদু হাসল জীবন। দুর্ধর্ষ কাঁধের ওপর শক্ত ঘাড়, বুকের দু-ধারে চৌকো পেশি, দাঁতে ব্রাশ ঘষতে হাতের শক্ত রগ, শিরা আর মাংসপেশিতে ঢেউ ওঠে। ছোটো করে ছাঁটা চুল, টানা, মেয়েলি এবং দুঃখী এক ধরনের চোখ তার। তার গায়ের রং শ্যামবর্ণ, যেমনটা মিঠুর। মধু তার মায়ের মতোই ফর্সা। জীবনের নাক চাপা, ঠোঁট একটু পুরু কিন্তু সুন্দর। তার সঙ্গে মিঠুর-ই মিল বেশি, মধুর সঙ্গে অপর্ণার, জীবনের চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ আছে, বোঝা যায় আলস্য বা আরামে সে খুব অল্প সময়ই ব্যয় করেছে। তৃপ্তিতে আয়নার দিকে চেয়ে হাসে জীবন। বাস্তবিক প্রায় ফুটপাথের রাস্তার জীবন থেকে এতদূর উঠে আসতে পারার পরিশ্রম ও সার্থকতার কথা ভাবলে, তার মাঝে মাঝে নিজেকে বড়ো ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। সে তার বউ, মেয়ে এবং পরিবারের জন্য কি সমস্ত কর্তব্যই করেনি? এই ভেবেই সে তৃপ্তি পায় যে, এরা কেউ দুঃখে নেই, জীবনের ওপর পরম নির্ভরতায় এরা নিশ্চিন্তে বেঁচে থেকে বেঁচে থাকাকে ভালোবাসছে। সে নিজেও কী বেঁচে থাকাকেই ভালোবাসেনি বরাবর? যখন সেই অনিশ্চিত ছেলেবেলায় সে কখনো চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, কখনো-বা মোটর-সারাই কারখানার ছোকরা কারিগর, তখনও সে রাস্তা পার হতে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল দেখে আনন্দে গান গেয়েছে, খাদ্য অনিশ্চিত ছিল, তবু প্রতিটি খাদ্যকণার কত স্বাদ ছিল তখন। তখন দেশভাগের পর কলকাতায় এসে রহস্যময় এই শহরকে, কত সহজে চিনে নিয়েছিল জীবন। আজ সে যখন তার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে, গাড়ির জানলা থেকে বা বার-এর দরজার কাচের পাল্লার ভেতর দিয়ে দেখে, তখন এখানকার রাস্তাঘাট, ভিড়, আলো কত দূরের বলে মনে হয়। কিংবা রাতে ঘোর মাতাল অবস্থায় ফিরে এসে, যখন খাবারঘরে ঢাকা খাবার খুলে সে সুন্দর সমস্ত খাবারের রঙের দিকে চেয়ে দেখে, তখনও তার মনে হয় এসব খাবারে কি সেইসব স্বাদ আর পাওয়া যাবে!

জীবন ঘরে ঢুকে দেখল ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অপর্ণা মধুকে সাজাচ্ছে।
জীবন বলল, 'ও যাবে নাকি?'
অপর্ণা মধুর মাথায় রিবন জড়াতে জড়াতে বলল, 'যাবে না! থাকবে কার কাছে? যা বায়না মেয়ের।'
জীবন বিরক্তভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখল, মিঠু মেঝের লিনোলিয়মে খোলা 'হাসিখুশি'র সামনে বসে 'হাঁ' করে মা আর মধুর দিকে চেয়ে আছে। জীবন বলল, 'দোকানে দোকানে ঘুরতে হবে, ওকে নিলে অসুবিধে। কখন জলতেষ্টা পায়, কখন হিসি পায় তার ঠিক কী!'
শুনে মিঠু মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে। অপর্ণা তার ধীর হাতে মধুর মাথার রিবন সরিয়ে নেয়। তেমনি গম্ভীর মুখে একবার মিঠুর দিকে চেয়ে বলল, 'ঠিক আছে।'
জীবন সঙ্গে সঙ্গে সহজ হওয়ার ভাব করে বলে, 'অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছে হয়—'
'না, থাক। আতর তো রইলই, ও দেখতে পারবে।'
'কাঁদবে বোধ হয়।'
'তা কাঁদবে।'
'কাঁদুক।' জীবন হাসে, 'কাঁদা খারাপ নয়, তাতে অভ্যেস ভালো হয়। জেদটেদ কমে স্বাভাবিকতা আসে।'
অপর্ণা উত্তর দিল না।

জীবনের খয়েরি রঙের ছোটো সুন্দর গাড়িটা দরজার সামনে দাঁড় করানো। ড্রাইভার গাড়ির দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের এক পা পেছনে অপর্ণা—ছাইরঙা সিল্কের শাড়ি, ছাইরঙা ব্লাউজ, হাতে ছাইরঙা বটুয়া, মাথায় এলো খোঁপা, পায়ে শান্তিনিকেতনি চটি—বড়ো সুন্দর দেখায় অপর্ণাকে। পাশাপাশি যেতে কেমন অস্বস্তি হয় জীবনের। সে নিজে পরেছে সাদা টেরিলিনের শার্ট আর জিন-এর প্যান্ট—নি:সন্দেহে তাকে দেখাচ্ছে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো, তবু অপর্ণার পাশে কী কারণে যেন, কিছুতেই তাকে মানায় না। ড্রাইভারকে ইঙ্গিতে সরে যেতে বলে জীবন একবার পিছু ফিরে চাইল। ব্যালকনিতে আতরের কোলে মধু—সে ভীষণ কাঁদছে, চোখের জলে মুখ ভাসছে তার। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছে মিঠু—বিষণ্ণ মুখ—জীবনের চোখে চোখ পড়তেই হাসল, হাত তুলে বলল, 'টা-টা বাবা! দুর্গা দুর্গা বাবা!' অপর্ণা খুব তাড়াতাড়ি ব্যালকনির দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে গাড়িতে ঢুকে গেল। জীবন হাসিমুখে হাত তুলে ব্যালকনিতে মিঠু আর মধুর উদ্দেশ্যে বলল, শিগগিরই আসছি ছোটোমা! টা-টা, দুর্গা-দুর্গা বড়োমা।'
'টা-টা দুর্গা দুর্গা বাবা। টাটা দুর্গা দুর্গা।'
জীবন গাড়ি এনে দাঁড় করাল মোড়ের পেট্রোল পাম্পে। অপর্ণা নামল না। জীবন নেমে ধরাল একটা সিগারেট। আকাশে শরৎকালের ছেঁড়া মেঘ, রোদে উড়ছে। পেট্রোল পাম্পের একদিকে বিরাট সাইনবোর্ড 'হ্যাপি মোটরিং,' সেইদিকে চেয়ে রইল জীবন, হঠাৎ আলগা একটা খুশিতে তার মন গুনগুন করে উঠল 'হ্যাপি মোটরিং'! হ্যাপি হ্যাপি হ্যাপি মোটরিং!' যে বাচ্চা ছেলেটা মোটরে পেট্রোল ভরল, হাত বাড়িয়ে তাকে একটা টফি দিল অপর্ণা। খুশি হল জীবন। অপর্ণার মুখ এখন পরিষ্কার ও সহজ। হায়! কতকাল অপর্ণার সঙ্গে জীবনের ঝগড়া বা খুনশুটি হয় না। জীবন যা বলে অপর্ণা একটু গম্ভীর মুখে তাই মেনে নেয়। সত্যিই মেনে নেয় কি না, জীবন তা জানে না। অন্তত বিয়ের আগে অপর্ণা যে-বাড়ির মেয়ে ছিল সে-বাড়ির লোকেরা সহজে অন্য কারো কথা মেনে নিত না, বশও মানত না। অপর্ণাই মানছে কি! ঠিক জানে না জীবন। আসলে সারাদিন তাকে অপর্ণার বা অপর্ণাকে তার কতটুকু দরকার পড়ে! ভালো করে দেখাও হয় না। শুধু রাতে যখন সে ঘোরলাগা অবস্থায় ঘরের দরজায় পৌঁছোয়, আর দরজা খুলে দিয়ে অপর্ণা সরে যায় তখন প্যাসেজের আলো-আধাঁরিতে, সে এক ঝলক অপর্ণার সুন্দর কিন্তু নিষ্ঠুর মুখে একটু বিরাগ লক্ষ করে

মাত্র। সেটুকুও ভুল হওয়া সম্ভব। তবু অপর্ণাকে ছাড়া, অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসার কথা মনেও হয় না জীবনের।

সামনেই ট্র্যাফিকের হলুদ বাতি লাল হয়ে যাচ্ছিল। আগে একটা সাদা বড়ো প্লিমাউথ শ্লথ হয়ে থেমে যাচ্ছিল, জীবন স্টিয়ারিং ডাইনে ঘুরিয়ে তাকে পাশ কাটাল, গতি কমাল না, জ্বলজ্বলে লাল আলোর নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল, তার ছোটোগাড়ি, আড়াআড়ি ক্রসিং-এর গাড়িগুলো সদ্য চলতে শুরু করেছে, জীবন অনায়াসে ধাক্কা বাঁচিয়ে বেরিয়ে গেল। অপর্ণা চমকে উঠে বলল, 'এই! কী হচ্ছে!' জীবন বাঁ-হাতটা তুলে অপর্ণাকে শান্ত থাকতে ইঙ্গিত করল শুধু। অপর্ণা ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের রাস্তা দেখে নিয়ে বলে, 'পুলিশ তোমার নাম্বার কল করছে, হাত তুলে থামতে বলছে।' জীবন গম্ভীর মুখে বলল, 'যেতে দাও।' অপর্ণা চুপ করে যায়। চওড়া সুন্দর গড়িয়াহাট রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে পার্ক সার্কাসের দিকে। সকাল। ট্রাফিক খুব বেশি নয়। তবু সামনেই বাস-স্টপে এক, দশ নম্বর বাস আড় হয়ে থেমেছে। ফলে পাশ কাটানোর রাস্তা প্রায় বন্ধ। জীবন নিশ্বাসের সঙ্গে একটা গালাগাল দেয়, গাড়ির গতি একটুও কমায় না, তার ছোটোগাড়ি বাসটাকে প্রায় বুরুশ করে বেরিয়ে গেল। অপর্ণা কিছু বলে না। শুধু তার বড়ো বড়ো চোখ কৌতূহলে জীবনের মুখের ওপর বার বার ঘুরে যায়। জীবনের মুখ বড়ো গম্ভীর, কপালে অল্প ঘাম। যেতে যেতে জীবন, ভীষণ বেগে হঠাৎ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার সোজা করে নিল, গাড়ি এতজোরে টাল খেল যে, ড্যাশবোর্ডে মাথা ঠুকে গেল অপর্ণার। 'উঃ।' গাড়ির সামনের রাস্তায় চমৎকার সাজগোজ করে একটি যুবতী মেয়ে তিড়িং করে লাফ দিয়ে ট্রামলাইনের দিকে গিয়ে পড়ল। ওই বয়সের মেয়েকে এরকম লাফ দিতে আর দেখেনি জীবন। সে ঘাড় ঘুরিয়ে আর একবার মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করে, অপর্ণা হঠাৎ তীব্র গলায় বলে, 'তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো? এটা কি বাহাদুরি নাকি।' জীবন তার গম্ভীর অকপট মুখ ফেরায়, অপর্ণা, আমরা একটু মুশকিলে পড়ে গেছি।' অপর্ণা বড়োচোখে তাকায়, 'মুশকিল!' জীবন রাস্তার দিকে তার পুরো মনোযোগ রেখে বলে, 'গাড়ির ব্রেকটা বোধহয় কেটে গেছে। ধরছে না।' অপর্ণা নি:শব্দে শিউরে ওঠে, চুপ করে জীবনের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে, 'স্টার্ট বন্ধ করে দাও।' জীবন একটা টেম্পোকে পাশ কাটিয়ে নিল, অদূরে একটা ক্রসিং, আড়াআড়িভাবে একটা লরি পাশের রাস্তা থেকে প্রকান্ড কুমিরের মতো মুখ বার করেছে—এক্ষুনি রাস্তা জুড়ে যাবে। জীবন এই বিপদের মধ্যেও ছোটো আয়নায় একপলকের জন্য নিজের ভয়ংকর উদবিগ্ন ও রেখাবহুল মুখ দেখতে পেল, অপর্ণা চোখ বুজে হাতে হাত মুঠো করে ধরে আছে। জীবন হাত বার করে লরির ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে নাড়ল, তারপর হাত নাড়তে নাড়তেই এক হাতে স্টিয়ারিং-এ জীবন গাড়িটাকে এক ঝটকায় মোড় পার করে দিল। অল্প ফাঁকায় জীবন। 'স্টার্ট বন্ধ হচ্ছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। একটু আগেও সব ঠিকঠাক ছিল।' অথচ....অপর্ণা বক্তব্যহীন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকায়, 'কী হবে তাহলে?' ড্যাশবোর্ডে ঝুলছে স্টিলের চকচকে চাবির রিং, দোল খাচ্ছে। জীবন আর একবার স্টার্ট বন্ধ করার চেষ্টা করল। অপর্ণা শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলে, 'ঠেলাগাড়ি, ওঃ, একটা ঠেলাগাড়ি...' জীবন তার হাতের ওপর অপর্ণার নরম হাত টের পায়, বলে, 'ভয় পেয়ো না, চেঁচিয়ো না, মাথা ঠিক রাখো, সামনে যতদূর দেখা যায়, দেখে দেখে আমাকে বলো। ফাঁকা রাস্তা পাচ্ছি এখনও। বোধ হয় বেরিয়ে যাব।' অপর্ণা হাতের দলাপাকানো রুমালে চোখ মোছে, 'গাড়ির এত গন্ডগোল, আগে টের পাওনি কেন?' খোলা জানলা দিয়ে হুহু করে বাতাস আসছে, তবু জীবনের কপালের ঘাম নেমে আসছে চোখে-মুখে, জিভে সে ঘামের নোনতা স্বাদ পায়, বলে, 'দিন পনেরো আগেই তো গ্যারাজ থেকে আনলুম, গিয়ারটা একটু...' অপর্ণা হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে, বাঁ-দিকে, বাঁ-দিকে মোড় নাও, সামনে জ্যাম', তিনটে রিকশা একে অন্যকে কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল, পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ির বনেটে লাগল একটা রিকশার হাতলে, ছোটো একটা ধাক্কায় রিকশাটাকে সরিয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরল জীবন, রিকশাওয়ালা হাতল শূন্যে তুলে প্রাণপণে রিকশাটাকে দাঁড় করবার চেষ্টা করছে...এই দৃশ্য দেখতে দেখতে, হাজরা রোডে ঢুকে উলটোদিকে থেকে আসা একটা ষোলো নম্বর বাস-এর দেখা পায় জীবন। বাসটা একটা ধীরগতি কালো অস্টিন অফ ইংল্যাণ্ডকে

ছাড়িয়ে যাবে বলে রাস্তাজুড়ে আসছে, দাঁতে ঠোঁট চাপে জীবন, টের পায় ঠোঁটের চামড়া কেটে দাঁত বসে যাচ্ছে, ফুটপাথ ঘেঁষে স্টিয়ারিং ঘোরায় সে, তবু বুঝতে পারে অত অল্প জায়গা দিয়ে গাড়ি যাবে না। চোখ বুজে ফেলার ভয়ংকর একটা ইচ্ছে দমন করে সে দেখে, ষোলো নম্বর বাসটা তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, বাস-এর ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে তার কান মলে দিয়ে বলতে পারে—'শিখতে অনেক বাকি হে।' কিন্তু জীবন খুব অবাক হয়ে দেখল তার ছোটোগাড়িটা যেন, ভয় পেয়ে জড়সড়ো এবং আরও ছোটো হয়ে রাস্তার সেই খুব অল্প ফাঁক দিয়ে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল। নেশাগ্রস্তের মতো হাতে জীবন, অপর্ণা...। তাকিয়ে দেখে অপর্ণা দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। জীবনের ডাক শুনে শুধু বলল, 'আমার মেয়ে দুটো? মেয়ে দুটোর কী হবে?' মুহূর্তের জন্য স্টিয়ারিং-এর ওপর হাত ঢিলে হয়ে যায় জীবনের। গাড়ি টাল খায়। দুর্বল সময়টুকু আবার সামলে নেয় জীবন, বলে, 'কেঁদো না, কাঁদলে আমার মাথা ঠিক থাকবে না। একটু ভুল হয়েছে তোমার, এই রাস্তায় মোড় নিতে বললে, কিন্তু রাস্তার বড়ো ভিড়।' গাড়ি খুব জোরে চলছে না, জীবন চারিদিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিল। অপর্ণা চোখের জল মুছে, শক্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে, 'যেমন করে হোক বাসার দিকে গাড়ি ঘোরাও।' জীবন স্থির গলায় বলে, 'তাতে লাভ কী? বাসার সামনে গেলেই কি গাড়ি থামবে?' অপর্ণা জোরে মাথা নাড়ে, 'না, থামুক। মধু আর মিঠু হয়তো এখনও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।' জীবনের ঘাড় টনটন করছিল ব্যথায়, সহজ ভঙ্গিতে না বসে, সে অনেকক্ষণ তীব্র উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে আছে। বাঁ-দিকে পরপর কয়েকটা সরু নোংরা গলি, মোড় ফেরা গেল না। সামনেই চৌরাস্তা, দূর থেকেই দেখল জীবন ট্রাফিক পুলিশ অবহেলার ভঙ্গিতে হাত তুলে তার সোজা রাস্তা আটকে দিল। অপর্ণা হঠাৎ জোরালো গলায় বলল, 'ডানদিকে মোড় নাও, ওদিকে ফাঁকা রাস্তা, তারপর রেইনি পার্ক...' কিন্তু জীবন মোড় নিতে পারল না, গাড়িটা অল্পের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর সহজ নিশ্চিতভাবে ট্রাফিক পুলিশটাকে লক্ষ্য করেই ছুটছিল। লোহার হাতে স্টিয়ারিং সোজা রাখে জীবন, পুলিশটার হাতের তলা দিয়ে তার গাড়ি ছোটে। বাঁকের মুখে নীল রঙের একটা ফিয়াট তার গাড়ির বাফারের ধাক্কায় নড়ে উঠে থেমে কাঁপতে থাকে। ফিরেও তাকায় না জীবন, দুটো লরিকে পরপর কাটিয়ে নেয়। পেছনের পুলিশটা চেঁচিয়ে গাল দিচ্ছে। সামনেই হাজরার মোড়, লাল বাতি জ্বলছে, অনেক গাড়ি পরপর দাঁড়িয়ে। কিছুই ভাবতে হয় না জীবনকে। সে থেমে-থাকা গাড়িগুলোকে বাঁয়ে রেখে অবহেলায় এগিয়ে যায়, আবার একটা ডবলডেকার, পেছনে লম্বা ট্রাম আড়াআড়ি রাস্তা জুড়ে যাচ্ছে, জীবন শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'আজ কেবল লাল বাতি, রোজ এমন হয় না তো।' অপর্ণা বাঁ-হাত বাইরে বের করে মোড় নেওয়ার ইঙ্গিত দেখায়, ডবলডেকারটার মুখ কোনোক্রমে এড়িয়ে জীবন গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল। রাস্তা ফাঁকা নয়, কিন্তু অনেকটা সহজ। বাঁয়ে মনোহরপুকুরের মুখ, একটু দ্বিধাগ্রস্ত, হাতে গাড়ি ঘোরাবে কি না, ভাবতে ভাবতে জীবন সোজাই চলতে থাকে। কালীঘাটের স্টপে গোটা চার-পাঁচ স্টেট বাস একসঙ্গে থেমে আছে। দূর থেকেই জীবন দেখে, প্রথম বাসটা ধীরস্থিরভাবে স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে, সে পৌঁছোবার আগে আর বাসগুলো যে ছাড়বে না তা নিশ্চিত। এখানে বাসস্টপের পাশেই একটা পাবলিক ইউরিন্যাল। আগে থেকেই জীবন তাই ট্রামের ট্র্যাকে তুলে দিল তার গাড়ি। অপর্ণা কী বলতে গিয়ে থেমে যায়। কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে, তাদের গাড়িটা এবার অনেকের নজরে পড়েছে। জীবন কালীঘাট পেরিয়ে ট্রামের ট্র্যাকে ঘাসমাটির জমির ওপর দিয়েই চলতে থাকে। লোকজন দূর থেকে চেঁচিয়ে কী বলছে, একটু ঘোলাটে চোখে অপর্ণার দিকে চায়; 'অপর্ণা...' অপর্ণা অর্থহীন চোখে তার মুখের দিকে তাকায়। জীবন বলে, 'আমার কেমন ঘুম পাচ্ছে।' অপর্ণা বুঝতে না পেরে বলে, 'কী বলছ'? জীবন মাথা নাড়ে, 'চোখের সামনে আঁশ আঁশ জড়ানো একটা ভাব। অনেকক্ষণ সিগারেট না খেলে আমার এরকম হয়। আমি অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি।' অপর্ণার চোখে জল টলমল করছে, রুমালের ঘষায় চোখের আশপাশের জায়গা লাল, বড়ো সুন্দর দেখায় তাকে। কপালের সিঁদুর অল্প মুছে গেছে। তৎপর গলায় বলে, 'কোথায় তোমার সিগারেট?' জীবন তার দিকে চেয়ে বলে, 'পকেটে।' অপর্ণা বলে, 'বের করে দাও।' এবার সামনের মোড়ে

সবুজ বাতি জ্বলছে, বালিগঞ্জের ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা হয়ে, ট্রাম ট্র্যাকের পাশে পাশে কয়েকটা গাছ হয়ে, স্টপে লোকের ভিড়। তাঁদের গাড়িটা কাছে আসতেই লোকে চেঁচাচ্ছে। 'এটা কী হচ্ছে...!' জীবন ক্রমান্বয়ে হর্ন দিয়ে ট্রামের ট্র্যাক থেকে রাস্তায় নামে। সামনে একটা নয় নম্বর। এটা ট্রলি বাস—প্রকান্ড বড়ো, আস্তে আস্তে রাস্তা জুড়ে চলে। জীবন হর্ন দেয়, বাসটাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করা বৃথা—জায়গা নেই। ট্রাম ট্র্যাকের দিকে আবার মুখ ঘোরাতে গিয়ে জীবন দেখে, তিন-চারজন লোক রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁয়ে স্টিয়ারিং চেপে ধরে জীবন। কংক্রিটে প্রবল ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা সোজা ফুটপাথে উঠে যায়। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের গাড়িবারান্দার তলা থেকে একেবারে শেষমুহূর্তে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কয়েকজন লোক সরে যায়, জীবনের গাড়ির মুখ থেকে। জীবন গালাগাল শুনতে পায়, 'এই শুয়োরের বাচ্চা, হারামি...' ছোটো আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন তার গাড়ির পিছু নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে পিছিয়ে পড়তে থাকে। তারা দূর থেকে হাত নেড়ে শাসায়। মুক্ত অঙ্গনের সামনে জীবন ফুটপাথ ছেড়ে আবার রাস্তায় নামে। একটা ঢিল এসে পেছনের কাচে চিড় ধরিয়ে দিল। এতক্ষণ উত্তেজনায় অপর্ণাকে দেখেনি জীবন, এখন দেখে অপর্ণা গাড়ির দরজায় ঢলে চোখ বুজে আছে; কপালে একটু জায়গা কাটা, একটা রক্তের ধারা থুতনি পর্যন্ত নেমে এসেছে। জীবন চেঁচিয়ে ডাকে, 'অপর্ণা।' আস্তে চোখ খোলে অপর্ণা, কেমন বোধ ও যন্ত্রণাহীন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ জীবনের মুখের দিকে তাকায়, হঠাৎ তীব্র আক্রোশে বলে, 'তুমি ছোটোলোক। তুমি বরাবর ছোটোলোক, ভিখিরি ছিলে। তুমি কখনো আমার উপযুক্ত ছিলে না।' ঠিক। সে-কথা ঠিক। জীবন জানে। ফাঁকা সুন্দর রাস্তার দিকে চেয়ে সে বলে, 'আমার ঘুম পাচ্ছে অপর্ণা। আমি রাস্তা ভালো দেখছি না।' অপর্ণা তেমনি আক্রোশের গলায় বলে, 'ভেবো না, তুমি মরলেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি দরজা খুলে এক্ষুনি লাফিয়ে পড়ব।' বলতে বলতেই দরজার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দেয় অপর্ণা, আধখোলা দরজার দিকে ঝুঁকে পড়ে, দ্রুত হাত বাড়িয়ে অপর্ণার কনুইয়ের ওপর বাহুর নরম অংশ চেপে ধরে তাকে টেনে আনে জীবন। বলে, 'কপালটা কী করে কাটল? দরজায় ঠুকে গিয়েছিল, না! রুমালে ওটা মুছে ফ্যালো, বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।' বলতে বলতে লেকের দিকে গাড়ির মুখ ফেরায় জীবন। বলে, 'গাড়ির স্পিড, পঁচিশের মতো। এখন লাফিয়ে পড়লেও তুমি বাঁচবে না। যা নরম শরীর তোমার! কোনোকালে তো শক্ত কোনো কাজ করোনি।' বলতে বলতে হাসে জীবন। অপর্ণা রুমালে মুখ চেপে ফোঁপায়, 'কেমন অসম্ভব...অসম্ভব লাগছে, এমন সুন্দর সকালটা ছিল...মিঠু, মধু আর এখন! দুজনেই হয়তো মরে যাব। জীবন প্যান্টের বাঁ-পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে গাড়ির সিট-এর ওপরে রাখে, বলে, 'একটা সিগারেট আমার মুখে লাগিয়ে দাও তো! আর ধরিয়ে দাও।' অপর্ণা কাঁপা হাতে জীবনের ঠোঁটে সিগারেট লাগায়। লেকের হাওয়া দিচ্ছে, অপর্ণা অনভ্যাসের দেশলাই ধরাতে গিয়ে পরপর কাঠি নষ্ট করে। জীবন মাথা নাড়ে, 'হবে না, ওভাবে হবে না।' বলতে বলতে ঠোঁটের সিগারেট নিয়ে অপর্ণার দিকে বাড়িয়ে দেয়, 'তুমি নিজে ধরিয়ে দাও। গাড়ির মধ্যে নীচু হয়ে বসে ধরাও।' অপর্ণা প্রায় আর্তনাদ করে বলে, 'তার মানে? আমাকে মুখে দিতে হবে?' জীবন একবার তার দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়, তাড়াতাড়ি করো। আমার বিশ্রী ঘুম পাচ্ছে।' অপর্ণা একটু দ্বিধা করে, তারপর গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে মুখে লাগিয়ে সিগারেটটা ধরানোর চেষ্টা করে। ধরায়, তারপর সিগারেট জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলে, 'ছোটোলোক, তুমি ছোটোলোক ছিলে। কোনোদিন তুমি সুন্দর কোনো কিছু ভালোবাসোনি। ভেবো না, আমি টের পাইনি। কাল রাতে যখন তুমি প্যাসেজ দিয়ে আসছিলে, তখন আমি ফ্রিজের দরজা খোলার আর বন্ধ করার শব্দ পেয়েছিলুম।' স্টিয়ারিং হুইলের ওপর জীবনের হাতের পেশি ফুলে ওঠে, 'তার মানে?' অপর্ণা হিসহিসে গলায় বলে, 'ওই বেড়ালটা, ওই সুন্দর কাবলি বেড়ালটা...তুমি কোনোদিন ওটাকে সহ্য করতে পারোনি।' লেকের চারধারে ফাঁকা রাস্তায় জীবন গাড়ি ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। হাওয়া দিচ্ছে, প্রবল হাওয়ায় তার কপালের ঘাম শুকিয়ে যেতে থাকে, আর তার আবছা মনে পড়ে...হ্যাঁ, মনে পড়ে...সে ফ্রিজ-এর দরজা খুলেছিল কাল রাতে। অপর্ণা ঠিক বলছে। অপর্ণাই ঠিক বলছে। তার গাড়ি টাল খায়, ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে

একটা ছেলে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, আকাশের দিকে চোখ। জীবন তার দিকে সোজা এগিয়ে যেতে থাকে, অপর্ণা চিৎকার করে ওঠে, 'এই-ই-ই...' ছেলেটা চমকে উঠে তাকায়, তারপর দৌড়ে রাস্তা পার হয়। ঘুড়ির সুতো গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিনে লেগে দু-ভাগ হয়ে যায়। 'ভো—কাট্টা'! জীবন হাসে। অপর্ণা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'আমাদের পেছনে একটা পুলিশের গাড়ি...' জীবন আয়নায় তাকিয়ে একটা কালো গাড়ি দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের প্রথম রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় সে, অল্পক্ষণ পরেই তার গাড়ি লেক পার হয়ে ঢাকুরিয়া ওভারব্রিজ-এর ওপর উঠে আসে। ব্রিজ-এর নীচে একটা পুলিশ দু-হাত, দু-দিকে ছড়িয়ে তার গাড়িকে থামবার ইঙ্গিত করে। গ্রাহ্য না করে জীবন বেরিয়ে যেতে থাকে। অপর্ণা পিছু ফিরে দেখে, 'তোমার নম্বর টুকে নিল।' —বলতে বলতেই আবার কেঁদে ফেলে অপর্ণা, 'তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তোমার অনেক বছর জেল হওয়া উচিত।' জীবন কথা বলে না। সামনেই যাদবপুরের ঘিঞ্জি বাস-টার্মিনাস, বাজার, দোকানপাট। একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে, পেছনের চাকার কাছে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে, পেছনের চাকার কাছে একটা লোক বসে 'ঠাকঠাক' করে কী যেন ঠিক করছে, একটা সাইকেল-রিকশা মুখ ফেরাল। জীবন সোজা রাখে তার গাড়ি, রিকশার সামনের চাকা আর লরির পেছনের চাকায় সেই লোকটার মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময়ে সে স্পষ্ট টের পায়, কিছু একটায় তার গাড়ির ধাক্কা লাগল, একটা চিৎকার শোনা যায়। সে মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দ্যাখো তো লোকটা মরে গেছে কি না! কিন্তু অপর্ণা কী বলল শুনতে পেল না জীবন। তার কান, মাথা, চোখজুড়ে দপদপ করে চমকে উঠল একটা রগ। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছ'? অপর্ণা অস্ফুট উত্তর দিল। শোনা গেল না। সামনে লোক, অজস্র লোক, সরু রাস্তা, রিকশার লাইন, নীচু দোকানঘর...এইসব হিজিবিজি ছবির মতো তার চোখে দুলে দুলে উঠছিল। একটা বেড়াল, কাল রাতে একটা বেড়াল ফ্রিজ-এর মধ্যে সমস্ত রাত...না, মনে পড়ে না, মনে পড়ে না...জীবন দেখল ব্যালকনিতে মধু আর মিঠু দাঁড়িয়ে, মিঠু তার বাবার মতো, মধু তার মায়ের মতো—তারা হাত নাড়ছে, 'টা-টা, দুর্গা দুর্গা বাবা।' অপর্ণা কিছু বলছে?' কী বলছ তুমি?' সে জিজ্ঞেস করে, অপর্ণা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে স্টিয়ারিং সোজা রাখবার চেষ্টা করে। জীবন ঝাঁকুনি খেয়ে আবার ধোঁয়াটে ভাবটুকু কাটিয়ে দেয়। অপর্ণা কাঁদে 'কী হচ্ছে...এবার তুমি মাথা খারাপ করছ। চারজনকে ধাক্কা দিলে পরপর। ওরা ঢিল ছুড়ছে, গালাগাল দিচ্ছে।' বাস্তবিক ঢিল এসে পড়ছিল, পেছনে লোক দৌড়ে আসছে, সামনের দিকে একটা লোক বাঁশ তুলে চিৎকার করছে, 'মাইরা ফালামু...।' জীবন ক্লান্ত গলায় বলল, 'এত লোক কেন বলো তো! কেন এত অসংখ্য লোক! ইচ্ছে করে খুন করে ফেলি।' জীবন বাঁশ হাতে লোকটাকে পুরোপুরি এড়াতে পারল না, গাড়ির জানলা দিয়ে লোকটা বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে সরে গেল। বাঁশের নোংরা ধারালো মুখটা তার গলা আর থুতনি কেটে, গলায় ধাক্কা দিয়ে প্রচন্ড শব্দ করে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল, জীবন সিটের ওপর পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে বসে। মাথা ঠিক রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তার চোখের সামনে হিজিবিজি, হিজিবিজি দোকানপাট, টেলিগ্রাফের পোস্ট, সিনেমার বিজ্ঞাপন, আর অজস্র মানুষের মুখ, একটা ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতার ভেতরে সরে যেতে থাকে। তার মাথা টলতে থাকে, ঘুড়ির মতো লাট খায়, সেসব ভুলে একবার সিগারেটের জন্য স্টিয়ারিং ছেড়ে হাত বাড়ায়, আবার স্টিয়ারিং চেপে ধরে। অপর্ণা কেবলই কী যেন বলছে, সে বুঝতে পারছে না। এখনও তার ট্যাঙ্ক ভরতি পেট্রোল। কলকল শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ক্রমে বাঘা যতীন, বৈষ্ণবঘাটা পেরিয়ে যায় জীবন। গড়িয়ার পর হুহু-করা রাস্তা। কিন্তু জীবনের কাছে ক্রমে সবকিছুই আবছা হয়ে আসছিল। হঠাৎ জীবন যেন শেষ চেষ্টায় ব্রেকে পা দেয়, তারপর স্টিয়ারিং ছেড়ে দু-হাত শূন্যে তুলে বলে, 'অপর্ণা আমি আর পারছি না, পারছি না...গাড়ি বেঁকে গেল রাস্তার ঢাল বেয়ে, নেমে এল মাঠের ওপর। উঁচুনীচু খোয়াইয়ের মতো জমির ওপর দিয়ে কয়েক গজ এগিয়ে কাত হয়ে থেমে পড়ল।

আস্তে আস্তে চোখ খোলে জীবন। অপর্ণা গাড়ির ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেছে। ছোট্ট ছাইরঙা একটা পুঁটুলির মতো দেখাচ্ছে তাকে। জীবন আপন মনে হাসে, দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এখনও সকালের মতো নরম রোদ, ধান কেটে নিয়ে যাওয়া খেত। জীবন হাত-পা ছড়িয়ে একটু দাঁড়ায়,

তারপর দরজা খুলে অপর্ণাকে বের করে, মাঠের ওপর শুইয়ে দেয়। আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দেয় তাকে, ‘অপর্ণা, এই অপর্ণা...’ গালে থুতনিতে তীব্র জ্বালা টের পায় সে। গলায় ডেলা পাকানো ব্যথা, এখনও অল্প ধোঁয়াটে। অপর্ণা চোখ খোলে, অনেকক্ষণ জীবনের দিকে অর্থহীন চেয়ে থাকে। জীবন হাসে, ‘ওঠো। উঠে বোসো। আমরা বেঁচে আছি।’

অপর্ণার চোখ জীবনের মুখ থেকে সরে, আকাশের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্য উড়ে যায়। তারপর আঁচল সামলে সে উঠে বসে। তার মুখের কঠিন একটু নিষ্ঠুর অথচ সুন্দর পাথরের মতো প্রোফাইল ঘাসের সবুজ পশ্চাৎভূমিতে জেগে ওঠে। জীবনের মন গুনগুন করে ওঠে, ‘ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...’ অপর্ণা দাঁড়িয়ে বলে, ‘এবার, তাহলে?’ জীবনের দিকে চায়, ‘তোমার মুখের ডানদিক কী ভীষণ লাল হয়ে আছে, কেটে গেছে অনেকটা!’ জীবন হাতে অবহেলার ভাব ফুটিয়ে বলে, ‘ও কিছু না।’ রাস্তা থেমে জমি পর্যন্ত এমন কিছু ঢালু নয়। জীবন ভেবে দেখে, সে একাই গাড়িটা ঠেলে তুলতে পারবে। কয়েকজন পথচলতি লোক দাঁড়িয়ে গেছে, মাঠের ওপর দিয়ে দূর থেকে দৌড়ে আসছে কয়েকটা কালো কালো ছেলেমেয়ে। জীবন অপর্ণাকে বলে, ‘তুমি গাড়িতে উঠে বোসো, আমি এটাকে ঠেলে তুলছি।’ অপর্ণা ভ্রূ কোঁচকায়, ‘তুমি একা পারবে কেন?’ ‘পারব।’ অপর্ণা মাথা নাড়ে, ‘তা হয় না।’ পরমুহূর্তেই একটু অদ্ভুত নিষ্ঠুর হাসি হাসে সে, ‘একসঙ্গেই মরতে যাচ্ছিলুম, দুজনে। তা ছাড়া আমি তো তোমার সহধর্মিণীও, অনেক কিছুই ভাগ করে নেওয়ার কথা আমাদের।’ বলতে বলতে সে কোমরে আঁচল জড়ায়, গাড়িতে ‘হেঁইয়ো’ বলে ঠেলা দেয়, রাস্তার লোকেরাও কয়েকজন নেমে আসে। ‘কোথায় যাবে এটাকে নিয়ে!’ জীবন চিন্তিত মুখে বলে, ‘কিছুদূরেই বোধ হয় একটা পেট্রোল পাম্প আছে।’ যারা ঠেলছিল তাদের একজন সায় দেয়, ‘হ্যাঁ, আছে।’

বুড়ো মেকানিক খোলা বনেটের ভেতর থেকে মুখ তুলে জীবনের দিকে তাকায়, ‘কই! কিছু পাচ্ছি না তো! কোনো গোলমাল নেই ইঞ্জিনে। জীবন চিন্তিতমুখে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে, ‘আমি জানি যে, কোনো গোলমাল নেই। মেকানিক ঝাড়নে হাত মোছে, ‘চালিয়ে দেখব?’ জীবন মাথা নাড়ল, ‘না। বলল, বোধহয় হর্নটায় একটু...’ মেকানিক বলল, ‘কানেকশনের গোলমাল? আচ্ছা দেখছি।’ কয়েক মিনিটেই কাজ সারা হয়ে গেল। অপর্ণা পেট্রোল পাম্পের অফিসঘরে বসেছিল। জীবন ডাকতেই উঠে এসে, গাড়ির কাছে একটু থমকে দাঁড়াল। জীবন তাকিয়েছিল। একটুও দ্বিধা না করে গাড়িতে উঠে বসল। জীবন গাড়ি স্টার্ট দেয়।

সারারাস্তায় আর কথা হয় না দুজনে।

সন্ধেবেলায় জীবন বসবার ঘরে সোফায় জানলার দিকে মুখ রেখে এলিয়ে পড়েছিল। মধু আর মিঠু আতরের সঙ্গে বেড়াতে গেছে পার্কে। জীবন মনে মনে ওদের জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। অপর্ণা এসে সামনেই দাঁড়াল। জীবন একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

অপর্ণা জানলার থাকের ওপর বসে বলে, ‘তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।’

জীবন দু-আঙুলে কপাল টিপে রেখে বলে, ‘বলো।’

অপর্ণার মুখ খুবই গম্ভীর—‘যখন পেট্রোল পাম্পে বসেছিলুম, তখন ওখানকার লোকটার সঙ্গে কথা হল আমার। আমি গাড়ির কিছুই বুঝি না, কিন্তু লোকটাকে যখন আমাদের গাড়ির গোলমালের কথা বললুম, তখন সে খুব অবাক হয়ে বলল, অত গোলমাল একসঙ্গে একটা গাড়ির হতে পারে না। গাড়ি থামাবার অনেক উপায় নাকি ছিল।’

জীবন হাসে, ‘ঠিক। সেকথা ঠিক।’

‘তবে গাড়ি থামেনি কেন?’

জীবন মাথা নাড়ে, ‘গাড়ি থামেনি গাড়ি থামানো হয়নি বলে।’

'কেন? তুমি কী ঠিক করেছিলে আমাকে নিয়ে সহমরণে যাবে! নাকি এ তোমার খেলা?'

জীবন অস্থির চোখে অপর্ণাকে দেখে, 'খেলা!' পরমুহূর্তেই মুখ নীচু করে মাথা নাড়ে আবার, 'কী জানি কেন, আমি গাড়ি থামাতে পারিনি। থামানো সম্ভব ছিল না—এইমাত্র।'

'কেন?'

'কেন!' জীবন শূন্যচোখে চারপাশে চায়, ভেবে দেখবার চেষ্টা করে, তারপর অসহায়ভাবে বলে, 'কেন, তা তুমি বুঝবে না।'

ভ্রূ কোঁচকায় অপর্ণা, 'বুঝব না কেন? বোঝাও। আমি বোঝবার জন্য তৈরি।'

জীবন অপর্ণার চোখ এড়িয়ে যায়, কী একটা কথা যেন বলবার ছিল কিন্তু তা খুঁজে পাচ্ছে না সে, তবু ম্লান হেসে হালকা গলায় বলে, 'তুমি কোনোদিন আমাকে সুন্দর দ্যাখোনি, তাই-না! কিন্তু আজ যখন ওই ভিড়ের রাস্তায় প্রতিমুহূর্তে অ্যাকসিডেন্টের ওই ভয়ের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম—আমার মনে হয়—তখন আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তুমি দ্যাখোনি।'

জীবন মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখে অপর্ণার মুখ রাগে ঝলমল করে উঠল, 'সুন্দর! কীসের সুন্দর? তুমি জানতে-না তোমার সংসার আছে? দুটো বাচ্চা শিশুমেয়ে তোমার? তোমার নিজের হাতে তৈরি কারখানা যা অনেক কষ্টে তৈরি করতে হয়েছে? কতগুলো মানুষ তোমার ওপর নির্ভর করে আছে, সে-কথা তুমি কী করে ভুলে যাও?'

জীবন বুঝতে পারে, সে অপর্ণার সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে, বস্তুত তার কোনো যুক্তিই নেই, তবু হাসি-ঠাট্টা বজায় রাখবার চেষ্টায় সে বলে, 'বোধহয় তোমার কাছে একটু বাহবাও পেতে চেয়েছিলুম। তুমি তা দাওনি। কিন্তু মনে রেখো রাস্তার ওই ভিড়, পরপর অত বিপদের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে গেছি, একবারও থামিনি। মনে রেখো, একবারও থামিনি।'

রাস্তার একটা ন্যাংটো পাগলের দিকে লোকে যেভাবে তাকায়, সেভাবেই অপর্ণা জীবনের দিকে এক পলক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর এই প্রথম সে, জীবনকে নাম ধরে ডাকে, 'জীবন, তুমি ছিলে রাস্তার ছেলে প্রায় ভিখিরি। তোমার সঙ্গে কোনো ব্যাপারেই আমার মিল নেই। ভাগ্য তোমাকে এতদূর এনেছে। তবু আজ ওই কান্ড করে তুমি সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে চেয়েছিলে। ডোবাতে চেয়েছিলে নিজেকে, আমাদেরও। এর জন্যই কি তুমি বাহবা চাও?'

জীবনের মাথার জল টলমল করে ওঠে। অপর্ণার কথার ভেতরে কোথায় যেন একটা সত্য ছিল, কিন্তু জীবন তা ধরতে পারে না। তার প্রাণপণ ইচ্ছে হয় অপর্ণার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে—'তুমি ঠিক বলেছ অপর্ণা। ঠিক বলেছ। এই ঘর-বাড়ি-সংসার আমার নিজের বলে মনে হয় না। এখানকার খাবারে আমি এক কণা স্বাদ পাই না। আমার কেবলই ইচ্ছে, এইসব কিছুর বুকের ওপর দিয়ে একবার জোরে চালিয়ে দিই আমার গাড়ি। কিন্তু সেসব কিছুই বলে না জীবন, মুখে মৃদু হাসি টেনে আনে, তেমনি ঠাট্টার সুরে বলে, 'জীবনে সেই কয়টি মুহূর্তই দামি যেসব মুহূর্তে মানুষ মানুষকে সুন্দর দেখে। জন্ম থেকে তুমি কি কেবলই শিখেছ কী করে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়?'

মাথার ভেতরে, বুকের ভেতরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা বোধ করে জীবন। অপর্ণা নিষ্ঠুর ধারালো চোখে কিছুক্ষণ চুপ করে তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর সামান্য বিদ্রুপের মতো করে বলে, 'হায়, আমাদের কাবলি বেড়ালটারও সেই দামি মুহূর্ত বোধহয় কাল রাতে এসেছিল যখন তাকে তুমি সুন্দর দেখেছিলে। আমি, আর তোমার দুই মেয়ে তো সুন্দর জীবন, তাদের জন্য এবার একটা বড়ো দেখে ফ্রিজ কেনো। দোহাই, জোরে গাড়ি চালিয়ে নাটক কোরো না।'

হঠাৎ তীব্র এক অসহায়তা সঙ্গীহীন জীবনকে পেয়ে বসে। তার মাথায় ভেতরে কল চলবার শব্দ, বুকের ভেতরে কেবল-ই একটা রবারের বল লাফিয়ে ওঠে। তবু তার এই কথা বলবার ইচ্ছে হয়—'ঠিক, তুমি ঠিকই বলেছ অপর্ণা। আমার ওইরকমই মনে হয়। এইসব ভেঙেচুরে শেষ করে দিয়ে আমার আবার ফিরে

যেতে ইচ্ছে করে, ছেলেবেলার সেই চায়ের দোকানের উনুনের পাশে, চট আর ছেঁড়া শতরঞ্চির বিছানায়, যেখানে দুঃখী রোগা এক মায়াবী বেড়াল, আমার শিয়রের কাছে শুয়ে থাকবে সারারাত। কিংবা ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই মোটর-সারাই কারখানায়, যেখানে লোহার জোড় মেলাতে আমি কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল দেখে গান গাইব আবার। হ্যাঁ, অপর্ণা, আমি এখনও ছোটোলোক, ভিখিরি।' মুখে মৃদু হাসল জীবন, তার মুখ সাদা দেখাচ্ছিল, কোনোক্রমে সে গলার স্বরে এখনও সেই ঠাট্টার সুর বজায় রাখছিল, 'কে জানে তোমার কাবলি বেড়ালটাও আত্মহত্যা করেছিল কি না!'

অপর্ণা কী বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে জীবন বলে, 'চুপ, অপর্ণা!' তারপর স্খলিত গলায় জীবন বলে, 'তুমি সহমরণের কথা বলছিলে-না। ধরে নাও, আজ আমি তোমাকে সহমরণেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম। তুমি বুঝবে কি এসব অপর্ণা?'

অপর্ণা মাথা নাড়ে—'না'। তার চোখে জল, আর মুখের প্রতিটি রেখায় রাগ আর আক্রোশ। সে জীবনের দিক থেকে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে চলে যায়। জীবন বাধা দেয় না। শুধু এতক্ষণ অপর্ণা যে-জায়গায় বসেছিল সেইখানে গম্ভীর চোখে চেয়ে থাকে, যেন এখনও অপর্ণা বসে আছে।

ঘরে কেউ ছিল না, তবু হঠাৎ জীবন চমকে উঠে বলে, 'কে?' তারপর শূন্যচোখে চারদিকে চায়। সিগারেট আর দেশলাইয়ের জন্য চারদিকে হাতড়ে দেখে। বড়ো ক্লান্তি লাগে জীবনের, এলোমেলো অনেক কথা তার ভেতর থেকে ঠেলে আসতে চায়। মাথার ভেতরে ঘোলা জল টলমল করতে থাকে। সে ভীষণ অন্যমনস্কের মতো বলে, 'আঃ, অপর্ণা...!' পরমুহূর্তেই চমকে ওঠে, 'কেউ কি আছ?' কেউ ছিল না, তবু জীবন একবার পরম বিশ্বাসে দুটো হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে শূন্যে তুলে ধরে, যেন ভিক্ষুকের মতো বলতে চায় —'আমাকে নাও।'

দরজার কাছ থেকে মিঠু ডাকে, 'বাবা!'

অলীক আত্মসমর্পণের এক শূন্যতা থেকে জীবন আবার শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের বাস্তবতার ভেতরে দ্রুত ফিরে আসে।

ঝড়

একটা মেয়ে হাসি-হাসি মুখ করে একটা বিস্কুট খাচ্ছে—এই হল বিজ্ঞাপন। তা বদরী অনেকক্ষণ খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনটা দেখল। খবরের কাগজ তার নয়, পাশে বসা পুলিনবিহারীর। পুলিন খুব খবরের কাগজ পড়ে। কেন পড়ে কে জানে! বদরী বিজ্ঞাপনটা দেখে ভাবল, তাকেও ওই বিস্কুট খেতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন তো তাই বলে।

এই মেয়েটা যখন বিস্কুটটা খাচ্ছে, তখন তোমারও বাপু খাওয়া উচিত। কিন্তু কেন খাবে, বদরী এটাই বুঝতে পারে না। কোলে রাখা গামছাটা তুলে সে কপালের ঘাম মুছল। গরমটাও পড়েছে বাপ। একবারে কাঁঠাল-পাকানো গরম। যেমন ভ্যাপসা, তেমনি চনচনে। রোদ্দুরের মুখে আবডাল দেওয়ার মতো ছেঁড়া কাঁথাকানির মতো একটু মেঘও নেই। আকাশ একেবারে নিকোনো উঠোন। মাটিতে কোদাল মারলে এখন 'ঠন' করে শব্দ হয়।

বিস্কুট খাওয়ার বিজ্ঞাপনটা চাপা পড়েছে। পুলিনবিহারী পাতা ওলটাল। এবার একটা টিভির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। সেখানেও একটা মেয়েছেলে, টিভির ওপর হাতের ভর দিয়ে হেলে দাঁড়ানো, হাসি-হাসি মুখ। মেয়েছেলে ছাড়া দুনিয়ায় যেন কিছু হওয়ার জো নেই! বদরী একটা শ্বাস ফেলল।

পুলিনবিহারীর বয়স তেষট্টি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, শক্ত গড়ন। গায়ে ঘেমো ময়লা একখানা পলিয়েস্টারের পাঞ্জাবি, আধময়লা ধুতি, চোখে চশমা। মাতব্বর লোক। একটা খবর একটু ঝুঁকেই পড়ছিল। জম্পেশ খবরই হবে। দুনিয়ায় খবরের অভাব কী? খবরের কাগজ হল কুচুটে মেয়েছেলের মতো, যত রাজ্যের গালগল্প ফেঁদে বসে মানুষের কাছে।

ট্রেন চলছে বটে, কিন্তু জানলা দিয়ে তেমন হাওয়া আসছে না। যা আসছে তা যেন কামারশালায় হাপরের ফুঁ। জানলার ধারটা পাওয়া যায়নি। ওদিকে দুটো লোক। বাকি দুজন সে আর পুলিনবিহারী। তিনজনের সিটে চারজন। এটাই নিয়ম। ঠাসন্ত ভিড়। ওপরে পাখা-টাখা ছিল এককালে। কে খুলে নিয়ে গেছে।

বদরী আলালের ঘরের দুলাল নয়। গরমও সয়, শীতও সয়। তবে মাঠে-ঘাটে খোলামেলা থাকার একটা রকম আছে। এই যে খাঁচায় পোরা অবস্থা, এটা তার অভ্যেস নেই।

ট্রেনটা একটা আঘাটায় দাঁড়াল। তা এরকম দাঁড়ায়। পুলিনবিহারীর বাঁ-হাতে ঘড়ি। দেখে নিয়ে বলল, চারটেয় পৌঁছোতে পারলে ফেরার শেষ ট্রেনটা পেয়ে যাব।

ফিরতেই হবে। কচি মেয়েটাকে রেখে এসেছি।

আহা, অত উতলা হলে চলে? জলে তো আর ফেলে আসিসনি। পিসির কাছেই তো আছে। বিলাসী বুক দিয়ে আগলে রাখে।

না ফিরলে চিন্তা করবে। রাতে পিসির কাছে থাকতে চায় না। তার ওপর বিলাসীর যা গন্ধমাদন ঘুম। রাতে ভয় খেয়ে পিসিকে ডাকলেও উঠবে না।

ঘড়িটা আবার দেখে পুলিন বলল, আর চারটে স্টেশন। তারপরই নেমে পড়ব। মেরেকেটে তিন মাইল রাস্তা। মনে হচ্ছে হয়ে যাবে। ফেরার শেষ ট্রেন সাড়ে নটায়।

যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজন বলল, নটা-কুড়ি, যাবেন কোথা?

মৌলবির বাজার।

অ। দূর আছে।

পুলিন পাঞ্জাবিটা তুলে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে পেট চুলকোল। চশমাটা ঘামে পিছলে নাকের ডগায় নেমে এসেছে। সামনের দুটো দাঁত নেই। বলল, আর দেরি না করলেই হল।

এদিককার ট্রেন এরকমই চলে। দাঁড়ায়, জিরোয়, ঘুমিয়েও পড়ে। ট্রেন নড়ছে না।

বদরীর একটা আঁকুপাঁকু লাগে। গরম, ঘাম, ভিড় সব সহ্য হয়, কিন্তু দেরিটা ভোগাবে। তেমনি দেরি হলে—বদরী ঠিক করেই রেখেছে—দাঁইহাট স্টেশন থেকেই ফিরতি ট্রেন ধরবে। বিলাসী শ্বশুরবাড়ি থেকে মোটে আসতে চায় না। সেখানে বিরাট সংসার। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনিয়েছে। কাল-ই তার রওনা হওয়ার কথা। তার মেয়ে নন্দরানির বয়স মোটে তিন। বিলাসীর তিনটে মেয়ে একটা ছেলে। দিনের বেলাটা নদু ওদের সঙ্গে বেশ থাকবে। তবে রাত হলে তার বাপকে চাই। মা-মরা মেয়ে, বাপের বড্ড নেই-আঁকড়া। বাপের দিক থেকে একটা একরকমের ভাবনা থাকে। আবার মেয়ের দিক থেকেও আর একরকমের ভাবনা আছে। এমন হতে পারে, মেয়ে বাপের কথা তেমন ভাবছে না। যেমনটা মেয়ে ভাবছে বলে মনে করছে, তেমনটা নয়।

পুলিনদা, কী হবে?

পুলিন একটা ময়লা রুমালে নাক মুছল। চশমাটা ফের নাকে বসিয়ে বলল, অত ভাবছিস কেন? খবরের কাগজটা ভাঁজ করে একটু হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করল পুলিন। পুলিনবিহারীর পিছুটান তেমন নেই। গাঁয়ের মাতব্বর হলে কী হয়, বাড়িতে বিরাট সংসারে তেমন পোঁছে না কেউ। ছেলেরা লায়েক হয়েছে, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, পুলিনবিহারীও নানা কাজে বারমুখো। যেখানে সেখানে দেহখানা রাখলেই হয়। দু-চার দিন তার খোঁজও হবে না।

পুলিন বলল, কাজটা আসল, না ফেরাটা আসল?

ভারি তো কাজ! বলে বদরী মুখ ফিরিয়ে নিল।

কে একজন বিড়ি ধরিয়েছে, তার ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে এদিকে। এই দমবন্ধ অবস্থায় বিড়ির গন্ধ যেন, আরও গরম করে দিল কামরাখানা। চারদিকে অনড় ভিড়। তবে গোলমালটা কম। গরমে হাঁফিয়ে গিয়ে লোকের আর কথা বলার মতো দম নেই। শুধু 'শালা', 'সুমুন্ধির পুত', 'রেল কোম্পানির ইয়ে করেছে', গোছের কয়েকটা কথা কানে এল।

গাড়ি একটা স্তিমিত ভোঁ দিয়ে অবশেষে ছাড়ল। পুলিন ঘড়ি দেখে বলল, হয়ে যাবে।

কী হয়ে যাবে?

সময় থাকবে হাতে। ভাবিসনি।

আরও চারটে স্টেশন, তার মধ্যে কত কী হয়ে যেতে পারে!

পুলিন মুখটা কুঁচকে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আজ রোদটাও উঠেছে।

চারদিকটা যেন স্টিলের বাসনের দোকান হয়ে আছে।

পরের স্টেশনটা কাছেই ছিল। থামতেই কিছু লোক নামায় কামরাটা কিছু হালকা হল। জানলার দিকের দুটো লোক উঠল বটে, কিন্তু বদরী ওদিকে এগোল না। তেরছা হয়ে রোদ পড়ছে জানলা দিয়ে।

ঝালমুড়ি, শসা আর দাঁতের মাজনে ফিরিওয়ালারা হেদিয়ে পড়ে নেমে গেছে। একটা বাচ্চা চা-ওয়ালা উঠে হাঁক মারছিল।

পুলিন বলল, চা খাবি?

ও বাবা, এ গরমে চা!

বিষে বিষক্ষয়।

আমার দরকার নেই। তুমি খাও।

পুলিন চা নিল। চুমুক মেরে বলল, আগে অটোরিকশা সব যেত। রাস্তাটা দু-বছর আগে এমন ভাঙল যে, আর কিছুই যায় না।

দেশের অবস্থা যে ক্রমে খারাপ হচ্ছে এটা জানে বদরী। তবে তাতে তার বিশেষ আসেও না, যায়ও না। সে উদয়াস্ত খেতে পড়ে থাকে। শরীরখানা পাত করে, তবে অন্ন জোটে বরাবর। এ ব্যবস্থার ভালোও নেই, মন্দও নেই। চলে যায়। খরা, বন্যা হলেই যা বিপদ।

পরের স্টেশনে দুড়দাড় লোক নামতে লাগল দেখে, বদরী একটু অবাক হল। পুলিন বলল, আজ হরিপুরের হাট। চৈত্র-সংক্রান্তির মেলাও বসেছে ক-দিন হল। হরিপুরের জন্যই ভিড়, নইলে এ ট্রেন ফাঁকা যায়।

বড্ডই ফাঁকা হয়ে গেল। গরমটাও যেন খানিক উড়ে গেল খোলা বাতাসে। পুলিন চায়ের ভাঁড়টা এতক্ষণ ফেলেনি, হাতে ধরেছিল। এবার সেটা জানলার বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, তোর কপালটা ভালো, বুঝলি! বিয়েটা যদি লেগে যায়, দেখবি কপাল খুলে যাবে।

ভালোর তো লক্ষণ দেখছি না। যাত্রাটাই খারাপ হল। ট্রেন যা লেট মারছে স্টেশন থেকেই না ফিরতে হয়।

কথাটা গ্রাহ্য করল না পুলিন। বলল, স্বয়ং কাত্যায়নীর সংসার, বুঝলি তো? এক ছটাক বাড়িয়ে বলা নয়। এ-তল্লাটের সবাই জানে। অজাপুর থেকে বউ এল, তেরো বছর সবে বয়স। একেবারে লক্ষ্মীপ্রতিমা। গাঁয়ে ঢুকতেই দু-বছরের খরা কেটে বৃষ্টি নামল। গাছে গাছে ফলন। বউ যেখান দিয়ে যায় যেন লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ পড়ে। ভাসুরকে ভাত দিতে গিয়ে বিপত্তি, ঘোমটা পড়ে গেল। দু-হাত জোড়া। কী করে? সবাই দেখতে পেল, বউ আর এক জোড়া হাত বের করে ঘোমটাটা তুলে দিল মাথায়।

ও গপ্পো আগে শুনেছি।

বলেছি নাকি তোকে?

তুমি বলোনি। অন্য এক বউ সম্পর্কে এরকম আর একজন কেউ বলেছিল।

ও যে এই বউয়ের-ই গল্প। পাঁচমুখে ছড়িয়েছে। এ তল্লাটে সবাই জানে।

তা নয় হল, কিন্তু সে তো পুরোনো কাসুন্দি। তোমার খুড়োর মেয়ে তো আর সে নয়।

ওরে ওনারা যে-পরিবারে আসেন, সেই পরিবারটাই জাতে উঠে যায় কিনা। ওর একটা ধারা থাকে।

কতকাল আগেকার কথা সব। ওর ধারা আর নেই গো পুলিনদা।

তা এক-দেড়শো বছর হবে। এমন কিছু বেশিদিনের কথা নয়। ধরো আমার বাবার বয়েস।

ধরলাম। কিন্তু তাতেও সুবিধে হচ্ছে না। যদি সেই ধারাই হবে, তাহলে আমাকে পাত্তর ঠাওরাচ্ছ কেন?

পুলিন গোঁফের ফাঁকে একটু হাসল, কেন তুই কি খারাপ পাত্তর? পনেরো বিঘে জমি, দু-বিঘে মাছের পুকুর, বাড়িতে অতগুলো ফলন্ত গাছের বাগান।

পাত্তরের আর কিছু লাগে-না বুঝি?

আর কী লাগে?

কেন, চরিত্তির, পেটে বিদ্যে, বংশগৌরব।

তোর কী চরিত্তির খারাপ? বিদ্যেও ধরা, বাংলাটা জানিস, ইংরিজিতে নাম-সই কম নাকি? হারাধন বিশ্বাসের নাতি—বংশই কি ফেলনা?

স্টেশনগুলো পটাপট পেরিয়ে এল তারা।

পুলিন একটু হুটোপাটা করে উঠল, 'ওরে নাম নাম। সামনের স্টেশনটাই।' গাড়ি ধিইয়ে এল।

নেমে পড়ল তারা। পুলিন ঘড়ি দেখে একগাল হেসে বলল, দেরি করেনি রে। চারটে বেজে পাঁচ মিনিট। হেসেখেলে সাড়ে-নটার গাড়ি পাব।

তোমার তিন মাইল যদি চার বা পাঁচে দাঁড়ায় তাহলে অন্য কথা।

ওরে না না। অত নয়।

উদোম মাঠের ভেতর দিয়ে পথ। পাকা না হলেও রাস্তাটা পাথরকুচির ছিল বটে। তবে বহুকাল সারানো হয়নি। ভেঙে-টেঙে একশা।

পুলিন বলল, এইবার রাস্তাটা স্যাংশন হয়েছে। সারানো হবে। সামনের বছর যখন জামাইষষ্ঠীতে আসবি, তখন পাকা রাস্তা দিয়ে অটোয় চেপে হাসতে হাসতে গোঁফে তা দিতে দিতে আসবি। বুঝলি?

গাছে এখন কাঁঠালের ফুলটিও আসেনি গো, গোঁফে তা দিয়ে হবে কী? দ্বিতীয়বার ছাদনাতলায় বসার ইচ্ছে নেই গো মোটে। তুমি ধরে নিয়ে এলে বলে আসা। নদুকে আমি সৎমায়ের হাতে দেব ভেবেছ নাকি?

আচ্ছা আচ্ছা, আগে দেখ তো। কাকা বলে ভাবিসনি যে বুড়ো। বাবার পিসির ছেলে। বয়েস আমার চেয়েও পাঁচ বছর কম। তারই দ্বিতীয়পক্ষের কনিষ্ঠা। পনেরো-ষোলোর বেশি হবে না।

সবই জানে বদরী। পুলিন একবার নয়, বহুবার বলেছে। বলে বলে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। তাই বাঁচার জন্য আসা। একবার দেখে নাকচ করে দিলেই হবে। বিয়ে করতে বড়ো বয়েই গেছে বদরীর। মেয়েটার জন্য গাঁয়ের শোভাখুড়ির সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে আছে। বদরী যখন মাঠে যায়, খুড়ি এসে দেখে। বছর পাঁচেক বয়স হলে তখন আর খবরদারির তেমন দরকারও হবে না। পাঁচটা গাঁয়ের মেয়ের সঙ্গে খেলবে-ধুলবে, বড়ো হয়ে যাবে। বদরীর তখন ঝাড়া হাত-পা। বিয়ে আর নয়। ত্রিশ-বত্রিশ বয়স হল তার। আর দরকার কী বিয়ের?

পুলিনবিহারী আগড়ম বাগড়ম, বলতে বলতে পথ হাঁটছে আগে আগে। পেছনে বদরী।

ঘরটাও পাওয়া গেছে পালটি। একেবারে যেন তোর জন্য পাঠিয়েছেন ভগবান।

বদরী জবাব দিচ্ছে না। 'হাঁ' করলেই গলা বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, এমন গরম।

প্রথম গাঁ গোবিন্দপুর, দ্বিতীয় সোনাডাঙা, তিন নম্বর মৌলবির বাজার। আন্দাজ আছে বদরীর। তিন মাইলই হবে।

মৌলবির বাজার যেন মরুভূমির মধ্যে একখানা দ্বীপ। বড্ড গাছপালা চারদিকে। ধূলিধূসর ভাবটা নেই।

কেন জানিস তো? সাতাশখানা পুকুর আছে, একখানা দিঘি। তার ওপর ইরিগেশনের খাল। এ-গাঁ একেবারে লক্ষ্মীমন্ত। হবে-না? স্বয়ং কাত্যায়নী লীলা করে গেছেন।

বদরীর একটু ভয় ভয় করছে। কেন কে জানে!

ঘাবড়াচ্ছিস নাকি?

না, ঘাবড়াব কেন?

মৌলবির বাজার যে লক্ষ্মীমন্ত গাঁ এটা মনে মনে স্বীকার করতে হল বদরীনাথকে। গাছপালা আছে। পাড়ায় পাড়ায় পুকুর। গাঁও বিশাল। মেলা লোকের বাস। রোজ বাজার বসে। হপ্তায় দু-দিন হাট।

পুলিনবিহারী দূর থেকে দেখাল, ওই যে শিবমন্দির দেখছিস, ওর পিছনেই বাড়ি।

বাড়িখানা পুরোনো হলেও ভালোই। পাকা দেয়াল, মেঝে, ওপরে টিনের চাল। মস্ত উঠোন, তিনটে ধানের গোলা, সবজি বাগান, নারকেল আর সুপুরির গাছ আছে।

পুলিনবিহারী হাঁক মারল, কই রে, কোথায় গেলি সব?

হাঁক-ডাকের দরকার ছিল না। দাওয়াতেই একধারে দুজন লোক বসে গ্যাঁজালি করছিল। রোগা কালোপানা একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও বাবা, ভাইপো যে!

এই কাকা, বুঝলি? এর-ই মেয়ে।

কাকার কপালে রসকলি, গলায় কণ্ঠি, গায়ে গেঞ্জি, পরনে ধুতি। মুখখানায় ধূর্তামি আছে। বদরী ভালো করে দেখে নিল।

পুলিন বারান্দায় উঠে বলল, হাতে মোটেই সময় নেই। রাত সাড়ে নটায় ফিরতি ট্রেন। বুঝেছ তো?

সম্পর্কে খুড়ো হলেও বয়েসে কম। ফলে সম্পর্কটা ঘোরালো। খুড়ো কদম দাস বলল, আজই ফেরত যাবে কেন? চোত সংক্রান্তিতে মেলা বসিয়েছি এবার, দুটো দিন থেকে যাও।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে পুলিনবিহারী বলল, না না, এই বদরীর জন্যই আসা। তা তার থাকার উপায় নেই কিনা।

বলেই গা থেকে জামা খুলে ফেলল পুলিনবিহারী। তার সারাগায়ে দগদগ করছে ঘামাচি। বলল, 'হাতপাখা দাও তো একটা। আর ডাব।'

কদম দাস তাড়াতাড়ি ভেতর বাগে গেল। যে-লোকটা বসে এতক্ষণ কদমের সঙ্গে কথা বলছিল, সে এবার উঠে কাছে এসে বলল, এদিকটায় রোদ। ওদিকটায় ছায়া আছে।

বদরী এ-লোকটাকেও ভালো করে দেখল। বয়েস অল্পই। ছোকরা গোছের। ভারি বিনয়ী, নরমসরম ভাব।

পুলিন বলে উঠল, এক্রাম নাকি রে?

আজ্ঞে।

তোর মোকদ্দমার কী হল?

চলছে।

মোকদ্দমার কথায় পুলিনের আলাদা উৎসাহ আছে। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারটা সে খুব পছন্দ করে। পাঞ্জাবিটা কাঁধে ফেলে বলল, ফাঁকে চল তো, শুনি ভালো করে।

বদরী দেখল, কথা কইতে কইতে তারা ফটক অবধি গিয়ে দাঁড়াল। কথা আর শেষ হয় না। মামলা-মোকদ্দমার কথা শেষ হওয়ারও নয়।

কদম দাস সঙ্গে একটা রাখাল গোছের ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে এল। রাখাল ছেলের দু-হাতে কাটা ডাব।

জলটুকু খেয়ে নাও ভাই। তারপর অন্য ব্যবস্থা হচ্ছে।

ডাবটা হাতে নিয়ে বদরী বলল, এক ঘটি জলও দেবেন। বড্ড তেষ্টা।

হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরে পুটু, শিগগির গিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে নিয়ে আয়।

রাখাল ছেলেটা দৌড়োল।

ও ভাইপো, ডাব খাবে না?

পুলিনবিহারী হাতটা তুলে বরাভয় দেখাল। কথা থামল না।

ডাবটা শেষ করে বদরী ঢকঢক করে ঘটির জলটাও মেরে দিল। ভেতরটা একবারে ঝামা হয়েছিল এতক্ষণ।

রাখাল ছেলেটা দুটো লোহার চেয়ার এনে বারান্দায় পেতে দিয়ে বলল, 'উঠে বসুন।' দাওয়ার দড়িতে একটা মোটা চাদর ঝুলিয়ে ছায়ার ব্যবস্থাও হল। হাতপাখা চলে এল।

কিন্তু মুশকিল হল, পুলিনবিহারীকে নিয়ে। তার কথা আর শেষ হচ্ছে না। এক্রামকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আরও তফাত হল। তারপর চোখের আড়াল।

কদম দাস বোধহয় ভেতর-বাড়িতে খবর করতে গিয়েছিল। হঠাৎ বদরী দেখতে পেল, ঘরের দরজায় কিছু মেয়েমানুষের ভিড় আর ঠেলাঠেলি। দু-চারটে কচিকাঁচাও আছে। বদরী আজ দাড়ি কামিয়ে গোঁফ ছেঁটে এসেছে। গায়ে একখানা সবুজ পাঞ্জাবি, পরনে তাঁতের ধুতি। ঘামে একটু দুমড়ে দুমড়ে গেলেও, পোশাক খারাপ নয়। বদরী পেছনদিকে আর তাকাল না। হাতপাখায় বাতাস খেতে খেতে বে-আক্কেলে পুলিনবিহারীর চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করছিল মনে মনে। বিপদের মুখে ফেলে কোথায় যে। হাওয়া দিল। কান্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে। বদরীকে একটা লজ্জার অবস্থায় ফেলে এরকম চলে যাওয়াটা কী ভালো হল?

রাখাল ছেলেটা একখানা আগাম টুল মুখোমুখি পেতে দিয়ে চলে গেল। তাতে এসে বসলেন একজন রোগামতো বুড়োমানুষ। তার সাদা গোঁফ, গায়ে গেঞ্জি। গায়ের রং তামাটে। গলায় একটু চাপা কফের শব্দ হচ্ছে। মুখে একটু আপ্যায়নের হাসি।

বাবাজীবনের কথা খুব শুনেছি বিপিনের কাছে।

এসব কথার জবাবে কী বলতে হয়, তা বদরী জানে না। তার একবারই বিয়ে হয়েছিল। তাতে মেয়ে দেখার ঝামেলা ছিল না। মেয়ে দেখে রেখেছিল জেঠিমা। দিন ঠিক হলে সেইদিন খেত থেকে একটু সকাল সকাল ফিরে বরযাত্রীদের সঙ্গে রওনা হয়ে পড়েছিল। পাশের গাঁয়ের মেয়ে। 'ট্যাং ট্যাং' বাজনা বাজিয়ে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ঝুটঝামেলা ছিল না। টানা পাঁচ বছর সংসার। এই বছর দেড়েক আগে বাসন্তীর কী যে রোগ হল ধরাই গেল না। 'পেটে ব্যথা' বলে যখন তখন অজ্ঞান হয়ে যেত। ডাক্তার দেখে ওষুধও দিত। তারপর বাড়াবাড়ি হওয়ায় শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেল। তখন শেষ অবস্থা। ডাক্তার বলল, দেরি করে ফেলেছেন। অ্যাপেণ্ডিক্স বাস্ট করে গেছে। নইলে আজ এই ঘেমো দুপুরে এই রোদ ঠেঙিয়ে আসতে হত না।

বুড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ-বংশের মেয়ে যে-সংসারে যায় সে-সংসারে সুখ একেবারে খুলে পড়ে, বুঝলে? স্বয়ং কাত্যায়নী এ-সংসারে এসেছিলেন তো। আমার প্রপিতামহের আমলে। বুঝলে? খুব রোখাচোখা পুরুষ ছিলেন, আবার দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল খুব। তা আমার প্রপিতামহী এলেন, নামেও কাত্যায়নী, কাজেও কাত্যায়নী...

আজ্ঞে, সে-গল্প শুনেছি।

সবাই জানে কিনা। এ-বংশের খুব নাম। তা তোমার ক-টি ছেলেপুলে?

একটিই মেয়ে, তিন বছর বয়স।

ভালো হাতে পড়বে। সৎমা বলে ভাবতেও পারবে না কখনো।

খুব ঘামছে বদরী। আরও জনাকয় এসে আশপাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বেশ জাঁদরেল চেহারার মহিলা। লজ্জায় সংকোচে তাকাতে পারছিল না বদরী। এদিকে ভিড় হওয়াতে বাইরের হাওয়া আসতে পারছে না। গরম হচ্ছে।

জাঁদরেল মহিলাই হঠাৎ বললেন, ওরে খুবলো, বাতাস কর-না। কত দূর থেকে এসেছে। গরম হচ্ছে।

খুবলো একটা বছর পনেরো-ষোলোর ছেলে। পাখাটা নিয়ে টেনে বাতাস করতে লাগল। উৎসাহের চোটে দু-একবার 'ফটাস ফটাস' করে পাখার চাঁটিও লাগিয়ে ফেলল মাথায়। মাথাটা একটু নামিয়ে নিল বদরী। এরা যে কার কে হয়, তা বুঝতে পারছে না সে। বোঝার অবশ্য বিশেষ দরকারও নেই। তার এখন লক্ষ্য হল রাত ন-টা কুড়ির শেষ ট্রেনটা ধরা। মেয়েটা বাপ ছাড়া থাকতে পারবে কি?

জরদগব অবস্থা। মেয়ে দেখতে এসেছে সে, উলটে তাকেই 'হাঁ' করে দেখছে সবাই। মাথাই তুলতে পারছে না বদরীনাথ।

জাঁদরেল মহিলার হাতখানা দেখতে পাচ্ছিল বদরী। হাতে শাঁখা আছে, নোয়া আছে। সধবা। কার বউ কে জানে?

কদম দাস ব্যস্ত পায়ে এসে জাঁদরেল মহিলাকে বলল, তোমাদের হল? এরা সব রাতের ট্রেনে ফিরবে যে!

জাঁদরেল বলল, আহা, ফিরবে তো কী? দেরি আছে।

ছ-টা বেজে গেছে কিন্তু।

বদরীর হাতে ঘড়ি নেই। ছ-টা শুনে তার একটু চিন্তা হল। তিন মাইল রাস্তা অন্ধকারে হাঁটতে হবে। গাড়িটা পেলে হয়। পুলিনবিহারীর ভাবগতিক ভালো ঠেকছে না তার। পুলিনের ফেরার ঠেকা নেই, তার আছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে আর একটা শাঁখা-পরা কালো আর রোগা হাত এগিয়ে এল। হাতে একখানা কাঁসার রেকাব। তাতে মিষ্টি। সঙ্গে এক গ্লাস জল।

খাও বাবা।

খিদে আছে। রেকাবটা হাত বাড়িয়ে নিলও বদরী। কিন্তু এত জনার চোখের সামনে খায়-ই বা কী করে? এ তো বড়ো অসুবিধের মধ্যেই পড়া গেল।

সে বলল, পুলিনদা আসুক।

কদম ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে, তাই তো! ভাইপোকে তো দেখছি না। গেল কোথা? ওরে ও পুটু, একটু রাস্তায় গিয়ে দেখ তো বাবা। বড়ো বে-আক্কেলে লোক। ডেকে আন।

ছোঁড়াটা দৌড়ে গেল।

বদরী বসে রইল চুপ করে। হাতপাখা চলছে, তবু ঘামছে। গামছাটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এদের সামনে সেটা বের করা যাচ্ছে না। লজ্জা হচ্ছে।

পুলিন বেশিদূর যায়নি। এসে গেল। আগর ঠেলে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, ওরে বাবা, উকিলের ওপর ছেড়ে দিলে, কী আর মামলা জেতা যায়? 'তদবির' হল আসল কথা। উকিলের কী? দক্ষিণাটি নিয়ে কথা কয়ে ছেড়ে দেবে। পয়েন্ট দিতে হবে না?

ভিড় ঠেলে গন্ধমাদনের মতো বারান্দায় উঠে পুলিন বলল, এঃ, এ যে বাঁদর নাচের ভিড় লাগিয়েছিস তোরা। সর-সর, বাতাস আসতে দে।

তাকেও একটা রেকাব ধরানো হল। পুলিন খেতে খেতে বলল, 'এক্রামকে জোরালো কয়েকটা পয়েন্ট ধরিয়ে দিয়েছি। খুব খুশি।'

খাওয়া-দাওয়া মিটতেই কদম বলল, 'এবার যে একটু ঘরে আসতে হচ্ছে। একটু গরম হবে ঘরে। কিন্তু বারান্দায় তো আর পাত্রী দেখানো যায় না।'

পুলিন বলল, 'আহা, বাইরেই কী গরম কম নাকি? আয় রে বদরী। অত ভাবিস না, সাড়ে ন-টার ট্রেন ধরতে পারবি।'

ঘরখানা একটু ঝুঁঝকো আঁধার। জানলা-দরজা বিশেষ বড়ো নয়। তা ছাড়া জানলার বাইরেই বড়ো বড়ো গাছ। একধারে বড়োচৌকি বেডকভার দিয়ে ঢাকা। চৌকির পায়ের ধারে বেঞ্চিতে মেলা ট্রাঙ্ক বাক্স থাক দিয়ে সাজানো।

একধারে একখানা কাঠের চেয়ার। অন্য ধারে কিছু ছিল না। রাখালছেলে পুটু বারান্দার চেয়ার দুটো তুলে এনে পাতল। ঘরে বেশ ভিড় জমে গেছে চারধারে। বসতেই খুবলো ফের পাখা চালাতে লাগল পেছন থেকে। পুলিন বলল, 'জোরে চালা বাবা। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। কই গো, আনো মেয়েকে। ওরে বাবা, গেরস্ত ঘরেই তো যাবে। বেশি সাজানো-গোছানোর দরকার নেই।'

অন্দরমহলের দরজায় একটু ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। মেয়ে আসছে। একটু কেমন ভয় ভয় করছিল বদরীর। মেয়ের চারখানা হাত বেরোবে না তো!

ভিড় ঠেলে যাকে আনা হচ্ছিল, তার দিকে বদরী চাইতেই পারল না। দেয়ালে একখানা পাখির বাঁধানো ছবি দেখছিল। হলুদ রঙের পাখি। কী পাখি কে জানে বাবা! সুতোর কাজ।

ওরে দেখ, দেখ। দেখে নে। অন্যদিকে চেয়ে আছিস যে?

বদরী মাথাটা প্রথমে নুইয়ে তারপর তুলল। সব মুখই কালো লেপাপোঁছা দেখাচ্ছিল। বাইরে এতক্ষণ বসেছিল বলে, চোখটাও ধাঁধানো। ঘরটাও অন্ধকার।

তবু তারমধ্যেই একজোড়া চোখে তার চোখ আটকাল। একজোড়া? নাকি তিনটে? মেয়ের কি তিনটে চোখ? যা-সব গল্প শুনেছে পুলিনের কাছে, হওয়া বিচিত্র কী?

তবে না। কপালে একটা লম্বাটে বড়োটিপ পরেছে বলে ওইরকম। মুখচোখের তেমন হদিশ পেল না। পেয়ে হবেটাই বা কী? ফেরার পথে পুলিনকে শুধু একটা কথাই বলতে হবে, 'পছন্দ হয়নি।'

হঠাৎ ঝাঁ করে, এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে যে এল কে বলবে? বদরীর মনটাই আজ নানা আলৌকিকের বাসা হয়ে আছে। সে একটু চমকে উঠল। ‘এ কী রে বাবা, ঠাণ্ডা হাওয়া মারে কেন?’

কে একজন হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, ‘ঝড় আসছে।’

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই একটা সিংহগর্জনের মতো মেঘ ডেকে উঠল। সেরেছে। এতক্ষণ লক্ষ করেনি বদরী। লক্ষ করবেই বা কীভাবে। যা ঘিরে ছিল সবাই মিলে।

পুলিনবিহারী পান চিবুচ্ছে। কোত্থেকে পেল কে জানে? তার খুড়োর বাড়ি পেতেই পারে। বলল, ‘আসুক বাবা, আসতে দে। ঘামাচিগুলো মরে তাহলে।’

দু-চারজন ছিটকে বেরিয়ে গেল। ঝড় এলে গেরস্তবাড়িতে কিছু সারা-তাড়া থাকে।

জাঁদরেল মহিলা বলল, ‘ও কাতু, অমন মাথা নুইয়ে আছিস যে? মুখটা তোল। ভালো করে দেখুক। নইলে পছন্দ হবে কী করে?’

না:, মিঠে হাওয়াটা বন্ধ হল না। বরং বাড়ল। চোতের কালবোশেখি কত তাড়াতাড়ি আসে, তা বদরী আর পাঁচজন চাষির মতোই জানে। দম ফেলার সময়টুকু দেয় না। ‘কড়াৎ কড়াৎ’ করে দুটো বাজ পড়ল, আর মুঠো মুঠো ধুলো উড়ে এল বাতাসে। ঝপঝপ জানলা-দরজা বন্ধ করছিল সবাই। একটা হুড়োহুড়ি।

পুলিন বলল, ‘ওরে আসতে দে, আসতে দে। এ যে, সূচিভেদ্য করে ফেললি বাপ!’

বাস্তবিকই, দরজা-জানলা বন্ধ হওয়ার পর, ঘরখানা জম্পেশ অন্ধকার হয়ে গেল হঠাৎ। বাইরে তুমুল গর্জন করে একটা বড়ো হাওয়ার ঝটকা, টিনের চালে ‘মটমট’ শব্দ করে গেল। দু-নম্বর ঝটকায় দরজাটা উঠল মড়মড় করে। তারপর একেবারে হুহুংকারে কেঁপে উঠল চারদিক। বাইরে চেঁচামেচি, দৌড়োদৌড়ি, ‘ঠাস ঠাস’ কপাট-জানলার শব্দ।

ঝড়ের গর্জনে ঘরের ভেতরকার কথাবার্তাও চাপা পড়ে গেল। কানে তালা ধরিয়ে বাজ পড়ল কোথাও। খুব কাছেই।

বদরীর অবশ্য ভয় নেই। প্রতিবারই খোলা মাঠে এই ঝড়ের সঙ্গে তার দু-চারবার দেখা হয়। ঘরে বসে সে শুধু শব্দটা শুনে তান্ডবটা কীরকম তা আন্দাজ করছিল। বেশি বাড়াবাড়ি হলে ট্রেনটা পিছলে যাবে।

আচমকাই ফের মনের ভুল? নাকি চোখের বিভ্রম! পরিষ্কার দেখল সে, একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে চোখ অন্ধকারে তিনটে পিদিমের শিখার মতো জ্বলছে। স্থির।

না:, আজ তার মাথাটাই গেছে। কোথায় কী? ঘর যেমন কে তেমন অন্ধকার। তার মধ্যেই পুলিন টর্চ জ্বালাল। পাত্রীর চেয়ার ফাঁকা। উঠে গেছে কোন ফাঁকে। ঘরের ভিড়ও পাতলা হয়ে গেছে। সেই বুড়ো, জাঁদরেল মহিলা আর কদম দাস দাঁড়িয়ে।

পুলিন বলল, এ তো মুশকিল হল রে! যাবি কী করে?

পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি তো আয়ু নয়। থেমে যাবে। বদরী বলল।

সে যাবে। কিন্তু রাস্তাটার কী অবস্থা হবে জানিস?

একটু হাসল বদরী। সে হেলে চাষা, জলকাদা ভেঙে চাষ। এসব বাবু-ঘেঁষা কথা শুনলে মায়া হয়।

ঝড়ের তাড়স বাড়ল। বৃষ্টিটা এখনও শুরু হয়নি।

কদম দাস বলল, আমের বউলগুলো সব গেল।

পুলিন বলল, যায় যাক, তবু ঠাণ্ডা হোক। চাষবাস লাটে উঠতে বসেছিল।

তা বটে।

চালের টিন ধরে টানাটানি করছে ঝড় বাবাজীবন। ওপড়ায় আর কি!

কদম দাস ঊর্ধ্বমুখে চেয়েছিল। চালের নীচে কাঠের পাটাতন। পাটাতনে রাজ্যের জিনিস।

এ-ঘরের না হলেও অন্য কোনো ঘরের টিন মড়াৎ করে উলটে গেল বটে। বিকট শব্দে সেটা আছড়ে পড়ল কোথাও। দুটো গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হল পর পর।

সুপুরি আর জামগাছটা গেল। কদম দাস মুখ শুকনো করে বলল।

পুলিন টর্চটা নিবিয়ে বলল, অ বদরী।

বদরী বলল, ঘড়িটা দ্যাখো পুলিনদা।

ছ-টা বত্রিশ। টাইম দেখে হবেটা কী? ঝড় না থামলে তো নড়ার উপায় নেই।

এরপর খানিকক্ষণ কথাবার্তা বন্ধ। তারপর-ই বৃষ্টিটা এল। প্রথম চড়বড়ে কয়েকটা ফোঁটা। তারপর তুমুল। তারপর মুষলধারে।

বদরী চুপ করে বসে রইল। বাইরের ঝড়বৃষ্টি বা মেয়ের চিন্তা, শেষ ট্রেন কোনোটার কথাই ভাবছে না সে। ভাবছে, ভুল দেখল। কী দেখল সে? কাত্যায়নীর গপ্পো তো গপ্পোই। ওর কম অনেক রটনা হয়। তাহলে এরকমধারা হচ্ছে কেন?

বুড়ো মানুষটি হঠাৎ বলল, সুলক্ষণ।

পুলিন বলে, কীসের সুলক্ষণ?

এই কালবোশেখির কথাই বলছি।

অ।

কদম একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক, ফাঁড়াটা কেটেছে। গোয়ালঘরের একটা টিন গেছে। তা যাক।

বদরী বসে আছে চুপচাপ। তার যেন আর তাড়া নেই। গেলেও হয়, না গেলেও হয়।

তাড়াটা এল পুলিনের দিক থেকেই, 'ওরে ওঠ, সাতটা বাজে যে।'

ঝড় থেমেছে। বৃষ্টিটাও ধরে এল। টিনের চালে এখন শুধু মিঠে রিমঝিম। বদরী উঠল।

কদম দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, চললেন তাহলে। কষ্ট পেয়ে গেলেন একটু। যেতেও কষ্ট আছে। জলকাদা। বদরী বলল, ও কিছু নয়।

দাওয়ায় পা দিয়েই বুঝল, সামনের অন্ধকারে মেলা লন্ডভন্ড কান্ড হয়ে আছে। গাছ পড়েছে, ডাল ভেঙেছে, মেলা চাল উড়ে গেছে। লোকজনের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে খুব। আতঙ্কের গলা। টর্চ জ্বেলে হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরোচ্ছে দুজন। চারদিকে বিশাল অন্ধকার মাঠ। ভেজা বাতাস বইছে। জলে-কাদায় পিছল পথ।

ও বদরী, কিছু বল।

কী বলব?

পছন্দ হল?

বদরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'পছন্দ না হয়ে উপায় আছে'!

সাইকেল

বউ দিয়ে সে কী করবে? তার দরকার একখানা সাইকেল। 'সাইকেল-এর মতো জিনিস হয় না। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়ার মতো করে উঠে পড়লেই হল। তারপর দুখানা সরু চাকার খেল। এই খেলটাও বড়োই আশ্চর্যের। পড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু পড়ে না। ঘটুর দুনিয়াখানা এখন এসে জড়ো হয়েছে সাইকেলে। আর সাইকেলের রকমারি কম নয়। মদনবাবুর ছেলে কুঁড়োরাম কী জিনিসটাই কিনেছে। সবুজ রং, নীচু হ্যাণ্ডেল, যায় যেন পক্ষীরাজ। হরিপদর সাইকেলে একখানা বাহারি বাতি আছে, পেছনের চাকায় তার কল। কলখানা চাকার গায়ে ঠেসে দিলেই হল, সাইকেল চালালেই টর্চবাতির মতো আলো।

অত বাহারের অবশ্য দরকার নেই ঘটুর। নন্তের মতো পেছনের চাকার রডে একখানা পিচবোর্ডের টুকরো বেঁধে নেবে। চালালে চাকার স্পোকে লেগে শব্দ হবে 'ফটফট ফটফট', ঠিক যেন, মোটরসাইকেল যাচ্ছে।

বউয়ের দরকার না থাক, সাইকেলের জন্য বিয়ে করতেও রাজি আছে ঘটু। কিন্তু তাকে সাইকেল দেনেঅলা শ্বশুর কি তল্লাট ঢুঁড়লেও পাওয়া যাবে? হাড়হাভাতে ঘটুকে মেয়েই দিতে চাইবে না কেউ, তো সাইকেল!

তা বলে কি ঘটুর বউয়ের অভাব? তা নয়। হাড়হাভাতে মেয়ের বাপ মেলাই আছে। তারা মেয়ে পার করতে পারলে বেঁচে যায়, ঘটু চাইলে বিয়ের অভাব ঘটবে না। তা ঘটু সেটা চায় না। সে চায় সাইকেল।

ব্রজমাস্টার অবশ্য ভরসা দেয়। বলে সাইকেল দেনেঅলা শ্বশুর তোরও জুটবে। হাতের কাজটা আর একটু শিখেনে, তারপর দেখবি। সাইকেল তো সাইকেল, সঙ্গে সেলাইমেশিন, এমনকী রেডিয়ো অবধি পেয়ে যাবি। শুধু চাইলেই তো হবে না, চাওয়ার মতো পাত্তরও তো হতে হবে।

ব্রজমাস্টার হচ্ছে এ-অঞ্চলের নামকরা টিপকলের মিস্তিরি, শ্যালো আর টিউওয়েল বসানোর কাজে তার মতো এ-তল্লাটে আর কেউ নেই। ব্রজমাস্টার মরুভূমি থেকেও জল বের করতে পারে। মজুরিটি ন্যায্য, কাজে গাফিলতি নেই, কথার খেলাপ হয় না। ব্রজমাস্টারের তাই সারাবছর দম ফেলার সময় থাকে না। শুধু নতুন কল করাই তো নয়, পুরোনো কল খারাপ হলে মেরামতির কাজেও তাকেই চতুর্দিক থেকে ডাকাডাকি।

ব্রজমাস্টারের শাকরেদ হওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়। পেছন পেছন ঘুরলেই হবে না। ব্রজমাস্টার যাকে নেয় দেখেশুনেই নেয়। যারা বেশি খায় বা বেশি ঘুমোয় তারা প্রথমেই খারিজ। একবারে কথা বুঝতে পারে না, বা বেশি ফড়ফড় করে তারাও বাতিল। যারা কথা কইতে ভালোবাসে বা নেশাভাং বেশি করে ফেলে, তাদেরও সুবিধে নেই। ব্রজমাস্টার নেয় শুধু কাজের লোক।

ঘটু কাজের লোক কি না, তা সে নিজেও জানে না। কানাই মন্ডল হল, ব্রজমিস্তিরির ভগ্নীপোত। ঘটু আজ বছরতিনেক কানাইয়ের তাঁবেদারি করে যাচ্ছে। সব কাজেরই যে ফল ফলে তা নয়। তবে কানাই ঘটুর জন্য

এটুকু করেছিল। ব্রজমিস্তিরির সঙ্গে জুতে দিল তাকে। খোরাকিটা হয়ে যায়। দু-পাঁচ টাকা হাতে থেকেও যায়। আপাতত এটুকুই। তবে কাজ শিখে যদি হাতযশ হয় তাহলে হাত উপুড় করলেই পর্বত।

তা ঘটু লেগে আছে। ছিনেজোঁকের মতোই লেগে আছে কারণ তার যাওয়ার জায়গা নেই। তাদের সমাজে মা মরলেই বাপ তালুই। অর্থাৎ তখন বাপে আর তালুইমশাইতে তফাত থাকে না। বাপ আবার বিয়েতেও বসেছে। সুতরাং, ওদিকের পাট চুকেবুকে গেছে বলে ধরাই ভালো।

পেছনের দিকটার ঝাঁপ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু সামনের দিকটা খোলা। ব্রজমাস্টারের হাতের কাজটি নিজের হাতে তুলে নিতে পারলেই হল। তুলছেও ভালো। গোরাচাঁদের পাম্প-মেশিনে জল উঠছিল না। ব্রজমাস্টার তখন অন্যকাজে ব্যস্ত। বলল, 'যা দিকিনি, ব্যাপারটা দেখে এসে আমায় বল। ডিফেক্টটা যদি ধরতে পারিস, তবে বুঝব কাজ শিখেছিস।'

তা গিয়ে দেখেশুনে এসে ঘটু বলল, কেসিং পাইপে ফুটো হয়ে হাওয়া ঢুকে যাচ্ছে। নতুন করে পাইপ বসাতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

ব্রজমাস্টারও গিয়ে দেখল, তাই। বলল, ঠিকই ধরেছিস তো!

গাঁয়েগঞ্জে গেলে গাহাকের বাড়িতেই থাকা-খাওয়া। সব গেরস্তই যে জামাই-আদরে রাখে তা তো নয়। অনেক সময়ে বারান্দা দেখিয়ে দেয়। খাবারদাবারও বেশির ভাগ সময়েই সুবিধের নয়। মোটা ভাত, ডাল, একটা ঘ্যাঁট হলেই যথেষ্ট। তবে উঁচু নজরের লোকও কি নেই? মাঝে মাঝে তারাও আছে বলেই, ঝপ করে পাতে একটা মাছের টুকরো বা একখানা আস্ত ডিম নেমে আসে।

তবে সব মিলিয়ে ফুর্তিতেই আছে ঘটু। এক জায়গায় বাঁধা জীবন নয়। এ-গাঁ ও-গাঁ, গঞ্জে ঘুরে ঘুরে বেশ কাটে সময়। তেকাঠির বাঁশ, পুলি, রেঞ্জ বয়ে বয়ে বেড়ানো।

সাইকেলের বাইটা চাপল পিরপুরে গিয়ে। পিরপুর বড়ো জায়গা, মস্ত পিরের দরগা আছে। হরেরাম মুস্তফির বাড়ির বাইরের মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে ঘটু দেখছিল, মুস্তফির তেরো-চোদ্দো বছরের ছোটোছেলেটা সাইকেল চালাচ্ছে। হঠাৎ সেই ছেলেটা তাকে বলল, 'চালাবে? চালাও-না।'

ছেলেটা দেখতে যেমন, ফুটফুটে সুন্দর তেমনি বড্ডই ভালো। এরকমধারা আজকাল কি আর কেউ কাউকে বলে? ঘটু খুব খুশি। কিন্তু সমস্যা হল সে জন্মে সাইকেল চালায়নি। সে-কথা বলতেই ছেলেটা বলল, 'আরি বা:, তা হলে শিখে নাও। খুব সোজা।'

কথাটা সোজা হলেও কাজটা সোজা ছিল না। আর সাইকেলও সোজা জিনিস নয় মোটেই, কেবল একাত ওকাত হয়ে ঢলে পড়ে। ঘণ্টাটাক অনেক কসরত করল ঘটু। বারদশেক আছাড় খেল। শিখতে পারল না বটে, কিন্তু সাইকেল সেই যে তার মাথায় ঢুকল আর বেরোতে চায় না। উদয়পুরে কাজ হচ্ছে। মহিম মন্ডলের বাড়িতে শ্যালো বসছে। পাইপ টেনে খেত বরাবর নিতে হবে। অনেক টাকার কাজ। সন্ধের পর কাজের ছুটি হল। মহিম মন্ডল বড়ো গেরস্ত। সাঁঝবেলায় ধামাভরতি মুড়ি আর কয়েক চাকা গুড় পাঠিয়ে দিল ঝিয়ের হাতে।

গুরুপদ, সাধু গায়েন, তারানাথ, পচা, হাঁদু আর ঘটু গোল হয়ে বসে গেল মুড়ি খেতে। গুড়টার স্বাদ বড্ড ভালো।

গুরুপদ বড়ো মিস্তিরি। নিজের কারবার খোলার তালে আছে। মুড়ি খেতে খেতে বলল, 'আর হাজার দুই টাকা পেলেই আমার হয়ে যায়।'

কী হয়ে যায় সবাই জানে। গুরুপদের বাড়ি, জমি মহাজনের কাছে বাঁধা আছে। খেটেপিটে রোজগার করে কর্জটা মেরে এনেছে প্রায়। বাড়ি-জমি ছাড়াতে পারলেই গুরুপদ নিজে ব্যাবসা করবে। কাজও জানে ভালোই।

ঘটু বলল, তা, দু-হাজার হতে আর কতদিন লাগবে মনে হয়?

মেরেকেটে দুটো মাস।

তারপর তো তুমি রাজা।

গুরুপদ উদাস মুখে বলল, ধুর। রাজা-গজা আবার কী রে? বাপ পিতেমোর ভিটে, সেইটুকু রক্ষে করতে পারলেই যথেষ্ট। কুলাঙ্গার বলেই না বাঁধা রেখেছিলাম। তা ওই ভিটেটুকু আর তিন বিঘের চাষ ছাড়া আর কী আছে যে রাজা হব? তবে ওটুকু হাতে এলে একটা মনের জোর হয়। তখন লড়া যায়।

পাম্প মিস্তিরির কাজই করবে তো?

তা-ছাড়া আবার কী? একটু টাকা-পয়সা হলে একখানা মুদির দোকান দেওয়ার ইচ্ছে আছে। বউ সেটা চালাবে। আমাদের গাঁয়ে মুদির দোকান তেমন নেই। হরি সাউয়ের একখানা দোকান আছে বটে, কিন্তু লোকটা বড়ো ক্যাচালে। কেউ তাকে তেমন পছন্দ করে না।

সাধু গায়েন মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলে, তাও তোমার একখানা বাড়ি আছে, আমার তো তাও নেই। যাও-বা ছিল, তা সব বেচেবুচে দিয়ে, সেবার মায়ের চিকিৎসা করালাম। তা মাও বাঁচল না।

ঘটু বলল, তা হলে তোমার পরিবার থাকে কোথায়?

সে অনেক বৃত্তান্ত। নব দাস নামে এক গেরস্তর বাড়িতে আমার বউ কাজের লোক। তা সেই বাড়িতেই গোয়ালঘরের পাশে একখানা লকড়ির চালায় থাকে। জায়গা মোটে নেই। সেখানে আবার আমার থাকা বারণ। দিনমানে গিয়ে দেখা করা যায়, সন্ধের পর আর নয়। বর্ষাকালে ঘরে একহাঁটু জল হয়, তারমধ্যেই বউ দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকে কোনোক্রমে।

তারানাথ খুব হাসছিল। বলল, ওই জন্যই তো বিয়েটা করিনি। বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে সব ফর্সা হয়ে গেল। দাঁতে কুটো চেপে এই পড়ে আছি মাস্টারের সঙ্গে। মাস্টার যদি কোনোদিন পেছুতে লাথি মেরে তাড়ায়, তা হলেই হয়ে গেল।

গুরুপদ বলল, আহা, একাবোকা মানুষের আর চিন্তা কীসের? নিজের একখানা পেট, ও ঠিক চলে যাবে। কাজও শিখেছিস তো!

এ কাজের ভরসা কি বলো! লাইনে মিস্তিরি কিছু কম আছে? আর একাবোকাই কি চিরটাকাল থাকার ইচ্ছে ছিল?

ওরে কলের মিস্তিরির ভাত মারে কে? লেগে থাকলে কখনো না খেয়ে মরবি না।

পচা আর হাঁদুর বয়েস কম। তাদের বিয়ে-টিয়ে হয়নি। তবে সংসারের খাঁই আছে। তারা ইদিকে কান না দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে, হিন্দি সিনেমার গল্প করছিল। পরশু রাত্তিরেই একখানা মেরে এসেছে ভিডিয়ো হল-এ। পচা মুড়ি খেতে খেতেই সেই ছবির একখানা হিট গানের কলি গলায় খেলানোর চেষ্টা করছিল।

ঘটুর বয়েস পচা বা হাঁদুর মতো কম নয়। তার বাইশ চলছে। সেও একাবোকা লোক। তারও থাকার জায়গা নেই। কিন্তু সেসব নিয়ে তার মাথা গরম হয় না। চোখ বুজলেই সে একখানা সাইকেল চোখের সামনে ভাসতে দেখে। মানুষ মেলা যন্তর আবিষ্কার করেছে বটে, কিন্তু 'সাইকেল' হল একেবারে গন্ধমাদন। নির্ঝঞ্ঝাট জিনিস। পাঁইপাঁই করে উধাও হয়ে যাও। আবার সময়মতো ধীরেসুস্থে ফিরে এসো।

তা গুরুপদ যদি মাস্টারকে ছেড়ে নিজের ব্যাবসা খোলে, তাহলে একটা জায়গা খালি হবে। সেই জায়গায় উঠবে সাধু গায়েন। সাধু গায়েনের জায়গায় একধাপ উঠবে তারানাথ। তখন ঘটুর চাকরি পাকা হবেই।

চাকরি পাকা হলে মজুরি বাড়বে।

মজুরি বাবদে ব্রজমাস্টারের কিছু গন্ডগোল আছে। ব্রজমাস্টার একটা মোটা হিসেবে খদ্দেরের কাছ থেকে টাকা নেয়। কর্মচারীদের দেয় নিজের হিসেবমতো। গুরুপদ বা সাধু গায়েন যা পায়, তারানাথ তা পায় না। তা সে হতেই পারে। পুরোনো লোক বলে কথা! কিন্তু সেই হিসেবে পচা বা হাঁদুর চেয়ে বেশি পাওয়ার কথা ঘটুর। কেন না সে ওদের চেয়ে মাস ছয়েকের পুরোনো। কিন্তু কে সে কথা বলতে যাবে?

তবে মাস্টার খুব একটা মন্দ লোক নয়। কর্মচারীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। ধর্মভীরুও আছে। আর খুব কাজ-পাগল লোক।

গাঁ-দেশে সন্ধের পর আর কিছুটি করার থাকে না। মুড়ি খেয়ে গুরুপদ বারান্দার এক কোণে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সাধু গায়েন আর তারানাথ বসে বসে নানা সুখ-দুঃখের কথা ফেঁদে বসল। পচা আর হাঁদু বেরিয়ে পড়ল ফের ভিডিয়ো দেখবে বলে। উদয়পুর থেকে মাইলটাক উজিয়ে গেলেই মেহেরগঞ্জে আজ হাট। ভিডিয়ো সেখানে আছেই। পচা একবার আলগোছে জিজ্ঞেস করল বটে, যাবে নাকি ঘটুদা? ঘটুর ইচ্ছে হল না। ঝাড়পিট আর আশনাই আর নাচা-গানা সবসময় ভালো লাগে না। বরং চোখ বুজে একখানা স্বপ্নের সাইকেলে সওয়ার হলে অনেক ভালো।

সাইকেলখানা দিব্যি দেখতে পাচ্ছিল ঘটু।

শ্যাওলার মতো সবজে রং, ঝকঝকে ক্যারিয়ার, গোল ডিবের মতো বেল, একটু নীচু হ্যাণ্ডেল। সাঁই-সাঁই করে যাচ্ছে পাকা রাস্তা ধরে। সিটের ওপর ঘটু...

ব্রজমাস্টার আর মহিম মন্ডল কথা কইতে কইতে ভেতর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

ব্রজমাস্টার কথা বলছিল, ‘এত তাড়াতড়ি কী এসব কাজ হয় মহিমবাবু? সবে তো বাঁশটাশ লাগানো হল। এরপর বড়ো পাইপ ঢুকবে। তারপর জলের পাইপ, চাট্টিখানি কথা তো নয়। আজ শনিবার, সামনের শনিবারের আগে হচ্ছে না, যদি তাও হয়।’

মহিম মন্ডল ঠাণ্ডা গলাতেই বলল, সব-ই বুঝি হে ব্রজ। বলছি তো তিনগুণ মজুরি দেব। করে দাও। মেয়ের বিয়েটা হুট করে ঠিক হয়ে গেল কিনা। বুধবার বিয়ে। তুমি বুধবার সকালের মধ্যে কাজ সেরে দাও।

বুধবার যে অসম্ভব মহিমবাবু। তিনশো ফুটের ওপর পাইপ ঢোকানো কি চাট্টিখানি কথা?

তুমি ওস্তাদ লোক, মন করলে কী না পারো! দিনরাত কাজ করলে হয়ে যাবে, মজুরি চারগুণ দেব।

টাকা বাড়ালেই তো হবে না। এগুলো তো মানুষ, মেশিন তো নয়। চারদিন টানা চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করলে যে মরে যাবে।

আমার সম্মানটা রাখো মাস্টার। পাত্রপক্ষ বড়োলোক, তাদের কথার নড়চড় নেই। পাত্র গোরক্ষপুর থেকে এসেছে, বিয়ে করে শুক্রবার বউভাত সেরেই চলে যাবে কাজের জায়গায়। এ-পাত্র হাতছাড়া হলে তো চলবে না।

কী মুশকিল! পাত্র হাতছাড়া হতে যাবে কেন? হোক না বিয়ে, আমরা না-হয় বিয়েটা ফাঁক রেখে দু-দিন পরেই কাজ করব।

আহা, আমি যে শ্যালো বসালুম তা তাদের দেখাতে হবে না? তারা বড়োলোক, কিন্তু আমিও কম কীসে? শ্যালোতে ভটাভট জল উঠবে, ট্যাঙ্কে জমা হবে, হুড়হুড় করে পাইপ দিয়ে পড়বে, দেখে তাদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে, তবে না?

এ-যে বড়ো মুশকিলে ফেললেন মশাই। আমি রাজি হলেও আমার লোকেরা কি রাজি হবে ভাবছেন?

ডাকো তাদের, মজুরি চারগুণ তো পাবেই, তার ওপর আমি প্রত্যেককে দুশো টাকা করে বকশিশ দেব।

সাধু আর তারানাথের বাক্যালাপ থেমে গেছে। গুরুপদও উঠে বসেছে অন্ধকারে।

তারানাথ চাপা গলায় বলল, শুনলে?

গুরুপদ বলল, শুনলুম।

সাইকেলের দরদাম জানে না ঘটু। দুশো টাকায় কি হয়? হোক না হোক, সাইকেলটা যেন আবডাল থেকে খুব খুশির ঘণ্টি বাজাতে লাগল। সে এসে পড়তে চাইছে।

মাস্টার হাঁক মারল, গুরুপদ! ও গুরুপদ, একবার আয় তো ইদিকে ভাই।

গুরুপদ উঠে পড়ল। সঙ্গে সাধু গায়েন আর তারানাথও।

ঘটু গুরুতর কথায় থাকে না। তবে আড়ালে কান খাড়া করে রইল সে!

এই যে গুরুপদ, বাবু কী বলছে শোন। পারবি চারদিনে কাজ তুলে দিতে?

দশ দিনের কাজ চার দিনে? ও বাবা!

মহিম মন্ডল বলল, বাপু হে, হওয়ার কথাটা ভাবো, না হওয়ার কথাটা ভেবো না। দশ দিনে পারলে চার দিনেও পারা যায়। খাটুনিটা বাড়িয়ে দেবে।

আজ্ঞে, মানুষের শরীর তো!

মানুষ কি কম কিছু করছে? পাহাড়ে উঠছে, সমুদ্দুর পেরোচ্ছে সাঁতরে, আরও কত কথা শুনি। আমার যে সম্মানের প্রশ্ন হে!

আজ্ঞে মজুরিটা কত দেবেন?

যা পাও তার তিনগুণ, আর দুশো টাকা করে বকশিশ।

মাপ করবেন, ওতে পারব না।

কত চাও?

মজুরি চার ডবল করুন। আর হাতে হাতে তিনশো করে টাকা।

সুযোগ বুঝে বাড়াচ্ছ হে!

আজ্ঞে না। শরীরের রসকষ নিংড়ে দিতে হবে যে। চারদিন না ঘুমিয়ে, না জিরিয়ে কাজ করলে মানুষের কী অবস্থা হয় তা তো জানেন।

মহিম মন্ডলের পয়সা আছে, পয়সার গরমও আছে। হঠাৎ হুংকার দিয়ে উঠল, তাই পাবে। লেগে পড়ো, বুধবার বেলা বারোটার মধ্যে কাজ সারা চাই। জামাই আসবে সাড়ে পাঁচটায়। তার আগে এমন করে সব সারতে হবে যে, সদ্য হয়েছে বলে বোঝা না যায়।

তা হয়ে যাবে।

আজ রাত থেকেই শুরু করে দাও। আমি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি সাধনকে খবর দিচ্ছি, সে এসে একটা ডুম জ্বালানোর ব্যবস্থা করে দিক লাইন টেনে।

যে আজ্ঞে।

ও ঘটু, পচা আর হাঁদুকে দৌড়ে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। বেশিদূর যায়নি বোধ হয়।

তারানাথের হাঁক শুনে ঘটু উঠে ছুটল। আর ছুটতে ছুটতে তার মনে হল, এই অবস্থায় একখানা সাইকেল থাকলে—আঃ, শুধু প্যাডেল মারো আর উড়ে যাও।

পচা আর হাঁদু গাঁ পেরোনোর আগেই ধরে ফেলল ঘটু। বৃত্তান্ত শুনে তারা পড়ি কী মরি করে ছুটে এল। সাজো-সাজো রব।

মহিম মন্ডল ভারি খুশি হয়ে বলল, ‘এই তো চাই। ভালো করে কাজ করো বাবা সকল, আজ রাতে খাসির মাংস খাওয়াব।

ব্রজমাস্টার হাতজোড় করে বলল, ‘ও-টি করবেন না। গুরুভোজন হয়ে গেলে সবাই ঢুলবে, কাজ এগোবে না। বরং রুটি-তরকারির বন্দোবস্ত করুন। ঊন-পেটে থাকলে রাত জাগতে সুবিধে হয়।’

পুবের আকাশে সুয্যি ঠাকুরের মতো মাংসটা উদয় হচ্ছিল, কিন্তু অস্তও হয়ে গেল। বেজার মুখে ঘটু কাজে নেমে পড়ল।

কাজও বড়ো সোজা নয়। কার্তিক মাস, হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। দুখানা ডুমের আলোয় বড়ো বড়ো ছায়া ফেলে তারা কেসিং-এর পাইপ পুঁততে লাগল। হ্যামার মারতে মারতে হাঁদু, পচা আর ঘটুর গা ঘেমে গেল কয়েক মিনিটেই। তা ঘামুক, মন্ডলের পো পুষিয়ে দিচ্ছে।

ভোর হতে না-হতেই চারখানা পাইপ নেমে গেল নীচে।

ব্রজমাস্টার একখানা ঢিবির ওপর বসে দেখছিল সব। বলল, ‘এবার যাও, চোখে-মুখে জল দিয়ে একটু জিরিয়ে নাও। মুড়িটুড়ি যা জুটবে খেয়ে ঘণ্টা দুই ঘুমোও। একেবারে না ঘুমোলে শরীর দেবে না। কাজটা তোলা চাই। শরীর পাত হয়ে গেলে কাজ তুলবে কে?’

মুড়ি এল, সঙ্গে সেই গুড় তো আছেই, মন্ডলের পো একধামা বেগুনিও পাঠিয়েছে গরমাগরম। কিন্তু ব্রজমাস্টার বেগুনির ধামা সরিয়ে নিল। বলল, 'ও-জিনিস চলবে না। খাটুনির পর এসব ভাজাভুজি পেটে গেলে আর দেখতে হবে না।'

শেষ অবধি দয়াপরবশ হয়ে দুখানা করে দিল।

দুপুর অবধি কাজ অনেকটাই এগোল। দুপুরে যখন পেটে খান্ডবদহনের খিদে তখন যা-জুটল তা ব্রজমাস্টারের হুকুমেই। তেতোর ডাল, একটা ঘ্যাঁট আর ভাত। সঙ্গে আলুসেদ্ধ। ব্রজমাস্টার বলল, 'গুরুপাক খেলে শরীর দেবে না। ঊন খাওয়াই ভালো। কাজ তুলে দে, তারপর বিয়ের ভোজ তো আছেই।'

খাওয়ার পর ফের ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিল তারা। তারপর ফের কাজ। পাইপ নামছে। কাজ এগোচ্ছে। তবে রাতের মধ্যেই ঘটু বুঝতে পারল শরীরের নাম 'মহাশয়'। চোখে ঢুলুনি। হাতে পায়ে সেই দুনো জোর আর নেই। তিনশো টাকা আর তিন ডবল মজুরিতে তার সাইকেলখানা হয়ে যাবে, এই আশায় হ্যামার মারতে লাগল ঘটু। গুরুপদ খাটছে, দু-হাজার টাকার খানিক উশুল করবে বলে। সাধু গায়েন বউকে উঞ্ছবৃত্তি থেকে রেহাই দেবে। তারানাথ বে ঘসবে। পচা আর হাঁদু টাকাটা ওড়াবে ইচ্ছেমতো, কিছু বাড়িতেও দেবেথোবে। নানান ধান্ধায় মহিম মন্ডলের শ্যালো নামছে মাটিতে। গভীরে।

সোমবার উদয়পুরে হাট। মহিম মন্ডলের বাড়ির পাশের মাঠ থেকেই হাটের শুরু। রবিবার বিকেল থেকেই ব্যাপারীরা এসে হাজির হচ্ছিল পিলপিল করে। সোমবার সকালে হাঁকে-ডাকে জমজমাট।

'খাওয়াটা তেমন জুতের হচ্ছে না, বুঝলে? আরে খাটলে পিটলে একটু পোস্টাইও তো চাই।' এই বলে পচা আর হাঁদু যখন ব্রজমাস্টার সকালে মাঠপানে গেছে, তখন হাটে গিয়ে ভরপেট ঘুগনি মেরে এল। মহিম মন্ডলের চারটে মোষ আর বারোটা গোরু। পেছনের উঠোনে সকাল-বিকেল যখন দোয়ানো হয়, তখন মচ্ছব লেগে যায়। পচা আর হাঁদু এক ফাঁকে গিয়ে, এক ঘটি করে মোষের দুধ কাঁচাই গিলে এল। রাখাল লোকটা দিলও, কারণ বাবুর গুরুতর কাজ হচ্ছে, মিস্তিরিরা জান কয়লা করে খাটছে, না দেবেই বা কেন?

বিকেলের মধ্যেই দু-জনের পেট নামল সাংঘাতিক। কাজ করবে কী, হাতের জল-ই শুকোয় না। তার ওপর তারানাথের এল কম্প দিয়ে জ্বর।

'এঃ, এ যে তীরে এসে তরী ডুবতে বসল দেখছি।' —বলে মুখ বেজার করল ব্রজমাস্টার।

মহিম মন্ডল বলল, গতরে খাটার লোক দিতে পারব। তবে তারা এ-ব্যাপারে আনাড়ি।

তাই দিন। কাজ তো চালাতে হবে।

দুটো মুনিষ আর ঘটু মিলে ফের লেগে পড়ল। সোমবার মাঝরাতে কেসিং-এর পাইপ তিনশো ফুট নামল বটে, কিন্তু ঘটুর তখন হাতে-পায়ে সাড় নেই।

মাঝখানের পাইপ নামানো সাবধানের কাজ। রেঞ্চ দিয়ে ঠিকমতো আটকে না রাখলে একখানা পাইপও যদি ভেতরে পড়ে যায় তো চিত্তির। সব পরিশ্রমই বৃথা যাবে। একাজ আনাড়ি দিয়ে হওয়ার নয়। জ্বর গায়েই তারানাথ এসে হাত লাগাল। পচা আর হাঁদুও লেগে পড়ল ফের। হাঁদু চুপিচুপি ঘটুকে বলল, 'আমার ঠাকরদা রক্ত-আমাশায় মারা গিয়েছিল। আমারও সেটাই হয়েছে, তলপেটে বড্ড যন্ত্রণা।'

সাত-আট ঘণ্টা খাটার পর দু-ঘণ্টা ধরে ঘুমোচ্ছে তারা। কিন্তু তাতে শরীরের আবল্যি যাচ্ছে না। পাইপ নামানোর সময় রেঞ্চ ধরা হাত দুখানা থরথর করে কাঁপছিল ঘটুর। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রইল। চোখ বুজলেই সাইকেল। সাইকেলখানা দেখতে পেলেই বুকখানা যেন ভরে যায়। নীচু হ্যান্ডেল, শ্যাওলা সবজে রং, ঝকঝকে ক্যারিয়ার।

'হড়াক' করে একটা শব্দ হওয়ায় চটকা ভাঙল ঘটুর। সবাই চেঁচাচ্ছে, 'গেল! গেল'! রেঞ্চ তার ঘুমন্ত হাত থেকে আলগা মেরে পাইপ সরসর করে নেমে যাচ্ছিল। ঘটু প্রাণ হাতে নিয়ে দুহাতে সাপটে ধরল পাইপ। কাদাজলে পিছল হাত, আর চারখানা জোড়ের ভারী পাইপ। ধরে রাখতে হাতির জোর চাই। তবু ধরে রইল ঘটু। অন্য সবাই হাত না লাগালে হয়ে যেত।

না, ব্রজমাস্টার বকল না। বরং বলল, 'ওর দোষ কী? শরীর বলে কথা। ও ঘটু, যা বরং জর্দা দিয়ে একটা পান খেয়ে আয়, ঘুমের চটকাটা যাবে।'

পান আর খেতে হল না। দু-খানা হাতের তেলোর দিকে চেয়ে ঘটু জলভরা চোখে দেখল, হাত দুখানা ছড়ে-কেটে একশা। ভারী পাইপ ধরে রাখতে গিয়ে কেসিং-এর কানায় চেপে গিয়ে গর্ত হয়ে কেটেছে পাঞ্জার তলার দিকটা। কলের মতো রক্ত পড়ছে। সাধু গায়েন রেঞ্চটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'যা, ঘাস থেঁতো করে লাগা'।

তাই লাগাল ঘটু। বাবুভাইদের হাত হলে ভোগাত। মিস্তিরির হাত বলে তেমন গা না করলেও চলে। তবে বসে থাকতে ভয় হচ্ছে ঘটুর। মহিম মন্ডল যদি কথা তোলে, 'আমার মুনিষ খাটছে, তোমার লোক বসে আছে, আমি মজুরি কাটব। মুনিষ দুটোকেও তো দিতে হবে। তারা তো মাগনা খাটছে না!'

কথাটা তারানাথের কানে দিল ঘটু। তারানাথ বলল, 'না রে, মহিম দিলদরিয়া লোক। কাটবে না।'

মঙ্গলবার রাতে যখন, পাইপ নেমে গেল আর মুখ সিল করা হল তখন, ঘটুর হাতে বড়ো বড়ো ফোসকা। লেবুকাঁটা দিয়ে ফোসকা গেলে মরা চামড়া সরিয়ে দিল সে নিজেই। তারপর 'বিষহরি' তেল লাগাল। গরিবের হাত এতেই সারে। না সারলে কি চলে?

সারারাত জল ঢালা হল পাইপে। প্রথমে গোবরগোলা, তারপর সাদা জল। পাম্প চালিয়ে জল বের করা হতে লাগল। সবাই টান টান। জলের প্রেশার কেমন, ঠিকমতো মোটা নালে ওঠে কি না ওঠে।

বুধবার ভোরবেলা ভোগবতী মহিম মন্ডলের পাইপ বেয়ে উঠে এলেন। ফুরফুরে জল। পরিষ্কার ঝকঝকে।

বিয়েবাড়ির তুমুল হই-রইয়ের মধ্যেও মহিম ছুটে এসে পিঠ চাপড়ে দিল ব্রজমাস্টারের, 'কাজ দেখালে বটে বাপু! তাজ্জব!'

জল ট্যাঙ্কে উঠে যাচ্ছে ডিজেল পাম্পে। বিয়েবাড়ি ভাসাভাসি।

কাজ শেষ করে তারা বাইরের দিককার ঘরের বারান্দায় বসে আছে পাশাপাশি। সামনে ফাঁকা মাঠে রাতারাতি মস্ত ম্যারাপ বাঁধা হয়ে গেছে। এই ম্যারাপের নীচেই সাঁঝবেলায় বিয়ের আসর বসবে। মন্ডলের পো জামাইকে ঢেলে দিচ্ছে। স্কুটার, টিভি আরও কী কী সব যেন। জামাইও জম্পেশ। মস্ত চাকরি।

কাজের মেয়ে বলে গেছে, আজ মুড়ির সঙ্গে গরম বোঁদে দেওয়া হবে, আর দুখানা করে সন্দেশ। আর বেগুনিও। কিন্তু কারোরই তেমন গা নেই। শরীর নিংড়ে দিতে হয়েছে গত চার দিনে। কাজটা উঠে গেছে এই যা-একটা ভালো খবর।

গুরুপদ হিসেব কষছিল। কষে বলল, আরও হাজারখানেক হলেই হয়ে গেল।

সাধু গায়েন দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসেছিল। বলল, 'আমার এখনও ঢের দেরি। যতীন মজুমদারের জমিটা আড়াই কাঠা। তাও দশহাজার চাইছে।'

এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল। সকলেরই দমসম অবস্থা। গড়িয়ে নিতে পারলে হয়। হঠাৎ একটা শোরগোল মতো শোনা গেল ভেতরবাড়ি থেকে।

গুরুপদ সোজা হয়ে বসে বলল, 'গোল কীসের'?

তারানাথ বলল, 'বিয়েবাড়িতে অমন হয়। আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই পুরোনো খার থাকে কিনা।'

একটু বাদেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল ব্রজমাস্টার, 'ওরে, সর্বনাশ হয়েছে। বাবুর মেয়ে পালিয়ে গেছে।'

সবাই সোজা হয়ে বসল।

ব্রজমাস্টার উত্তেজিত হয়ে বলল, 'সকালে কুয়োপাড়ে মুখ ধোয়ার নাম করে গিয়েছিল। সেখানে একটা ছোকরা সাইকেল নিয়ে তৈরি ছিল। রডে তুলে নিয়ে হাওয়া।'

তারানাথ বলল, 'তাহলে কী হবে?'

'কী আর হবে?' মহিমবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। গিন্নী মূর্ছা গেছেন। চারদিকে লোক গেছে মেয়ে খুঁজতে। কিন্তু খুঁজে পেলেও লাভ নেই। রা পড়ে গেছে। পাত্রপক্ষ গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল,

তারাও জেনে গেছে। বিয়ে ভেস্তেই গেল ধরে নাও।

ঘটু উঠে সোজা হয়ে বসে বলল, ‘সাইকেল?’

ব্রজমাস্টার অবাক হয়ে বলে, ‘সাইকেল! সাইকেলের কথা উঠছে কেন?’

ঘটু একগাল হেসে বলল, সাইকেলের কথাই তো বললেন! সাইকেলে করেই তো পালিয়েছে!

হ্যাঁ। তাতে কী?

ঘটু উজ্জ্বল চোখে চেয়ে রইল। —একখানা সাইকেল হলে কত কী-না করা যায়!

লক্ষ্মীপ্যাঁচা

ওঃ, এ যে, একেবারে হরিপদ জিনিস রে!

আজ্ঞে, ভালো জিনিস বলেই তো আপনার কাছে আসা। এসব জিনিসের কদর ক-জন করতে পারে বলুন? আর দামই বা দিতে পারে ক-জন?

তা আনলি কোথা থেকে? বাজারি জিনিস নয় তো! তোকে বাপু বিশ্বাস নেই।

কী যে, বলেন। কবে নেমকহারামি করেছি বলতে পারেন? দ্বিজপদ আর যাই হোক বিশ্বাসঘাতক নয়। সত্যি কথাই বলছি, গেরস্ত ঘরেরই মেয়ে। আতান্তরে পড়েছে। এঁটোকাঁটা হয়নি এখনও।

গেরস্তঘরের মেয়ে বলছিস? পরে আবার পুলিশের ঝামেলা হবে না তো! দেখিস বাপু। আমার একটু চরিত্রের দোষ আছে বটে, তা বলে আমি মেয়েছেলে দেখলেই কান্ডজ্ঞান হারিয়ে বসি না।

সে আর বলতে। আপনার সঙ্গে তা ধরুন তিন বছরের কাজ-কারবার আমার। আপনাকে চিনতে কি আর বাকি আছে? এ ভালো মেয়ে বাবু, সরল-সোজা, গরিব ঘরের মেয়ে। নিজের ইচ্ছেতেই এসেছে। ও নিয়ে ভাববেন না।

ওরে তাই কখনো হয়! আমার একটা নিয়ম আছে তো! ঘরে ওর কে কে আছে সব খতেন দে। বাপ কী করে?

নেই।

মরেছে?

কবে।

আর কে আছে?

মা আছে, দুটো ছোটো ছোটো ভাইবোন আছে।

চলে কী করে?

গতর খাটিয়ে ওর মা খেতের কাজটাজ করে, মুড়িটুড়ি ভাজে। চলে না। বড্ড অসুবিধের মধ্যে আছে।

মেয়েটাকে কাছে ডাক, একটু কথা কয়ে দেখি।

মেয়েটা একটু দূরে মালঘরের দরজার কাছে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথাটথাগুলো শুনতে পেয়েছে কি না বোঝা গেল না। কোনো ভাবান্তর নেই। তবে দেখতে বেশ। ছোটোখাটো চেহারা, তেমন কালো নয়, মুখের ডৌলটুকু ভারি মিঠে। যোগেনের চোখে লেগে গেছে।

মেয়েটা কাছাকাছি এসে হেঁটমুন্ডু হয়ে দাঁড়াতেই যোগেন জিজ্ঞেস করে, বলি নিজের ইচ্ছেয় এসেছ, নাকি এ হতভাগা ধরেবেঁধে এনেছে? দ্যাখো বাপু, আমি ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করি না। বুঝেসুঝে এসে থাকলে ভালো, নইলে বাপু আমার পোষাবে না।

মেয়েটা কথা কইল না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল।

ও দ্বিজু, কথা কয় না কেন রে? বোবা নাকি?

না না, বোবাকালা, হাবাগোবা ওসব কিছু নয়। তবে মুখরা নয় আর কী।

মুখরা নয় সে না হয় হল, তা বলে বোবা হলে চলে কী করে? তোমার নাম কী গো মেয়ে?

বোবা যে নয় তা বোঝা গেল। ক্ষীণকণ্ঠে জবাব এল, অধরা।

অধরা! বা: বেশ নাম। তা দ্বিজপদর কাছে সব ভালো করে শুনে বুঝেসুঝে নিয়েছ তো!

মেয়েটা আবার চুপ।

দ্যাখো বাপু, আমার লুকোছাপা কিছু নেই। সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। দেশের বাড়িতে আমার বিয়ে-করা বউ আছে, ছেলেপুলে আছে। আমার বয়সও ধরো এই উনপঞ্চাশ চলছে। বাড়ি ছেড়ে কারবার আঁকড়ে পড়ে থাকি। রসকষহীন জীবন, বুঝলে? তাই মেয়েমানুষের দরকার হয়ে পড়ে। পয়সা ন্যায্যই পাবে, কিন্তু পরে আবার ঝামেলা পাকিয়ে তুলো না। আগেরজন তো গয়নাগাটি, সম্পত্তির ভাগ চেয়েও ক্ষান্ত হল না। পরে বিয়ে করার জন্য চাপাচাপি শুরু করে দিল। ওসব মতলব থাকলে আগে থেকেই খোলসা হও।

মেয়েটা চুপ।

দ্বিজপদ কাঁচুমাচু মুখে বলে, আহা, আনকোরা মেয়েটাকে এমন পষ্টাপষ্টি বলতে আছে! ঘাবড়ে যাবে যে বাবু। ওসব যা বলা-কওয়ার তা বলে-কয়েই এনেছি। আপনাকে ভাবতে হবে না।

দেখ দ্বিজপদ, পুতুলকেও তো তুই বলে-কয়েই এনেছিলি। তাতে কাজ হয়েছিল? কী হাঙ্গামাটাই বাধাল, বল!

তা বাবু, কিছু মনে যদি না করেন, পুতুল থাকলেও আপনার ওই সরস্বতীর সঙ্গে মাখামাখি করাটা ঠিক হয়নি।

যোগেন ফুঁসে উঠে বলে, কেন, ঠিক হয়নি কেন? সরস্বতীর সঙ্গে কী আর কার সঙ্গে মাখামাখি করলুম তাতে ওর কী? ও কি আমার মাগ নাকি? পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক, ব্যস পয়সাতেই সম্পর্ক শেষ।

আচ্ছা সেসব কথা একটু আবডালে বলবেন। এ একেবারে আনকোরা, কাঁচা মেয়ে। ভয় খেয়ে যাবে।

যোগেন নরম হল। আসলে মেয়েটিকে তার বেশ ভালোই লাগছে। বাইশ-তেইশ বছরের বেশি বয়স নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে। উলোঝুলো নোংরা ভিখিরির চেহারা নয়।

তা ওহে মেয়ে, সব বুঝলে তো! কথা না কও, একটু ঘাড়খানা নাড়তেও তো পারো।

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল না, কথাও কইল না।

মুশকিলে ফেললে দেখছি। অমন কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু কি বুঝবার জো আছে? বলি কালা নও তো!

দ্বিজপদ বলে, না কালা নয়। ওই যে বললুম, একটু লাজুক আছে। মনটাও ভালো নেই, এই প্রথম বাড়ির বাইরে আসা।

একটা শ্বাস ফেলে যোগেন বলে, সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু আছে? শাড়ি সায়াটায়া?

দ্বিজপদ শশব্যস্তে বলে, না না, ওসব থাকবে কোত্থেকে? যা পরনে দেখছেন তাই সম্বল।

যোগেন একটু হাসল, ওহে দ্বিজপদ, এতবড়ো কারবারটা যে চালাই তাতে একটু বুদ্ধির দরকার হয়। এর আগে তুই আরও দুজন এনেছিলি, তাদেরও ওই পরনেরটুকু ছাড়া আর কিছু ছিল না। ওসব কি আর আমি বুঝি না? শুরুতেই আদায় উসুল করতে লেগে পড়া।

কী যে বলেন বাবু।

ঠিকই বলি। ওহে মেয়ে, যাও, ওই পিছনদিকে গুদোম-ঘরের লাগোয়া ডানহাতি একখানা ঘর পাবে। সেখানে গিয়ে বোসো।

মেয়েটি ভারি সংকোচের সঙ্গে পায়ে পায়ে চলে গেল।

যোগেন মুখ তুলে বলে, বন্দোবস্ত কীরকম?

আজ্ঞে ওই যা দেন, তাই দেবেন আর কী! মাসে হাজার টাকা, আর খাওয়া-পরা। বাড়তি শুধু দশটি হাজার টাকা।

আঁতকে উঠে যোগেন বলে, তার মানে?

দ্বিজপদ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, বললুম না, ওরা বড়ো বিপাকে পড়েছে! কিছু জমি বাঁধা পড়ে আছে। ছাড়াতে হলে দশ হাজার টাকা না-হলেই নয়। ওর মা চেয়েছে।

বলি, টাকা কি গাছে ফলে রে দ্বিজপদ?

বাবু, মেয়েমানুষের রেট কি এক জায়গায় বসে আছে? তা ছাড়া দেখছেন তো জিনিসটি একেবারে হরিপদ। তা হরিপদ জিনিসের জন্য দরটাও তো হরিপদই হবে, নাকি?

পাগল হলি নাকি? দশ হাজার টাকা মুখের কথায় ফেলে দেব, আমি সেই বান্দা নই।

তা হলে হল না বাবু। ওর মা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, মেয়েকে এসব নোংরামির মধ্যে নামানোর তার মোটে ইচ্ছে নেই। পেটের দায়ে রাজি হয়েছে। ওই দশটি হাজার টাকা পুরোপুরি চাই। নইলে মেয়ে ফেরত নিয়ে যেতে বলে দিয়েছে।

যোগেন কেমন যেন কাহিল হয়ে পড়ল। মিনমিন করে বলল, না:, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

আজ্ঞে সে আপনি যা মনে করেন। বাড়াবাড়ি মনে করলে ও মেয়ের দায় আপনাকে ঘাড়ে নিতে হবে না। মেলা লোক গেঁজে হাতে করে বসে আছে।

ওঃ, খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হচ্ছে! বলি এ-তল্লাটে খপাৎ করে দশ হাজার টাকা ফেলার লোক পাবি তুই?

হাসালেন বাবু। আপনি তো মান্ধাতার আমলে পড়ে আছেন দেখছি।

তার মানে?

সাহাগঞ্জ কি আর আগের মতো আছে? দু-দুটো কোল্ড স্টোরেজ, পাঁচখানা চালকল, তিনটে পাউরুটির কারখানা, সাতটা লেদ মেশিন, সাতটা পোলট্রি, হাইওয়েতে পুব-পশ্চিমে দু-দুটো পেট্রোল পাম্প, পয়সাওয়ালা লোকের অভাব বলে আপনার মনে হয়?

যোগেন বৃথা একটু তড়পাল, ওরে চিনি তোর পয়সাওয়ালাদের। ওই তো মদন গুছাইত, হরেন মন্ডল, চিনি ঘোষ আর সুধীর পুততুন্ড। এই তো! দশ হাজার টাকা ফেলতে কাত হয়ে যাবে তারা।

কিন্তু অধরার মা যেন একটি আধলাও কম নেবে না বাবু। তা হলে মেয়েটাকে ডাকুন, বেলাবেলি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই।

যোগেন একটু বিপাকে পড়ল। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাতটা সে একটু ভোগসুখে কাটাতে চায়, বহুকালের অভ্যেস। বরাবর তার রাখা মেয়েমানুষ ছিল। এমন কিছু লুকোনো-চুরোনো ব্যাপার নয়। পুতুল বেশ মেয়ে ছিল। সে বিদেয় হওয়ার পর হাড়হাভাতে জুটল একটা তার নাম লক্ষ্মী। সেটা চুরি করত খুব। তাকে তাড়ানোর পর এখন বড্ড ফাঁকা যাচ্ছে।

দেখ দ্বিজপদ, পরে যদি টের পাই যে, লাইনের মেয়ে গছিয়ে গেছিস তাহলে কিন্তু ভালো হবে না।

ওই যে বললুম বাবু, দ্বিজপদ আর যা-ই হোক নেমকহারাম নয়। চাই তো ওর গাঁয়ে গিয়ে তল্লাশ নিয়ে আসতে পারেন। বেশি দূরেও নয়, রেলরাস্তা পার হয়ে মেটে পথ ধরলে দু-ক্রোশ দূরে বিষ্টুপুর। খেতের ওপর দিয়ে রাস্তা, সাইকেল, ভ্যান, অ্যাম্বাসাডার সব যেতে পারে।

দশ হাজার টাকা না হয় দিলুম, তারপর যদি মেয়েটা বিগড়োয় বা পালায়? ভালো করে তো বুঝেই উঠতে পারলুম না এখনও।

বিগড়োবার মেয়ে নয়। স্বভাব ভারি ভালো। পালানোর কথাও ওঠে না। আর পালালে তো আমি আছি।

সবদিক বিবেচনা না করে কাজ আমি করি না, তুই তো জানিস।

তা আর বলতে! তবে টাকাটা আজ-ই গিয়ে হাসিমাসির হাতে দিতে হবে। তার বড়ো ঠেকা।

কাল আসিস।

না বাবু, আজই। আপনার কারবার নগদে চলে, আমি জানি। টাকাটা ফেলুন, চলে যাই। বিষ্টুপুর ঘুরে ফিরতে রাত হয়ে যাবে আমার।

বেজার মুখে উঠল যোগেন। আলমারি খুলে টাকাটা দিয়ে দিল। আহাম্মকিই হল বোধহয়। মেয়েটার মুখখানা বড়ো ভালো লেগে গেল যে! টুলটুলে মুখ, ভারি মিষ্টি।

যাওয়ার সময় দ্বিজপদ বলে গেল, বাবু, একেবারে কুমারী মেয়ে! ঘরও ভালো। পেটের দায়ে নানা ধান্দাবাজি করে বেড়াই, নরকবাস আমার কপালে আছেই। কিন্তু এ-কথাটা বিশ্বাস করবেন, দশ হাজার টাকা আপনার জলে ফেলা হচ্ছে না।

বেলা চারটার পর মালঘর খোলে। তখন খদ্দেরের ভিড় লেগে যায়। বস্তা বস্তা ভুসিমাল, চটের বস্তা, দড়ি এইসব বোঝাই হয় লরি, টেম্পো আর ভ্যানে। যোগেনের তখন দম ফেলার সময় থাকে না।

মেয়েটাকে একটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল, তা সেটা আর রাত আটটা অবধি হয়ে উঠল না। খাজাঞ্চি আর সে মিলে, রাত আটটা নাগাদ যখন হিসেব-নিকেশ করে উঠল তখন দেখল আজকের আদায়-উসুল বড্ডই যেন ভালো। মালও গেছে প্রচুর। এত বড়ো মালঘর ফাঁকা হয়ে যেন 'হাঁ-হাঁ' করছে।

খাজাঞ্চি বলল, উঃ, আজ বিক্রিটাও হয়েছে বটে!

তাই দেখছি। কত হল বল তো?

বাহান্ন হাজার টাকার বেশি। সব নগদ আদায়। মাত্র চারজন খাতা লিখিয়েছে। তা সেখানেও না হোক আরও দশ-বারো হাজার টাকা হবে।

হুঁ। বড্ড ভালো।

খাজাঞ্চি বিদেয় হলে সদর দরজা বন্ধ করে মালঘরের পেছনে নিজের ঘরখানায় এসে জামাটামা ছাড়ল যোগেন। আশ্বিন মাসেও আজ ঘাম হচ্ছে। টাকার গরম-ই হবে। পুজোর আগে বিক্রিবাটা ভালোই হয়। কিন্তু এত ভালো নয় তা বলে। যোগেন হিসেব দেখে অনুমান করল, কম করেও আজ তার পনেরো হাজার টাকা থাকবে।

দিনে পনেরো হাজার টাকা রোজগারটা যদি বজায় থাকে, তা হলে আর ভাবতে হবে না। দুটো মেয়ের বিয়ে লাগিয়ে দেবে আর সনাতন মুহুরির সম্পত্তিটাও খরিদ করতে পারবে। বায়না করে রেখেছে মাস দুয়েক হল। আরও কিছু শখ-আহ্লাদ আছে। তা সেসব হবেখন।

যোগেন মালঘরেই থাকে। পেছন দিকটায় গোটা দুই খুপরি বানিয়ে নিয়েছে। রান্নাঘর, টিউবওয়েল, পায়খানা সবই আছে। এখানে থাকায় মালঘরে পাহারাও হয়, আর ব্যাবসাটার সঙ্গে নিজেকে সেঁটে রাখতেও সুবিধে হয়।

হাতমুখ ধুয়ে এসে ঘরে-রাখা সিংহাসনে গুচ্ছের ঠাকুর দেবতাকে আজ খুব পেন্নাম ঠুকল সে। দিনটা বড়ো পয়া।

প্রণাম করে ওঠার সময় মাথায় বজ্রাঘাতের মতো মেয়েটার কথা মনে পড়ল। তাই তো! আশ্চর্য! কাজকর্মে মেয়েটার কথা মনেই ছিল না তার। সাড়াশব্দও তো পাওয়া যাচ্ছে না! তাহলে কি পালাল নাকি? উরেব্বাস, দশ দশটি হাজার টাকা গুনে দিয়েছে যে, একটু আগে দ্বিজপদকে!

তাড়াতাড়ি উঠে সে ওপাশের ঘরটায় ঢুকে দেখল, না, পালায়নি। চৌকিতে পাতা বিছানায় পড়ে নি:সাড়ে ঘুমোচ্ছে। দুটো পা চৌকির বাইরে ঝুলে আছে। আর জানলা দিয়ে আসা পূর্ণিমার দুধের মতো চাঁদের আলায় বিছানা ভেসে যাচ্ছে। আর মুখখানা যেন খুব ফুটে উঠেছে জ্যোৎস্নায়।

দাঁড়িয়ে দেখছিল যোগেন। এ কে? এ আসলে কে? অমন মুখ, অমন পায়ের গড়ন, অমন চমৎকার চুলের ঢল। এ কি রাখা মেয়েমানুষের রূপ!

মাথায় ফের একটা বজ্রাঘাত। সর্বনাশ! এ এল আর সঙ্গে সঙ্গে তার বিক্রিবাটা চৌগুণে উঠে গেল যে! কী করে হয়? অ্যাঁ! কী করে?

ঘুনঘুন করে একটা পেঁচা ডাকছিল বাইরে। রোজই ডাকে। রাতের বেলাতেই তাদের কাজকর্ম কিনা! কিন্তু হঠাৎ সেই পেঁচার ডাকটা কানে বড়ো লাগল যোগেনের। পেঁচাটা কি কোনো সংকেত দিচ্ছে তাকে? কিছু বলছে?

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল যোগেন। দরজার কাছে উপুড় করে রাখা লোহার বালতিটায় পা লেগে 'খটাং' করে শব্দ হল একটা।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা চমকে জেগে গেল।

জ্যোৎস্নায় সব দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা চোখ চেয়ে অবাক হয়ে চারদিক দেখছে। তারপর তাকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। অপরাধী গলায় বলল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

যোগেনের মুখে কথা এল না। কেমন যেন শ্বাস আটকাচ্ছে গলার কাছটাতে। সে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটা তার ভাঙা খোঁপাটি ফের বেঁধে নিল। তারপর যোগেনের দিকে চেয়ে মিষ্টি গলায় বলল, এখানে কি টিপকল আছে?

আছে বই কী, এই তো পিছন দিকটায় উঠোন। এসো, পাম্প করে দিচ্ছি।

বুকটা বড়ো 'ধক ধক' করছে যোগেনের। বড়ো ভয়-ভয় করছে, বড়ো অদ্ভুত লাগছে। মেয়েটা আঁজলা করে জল খেল, চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল।

তারপর বড়ো বড়ো দু-টি চোখ তুলে তাকাল তার দিকে।

ওই চোখে চোখ রাখে সাধ্যি কী যোগেনের? শরীরে কাঁপুনি দিল তার।

মেয়েটা আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'এই বুঝি ঘরদোর?'

যোগেনের কাঁপুনি থামছে না। বলল, 'হ্যাঁ।'

মেয়েটা একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'এখানেই থাকতে হবে বুঝি আমাকে?'

যোগেনের মাথায় কথা আসছে না। সে আমতা আমতা করে বলে, তা-ইয়ে-ইচ্ছে হলে—

আমার আবার 'ইচ্ছে অনিচ্ছে' বলে কিছু আছে নাকি? নষ্ট হতে এসেছি, আমার ইচ্ছেয় কি কিছু হবে?

যোগেন হঠাৎ শুনতে পেল, অশ্বত্থ গাছ থেকে পেঁচাটা খুব ডেকে উঠল। খুব ডাকছে। ভীষণ ডাকছে। ভয়টা যেন সমস্ত বুক আর মাথা গ্রাস করে নিল তার। শরীরের কাঁপুনিটাও এমন বেড়ে গেল যেন, মূর্ছা হবে। কিন্তু মুখে কথা আসছে না।

মেয়েটা জ্যোৎস্নায় ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থেকে বলল, মা বেচে দিল আমাকে। আপনি কিনে নিলেন। আমি যেন একটা কী। এখনও বিশ্বাস হয় না। কখন নষ্ট করবেন আমাকে?

এইবার যোগেনের মুখে কথা এল, নষ্ট! নষ্ট হবে কেন? নষ্ট হওয়ার কথা নাকি তোমার?

মেয়েটা ধীরে মুখ নামিয়ে তার দিকে ফিরে বলল, তাই তো কথা!

যোগেন পেঁচার ডানার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় উড়ে বেড়াচ্ছে পাখিটা। তার ছায়া একবার যেন স্পর্শ করে গেল তাকে। শিউরে উঠল যোগেন। ছায়াটা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। সাবধান করছে তাকে। ভয় দেখাচ্ছে।

না না, তোমার কোনো ভয় নেই।

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, টাকা দিলেন যে!

তাতে কী!

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, আপনি যে বললেন আপনার একজন মেয়েমানুষ না হলে চলে না।

বলেছি! কথাটা ধোরো না মা, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, 'মা! মা' বলে ডাকছেন আমাকে?

যোগেন মাথা নেড়ে বলে, তাই তো ডাকলুম।

ওমা! কেন?

কী হচ্ছে তা বুঝতে পারল না যোগেনও। সে নয়, তার ভেতর থেকে যেন অন্য কেউ কথা কইছে। থতোমতো খেয়ে সে বলে, মুখ থেকে বেরিয়ে গেল যে!

মেয়েটা হেসে বলে, তা হলে কী হবে?

কিছু হবে না মা। ঘরে এসো, কিছু খাও।

খাব? হ্যাঁ, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

তা খেল মেয়েটা। ডাল, ভাত, তরকারি, কী যত্ন করে ছোটো ছোটো গরাসে খেল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল যোগেন। না:, তার মনে আর কোনো ধন্দ নেই। সে যা বোঝার বুঝে গেছে।

আমাকে কি দিয়ে আসবেন মায়ের কাছে?

যোগেন গর্জন করে উঠল, পাগল!

তা হলে?

লক্ষ্মীকে হাতে পেলে ছাড়তে আছে? আমার একটা ছেলে আছে মা। ব্যাবসা-বাণিজ্যে মন নেই, তার লেখাপড়ায় মন। ছেলে বড়ো ভালো। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

মেয়েটা লজ্জায় মাথা নোয়াল।

নবদুর্গা

গোরু দুইতে নারু আসছে ওই যে। বৈষ্ণবদিঘির পার দিয়ে বাঁশতলা পেরিয়ে। ভারি সুন্দর জায়গা ওটা। মিষ্টি তেঁতুলের একটা সার আছে ওখানে। সে ভারি সুন্দর তেঁতুল, পাকলেই মিষ্টি। কিন্তু সেটা বড়োকথা নয়। এই বিকেলের দিকে গড়ানে রোদ্দুরের আলোয় ওই তেঁতুলবনে যে আলোছায়ার চিকরিমিকরি তৈরি করে তা যেন রূপকথার মতো।

এ বাড়ির সবাই গোরু দুইতে পারে। তবু নারুকে আসতে হয় লছমির জন্য। ভারি দুষ্টু গোরু। জগাখুড়ো বলে, 'বাপরে, ও হল লাথ মারুয়া গোরু, ওর কাছে যেতে আছে?' অথচ লছমি দুধ দেয় এককাঁড়ি। আবার লাথি বা ঢুঁসো মারতেও কসুর করে না। নারু খুব যত্ন করে লছমির পেছনের পা দুটো গামছা দিয়ে বাঁধে। তারপর পেতলের বালতিতে চ্যাংচুং শব্দে দুধ দোয়ায়। লছমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, একটুও দুষ্টুমি করে না।

আচ্ছা নারুদাদা, তোমাকে কি লছমি ভয় পায়?

নারু হাসে। বলে, না রে পাগলি, ভয় পাবে কেন? ও আমাকে ভালোবাসে।

তা তোমাকেই বাসে, আর আমাদের বাসে না কেন? আমরা তো ওকে খড়-বিচালি দিই, জাবনা দিই, ভাতের ফ্যান, তরকারির খোসা খাওয়াই, কত আদর করি গলকম্বলে হাত বুলিয়ে।

কোনো কোনো গোরু ওরকম হয়।

জগাখুড়ো বলে, তুমি নাকি মন্তরতন্তর জানো।

খুব হাসে নারু, শোনো কথা। মন্তরতন্তর কোথা থেকে জানব? আমাদের কি তত ক্ষমতা আছে? জগাখুড়ো হল মাথা-পাগলা মানুষ, কত কী বলে।

নবদুর্গার খুব ইচ্ছে করে লছমির সঙ্গে ভাব করতে। ইচ্ছে হবে না-ই বা কেন? কী সুন্দর দেখতে লছমি। দুধসাদা রঙের ওপর কালো ছোপ। তেমনি মায়াবী দুখানা চোখ। বলতে নেই, লছমি বেশ বড়োসড়ো গোরু, তেজও তেমনি। নবদুর্গার সঙ্গে কি তা বলে লছমির ভাব নেই? আছে। লছমি যখন মাটির কালো গামলায় জাবনা খায় তখন তো নবদুর্গাই জাবনা নেড়েচেড়ে দেয়। তখন গলায় হাত বোলালে লছমি ভারি আরাম পায়। কিন্তু তাদের অন্য আর পাঁচটা গোরু যেমন মাটির মানুষ আর বাধ্যের মানুষ, ডাকলেই কাছে আসে, লছমি তেমনটি নয়। আর এই যে নারুদার ওপর লছমির একটু পক্ষপাত, এতেও নবদুর্গার হিংসে আছে। হিংসে হবে না বলো! এত ভালোবাসে সে লছমিকে, আর লছমি কিনা অমন!

নবদুর্গার একটু হিংসে-টিংসে আছে বাপু। ওই যে তার খেলুড়ি বন্ধুরা এসে জামতলায় জড়ো হয়েছে, ওদের মধ্যে যেমন তোটন আর রমলা তার খুব বন্ধু, অন্যরা কি তেমন? তোটনের সঙ্গে পুষ্পর যদি বেশি ভাব দেখতে পায় নবদুর্গা তবে তার হিংসে হয়। কেন তা কে বলবে?

তোটন অবশ্য বলে, তোর একটুতেই বড্ড গাল ফোলে।

তা ফোলে বাপু, নবদুর্গা মিথ্যে কথা বলতে পারবে না।

জগাখুড়ো ওই যে বসে আছে তার দাওয়ার এক কোণটিতে। নবদুর্গাদের মস্ত উঠোন। তাও একটা নয়, চারখানা। বেশির ভাগই মাটির ঘর। একতলাও আছে, দোতলাও আছে। হালে একখানা পাকা দোতলাও উঠেছে ওই ধারে। জগাখুড়ো এ বাড়ির কেউ নয়, আছে মাত্র। তিন কুলে কেউ নেই। ঘরে বসে নানারকম কিম্ভুত ওষুধ, আচার এসব বানায় আর ধর্মের বই পড়ে। এই যে বিকেলটি হয়ে আসছে, এই সময়টায় জগাখুঁড়ো এসে দাওয়ায় বসবে মাদুর পেতে। সামনে একখানা জলচৌকি, কত কী পাঠ করে সুরেলা গলায়। সন্ধের পর জগাখুড়োকে ঘিরে বাড়ি আর পাড়ার বউ-ঝি আর বুড়ো-বুড়িদের জমায়েত হয়। জগাখুড়ো একদিন তাকে বলেছিল, 'নরক কা মূল অভিমান। তোর অত কথায় কথায় গাল ফোলে কেন রে? ওরকমটা ভালো নয়।'

তা কী করবে নবদুর্গা? তার যে হয়। 'নরক কা মূল অভিমান'—কথাটা মনে হলে তার একটু ভয়ও হয়। তার যে কথায় কথায় গাল ফোলে ভগবান? তবে কি নরকেই যেতে হবে তাকে? মাগো! বাজিতপুরের হাটে নরকের একখানা বড়ো পট দেখেছিল নবদুর্গা। পাজি মেয়েদের কী দুরবস্থা বাবা! ফুটন্ত হাঁড়িতে ফেলছে একজনাকে তো অন্যজনাকে চুলের মুঠি ধরে গদা নিয়ে পেটাচ্ছে। একজনকে তো ন্যাংটো করে—মাগো!

দুধেভরা পেতলের বালতিটা নারুদার হাত থেকে নিতে নিতে কে জানে কেন, নবদুর্গা বলে ফেলল, তুমি খুব ভালো লোক নারুদাদা।

নারু হেসে লজ্জার ভাব করে বলে, শোনো কথা। আমরা কেমন করে ভালো লোক হতে পারি বলো। আমাদের কী জ্ঞান আছে? অজ্ঞানী যে বড্ড।

তুমি নিশ্চয়ই ভালো লোক, নইলে কি লছমি তোমাকে অত ভালোবাসত?

এটা কোনো কথা হল নবদিদি? গোরু দিয়ে কি মানুষ চেনা যায়? তোমার যেমন কথা!

খেলুড়িরা সব জামতলায়। পেতলের বালতিটা ভাঁড়ার ঘরে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে নবদুর্গা বলল, খেলতে যাচ্ছি মা!

দিন-রাত খেলা আর খেলা। কীসের খেলা রে? ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েরা বসে বসে কেবল গুজগুজ ফুসফুস। ওটা খেলা নাকি?

কথাটা মিথ্যে নয়। আজকাল তারা একটু পেকেছে। আগে যেমন 'পুতুল-খেলা', 'এক্কা-দোক্কা', 'চোর-চোর', 'গোল্লাছুট' ছিল এখন আর তেমনটি ইচ্ছে যায় না। বসে বসে গল্প করতেই ভালো লাগে। হ্যাঁ বটে, তার মধ্যে আজকাল রসের কথাও কিছু থাকছে।

সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, যাই-না মা!

মা একবার কঠিন চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, কাল তোমাকে দেখতে আসছে গোবিন্দপুরের লোকেরা। কথাটা মনে রেখো। শেফালিকে বলে দে, কাল সকালে নাপতেবুড়ি এসে যেন, তোর পা ঝামা ঘষে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, আর বিকেল বিকেল এসে খোঁপা বেঁধে দিয়ে যাবে।

পাত্রপক্ষের কথা নবদুর্গা জানে। এর আগেও দুটো পক্ষ এসে দেখে গেছে। এক পক্ষ পছন্দই করেনি, আর এক পক্ষ পছন্দ করলেও দেনা-পাওনায় মেলেনি।

বিয়ের কথা ভাবতে যে তার ইচ্ছে হয় না তা নয়। কিন্তু ওই যে, একলাটি সে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, অচেনা এক মানুষ আঁচলে গেরো দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে তাকে, এ-কথা ভাবলে বুকে একটা কষ্ট হয়। মা, বাবা, ভাই, বোন, খেলুড়ি বন্ধুরা, ভুলো কুকুর কিংবা টেনি বেড়াল, এই গাঁ, ওই ষষ্ঠীতলা, আর ওই যে মিষ্টি তেঁতুলের ঝিরিঝিরি ছায়া, লছমি বা রাঙা গাই, এদের সবাইকে ফেলে যেতে হবে তো। তার কাছে এরা সবাই মানুষের মতো। এমনকী বেড়াল, কুকুর, গাছ, গাঁ সব সব সব। এদের ছেড়ে গিয়ে সে কি বাঁচবে?

মায়ের যখন মেজাজ ভালো থাকে, তখন মা বলে, বাঁচবি। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস তো পরের ঘরের জন্যই। এজন্যই তো মেয়ে দিয়ে বংশরক্ষা হয় না। না বাঁচে কে বল তো! এই যে, আমি কেমন বেঁচে আছি দেখছিস না। সব ছেড়ে আসিনি আমি? আবার সব পেয়েছিও তো!

সাঁঝবেলাতে এমনিতেই মন একটু খারাপ হয়। পাত্রপক্ষের কথা শুনে আরও একটু হল। গোবিন্দপুর কেমন গাঁ কে জানে! সেখানে হয়তো সবাই গোমড়ামুখো, সবাই রাগি। কে জানে কী!

খেলুড়িরা গোল হয়ে বসেছিল। নবদুর্গা কাছে যেতেই চারি বলল, বাব্বা: রে বাব্বা:! কতক্ষণ বসে আছি তোর জন্য। এই তোর আসার সময় হল?

ধুস, আমার কিছু ভালো লাগছে না।

কেন, কী আবার হল?

কারা যেন দেখতে আসবে কাল।

পটলি একটু কম কথা কয়। সে ভারি ভালমানুষ। খুব ছোটোখাটো, রোগা আর কালো। ফস করে বলে উঠল, আমি জানি।

কী জানিস রে?

গোবিন্দুপুরে আমার জ্যেঠতুতো দিদির শ্বশুরবাড়ি। দিদি আজই এল সকালে। মাকে বলছিল ওখানে সমীরণ না কে একটা ছেলে আছে, তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ।

সমীরণ নামটা খুব একটা খারাপ লাগল না নবদুর্গার। ঠোঁট উলটে অবশ্য বলল, বয়েই গেছে বিয়ে করতে।

পটলি বলল, দিদি বলছিল নাকি পাগলা মানুষ।

বলিস কী? বলে সবাই চমকে উঠল।

হিহি করে হাসল পটলি, পাগলা বলতে তেমন নয় কিন্তু। খেয়ালি।

তার মানে কী? বিড়বিড় করে নাকি?

সে আমি জানি না। দিদি বলছিল, ছেলে নাকি মন্দ নয়।

চটারি বলল, কেমন দেখতে? মুশকো, কালো, ঝ্যাঁটা গোঁফ নাকি?

তা কে জানে? অত শুনিনি।

নবদুর্গা বলল, তাই হবে। আমার কপালে কী ভালো কিছু জুটবে?

মান্তু বলল, কেন বাবা, তোর কপালটা এমন কী খারাপ? আমাদের মতো তো তোর গরিব-ঘর নয়। দশ-বিশ হাজার টাকা খরচ করতে পারে জ্যাঠামশাই, আমার বাবা পারবে?

কয়েক মাস আগে লোহাগঞ্জের মস্ত এক পরিবারে মান্তুর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। দশ হাজার টাকা পণের জন্য ভেস্তে যায়।

মান্তুর মুখখানা দেখে ভারি কষ্ট হল নবদুর্গার। গরিব-ঘরের হলেও মান্তু দেখতে বেশ। বড়ো বড়ো চোখ, রংটাও ফর্সার দিকে, ভারি ঢলঢলে মুখ। ভালো ঘরেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। মান্তুর বাবা হরিপদ ধারকর্জের চেষ্টাও করছিল কম নয়। পায়নি।

মান্তুর কথাটার পরই আজকের জমায়েতটার কেমন যেন তাল কেটে গেল। কারো আর কথা আসছিল না। তাদের যা বয়েস এখন, তাতে সকলেরই দিন আসছে। কার ভালো বিয়ে হবে, কার খারাপ তা যেন রথের মেলায় মোয়াওয়ালা ফটিকের ঘুরণচাকি। পঞ্চাশটা পয়সা ফেললেই ফটিক তার চাকির কাঁটা, বাঁই করে ঘুরিয়ে দেবে। চাকির গায়ে নম্বর লেখা। কাঁটা যে ঘরে থামবে ততটা মোয়া। কারো ভাগ্যে দশও ওঠে, কারো ভাগ্যে শূন্য। বিয়েটাও হল তাই। আর সেজন্যই তাদের বুকে একটা গোপন দুরদুরুনি আছে। মাঝে মাঝে যেন শ্বাসকষ্ট হয়।

আজ জোরদার পাঠ হচ্ছে জগাখুড়োর দাওয়ায়। দশ-বারোজন জুটেছে। খেলুড়িরা একে একে চলে যাওয়ার পর জামতলা থেকে ফেরার সময়ে দৃশ্যটা দেখতে পেল নবদুর্গা। একখানা পেতলের ঝকঝকে হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়ে বসেছে জগাখুড়ো। যাই-যাই শীত। খুড়োর গায়ে নস্যি রঙের র‍্যাপার।

নবদুর্গারও একটু শীত করছিল। সে অন্তি জ্যাঠাইমার দাওয়ায় পাতলা অন্ধকারে বসে চেয়ে রইল। গোবিন্দপুর কতদূর? যাবে কি সেখানে? 'সমীরণ' নামটা কিন্তু বেশ।

দিঘির জলে সূর্য ডুবে গেল একটু আগে। পশ্চিমের আকাশে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো মেঘ এসে শেষ আলোটুকুও পুঁছে দিচ্ছিল। এ-সময়ে নবদুর্গার কেন যে-রোজ কান্না পায়! রোজ পায়।

লছমির ডাক শোনা যাচ্ছে। একটু চমকে ওঠে নবদুর্গা। লছমি খুব কমই ডাকে। আজ ডাকছে কেন? জাবনার গামলার মধ্যে মুখ দিচ্ছে না তো! ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে কাকে দেখছে যেন।

হঠাৎ নবদুর্গার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। রোজ সে লছমির সোহাগ পাওয়ার জন্য জাবনাটা নেড়ে দেয়। আজ দেয়নি। তাই কি খুঁজছে? যদি তাই হয়? ইস, আনন্দে বুকটার মধ্যে যেন একটা বাতাস বয়ে গেল।

নবদুর্গা এক ছুট্টে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'আমাকে খুঁজছিস, ও লছমি? আমাকে? ও আমার সোনালক্ষ্মী, ও আমার বুকের ধন...'

নবদুর্গা হাত দিল গামলার মধ্যে। আর কী আশ্চর্য ভগবান, এমনও হয় নাকি? লছমি একটা বড়শ্বাস ফেলে জাবনা খেতে লাগল মসমস করে।

নবদুর্গার চোখের জল বাঁধ মানল না। হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তা হলে তুই আমাকে ভালোবাসিস লছমি! এত ভালোবাসিস?

কত সোহাগ হল দুজনে। এসব কেউ বুঝবে না। শুধু সে বোঝে—এসব অদ্ভুত আশ্চর্য আবিষ্কার।

রাত্রিবেলা যখন পাঠ শেষ করে ঘরে বসে জগাখুড়ো খই দুধে মেখে খাচ্ছে তখন গিয়ে তার ঘরে হানা দিল নবদুর্গা। জগাখুড়ো তার মস্ত অবলম্বন।

জগাখুড়ো, একটা কথা।

বল।

গোবিন্দপুর থেকে কাল আমাকে কারা দেখতে আসছে গো?

তা আসুক না।

শোনোনি?

আমাকে কি কেউ কিছু বলে? পড়ে আছি একধারে কুকুরটা-বেড়ালটার মতো।

এই জগাখুড়োই না-বলে, 'নরক কা মূল অভিমান!'

কী হল গো তোমার খুড়ো?

জগাখুড়ো খইয়ের বড়ো বাটিটা মেঝের ওপর রেখে উদাস মুখে বলল, কী মনে হয় জানিস? মনে হয় বয়সকালে সংসারধর্ম করাই ভালো ছিল। তাতে তো আপনজন হত কয়েকজন। ওই দ্যাখ খই, দুধে কেমন মিশ খেয়ে গেছে। তেমনধারা মিশ খেতে পারলুম কই তোদের সংসারের সঙ্গে?

তুমি কি কালকের ঝগড়ার কথা কইছ খুড়ো? নগেনকাকা তো মাথাগরম মানুষ, সবাই তো জানে।

জগাখুড়োর সঙ্গে কাল নগেনকাকার লেগেছিল খুব। তেমন কিছু ব্যাপার নয়। নগেনকাকা তার ছেলে মদনকে খুব মারধর করছিল কাল, ঝড়ুপট্টিতে গিয়ে ভিডিয়ো দেখে রাত কাবার করে ফিরেছিল বলে। নগেনকাকার মার মানে পুলিশের মারকেও হার মানায়। মোটা বেতের লাঠি দিয়ে যখন মারে আর মদন যখন চেঁচায় তখন আশপাশে মানুষ থাকতে পারেন না। জগাখুড়ো গিয়ে তখন মাঝখানে পথে পড়েছিল। নগেনকাকার তাই রাগ, 'তুমি কে হে বারণ করার? আমি আমার ছেলেকে শাসন করছি, তুমি বলতে আসো

কেন? ভালোমানুষি দেখাতে এসো না, ছেলেটা যদি নষ্ট হয় তো তাতে তোমার তো ক্ষতি হবে না, হবে আমারই... তোমার আর কী... এইসব। গায়ে না মাখলেও চলে।

জগাখুড়ো খইয়ের বাটিটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলল, মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, তোদের সংসার ছেড়ে হিমালয়ে চলে যাই।

তুমি গেলে আমি কাঁদব কিন্তু। ওরকম বলে না। কালকেই দেখো, মদনকাকা এসে তোমার কাছে গাঁইগুঁই করবে।

ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে জগাখুড়ো বলল, তা আর করতে হবে না। মনটাই আমার ভেঙে গেছে। তা কী বলতে এসেছিলি?

আগে খই-দুধ খাও, বলছি। বলে বাটিটা হাতে তুলে দেয় নবদুর্গা।

একটু চুপ করে থেকে জগাখুড়ো বলে, সংসারটা নরক।

আর 'নরক কা মূল অভিমান', তাই-না খুড়ো?

জগাখুড়ো ভ্রূ কুঁচকে বলে, কোথা থেকে শিখলি কথাটা?

যার কাছ থেকে শিখি। তুমি গো।

অ। পেকেছ খুব। বৃত্তান্তটা কী? গোবিন্দপুর তো?

হ্যাঁ! পাত্রের নাম সমীরণ। তারা কেমনধারা লোক?

তার আমি কী জানি?

২

এ-কাজটা কার তা বলা কঠিন। হাটুরে ধুলোয় লোকটা পড়ে আছে। একটু আগে মুখ দিয়ে রক্ত আর গোঙানি বেরোচ্ছিল। এখন গোঙানিটা নেই। মরে গেল নাকি? না:, শ্বাস চলছে।

যারা মেরেছিল তারা এখন তফাত হয়েছে। সে চারদিকটা দেখে নিল একবার। নীলুদাদু কি সাধে বলে, 'লোকের ভালো করতে নেই।' যতবার ভালো করতে গেছে সে, ততবারই গন্ডগোল হয়েছে। তবু এই ভালোটা না করেও সে পারে না। লোকটা চোর এবং পাকা চোর। মার কি আর এমনি খায়? লোকে খেটেপিটে রোজগার করে আর এ-ব্যাটা ফাঁকতালে। তবে এরও হয়তো বালবাচ্চা, এন্ডিগেন্ডি, বাপ মা আছে। এটাই কষ্টের। চোর গুণ্ডা খুনে যা-ই হোক—তাদেরও জন থাকে। জনগুলোরই কষ্ট।

লোকটাকে কাঁধে তুলেই ফেলল সে। খুব ভারী মানুষ নয়। কাঁধে দো-ভাঁজ চাদরের মতো নেতিয়ে পড়ল। কুমোরপাড়া পেরোলেই সাউ ডাক্তারের ঘর।

ডাক্তারবাবু, —আছেন নাকি?

ডাক্তার আছে। আজ হাটবার, মেলা রুগি। এ-দিনটা সাউ সেঁটে থাকে।

কে রে?

আজ্ঞে আমি, সমীরণ।

সাউ মুখ বেঁকাল, অ তা কী মনে করে? কাঁধে আবার কোন গন্ধমাদন বয়ে আনলে বাপু?

এ-ব্যাটা হাটুরে ঠ্যাঙানি খেয়েছে। বাঁচবে কি না দেখে দিন তো!

ও বাবা, ও আপদ বিদেয় করে এসো। হাটের জিনিস হাটেই পড়ে থাকত বাবা, বয়ে আনার কী ছিল? কলজের জোর থাকলে হাওয়া-বাতাসেই আরাম হবে, ওষুধ লাগে না ওদের।

একটু দেখে দিন তবু।

ভিজিটটা দেবে কে?

দেওয়া যাবে।

কেন যে বাপু, এসব ঝামেলায় আমাকে জড়াও। সদ্য চেম্বার বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম...

গজগজ করতে করতে ডাক্তার সাউ লোকটাকে দেখল। দেখতে দেখতে বলল, বলেছি না, এ-শালা বেজন্মাদের ওষুধ লাগে না। দিব্যি বেঁচে আছে। মারের চোটে ভিরমি খেলেও কিছু নয়। টিকে যাবে। নিয়ে যাও।

একটু ওষুধ-টষুধ দেবেন-না?

পয়সা?

হবে।

দেখো বাপু। বাকি কারবারে ফেলো না। অনেক ভিজিট মার গেছে আমার জীবনে।

তা ওষুধ হল, পট্টিও লাগানো হল। লোকটা একটু খোলা চোখে চাইলও।

সমীরণ বারোটা টাকা হিসেবমতো দিয়ে দিল। তারপর লোকটাকে দাঁড় করিয়ে বলল, চল ব্যাটা। বেঁচে গেছিস।

লোকটা টলতে টলতে বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

কুমোরপাড়ার রাস্তায় পড়ে লোকটা সটান হল। বলল, বাবু কি আমাকে পুলিশে দিচ্ছেন?

দেওয়াই উচিত।

ও শালা পুঙ্গির ভাইয়েরা যে পেটাল ওদের কী করছেন?

হাটসুদ্ধু কি পুলিশে দেওয়া যায়? বেশ করেছে মেরেছে।

বেশ করা আমিও বের করে দেব, দেখবেন। বনমালির দোকান থেকে—বললে বিশ্বেস করবেন না—মোটে পাঁচটি টাকা কুড়িয়েছি তাইতেই এই কান্ড।

কুড়িয়েছ মানে?

বনমালি ক্যাশবাক্স খুলে টাকা খাবলে কাকে যেন খুচরো ফেরত দিতে যাচ্ছিল, পাঁচ টাকার নোটটা উড়ে এসে পড়ে মাটিতে। সেইটে কুড়িয়ে গস্ত করায় এই হেনস্থা।

তুমি চোর নও তা হলে?

কোন শালা নয়। সব চোর। হাটে-বাজারে পথেঘাটে দাঁড়িয়ে যেদিকে তাকাব সব চোর।

জানি। বাড়ি যাও।

গেলেই হবে?

তার মানে?

শুধু হাতে গিয়ে মা কালীর মতো জিব বের করে দাঁড়াব নাকি মাগের সামনে? সে আমার ট্যাঁক দেখবে না? তবে যদি ঢুকতে দেয় ঘরে।

ভালো জ্বালা দেখছি।

আপনি ভালো লোক। সমীরণবাবু তো?

চিনলে কী করে?

গোবিন্দপুরে থাকেন, রায়বাড়ির ছোটোছেলে। সবাই জানে।

কী বলে জানে? বোকা না পাগল?

দুটোই। তা ওরকমধারাই ভালো। বোকা যদি না হতেন, ছিটিয়াল যদি না হতেন তা হলে আজ এই নয়ন শর্মার কি প্রাণখানা থাকত দেহপিঞ্জরে?

কত চাই?

যা দেন। দশ বিশ।

খাঁই তো কম নয় দেখছি।

দশটা টাকা পেয়ে নয়ন সেলাম বাজিয়ে হাওয়া হল। তখন ভারি বোকা বোকা লাগল নিজেকে সমীরণের। ঠকে গেল নাকি? হিসেবটা সে করতে চায় না। আবার করেও ফেলে। কত ঠকল জীবনে?

ঠকেও সে। আবার পুরোপুরি ঠকেও না। এ, তিন বছর আগেকার কথা। নয়ন শর্মা এরপরে এসে, তাদের বাগানের বেড়া বেঁধে দিয়ে গেছে। গোয়ালঘর ছেয়ে দিয়ে গেছে। একটা কুড়ুল আর একখানা বাটি চুরি করে নিয়ে গেছে। এই লেনদেন নিয়ে সংসার—সমীরণ যা বোঝে।

সে যে খানিক পাগল এটা সে জানে। আবার জানেও না। বাসুলি পুকুরে হরিমতিপিসির নারকোল তুলতে গিয়ে বিপদ হয়েছিল সেবার।

নারকোল বেচেই বুড়ির চলে। সেবার ঝড়বৃষ্টিতে মেলা নারকোল পড়ল জলে আর ডাঙায়। সমীরণ ফিরছিল তার তাঁতঘর থেকে। বুড়ি ধরে পড়ল, 'ও বাবা, নারকোল ক-টা তুলে দিয়ে যা। নইলে সব তুলে নিয়ে যাবে। যা হারামি সব ছেলেপুলেগুলো।'

তা নেমেছিল সমীরণ। মোট কুড়িখানা নারকোল ডাঙায় ছুড়ে দিয়ে যখন উঠে আসছে তখনই মস্ত এক সাপ। ফণা তুলে সামনে দাঁড়ানো একেবারে নাগালের মধ্যে, মুখোমুখি।

বাঁচার উপায় অনেক ছিল। উলটে জলে পড়লেই হত। কিংবা হাতের একখানা নারকোল ছুড়ে মারলেও হতে পারত।

কিন্তু সমীরণের স্তম্ভনটা অন্য কারণে। সাপটা অদ্ভুত। বুকখানা টকটকে লাল। আর পিঠটা সাদা চিকরিমিকরি, এরকম অদ্ভুত সাপ, সে জন্মে দেখেনি। ভয় পাবে কী, সাপ দেখ সে মুগ্ধ। বিড়বিড় করে বলেও ফেলল, তুমি কী সুন্দর! কী সুন্দর!

কয়েক সেকেণ্ড ফণা তুলে দুলল সাপটা। সমীরণ দাঁড়িয়ে। শরীর ভেজা। টপটপ করে জল পড়ছে। বুকে একটুও ভয় নেই।

সাপটা তাকে দেখল কিছুক্ষণ। বোধহয়, বোকা আর পাগল বলে চিনতেও পারল। তাই হঠাৎ একটা শ্বাস ফেলে মাথাটা সরসর করে নামিয়ে ঘাসবনে অস্ত গেল।

কাউকে বলেনি সমীরণ। বললে লোকে বলবে, তুমি সত্যিই পাগল হে!

বাড়ি গিসগিস করছে লোকে। তাই সমীরণের জায়গা হয় না। আসলে একটু দাপুটে লোক হলে জায়গার অভাব হয় না। কিন্তু সমীরণের মতো মুখচোরার দ্বারা তা হওয়ার নয়। নবীনদাদু মরার পর তার ঘরখানা সমীরণের পাওনা ছিল। কিন্তু গদাইকাকা এসে ঘরখানার দখল নিয়ে ফেলল, বলল, তুই একাবোকা মানুষ, তোর আস্ত একখানা ঘরের দরকারটা কী? যখন বিয়ে করবি তখন দেখা যাবে।

সমীরণ তাই একটু ফাঁকে থাকে। ঘর নয়। রাঙাকাকার ঘরের লাগোয়া দাওয়ার উত্তর দিকটা একটু বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। সেই ঠেকখানা তেমন মজবুত নয়। শীতের হাওয়া, গরমের হাওয়া দুই-ই ঢোকে, বৃষ্টির ছাঁট আসে, ব্যাং লাফায়, ইঁদুর দৌড়োয়, কুকুর, বেড়াল ঢুকে পড়ে। বেড়ালদের বাচ্চা দেওয়ার সময় হলে তারা আর কোথায় যাবে সমীরণের চৌকির তলা ছাড়া? সমীরণের বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে। সে ভাবে, বিয়ে না হয় হল, কিন্তু এই এক চিলতে ঘরে বউ আর সে, বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি হবে না? তার ওপর এই একটা সরু চৌকি, রাতবিরেতে হয় তার ধাক্কায় বউ পড়ে যাবে, নয় তো বউয়ের ধাক্কায় সে। কী কেলেঙ্কারিটাই হবে তা হলে! ভালোমানুষের মেয়েকে কষ্ট দেওয়া বই তো নয়।

সকালবেলাটায় সমীরণের মনটা বেশ ভালো থাকে। আজও ছিল। সোনাজ্যাঠা এসে সেটা কেমন উলটে দিল। এসে ঘরের ভেতরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে নাক সিঁটকে বলল, এ ঘরটায় এমন মুতের গন্ধ কেন রে?

সমীরণ অবাক হয়ে বলল, নাকি?

নয়? তোর তো দেখছি তূরীয় অবস্থা, মুতের গন্ধ পায় না, এমন আহাম্মক কে?

সমীরণ ভারি কাঁচুমাচু হল। মুতের গন্ধের দোষ কী? মোতি নামের বেড়ালটার প্রসব হয়েছে ক-দিন। চৌকির তলায় তার আঁতড়ঘর। অপকর্মটা হয়তো মোতিই করে। কে জানে বাবা!

নবাবগঞ্জের মেয়েটা বাতিল হয়ে গেল, বুঝলি!

বুঝল না সমীরণ। বলল, কোন মেয়ে?

আমার খুব পছন্দ ছিল। গণেশদাদাও বলছিল দুর্গাপ্রতিমার মতো দেখতে। কিন্তু সেজোবউ বলল, মেয়ের খুঁত আছে। কী খুঁত তা ভেঙে বলল না। মেয়েলি ব্যাপার, কে জানে বাবা কী! মোটমাট বাতিল।

ও। আচ্ছা। সমীরণ এর বেশি আর কী বলবে?

সমীরণ চেয়ে রইল।

ও মেয়ে দেখার পর সেজোবউ ভয় পেয়েছে, সুন্দরী বলে তার যে গ্ল্যামার ছিল তা এবার যাবে। নবদুর্গা এলে তাকে কেউ ফিরেও দেখবে না। তা বলে মুখের ওপর অমন কটমট করে কথা না শোনালেও পারত।

কী কথা জ্যাঠা!

এই হেনতেন, মেয়েদের অনেক কায়দা জানা আছে। বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে এমন বলে। মেয়েটা ভারি দুঃখ পেল।

সমীরণ একটু বিষণ্ণ হল। মুখের ওপর কাউকে বাতিল করা কি ভালো?

তুই মুতের গন্ধ পাস না কেন রে? এঃ বাবা, নাক যে জ্বালা করছে।

সমীরণ পায় না, তা কী করবে। ভারি দুঃখী হয়ে সে বসে রইল। হোক মুতের গন্ধ তা বলে কি, সে মোতিকে বাচ্চাসমেত ঘরের বার করতে পারে? সমীরণ অনেক কিছুই পারে না, যা পারা উচিত।

তাঁতঘরে আজ সারাদিন ভারি আনমনা রইল সমীরণ। অন্যদিন তাঁতের শব্দ তার সঙ্গে নানা কথা বলে। শুনলে লোকে তাকে আরও পাগল বলবে বলে, সে-কথাটা কাউকে বলে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী তাঁতের সঙ্গে তার নানা কথা হয়। তাঁতও তার কথা বুঝতে পারে, সেও বোঝে তাঁতের ভাষা।

আজ তাঁত বলল, পরশু শিবরাত্রি।

হ্যাঁ, তা জানি, তাতে কী?

জান? ভালো। এই বলছিলাম আর কী, শিবরাত্রি ভারি ভালো দিন।

অ। তা হবে। আজ আমার মনটা ভালো নেই।

ভালো না থাকারই কথা। বলি কি শিবরাত্রির দিনই গিয়ে নবাবগঞ্জে হানা দাও। মেয়েটার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

যাব?

যাও। খুঁতো মেয়ে বলছে, তা খুঁতো নয় কে? সবাই খুঁতো।

সমীরণ একটা শ্বাস ফেলল। বলল, দুনিয়াটা কেমনধারা বলো তো!

তোমার জায়গা নয় হে এটা। তুমি হলে পাগল আর বোকা।

তা তো জানি।

ওরকমই থাকো। অন্যরকম হওয়ার কথা নয় তোমার। ঠাকুর যেমনটি করেছেন তোমায় তেমনটিই থাকো।

৩

জগাখুড়ো এসে বলেছিল, তোর কপালে হলে হয়। ছেলে পাগল ঠিকই, বোকাও হয়তো, কিন্তু ভগবান কাউকে কাউকে পাঠান। এ তার নিজের লোক।

পাগল আর বোকা! মাগো!

জগাখুড়ো যেন কেমনধারা পাগুলে চোখে আনমনা চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, সংসারী হিসেবে সে এমন কিছু আহামরি নয়। তবে অন্য একটা হিসেবও তো আছে।

অন্য হিসেব—

এই অন্য হিসেবটা বোঝে না নবদুর্গা। সে তো সংসারী মানুষ, বুঝবে কী করে? আবার তার মনটা মাঝে মাঝে ভারি মেদুর হয়ে যায়, ভারি অন্যরকম, তখন সে ঠিক সংসারী থাকে না। তখন তারও হিসেব উলটেপালটে যায়।

গোবিন্দপুরের লোকেরা এসেছিল। তাকে নাকচ করে গেছে মুখের ওপরেই। ভগবানের লোকের সঙ্গে তার বিয়েটা হচ্ছে না। একটা বউ এসেছিল তাদের সঙ্গে—দেখতে ভারি ঢলঢলে। কিন্তু জিবের যা ধার। মিষ্টি মিষ্টি করে এমন সব কথা বলল, রংটা তো তেমন নয়, চুলের গোছ কী আর ভালো, দাঁতগুলো অমন কেন, পান খাও নাকি? পোকা নয় তো! খামোখা কথা সব। বলতে হয় বলে বলা।

কাল শিবরাত্রির উপোস গেছে। আজ নবদুর্গার শরীর ভারি দুর্বল। সকালে কাঁচা মুগ ভেজানো গুড় দিয়ে খেয়েছে আর মিছরির শরবত। শরীর নয়, মনটাই যেন আজ কেমনধারা। শিবরাত্রি করে কী হয়? কচু হয়। কিছু হয় না। ন-বছর বয়স থেকে শিবরাত্রি করে আসছে সে। কিছু হল?

জগাখুড়ো এল বেলা ন-টা নাগাদ।

আছিস নাকি ঘরে?

আছি গো, কেন?

শরীর খারাপ নাকি?

ব্রত করলাম-না?

ও, তাই তো বটে!

জগাখুড়োর মুখে কেমন যেন বোকা-বোকা হাসি। মাথাটাথা চুলকে বলল, ওই একটা ব্যাপার হয়েছে।

কী ব্যাপার খুড়ো?

বাড়ির লোক টের পেলে কী করবে কে জানে?

ভয় খেয়ে নবদুর্গা উঠে বসল। তার যে বুক দুরদুর করছে!

কী হল খুড়ো?

আমার ঘরটায় একবার যা। একজন এসে বসে আছে। বড্ড দুঃখী মানুষ।

কে গো?

যা-না। দেখে যদি বুঝতে পারিস তবেই হয়। যা একবার।

নবদুর্গার বুকের মধ্যে কেমন যেন আছাড়ি পিছাড়ি ভাব। বড্ড মোচড় দিচ্ছে পেটের মধ্যে। মুখ শুকিয়ে কাঠ। সে তবু উঠল।

খুড়োর ঘর পর্যন্ত যেতে উঠোনটা যেন তেপান্তরের মাঠ। সিঁড়ি মোটে এক ধাপ। তাও পেরোতে যেন হাঁটু ভেঙে এল। ঘরের দাওয়ায় উঠে দরজা অবধি যেন যেতেই পারছিল না। দরজায় থমকে গেল।

একে সে এ-জন্মে দেখেনি ঠিক। কিন্তু এ তার সাত জন্মের চেনা। এ কি আজকের?

অপরাধী একজোড়া চোখ তুলে সে চাইল। তারপর তার চোখও পলকহীন। চিনেছে কি? হ্যাঁ চিনেছে। সেই চেনার ঝিকিমিকি চোখে উথলে উঠল।

নবদুর্গা একটু হেসে মাথা নোয়াল।

দুজনের কোনো কথা হল না। শুধু আড়াল থেকে জগাখুড়োর মৃদু গলা খাঁকারির একটা শব্দ হল। উঠোনের ওধার থেকে লছমি হঠাৎ ডেকে উঠল অকারণে। কিংবা কে জানে তত অকারণে হয়তো নয়।

হ্যাঁ

অধ্যাপক ঢোলাকিয়া অবশেষে এক জানুয়ারির শীতার্ত রাতে তার টেবিল ছেড়ে উঠল। টেবিলের ওপর অজস্র কাগজপত্র ছড়ানো, তাতে বিস্তর আঁকিবুকি এবং অসংখ্য অঙ্ক। এত অঙ্ক ও আঁকিবুকির সমুদ্র থেকে একটি মাত্র কাগজ তুলে নিল ঢোলাকিয়া, ভাঁজ করে কোটের বুক-পকেটে রাখল। গত সাতদিন ঢোলাকিয়া জীবন-রক্ষার্থে সামান্য আহার্য গ্রহণ করা ছাড়া ভালো করে খায়নি, ভালো করে ঘুমোয়নি, বিশ্রাম নেয়নি। এখন সে একটু অবসন্ন বোধ করছিল, কিন্তু মনটা খুশিতে ভরা। মনে হচ্ছে সে কৌশলটা আবিষ্কার করতে পেরেছে।

ঢোলাকিয়াকে লোকে বলে অযান্ত্রিক মানুষ। এই কম্পিউটার এবং ক্যালকুলেটরের যুগে ঢোলাকিয়া পড়ে আছে দেড়শো বছর পেছনে। সে এখনও কাগজে কলম দিয়ে আঁক কষে, রেখাচিত্র আঁকে। পৃথিবীর যত শক্ত অঙ্ক আর রেখাচিত্র, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশ যখন যন্ত্রই করে দিচ্ছে তখন মানুষ কেন অযথা পরিশ্রম করবে? ঢোলাকিয়ার বক্তব্য হল, অঙ্ক আমার কাছে আর্ট, লাইন ড্রয়িং-এ আমি সৃষ্টিশীলতার আনন্দ পাই। যন্ত্র তো মানুষের মস্তিষ্কেরই নকল। যন্ত্র আর্ট বোঝে না, সৃষ্টিশীলতাও তার নেই। প্রোগ্রাম করা যান্ত্রিকতা আমার পথ নয়।'

ঢোলাকিয়ার মতো আরও কিছু মানুষও আজকাল কম্পিউটারের চেয়ে কাগজ কলম বেশি পছন্দ করে। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও এ-ধরনের কিছু মানুষের ইদানীং যে উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ঢোলাকিয়া তার বাড়িটাকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সাজায়নি। আজকাল বোতাম টিপলেই ঘরের আকার ও আকৃতি বদলে নেওয়া যায়। কম্পিউটারে নানারকম নকশা দেওয়াই থাকে। সেসব নকশার নম্বর ধরে বিভিন্ন বোতামের সাহায্যে ওপর থেকে বা আড়াআড়ি নানাধরনের হালকা ভাঁজ করা দেওয়াল এসে ঘরকে বদলে দিতে পারে। আছে বাতাসি পর্দা, যা দিয়ে বাইরের পোকামাকড় বা বৃষ্টির ছাঁট বা ঝোড়ো হাওয়া রুখে দেওয়া যায় —জানলা বা দরজায় কপাটের দরকার হয় না। বাতাসি পর্দাকে অস্বচ্ছ করে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। জানলা-দরজার প্যানেলে সরু সরু ছিদ্র দিয়ে প্রবল বায়ুর প্রবাহই হচ্ছে বাতাসি পর্দা।

ঢোলাকিয়া তার বাড়িটাকে শীততাপনিয়ন্ত্রিতও করেনি। ঠাকুরর্দার আমলের পুরোনো ঘরানার বাড়িতে সে যেন বিংশ শতাব্দীকে ধরে রেখেছে।

ঢোলাকিয়া আজ কিছু চঞ্চল, উন্মন। সে তার স্টাডি থেকে বেরিয়ে বাড়ির বিভিন্ন ঘরে উদভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। নিজেকে শান্ত করা দরকার। বেশি আনন্দ বা বেশি দুঃখ কোনোটাই ভালো নয়।

ঢোলাকিয়ার বাড়িতে জনমনিষ্যি নেই। এমনকী কুকুর, বেড়ালটা অবধি নয়। ঢোলাকিয়া বিয়ে করেনি, মা-বাবা থাকে গাঁয়ের বাড়িতে। ঢোলাকিয়াকে সবাই অসামাজিক মানুষ বলেই মনে করে। আসলে সামাজিক হতে গেলে কাজকর্ম, ভাবনাচিন্তা এবং গবেষণার সময় অত্যন্ত কম পাওয়া যায়। সে একাই বেশ থাকে।

অবশ্য সে জানে, একা বেশিদিন থাকা চলবে না। এই সোনালি দিনের আয়ু বেশি নয়। কারণ রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করাটা বাধ্যতামূলক। এবং সন্তান উৎপাদনও। দু-হাজার থেকে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, দুরারোগ্য ক্যান্সার আর এইডস, মারাত্মক ভূমিকম্প, বিশ্বযুদ্ধ ও ঘূর্ণিবাত্যায় পৃথিবীতে বিপুল লোকক্ষয়ের পরিণামে এখন জনসংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কম। সারা ভারতবর্ষে জনসংখ্যা এখন এক কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ মাত্র। এবং ভারতের জনসংখ্যাই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম। চিনে আড়াই কোটি মানুষ বেঁচে-বর্তে আছে। গোটা ইউরোপে আছে দু-কোটির সামান্য বেশি। আমেরিকায় মোট পঞ্চান্ন লক্ষ। আফ্রিকায় তিন কোটি দশ লক্ষ। বিপদের কথা হল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি বাড়ছে না। বরং কমছে। ফলে কাউকেই অবিবাহিত থাকতে দেওয়া হয় না। সন্তান উৎপাদনও করতেই হবে। কিন্তু অরুণ ঢোলাকিয়ার দুশ্চিন্তাই হল বিবাহিত জীবন। একটা মেয়ের সঙ্গে বাস করতে হবে, তার ওপর ছেলেপুলের চ্যাঁ ভ্যাঁ—এসব কি সহ্য হবে তার?

একটা কুশনের ওপর বসে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হল সে। মনকে শান্ত ও সজীব রাখার এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

স্যাটেলাইট টেলিফোনটা সংকেত দিল। পকেট থেকে ফোনটা বের করে অরুণ ঢোলাকিয়া বলল, বলুন।

ক্রীড়া দফতর থেকে অবিনশ্বর সেন বলছি। আপনার কাজ কি শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।

ভালো কথা। কিন্তু এখনও আপনার বিপক্ষ গোষ্ঠী ব্যাপারটা মানতে চাইছে না।

তারা কি বার বার একটা আপত্তিই জানাচ্ছেন? নাকি নতুন কোনো পয়েন্ট বের করেছেন?

না, নতুন পয়েন্ট নয়। তারা সেই পুরোনো কথাই আরও জোর দিয়ে বলছেন, কোনো অ-খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা যায় না।

আমি তো বলেইছি, আমি খেলোয়াড় নই বটে, কিন্তু আমি একজন বিশেষজ্ঞ। আমার পারফরম্যান্স হবে সম্পূর্ণ ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের ওপর।

ওদের ওখানেই আপত্তি। চূড়ান্ত দলে আপনাকে জায়গা দিতে হলে একজন দক্ষ খেলোয়াড়কে বাদ দিতে হয়। যেক্ষেত্রে আমরা চাপে থাকব।

সেনবাবু, আপনাদের মানসিকতা পিছিয়ে আছে। এমন একদিন আসতে বাধ্য যখন খেলোয়াড় এবং বিশেষজ্ঞ এ-দুটোই দরকার হবে। একথা ঠিক যে আমি ক্রিকেট খুব বেশি বুঝি না, ব্যাট করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবু আমি যা করতে পারি, তা আপনাদের টিমে কেউ পারবে না।

সেটাও পরীক্ষাসাপেক্ষ। আপনি কবে ডেমনস্ট্রেশন দিতে পারবেন?

আপনারা অর্থাৎ নির্বাচকমন্ডলীর সবাই যদি উপস্থিত থাকেন তবে আগামীকালই আমি ডেমনস্ট্রেশন দিতে পারি। কিন্তু দোহাই, একবারের বেশি দু-বার পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

কেন?

আমার কলাকৌশল বেশি লোকের কাছে এক্সপোজ করা ঠিক হবে না। আমি কৌশলটা একেবারে বিশ্বকাপের আসরেই প্রয়োগ করতে চাই।

খুব মুশকিলে ফেললেন।

আর একটা কথা।

কী?

আমার অ্যাকশনের কোনো ভিডিয়ো তোলা চলবে না। কোনো ক্যামেরা বা রেকর্ডারও নয়।

আপনি বড্ড বেশি দাবি করছেন।

করছি, কারণ আমি একাই ভারতকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে দেব বলে মনে করছি।

নির্বাচকরা এটাই মানতে চাইছেন না। যাই হোক, আপনি কাল সকাল দশটায় ক্রীড়াকেন্দ্রে চলে আসুন।

ফোনটা পকেটে রেখে অরুণ ঢোলাকিয়া উঠে পড়ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। কলকাতা শহরে আজকাল মাত্র বত্রিশ হাজার লোক বাস করে। একসময়ে এখানে এক কোটি মানুষ বাস করত। তখনও শহরটা ছিল ঘিঞ্জি, নোংরা, ভিড়াক্কার, এখন শহর গাছপালায় ভরতি। চওড়া রাস্তার দুধারে বড়ো বড়ো গাছের সারি, প্রচুর বাগান, পার্ক, জলাশয়। এসবের-ই ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূরে দূরে একখানা করে বাড়ি।

এবার প্রচন্ড শীত পড়েছে। গতকালও দু-ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। অরুণ ঢোলাকিয়ার গায়ে পশমের জামা আছে, তা সত্ত্বেও তার শীত করছিল। একটু হাঁটাচলা না করলে মাথার জটটা খুলবে না।

মাইলখানেক হাঁটল অরুণ, একজন মানুষের সঙ্গেও দেখা হল না। দুটো ওভারক্র্যাফট নি:শব্দে রাস্তা দিয়ে গেল।

আঞ্চলিক বাজার নামে কথিত একটা করে বহুমুখী কেন্দ্র শহরের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে। এগুলো আসলে বাজার, ক্লাব, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির সমাবেশ।

ঢুকতেই একটা হলঘর। মাঝখানে বিশাল এক ফোয়ারা, তার চারপাশে চমৎকার বসার জায়গা। দুঃখের বিষয় বসবার লোক নেই। হলঘরের মধ্যে রয়েছে বিস্তর গাছপালা এবং সবুজ লনও। ছাদটা স্বচ্ছ আবরণে তৈরি বলে এই ঘরে সূর্যের আলো আসতে পারে। হলঘরের চারদিকে ছোটো ছোটো থিয়েটার এবং ভিডিয়ো হল। টিকিট কাটতে হয় না, থিয়েটার এমনিই দেখা যায়। তবে নাটক করার মতো দল বেশি নেই বলে থিয়েটারগুলো বেশির ভাগই অচল থাকে। ভিডিয়ো হলেও লোক হয় না।

স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে এল অরুণ ঢোলাকিয়া। এখানে কিছু রেস্তোরাঁ এবং দোকানপাট। কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে। তবু খুব-ই ফাঁকা। এখানেই লোকটার আসার কথা।

অরুণ চারদিকে চেয়ে 'সবুজদ্বীপ' রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল। খুবই ছোটো রেস্তোরাঁ। সব মিলিয়ে দশটা টেবিল পাতা আছে। খুবই কম আলোয় দেখা গেল, খদ্দের নেই বললেই হয়। একটা টেবিলে চারজনের একটি পরিবার বসে খাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী এবং দুটি বাচ্চা। আর কোণের দিকে একজন লোক চুপচাপ বসে আছে।

ঢোলাকিয়া সেদিকেই এগিয়ে গেল।

নমস্কার।

লোকটা মুখ তুলে একটু হাসল, বোসো ঢোলাকিয়া।

সে বলল, কী খাওয়া যায় বলো তো?

যা খুশি। তবে আমি নিরামিষাশী।

সে তো আমিও। ভেজিটেরিয়ানদের সংখ্যাই তো বেশি।

নুডলসের অর্ডার দিয়ে লোকটি পকেট থেকে একটা খুদে টেলিভিশন সেট বের করে ঢোলাকিয়ার হাতে দিয়ে বলল, ওতে চার মিনিটের একটা কভারেজ আছে দেখে নাও।

ছোটো টিভি সেটটার মধ্যেই ভিডিয়ো টেপ রয়েছে। ঢোলাকিয়া সেটটা অন করল। একটা ক্রিকেট মাঠ। একজন ব্যাটসম্যান দাঁড়িয়ে। একজন বল করতে দৌড়োচ্ছে। বল করল, পিচে পড়ে বলটা নীচু হয়ে গেল। খুব নীচু। ব্যাটসম্যান সেটাকে আটকে দিল। দ্বিতীয় বলটা নীচু হল না, কিন্তু অফস্টাম্পে পড়ে বাঁই করে ঘুরে স্টাম্পের দিকে এল। ব্যাটসম্যান বিপজ্জনক বলটাকে ফের আটকাল। দেখতে দেখতে ঢোলাকিয়া বলল, এ বল-এ আজকাল খেলা হয় না।

জানি। নতুন 'নোভা' বলে ক্রিসক্রস সেলাই থাকে।

হ্যাঁ।

তুমি যে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চাইছ তাতে নোভা বল হয়তো সাহায্য করবে। কিন্তু মনে রেখো, পঞ্চাশ বছর আগে পুরোনো 'ক্যাট' বলেও এরকম সেলাই থাকত।

জানি। আমার কাছে পুরোনো সবরকম বলেরই নমুনা আছে।

পরের বলটা—আশ্চর্যের বিষয়—পিচে পড়েই সম্পূর্ণ গড়িয়ে স্টাম্পের দিকে গেল। ব্যাটসম্যান আটকাতে পারল না। বোল্ড।

লোকটা একটু হেসে বলল, দেখলে?

ঢোলাকিয়া মাথা নেড়ে বলল, দেখলাম, আপনি চল্লিশ বছর আগে শুটারস দিতেন।

হ্যাঁ, সারা পৃথিবীতে আমিই একমাত্র শুটারস আর লুপ বল করতে পারতাম। তবে ছ-টা বলের মধ্যে একটা দুটো বা তারও কম। ডেলিভারির ওপর কন্ট্রোল সহজে আসে না। কঠোর অনুশীলন দরকার, কেরিয়ারের শেষদিকে আমি কৌশলটা খানিক রপ্ত করতে পেরেছিলাম, কিন্তু পুরোটা নয়। আজ অবধি 'কৌশলটা' কাউকে শেখাইনি।

ঢোলাকিয়া কিছুক্ষণ নি:শব্দে খাবার খেয়ে গেল, তারপর বলল, 'কাল ওরা আমার পরীক্ষা নেবে।'

লোকটা একটু হাসল, মুখ না তুলেই বলল, 'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। যদি ওরা তোমাকে টিমে নেয়, তাহলে এই প্রথম একজন নন-ক্রিকেটার টিমে ঢুকবে।

হ্যাঁ, আমি ওদের বুঝিয়েছি যে, আমি ক্রিকেটার না, হলেও, একজন বিশেষজ্ঞ।'

লোকটা সকৌতুকে একটু চেয়ে মাথা নাড়ল।

খাওয়া শেষ করে লোকটা বলল, 'এবার চলো, হাতে-কলমে ব্যাপারটা দেখা যাক।'

বাইরে পার্কিং লটে লোকটার ছোটো হেলি-কারে এসে উঠল তারা। এ গাড়ি মাটি দিয়ে চলে না, হুশ করে হাওয়ায় ভেসে পড়ে। দ্রুত গতি, ব্যাটারি-চালিত মোটর পাখির ডানার মতো দুটি ফ্লোটারকে চালু রাখে, পাখির মতোই স্বচ্ছন্দে ওড়ে এই গাড়ি। দশ মিনিটের মধ্যেই তারা নিরিবিলি শরতলির একটা উজ্জ্বল আলোয় সজ্জিত মাঠে এসে নামল। মাঠের মাঝখানে বাইশ গজে ক্রিকেট পিচ। চারদিকে আলোর স্তম্ভ জায়গাটাকে দিনের অধিক আলোকিত করে রেখেছে।

লোকটা অনুচ্চ স্বরে ডাকল, 'রজনি?'

মাঠের ধারে একটা ছোটো তাঁবুর ভেতর থেকে একটি কিশোরী মেয়ে ঘুমচোখে বেরিয়ে এসে হাই তুলল।

লোকটা বলল, আমার ছোটোমেয়ে রজনি। ও যদি ছেলে হত, তবে ওকে আমার সব বিদ্যে শেখাতাম। আমার ছেলে নেই, চারটিই মেয়ে।

মেয়েরাও তো ক্রিকেট খেলে।

খেলে, আমার মেয়েরা ক্রিকেটে আগ্রহী নয়। মেয়েটা পিচের একধারে নি:শব্দে তিনটে স্ট্যাম্প পুঁতে দিয়ে সরে দাঁড়াল, তারপর বলল, 'ইনিই কি তিনি?

লোকটা বলল, হ্যাঁ, আমাদের তুরুপের তাস, 'এসো ঢোলাকিয়া, বল করো।

রজনি একটা ব্যাগ থেকে সাদা রঙের একটা বল বের করে অরুণ ঢোলাকিয়ার দিকে ছুড়ে দিল। এই সেই বিতর্কিত বল নোভা, বলটাকে যদি পৃথিবী হিসেবে ধরা যায় তাহলে এর একটা সেলাই গেছে বিষুবরেখা বরাবর, অন্যটা দুই মেরু ভেদ করে, বলের দু-পিঠে এক জায়গায় সেলাই দুটো কাটাকাটি করেছে আর এই দুটো জায়গাই অরুণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল অরুণ। নজরে পড়ল দুটো সেলাই যেখানে কাটাকাটি করেছে সেখানে হালকা পেনসিল দিয়ে চারটি অক্ষর—ডি ও এন টি, ভ্রূ কুঁচকে ঢোলাকিয়া একটু ভাবল, এর মানে কি 'ডোন্ট'? সে মেয়েটার দিকে এক ঝলক তাকাল, মেয়েটা খুব বিরক্তি-মাখানো মুখে অন্যদিকে চেয়ে আছে।

বৃদ্ধ রামনাথ রাই তার দিকে মিটমিটে চোখে লক্ষ রাখছে। রামনাথ ষাট সত্তরের দশকে ভারতীয় একাদশে খেলেছিল। তার রেকর্ড তেমন ভালো কিছু নয়, কিন্তু অরুণের মাথায় আইডিয়াটা ঢুকিয়েছিল এই লোকটাই, অঙ্কের জগতে অরুণ ঢোলাকিয়ার খ্যাতি সাংঘাতিক। বিশেষ করে জ্যামিতিক এবং ত্রিকোণমিতিক গণনায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার রৈখিক গণনায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার রৈখিক গণনা, বিচার ও বিশ্লেষণ পৃথিবীর

যেকোনো বিষয়েই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বৃদ্ধ রামনাথ একদিন তার দ্বারস্থ হয়ে বলল, 'বাপু, ক্রিকেটের জন্য তুমি কিছু করো।'

সেই সূত্রপাত, রামনাথই তাকে ক্রিকেট বুঝিয়েছিল এবং আগ্রহী করে তুলেছিল। মাসতিনেক ধরে সে নোভা বল নিয়ে মেতে আছে। আজ নিজের সাফল্য সম্পর্কে সে ঘোর আত্মবিশ্বাসী। ভারতীয় নির্বাচকমন্ডলী তার মতো নামি লোকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না, তাকে হয়তো দলে নেওয়াও হবে। এরজন্য বৃদ্ধ রামনাথের কাছে সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু মুশকিল হল বলের গায়ে 'ডোন্ট' কথাটা লিখে রজনি কী বোঝাতে চাইছে? তাহলে কি মাঠে ও আশপাশে বা ঊর্ধ্বাকাশে গুপ্তচর রয়েছে? তার বোলিং অ্যাকশন কি রেকর্ড করা হবে?

অরুণ ঢোলাকিয়া ফুটফুটে মেয়েটার দিকে বার বার তাকাল, কিন্তু মেয়েটা একবারও তার দিকে তাকাল না। উদাসীন মুখে ঘাসের ওপর বসে নিজের নখ দেখছে এখন।

ঢোলাকিয়া বিদ্যুৎবেগে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল। বৃদ্ধ রামনাথকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

সুতরাং অরুণ যে ছ-টা বল করল, তার একটাও গড়িয়ে গেল না। একটাও লুপ হল না।

উত্তেজিত রামনাথ মাথা নেড়ে বলল, পিচে জায়গামতো পড়ছে না।

তাই তো দেখছি, মনে হচ্ছে শুটার বা লুপ আমাদের কাগজে-কলমেই থেকে যাবে।

রামনাথ রাই প্রচন্ড হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, তাহলে তোমার পরিশ্রম বৃথাই গেল?

তাই মনে হচ্ছে।

আবার চেষ্টা করে দ্যাখো, নোভা বলের ভেতরে এক ধরনের সিনথেটিক আঠা থাকে। তার ফলে বলটা ক্যাট বলের চেয়ে একটু বেশি লাফায়। মুশকিল কি সেখানেই হচ্ছে?

ঢোলাকিয়া জানে, সেটা সমস্যা নয়। সমস্যা রামনাথ নিজেই। অরুণ সেটা রামনাথকে বলে কী করে?

তবে সে আর এক ওভার বল করল, ইচ্ছে করে প্রথম পাঁচটা বল করল বিশ্রীভাবে। কিন্তু ষষ্ঠ বলটা করল তার ক্ষুরধার 'ক্যালকুলেশন' দিয়ে। বলটা নীচে পড়ে মাটি কামড়ে বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে মিডল স্টাম্প ছিটকে দিল।

'বা:, এই তো হচ্ছে?' বলে চেঁচিয়ে উঠল রামনাথ।

রজনি হঠাৎ উঠে তাঁবুর দিকে হাঁটতে লাগল, ঢোলাকিয়া ভাবল সে কোনো মারাত্মক ভুল করে বসল নাকি? তবে বুদ্ধি করে সে ডান হাতের গ্রিপ বাঁ-হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। এবং শুধু গ্রিপ ছাড়াও অনেক ব্যাপার আছে যা, নকল করা সহজ নয়, বিশেষ এক গতিতে, বিশেষ এক কোণ থেকে ডায়াগোনাল রান আপ নিয়ে আসতে হবে। ডেলিভারির সময়ে গোটা হাতেরও একটা বিশেষ কম্পন চাই, এসব 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম' বিষয় অনুধাবন ও অনুশীলন সোজা কথা নয়। তবু মনটার খুঁতখুঁতুনি থেকেই গেল।

রামনাথ তাকে আরও বল করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কিন্তু অরুণ রাজি হল না, টেলিফোনে একটা হেলি-ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে বাড়ি ফিরল।

একটু রাতের দিকে ফোনটা এল।

আমি রজনি।

ওঃ, রামনাথবাবুর ছোট্ট মেয়েটা?

হ্যাঁ। আপনি আজ খুব ভুল করেছেন, বলের ওপর আমি লিখে রেখেছিলাম 'ডোন্ট'।

হ্যাঁ, দেখেছি।

তা সত্ত্বেও শেষ বলটা ওরকম করলেন কেন?

না-করলে, তোমার বাবা হতাশ হতেন।

তাহলেও ক্ষতি ছিল না, আজ মাঠের চারপাশে লোক ছিল, আপনি তাদের দেখেননি, কিন্তু আমি জানি, দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষজ্ঞরা আপনার অ্যাকশনের ছবি তুলে নিয়ে গেছে। আপনি আমার বারণ শুনলেন না

কেন?

আমার ভুল হয়েছে। আসলে তুমি একটি বাচ্চা মেয়ে বলে, তোমার বারণকে বেশি গুরুত্ব দিইনি।

আমার বয়স চোদ্দো, আজকাল এ-বয়সের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষজ্ঞরা জানল কী করে?

আমার বাবাই জানিয়েছে। চল্লিশ বছর আগে বাবাকে ভারতীয় টিম থেকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়। এটা তারই প্রতিশোধ।

কিন্তু উনিই তো আমাকে এ-কাজে নামিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, কারণ তিনি জানেন, আপনার মতো একজন ধুরন্ধর অঙ্কবিদকে দিয়েই কাজটা সম্ভব। আমার বাবাও একজন ম্যাথমেটিশিয়ান, কৌশলটা আপনাকে দিয়ে আবিষ্কার করিয়ে, সেটা অন্য দেশকে বেচে দেওয়ার মতলব ছিল তাঁর।

এখন তাহলে কী হবে?

সেটা আপনিই ঠিক করুন। আর এক মাস পরেই বিশ্বকাপ। দু-হাজার নিরানব্বই সালের সতেরোই ডিসেম্বর। প্রথম ম্যাচেই ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ আফ্রিকা, আপনি কতবড়ো ভুল করেছেন আজ তা বুঝতে পারছেন?

পারছি রজনি, আমার এতদিনের পরিশ্রম বৃথা গেলে আমি খুবই ভেঙে পড়ব।

এখন মন দিয়ে শুনুন।

বলো।

আপনি আমার বারণ শুনবেন না বলে ধরে নিয়ে, আমি একটা কাজ করেছি।

কী কাজ?

পিচের সোজাসুজি যে দুটি বাতিস্তম্ভ ছিল, আমরা সে দুটি থেকে 'বিমার' রশ্মি ফেলেছিলাম। যতদূর জানি এই রশ্মি ফেললে ক্যামেরার চোখ ঝলসে যায়, মানুষের চোখে কিছু ধরা পড়ে না।

সত্যি?

হ্যাঁ, আমি এবং আমার বান্ধবীরা বুদ্ধি করে এইটে করেছি। তাতে কতদূর কাজ হবে, তা আমরা জানি না। ওদের কাছে হয়তো আরও অত্যাধুনিক ক্যামেরা আছে।

সেটা থাকাই সম্ভব।

আমি যে-বলটা আপনাকে দিয়েছিলাম তাতেও একটা সলিউশন মাখানো ছিল। তাতে মুভমেন্টের সময় হাওয়া লাগলে, সেলাইগুলো সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে। জানি না, এতে কতটা কাজ হবে। কিন্তু আমরা আমাদের সাধ্যমতো করেছি।

তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব?

বিশ্বকাপটা জিতুন, তাহলেই হবে।

বিশ্বকাপের শুরুতেই সারাপৃথিবীতে তুমুল আলোচনা, ভারত তাদের দলে একজন নন-ক্রিকেটার অঙ্কবিদকে খেলাচ্ছে। হাসাহাসি, ঠাট্টা, মশকরা, সমালোচনা, প্রতিবাদ সবই হতে লাগল। তার মধ্যেই কলকাতার ইডেন উদ্যানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামল ভারত। টসে জিতে ভারতের অধিনায়ক নানক দাশগুপ্ত প্রতিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠাল ঢোলাকিয়ার পরামর্শে।

প্রথম ওভারেই ঢোলাকিয়ার হাতে বল। সারামাঠ নিশ্চুপ। একজন অঙ্কের অধ্যাপক অ-ক্রিকেটার কী করতে পারে জানার জন্য সমস্ত পৃথিবীই দমবন্ধ করে বসে আছে। অরুণ ঢোলাকিয়া কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। তারপর শুরু করল দৌড়।

প্রথম বলটা লুপ। স্টাম্পের সোজা পিচে পড়ে, বাঁ-দিকে বেঁকে গেল, ব্যাটসম্যানের বাড়ানো ব্যাটকে এড়িয়ে, ফের ডানদিকে ঘুরল, না, স্টাম্পে লাগল না। একটু উঁচু দিয়ে চলে গেল উইকেটকিপারের হাতে। ঢোলাকিয়া বিরক্ত। ক্যালকুলেশনের সামান্য ভুল।

দ্বিতীয় বলটা আবার লুপ। কিন্তু ধীর গতির ব্যাটসম্যান মরিস বলটাকে তার সিনথেটিক ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে দিল কভারে, চার।

আজকাল মাঠে কোনো আম্পায়ার থাকে না। কিন্তু মাঠের চারদিকে অজস্র বৈদ্যুতিন চোখ। স্কোরবোর্ড নির্দেশ দিল চারের।

তৃতীয় বলটা করার আগে ফের একটু ধ্যানস্থ হল সে। ধীরে দৌড়ে এসে বল করল। মরিস ব্যাটটা তুলল কিন্তু সময়মতো নামাতে পারল না। মাটি কামড়ে বলটা গিয়ে তার মিডলস্টাম্প উপড়ে দিল, শুটার।

ওভার যখন শেষ হল, তখন স্কোরবোর্ড-এ চার রানে চার উইকেট। হ্যাট্রিকসহ। দলের অন্য খেলোয়াড়রা এতদিন অ-ক্রিকেটার ঢোলাকিয়াকে পাত্তা দিচ্ছিল না। কিন্তু ওভার শেষ হলে, কেউ কেউ এসে তার পিঠ চাপড়ে গেল।

খেলা অবশ্য বেশিক্ষণ গড়াল না। মোট বাইশ রানে প্রতিপক্ষ অল আউট। ঢোলাকিয়ার ঝুলিতে দশ ইউকেট। সতীর্থদের কাঁধে চড়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরল ঢোলাকিয়া।

দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই প্রবল ঝড়বৃষ্টি এসে গেল। তাতে অবশ্য খেলা আটকায় না আজকাল। দুশো মিটার ওপরে অন্যদিক থেকে দশটা পদ্মফুলের পাপড়ির মতো স্বচ্ছ ঢাকনা এসে গোটা মাঠ ঢাকা দিয়ে দিল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ভারত জিতে গেল ম্যাচ। জনতা গর্জন করে উঠল। ঢোলাকিয়া জিন্দাবাদ। সমগ্র পৃথিবী স্তম্ভিত। এ কী আশ্চর্য বোলিং! পরদিন পত্রপত্রিকা আর ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কেউ কেউ দাবি করল ঢোলাকিয়া চাক করছে, ওকে নো বল ডাকা উচিত।

দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যাণ্ড, তৃতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া একে একে উড়ে যেতে লাগল। ফাইনালে শোচনীয়ভাবে হারল দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। তারা পনেরো রানে অল আউট।

বিশ্বকাপের উত্তেজনার পর তার নির্জন বাড়িতে ফিরে এল ঢোলাকিয়া। এত উত্তেজনা, এত চেঁচামেচি ও শোরগোল ইত্যাদিতে সে বড়ো অস্বস্তিতে ছিল। নিরিবিলিতে এসে, সে খুব শান্তি পেল। তার কাজ শেষ। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তার কলাকৌশল আর গোপন রাখা যাবে না। অন্যেরা কপি করে নেবে। তা নিক, লুপ আর শুটার নিয়ে বিস্তর গবেষণা হবে। বদল করা হবে বল, তাতে আর কিছু আসে যায় না অরুণ ঢোলাকিয়ার, সে তার অঙ্ক নিয়ে থাকবে।

অস্বস্তিটা শুরু হল তৃতীয় দিন থেকে। অধ্যাপক অরুণ ঢোলাকিয়ার খুব একা লাগছে। বড্ড একা, তার সময় কাটতে চাইছে না। প্রচুর অভিনন্দন জানিয়ে লোকে ফোন করছে, উপহার পাঠাচ্ছে, অনেকে চলেও আসছে তাকে দেখতে, পৃথিবীজুড়ে তাকে নিয়ে আলোচনা। এ-সবই তার কাছে বিরক্তিকর এবং অস্বস্তিকর।

কয়েকদিনের জন্য সে সমুদ্রের ধার থেকে ঘুরে এল। কিন্তু সারাক্ষণ একটা নি:সঙ্গতা সঙ্গে রয়েছে তার। প্রিয় অঙ্কশাস্ত্রও যেন আলুনি লাগছে আজকাল। কেন এমনটা হচ্ছে? সারাক্ষণ একটা অস্থিরতা বোধ করছে সে।

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে নিজেকেই সে প্রশ্নটা করল, এমন লাগছে কেন? কেন এমন লাগছে?

কোনো জবাব খুঁজে পেল না সে।

রামনাথ ফোন করল দশদিন বাদে, অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি আমাকে ধাপ্পা দিয়েছিলে বলে, গত দশদিন ফোন করিনি। আমার অভিমান আর রাগ হয়েছিল, সেটা সামলে উঠেছি।

রামনাথের গলা শুনেই কেন যে বুকটা হঠাৎ এমন দুরুদুরু করতে লাগল কে জানে! ধরা গলায় অরুণ ঢোলাকিয়া বলল, অনেক ধন্যবাদ।

ফোন রেখে অনেকক্ষণ ভাবল অরুণ, রজনিরও কি উচিত ছিল-না, একবার ফোন করা বা অভিনন্দন জানানো? অদ্ভুত তো মেয়েটা! খুব রাগ হল অরুণের। কেন জানাল না? কেন এত দেমাক ওর! কেন ওর এত অবহেলা তাকে? তার যে ভীষণ রাগ হচ্ছে। রাগে যে জ্বলে যাচ্ছে গা। অসহ্য। অসহ্য।

আরও দু-দিন সময় দিল সে, তারপর আরও তিনদিন, না: এ তো সহ্য করা যাচ্ছে না! কিছুতেই না।

সাতদিনের দিন এক সকালবেলা, সে রজনির মোবাইল ফোনের নম্বর বের করল কম্পিউটার সেন্টারে ফোন করে।

রজনির মিহি 'হ্যালো' শুনেই রাগে ফেটে পড়ল অধ্যাপক অরুণ ঢোলাকিয়া, কী—কী ভেবেছ তুমি! অ্যাঁ! কী ভেবেছ? আমাকে এত অবহেলা করার মানে কী আমি জানতে চাই...

এই তীব্র রাগের জবাবে মেয়েটা তাকে অবাক করে দিয়ে খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল, হ্যাঁ!

হ্যাঁ। 'হ্যাঁ' মানে কী?

হ্যাঁ মানে হ্যাঁ।

অরুণ একটু লাল হল লজ্জায়। তারপর বলল, ও, তাহলে হ্যাঁ?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ'।

বানভাসি

পরশুদিন দুপুরে ভাত জুটেছিল। আর আজ এই রাতে। হিসেবে দু-দিন দাঁড়ায়। তবে খিদেটিদে উবে গিয়েছিল জলের তোড়ে তল্লাট ভেসে যেতে দেখে। পরশু থেকে আজ অবধি কাশীনাথ তার নৌকায় কতবার যে কত জায়গায় খেপ মেরে লোক তুলে এনেছে তার লেখাজোখা নেই। রায়চক উঁচু ডাঙা জমি, এইরকম দু-একটা জায়গা ডোবেনি। এখন সেইসব জায়গায় রাসমেলার ভিড়। খোলামাঠেই বৃষ্টির মধ্যে বসে আছে মানুষ। কেউ কেউ মাথার ওপর কাপড়-টাপড় টাঙিয়ে মাথা বাঁচানোর একটা মিথ্যে চেষ্টা করছে। কেউ বাচ্চাটাচ্চাদের মাথায় ছাতা ধরে আছে সারাক্ষণ। তাতে লাভ হচ্ছে না। ভিজছে, সব ভিজে সেঁধিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। এরপর মরবে।

রিলিফ এলে অন্যকথা। কিন্তু তাই-বা আসবে কোন পথে। রেল বন্ধ, সড়ক বন্ধ, চারদিকে অথই জল।

কুলতলি থেকে একটা পরিবারকে তুলে এনে রায়চকে নামিয়ে ভাঙড়ে যাচ্ছিল আরও কিছু লোককে তুলে আনতে। শরীর নেতিয়ে পড়ছে, হাত চলতে চাইছে না, কেমন যেন আবছা দেখছে সে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম। কাশীনাথ বুঝতে পারছিল আর বেশিক্ষণ নয়। দু-দিন পেটে দানাপানি নেই। জুটবেই-বা কোথা থেকে। কাল দুপুরে এক বুড়ি তাকে দু-গাল চালভাজা খাইয়েছিল। আর রায়চকের বাজারে টিউবওয়েল থেকে পেটপুরে জল। সেই কয়লাটুকুতেই শরীরে ইঞ্জিন চলছিল এতক্ষণ। আর নয়। কিন্তু নেতিয়ে পড়লেও চলবে না। বড়োড্যামের জল ছেড়েছে, তার স্রোতে নৌকা না সামলালে উলটে যাবে। নয়তো কোনো আঘাটায় গিয়ে পাথরে বা গাছে ধাক্কা মেরে নৌকা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এই নৌকা এখন মানুষের জীবনতরী। ডুবলে চলে?

ঘুমও আসছিল তার। আর বার বার ঢুলে পড়ছিল। বইঠা বা লগির ওপর হাত থেমে থাকছে বার বার। ফের চমকে জেগে উঠছে। নয়াবাঁধের কাছে নৌকাটা একটু ভিড়িয়ে কয়েক মিনিটের জন্য চোখ বুজে ঘুমের আলিস্যিটা ছাড়াতে গিয়েছিল সে। যখন চোখ মেলল তখন রাত হয়ে গেছে। গোলাগুলির মতো বৃষ্টির ফোঁটা ছুটে আসছে আকাশ থেকে। ঝলসাচ্ছে মারুনে বিদ্যুৎ।

জামাটা খুলে নিংড়ে নিল কাশীনাথ। ভাঙড়ে এই দুর্যোগে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। নৌকা ডুববে। সে কোমরজলে নেমে নৌকার বাঁধনটা অন্ধকারেই একটু দেখে নিল। বটগাছের শিকড় শক্ত জিনিস। পাটের মোটা কাছিও মজবুত। নৌকা আর যাবে না। তবে নৌকার খোলে জল উঠেছে অনেক। ফের নৌকা ভাসাতে হলে জল ছেঁচতে হবে। আপাতত জলেই ডুবে থাক। ভাসন্ত বানে নৌকার ওপর মানুষের খুব লোভ। জলে ডুবে থাকলে—আর যাইহোক চুরি যাবে না।

বৃষ্টিকে ভয় খেয়ে লাভ নেই। জলে তার সর্বাঙ্গ ভিজে সাদা হয়ে আছে। সে নেমে পাড়ে উঠল। নয়াবাঁধ চেনা জায়গা। দু-পা এগোলেই হাটের অন্ধকারে কয়েকটা চালাঘর। সেখানে এণ্ডিগেণ্ডি নিয়ে বানভাসি

মানুষের ভিড়। তারপর বসতি, চেনাজানা কেউ নেই এখানে। তার দরকারও নেই। সে বটতলা থেকে আর এগোল না। একটা মোটা শিকড়ের ওপর বসে পড়ল। ঘুম নয়, একটু ঝিমুনি কাটানো দরকার।

ঘুমিয়ে পড়েওছিল। হঠাৎ মুখের ওপর জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল, কে রে? কে ওখানে?

চমকে সোজা হল কাশীনাথ। সামনে ছাতা মাথায় কয়েকজন লোক। অন্ধকারে ভালো ঠাহর হল না, তবু আন্দাজে বুঝল, এলেবেলে লোক নয়।

কাশীনাথ কী বলবে ভেবে পেল না। সে কাশীনাথ, কিন্তু এর বেশি তো আর কিছু নয়।

তা সেটা তো আর দেওয়ার মতো কোনো পরিচয়ও নয় তার।

কাশীনাথ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম আজ্ঞে। চোর-ছ্যাঁচড় নই, নৌকা বাই।

মাছ ধরো?

আগে ধরতুম। এখন হাটেবাজারে মাল নিয়ে যাই।

কে একজন চাপা গলায় বলল, 'ওলাইচন্ডীর কাশীনাথ।'

সামনের লোকটা বলল, ও, এই কাশীনাথ।

কাশীনাথ খুব অবাক হল। এরা তাকে চেনে! কী করে চেনে? তাকে চেনার কথাই তো নয়।

তোমার নৌকো কোথায়?

বটগাছে বেঁধে রেখেছি। শরীরে আর দিচ্ছিল না বলে। একটু ডাঙায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম বাবু। দোষ হয়ে থাকলে মাপ করে দেবেন। না-হয় চলেই যাচ্ছি।

আরে না না, দোষের হবে কেন? তবে এটা কি আর জিরোনোর জায়গা? তুমি তো মেলা লোকের প্রাণ রক্ষে করেছ হে বাবু।

করেছে নাকি কাশীনাথ? প্রাণরক্ষে করা কি সোজা কথা? প্রাণ বাঁচানোর মালিক ভগবান। সে কিছু লোককে বানভাসি এলাকা থেকে তুলে এনে ডাঙাজমিতে পৌঁছে দিয়েছে মাত্র। তারা যে কীভাবে এরপর বেঁচে থাকবে, তা সে জানে না।

কাশীনাথ টর্চের আলোর দিকে চেয়ে বলল, ভাঙড়ের দিকে যাচ্ছিলাম বাবু, তা শরীরে বড্ড মাতলা ভাব। তাই—

বুঝেছি। বলি দানাপানি কিছু পেটে পড়েছে?

ওসব তো ভুলেই গেছি। কার-ই বা দানাপানি জুটছে বলুন। সব দাঁতে কুটো চেপে শুধু ডাঙা খুঁজছে।

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তাই বটে হে। লোকের দুর্দশা দেখলে আঁত শুকিয়ে যায়। নয়াবাঁধে তবু আমরা কিছু চিঁড়ে-গুড় আর খিচুড়ির ব্যবস্থা করেছি। দিন দুই হয়তো পারা যাবে। রিলিফ না এলে তারপর কী যে হবে কে জানে।'

কাশীনাথের পায়ে অন্তত গোটাসাতেক জোঁক লেগেছে। সে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সেগুলোকে উপড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, সে আর ভেবে কী হবে? কিছু তো মরবেই।

তা বাপু বলি কী, তোমার পরিবার-পরিজন সব কোথায়?

কেউ নেই বাপু। আমি একাবোকা মানুষ।

ঘরদোর?

ওলাইচন্ডীতে আছে একখানা কুঁড়ে। তা সেটাও বন্যার তোড়ে ফি বছর ভেসে যায়। এবারেও গেছে। এখন নৌকাই ঘরবাড়ি বাবু।

লোকটা একটু হাসল। বলল, আমাকে চেন? আমি হলাম নয়াবাঁধের সাধুচরণ মন্ডল।

কাশীনাথ তটস্থ হয়ে বলল, বাপ রে! আপনি তো মস্তমানুষ বাবু।

হেঁ হেঁ। নামটা শোনা আছে তা হলে।

খুব খুব। তল্লাটের কে না চেনে বলুন?

আমি একটু মুশকিলে পড়েছি যে, কাশীনাথ। তোমাকে যে পেলুম তা যেন ভগবানের আশীর্বাদে। বলছিলুম কী, মংলাবাজার চেন?

খুব চিনি। নিত্যি যাতায়াত।

সেইখানে কয়েকজনকে পৌঁছে দিতে হবে। নয়াবাঁধে এসে আটকে পড়েছে। এই সাংঘাতিক স্রোতে নৌকো ছাড়তে রাজি হচ্ছে না মাল্লারা।

তা স্রোত আছে বটে!

তোমার মতো একজন ডাকাবুকো লোকই খুঁজছিলাম আমি। যদি পৌঁছে দিতে পারো তবে ভালো বকশিশ পাবে।

বকশিশের কথায় কাশীনাথ হেসে ফেলল। হাতজোড় করে বলল, এ তো ভগবানের কাজ বাবু। বকশিশ কীসের? ওসব লাগবে না।

বলো কী? পয়সা হল লক্ষ্মী। তাকে ফেরাতে আছে?

অতশত জানি না বাবু। তবে এ-সময়টায় পয়সার ধান্দা করতে মন সরছে না। মানুষের যা-দুর্দশা দেখছি। আমি পৌঁছে দেবখন।

তা হলে এসো, আমার বাড়িতে চাট্টি ডালভাত খেয়ে নাও। শরীরের যা-অবস্থা দেখছি, না খেলে পেরে উঠবে না।

ঠিক আছে, চলুন।

সাধুচরণের বাড়িখানা বিশাল। প্রকান্ড উঠোনের তিনদিক ঘিরে দোতলা বাড়ি। পাঁচ-সাতখানা হ্যাজাক জ্বলছে। উঠোনে ত্রিপলের নীচে বড়ো বড়ো কাঠের উনুনে মস্ত লোহার কড়াইতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। চারদিকে মেলা লোকলশকর, মেলাই চেঁচামেচি। বৃষ্টির মধ্যেই বাঁশে ঝুলিয়ে খিচুড়ির বালতি নিয়ে লোক যাচ্ছে, পেছনের উঠোনে বানভাসিদের খাওয়াতে।

সাধুচরণ তাকে নিয়ে ঘরে বসাল। বলল, গা মুছে নাও। বড্ড ধকল গেছে তোমার হে। শুকনো কাপড় পরবে একখানা?

কাশীনাথ হাসল, তাতে লাভ কী?। আমাকে তো ঝড়ে-জলে বেরোতেই হবে।

তাই তো।

দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই শালপাতা আর গরম ভাতের হাঁড়ি চলে এল।

সাধুচরণ বলল, তোমাকে ওই লঙ্গরের খিচুড়ি খাওয়াচ্ছি না বাপু।

কাশীনাথ তার খাতির দেখে একটু অবাকই হচ্ছে।

পেটে রাক্ষুসে খিদে ছিল, কিন্তু ভাতের গ্রাস মুখ পর্যন্ত পৌঁছোতেই কেমন গা গুলিয়ে উঠল তার। মনে হল, এই খাওয়ানোটার ভেতরে একটা অহংকার আছে।

খাও খাও, পেট পুরে খাও হে।

ডাল, ভাত, ঘ্যাঁট এবং পুঁটি মাছের ঝোল—আয়োজন খারাপ নয়। কিন্তু কাশীনাথ পেট পুরে খেতে পারল কই? কত মানুষের উপোসি মুখ মনে পড়ল। কত বাচ্চার খিদের চেঁচানি। ঘটির জলটা খেয়ে সে উঠে পড়ল। পাতে অর্ধভুক্ত ভাত-মাছ পড়ে রইল। পাতাটা মুড়ে নিয়ে সে বেরিয়ে এসে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘটির জলে আঁচিয়ে নিল।

সাধুচরণ কোথায় গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, এই অন্ধকারে তো আর মংলাবাজার যেতে পারবে না। বারান্দার কোণে চট পেতে দিতে বলেছি। শুয়ে ঘুমোও। কাল সক্কালবেলা বেরিয়ে পোড়ো।

এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর হয় না। সে বলল, ‘যে আজ্ঞে।’

তারপর চটের বিছানায় হাতে মাথা রেখে মড়ার মতো ঘুম।

কাকভোরে ঘুম ভাঙল। বাড়ি নি:ঝুম। এখনও আলো ফোটেনি। সে বসে আড়মোড়া ভাঙল। গা-গতরে ব্যথা হয়ে আছে। তবে কালকের চেয়ে অনেক তাজা লাগছে। অনেক জ্যান্ত। সে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল। কিশোরী মেয়ে, পরনে একখানা হাঁটুঝুল ফ্রক। আবছা আলোয় যতদূর দেখা গেল, মেয়েটি রোগাটে।

তুমিই আমাকে মংলাবাজারে নিয়ে যাবে?

তা তো জানি না। সাধুচরণবাবু বললেন, কাদের যেন পৌঁছে দিতে হবে।

আমাকে আর পিসিকে।

তা হবে।

পিসি পৌঁছোবে। কিন্তু আমি জলে ঝাঁপ দেব। আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

কাশীনাথ হাঁ করে মেয়েটার মুখের দিকের চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, জলে ঝাঁপ দেবে। কেন?

মরব বলে।

মরার-ই বা এত তাড়াহুড়ো কীসের?

সব কথা বলার সময় নেই। তবে এটুকু জেনো, আমি জ্যান্ত অবস্থায় মংলাবাজারে যাব না। সারারাত জেগে বসে ওই জানলা দিয়ে তোমাকে লক্ষ করেছি, কখন ঘুম ভাঙে।

তুমি কি সাধুচরণবাবুর কেউ হও?

আমি ওঁর ছোটোমেয়ে বিলাসী।

বটে। তাহলে তোমার দুঃখু কীসের? মরতে চাইছ কেন?

সে অনেক কথা। কাল রাতে নয়নের সঙ্গে আমার পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বন্যা হয়ে সব ভেস্তে গেল। বাবা টের পেয়ে আমাকে মংলাবাজারে মামাবাড়িতে পাচার করতে চাইছে। বিয়েও ঠিক করে ফেলেছে।

এ তো সাংঘাতিক ঘটনা।

তাই বলে রাখছি তোমাকে, আমি কিন্তু মরব। তুমি কিন্তু দায়ী হবে।

আমাকে কী করতে বলছ?

বললে শুনবে?

বলেই দ্যাখো-না।

গোবিন্দপুর চেন?

কেন চিনব না?

আমাকে সেখানে পৌঁছে দাও।

সেখানে কী আছে?

ওটাই নয়নের গাঁ। কাছেই। বন্যা না হলে আধঘণ্টা হাঁটলেই পৌঁছোনো যেত।

কাশীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, গোবিন্দপুরের অবস্থা কী তা জানি না। যদি ডুবে গিয়ে থাকে তাহলে তোমার নয়ন কি আর সেখানে বসে আছে?

তবু আমাকে যেতে হবে। এ-বাড়ি থেকে না পালালে, আমি বাঁচব না।

তারপর আমার কী হবে জান? সাধুচরণবাবু আমাকে আস্ত রাখবেন কি? মস্ত লোক, চারদিকে নামডাক। লোকলশকর, থানা-পুলিশ সব তাঁর হাতে।

আমার হাতে এই সোনার বালাটা দেখছ। তিন ভরি। আমার দিদিমা দিয়েছিল। এটা তোমাকে দিচ্ছি।

পাগল। ওসব আমার দরকার নেই।

মা শীতলার দিব্যি, আমায় যদি না নিয়ে যাও।

উঃ, কী মুশকিল!

শুনেছি তুমি নাকি খুব সাহসী লোক। অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছ। আমাকে বাঁচাতে পারবে না? এমন কী শক্ত কাজ?

তুমি নয়নের কথা ভেবে দুনিয়া ভুলে বসে আছ। আমার তো তা নয়। আমাকে যে আগুপিছু ভাবতে হয় গো!

হঠাৎ মেয়েটা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করল।

কী মুশকিল!

পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চলো। আমার যে বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।

দ্যাখো বিলাসী, যদি ধরো তোমাকে গোবিন্দপুর নিয়েই যাই, তা না-হয় গেলুম। কিন্তু যদি নয়নকে খুঁজে পাওয়া না যায়, তখন তোমাকে ঘাড়ে করে আমি কোথায় কোথায় ঘুরব?

ঘুরতে হবে না। যেকোনো ঘাটে নামিয়ে দিয়ো। আমি ভিক্ষে করে হোক, দাসীগিরি করে হোক, চালিয়ে নেব। বন্যার জল নামলে ঠিক নয়ন এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

আর ইদিকে আমার হাতে হাতকড়া?

তোমার কিচ্ছু হবে না, দেখো। মা শীতলা তোমার ভালো করবেন।

ভগবান তখনই ভালো করেন, যখন আমরা ভালো করি। বুঝলে?

তোমার পায়ে পড়ি।

বড্ড মুশকিলে ফেললে।

নইলে যে আমি মরব।

কাশীনাথ মৃদু স্বরে বলে, সে তোমার কপালে লেখাই আছে।

চলো-না। লোকজন উঠে পড়লে যে আর হবে না।

ঠিক আছে। চলো। রাবণে মারলেও মারবে, রামে মারলেও মারবে।

ভোর-ভোর নৌকা ছাড়ল কাশীনাথ।

মেয়েটা উলটো দিকে বসা। তাকে বইঠা ধরিয়ে লগি দিয়ে অগভীর জলে নৌকা ঠেলে নিচ্ছে। একটু তাড়াহুড়োই করতে হচ্ছে। লোকজন টের পেলে তাড়া করবে। কাশীনাথের ঘাম হচ্ছে খুব।

ডাঙাপথে গোবিন্দপুর যতটা দূর, জলপথে তত নয়। সাঁ করেই চলে এল তারা। সুপুরি, নারকেল গাছ, কয়েকটা দালানের ওপর দিকটা ছাড়া গোবিন্দপুর গাঁ নিশ্চিহ্ন।

দেখলে তো, কী বলেছিলাম?

মেয়েটা তার পুঁটুলি কোলে নিয়ে 'হাঁ' করে দৃশ্যটা দেখছে। দু-চোখে জলের ধারা।

এবার কী করবে বলো।

মেয়েটা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

কিশোরী মুখখানি এখন ভোরের আলোয় পদ্মফুলের মতো সুন্দর দেখাল। কান্নায় ভরাট গলায় বলল, কোথাও নামিয়ে দাও আমায়, যেখানে খুশি।

কাশীনাথ একটু ভেবে বলল, শোনো মেয়ে, নামিয়ে দিলে তোমার বিপদ হবে। তার চেয়ে চলো, আমি ভাঙড়ে যাচ্ছি কিছু লোককে তুলে আনতে। তাদের পৌঁছোতে পৌঁছোতে বেলা মরে যাবে। তারপর তোমাকে সাঁঝের পর বরং নয়াবাঁধেই নামিয়ে দেব। বাড়ি চলে যেয়ো।

বাবা আমাকে মেরেই ফেলবে।

দু-চার ঘা মারবে হয়তো। কিন্তু আবার ভালও বাসবে। বাড়ি হল আশ্রয়। আমাকে দ্যাখো-না, আমি এক লক্ষ্মীছাড়া। ভাববার কেউ নেই।

মেয়েটা গুম হয়ে বসে রইল।

নয়ন ভাঙড়ে গেল। বানভাসি লোক তুলল। তাদের পৌঁছে দিল ডাঙা-জমিতে। রায়চকে আজ রিলিফের খিচুড়ি দিচ্ছিল। বিলাসীকে নিয়ে নেমে পড়ল কাশীনাথ। বলল, ‘চাট্টি খেয়ে নাও। আর জুটবে কি না কে জানে!’

মেয়েটা আপত্তি করল না। খিচুড়িও খেল পেট ভরে। তারপর বলল, জানো, আমি এভাবে লঙ্গরখানায় বসে খাইনি কখনো। আমার বেশ লাগছে। মানুষের কী কষ্ট, তাই-না?

খুব কষ্ট?

কাছেপিঠে থেকে আরও দুটো খেপ মেরে কিছু লোক এনে ফেলতে হল কাশীনাথকে। সঙ্গে সারাক্ষণ বিলাসী।

কেমন লাগছে?

খুব ভালো লাগছে, কষ্টও হচ্ছে। একটা কথা বলব?

কী?

আমি নয়নের দেখা পেয়েছি।

অ্যাঁ! কোথায় দেখা পেলে? বলোনি তো!

রায়চকে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

বললে না কেন? ধরে আনতাম।

মাথা নেড়ে বিলাসী বলে, তাকে আমার আর দরকার নেই যে!

সে কি! তার জন্যই-না বিপদ ঘাড়ে করে বেরিয়ে এলে!

সে এসেছিলুম। এখন এত মানুষ আর তাদের কষ্ট দেখে মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে নয়নও আমাকে চায় না।

বাঁচালে। তা হলে চলো নয়াবাঁধে তোমাকে রেখে আসি।

বিলাসী ঘাড় হেলিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ।’

নৌকা বাইতে বাইতে কাশীনাথ বলল, ‘বাবার মারের আর ভয় পাচ্ছ না?’

বিলাসী আনমনে দূরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ‘বাবা আর কতটুকু মারবে? ভগবান যে তার চেয়েও কত বেশি মেরেছে এত মানুষকে!’

কাশীনাথ একটু হাসল।

বুদ্ধিরাম

বুদ্ধিরাম শিশিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। লেবেলে ছাপা অক্ষর সবই খুব তেজালো। "ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ক্রিমি নাশ, অম্ল, পিত্ত ও অজীর্ণতা রোগের নিবারণ অবশ্যম্ভাবী। অতিশয় বলকারক টনিকবিশেষ। স্নায়বিক দুর্বলতা, ধাতুদৌর্বল্য ও অনিদ্রা রোগেরও পরম ঔষধ। বড়ো বড়ো ডাক্তার ও কবিরাজেরা ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।..." ছাপা অক্ষরের প্রতি বুদ্ধিরামের খুব দুর্বলতা। ছাপা অক্ষরে যা বেরোয় তার সবটাই তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

আদুরি অবশ্য অন্য ধাতের। বুদ্ধিরামের সঙ্গে তার মেলে না। বুদ্ধিরাম যা ভাবে, বুদ্ধিরামের যা ইচ্ছে যায়, আদুরির ঠিক তার উলটো হয়। বুদ্ধিরাম যদি নরম সরম মানুষ তো আদুরি হল রণচণ্ডী। বুদ্ধিরাম যদি নাস্তিক, তো আদুরি হল ঘোর আস্তিক। বুদ্ধিরামকে যদি কালো বলতে হয়, তো আদুরিকে ফর্সা হতেই হবে। বিধাতা (যদি কেউ থেকে থাকে) দুজনকে এমন আলাদা মালমশলা দিয়ে গড়েছেন যে, আর কহতব্য নয়।

আর সেজন্যই এ জন্মে দুজনের আর মিল হল না। বলা ভালো, হতে হতেও হল না। এখন যদি বুদ্ধিরামের বত্রিশ-তেত্রিশ তো আদুরির কোনো-না-কোনোভাবে সাতাশ-আঠাশ চলছে। দুজনের কথাবার্তা নেই, দেখাশোনাও একরকম কালেভদ্রে, মুখোমুখি যদিবা হয়, চোখাচোখি হওয়ার জো নেই। আদুরি আজকাল বুদ্ধিরামের দিকে তাকায়ও না।

কিন্তু বুদ্ধিরাম লোক ভালো। লোকে জানে, সে নিজেও জানে। বুদ্ধিরাম আগাপাশতলা নিজেকে নিরিখ করে দেখেছে। হ্যাঁ, সে লোক খারাপ নয়। মাঝে মাঝে বুদ্ধির দোষে দু-একটা উলটোপালটা করে ফেললেও তাকে খারাপ লোক মোটেই বলা যাবে না।

খারাপই যদি হবে তবে সাত মাইল পথ সাইকেলে ঠেঙিয়ে চকবেড়ের হাটে কখনো আসে মন্মথ সেনশর্মার পিয়োর আয়ুর্বেদিক টনিক 'হার্বল' কিনতে? মাত্র মাসচারেক আগে প্লুরিসিতে ভুগে উঠল বুদ্ধিরাম। এখন শরীর তেমন জুতের নয়। কাকের মুখে কথাটা শোনা গিয়েছিল, আদুরির নাকি আজকাল খুব অম্বল হয়। তা এরকম কত মেয়েরই হয়। কার তাতে মাথাব্যথা? বুদ্ধিরাম মানুষ ভালো বলে-ই না খোঁজখবর করতে লাগল।

তেজেনের কাছে শুনল। হার্বল খেয়ে তার পিসির অম্বলের ব্যথা সেরে গেছে। কথাটা মানিক মন্ডলের কাছেও শোনা, হ্যাঁ, 'হার্বল' জব্বর ওষুধ বটে, তিন শিশি খেতে না খেতে তার বউ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আর একদিন পরিতোষও কথায় কথায় বলেছিল, 'হার্বল' একেবারে অম্বলের যম। তবে পাওয়া শক্ত। মন্মথ কবিরাজ সেই শিবপুরের লোক, আশির ওপর বয়েস। বেশি পারেও না তৈরি করতে। কয়েক বোতল করে ছাড়ে। দারুণ চাহিদা। চকবেড়ের হাটে একজন লোক নিয়ে আসে বেচতে।

খবর পেয়েই আজ মঙ্গলবারে স্কুলের শেষ দুটো ক্লাস অন্যের ঘাড়ে গছিয়ে সাইকেল মেরে ছুটে এসেছে এতদূর। অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় আধবুড়ো খিটখিটে চেহারার একটা লোক। ময়লা চাদর পেতে কয়েকটা বিবর্ণ ধুলোটে শিশি সাজিয়ে বসেছিল। ভারি বিরস মুখ।

বুদ্ধিরাম জিজ্ঞেস করল, হার্বল আছে?

লোকটা মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বলল, আছে। সতেরো টাকা।

সতেরো টাকা শুনে বুদ্ধিরাম একটু বিচলিত হয়েছিল। দু-শিশি কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কুড়িয়ে বাড়িয়েও পকেট থেকে আঠাশ টাকার বেশি বেরোল না।

আচ্ছা দু-শিশি নিলে কনসেশন হয়-না?

লোকটা এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চোখে তাকাল যেন, মরা ইঁদুর দেখছে। মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, পাচ্ছেন যে সেই ঢের। মন্মথ কবরেজের আয়ু ফুরোল বলে। তারপর হার্বলও হাওয়া। মাথা খুঁড়ে মরলেও পাওয়া যাবে না।

একটা শিশি কিনে বুদ্ধিরাম বলল, সামনের মঙ্গলবার আবার যদি আসি পাব তো!

বলা যাচ্ছে না।

কথাটা যা-ই হোক সেটা বলার একটা রংঢং আছে তো, লোকটা এমনভাবে 'বলা যাচ্ছে না' বলল যা আঁতে লাগে। মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটাই যেন বাহাদুরি। বেচিস তো বাপু কবরেজি ওষুধ, তাও গাছতলায় বসে, অত দেমাক কীসের!

শিশিটা নিয়ে বুদ্ধিরাম হাটে একটু ঘুরে বেড়াল। চকবেড়ের হাট বেশ বড়ো। বেশ গিজগিজে ভিড়ও হয়েছে। চেনামুখ নজরে পড়বেই। আশপাশের পাঁচ-সাত গাঁয়ের লোকই তো আসে। বুদ্ধিরামের এখন চেনা কোনো লোকের সঙ্গে জুটতে ভালো লাগছে না। মাঝে মাঝে তার একটু একাবোকা থাকতে বড়ো ভালো লাগে।

জিলিপি ভাজার মিঠে মাতলা গন্ধ আসছে। ভজার দোকানের জিলিপি বিখ্যাত। শুধু জিলিপি বেচেই ভজা সাতপুকুরে ত্রিশ বিঘে ধানজমি, পাকাবাড়ি করে ফেলেছে। কিনেছে তিনটে পাঞ্জাবি গাই। ডিজেল পাম্প সেট আর ট্র্যাক্টরও। ছেঁড়া গেঞ্জি আর হেঁটো ধুতি পরে, এমন ভাবখানা করে থাকে যেন তার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আজও ভজার সেই বেশ। নারকোলের মালার ফুটো দিয়ে পাকাহাতে খামি ফেলছে ফুটন্ত তেলে। চারটে ছোকরা রসের গামলা থেকে টাটকা জিলিপি শালপাতার ঠোঙায় বেচতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মানুষ মাছির মতো ভনভন করছে দোকানের সামনে।

বুদ্ধিরাম কাণ্ডটা দেখল খানিক দাঁড়িয়ে ডান হাতে, বাঁ-হাতে পয়সা আসছে জোর। ক্যাশবাক্সটা বন্ধ করার সময় নেই। আর তার ভেতরে টাকাপয়সা এমন গিজগিজ করছে যে, চোখ কচকচ করে। টাকাপয়সার ভাবনা বুদ্ধিরাম বিশেষ ভাবে না বটে, কিন্তু একসঙ্গে অতগুলো টাকা দেখলে বুকের ভেতরটায় যেন কেমন করে।

বুদ্ধিরাম বেঞ্চে একটু জায়গা খুঁজল। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি লোক। সকলেই জিলিপিতে মজে আছে। এমন খাচ্ছে যেন এই শেষ খাওয়া। ভোমা ভোমা নীল মাছি ওড়াউড়ি করছে বিস্তর। ভিতরবাগে তিনখানা বেঞ্চের একটা থেকে দুজন উঠে যেতেই বুদ্ধিরাম গিয়ে বসে পড়ল। এখনও আশ্বিনের শেষে তেমন শীতভাব নেই। দুপুরবেলাটায় গরম হয়। উনুনের তাপ আর কাঠের ধোঁয়ায় চালাঘরের ভেতরটা রীতিমতো তেতে আছে। বুদ্ধিরাম বসেই ঘামতে লাগল।

পাশের লোকটা এখনও জিলিপি পায়নি। বৃথা হাঁকডাক করছে, 'বলি ও ভজাদা, আধঘণ্টা হয়ে গেল 'হাঁ' করে বসে আছি। দেবে তো!'

দিচ্ছি বাপু, দিচ্ছি। দশখানা তো হাত নয়।

আর আমাদেরই বুঝি মেলা ফালতু সময় আছে হাতে?

এই কড়াটা হলেই দিচ্ছি গো।

লোকটা ফস করে বুদ্ধিরামের হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে দেখল। তারপর মাতব্বরের মতো বলল, ‘হার্বল? মন্মথ কবরেজের ওষুধ। দুর দুর, কোনো কাজের নয়। তিন শিশি খেয়েছি।’

বুদ্ধিরাম তার হাত থেকে বোতলটা ফের নিয়ে বলল, ‘তা বেশ। কাজ হয় না তো হয় না।’

লোকটা ভারি কড়া চোখে বুদ্ধিরামকে একটু চেয়ে দেখল। জিলিপি এসে পড়ায় আর কিছু বলতে পারল না। মুখ তো মাত্র একটা, একসঙ্গে দু-কাজ তো করা যায় না। তার ওপর ভজার জিলিপি, মুখকে ভারি রসস্থ করে দেয়। কথা বলাই যায় না।

বুদ্ধিরামকে লোকে বলে ভাবের লোক। কথাটা মিথ্যেও নয়। বুদ্ধিরাম বড়ো ভাবতে ভালোবাসে। ভাবতে ভাবতে তার মাথাটা যে তাকে ‘কাঁহা কাঁহা মুলুক’ নিয়ে যায়, কত আজগুবি জিনিস দেখায় তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। বুদ্ধিরাম ভজার জিলিপির দোকানে বসে বসে ভাবতে লাগল, এই যে, ভজা বাঁ-হাতে, ডান হাতে হরির লুটের মতো পয়সা কামাচ্ছে এতে হচ্ছেটা কী?

এত জমিজিরেত, ঘরবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, এসব ছেড়ে, একদিন ফুটুস করে চোখ ওলটাতে হবে। তখন ভজার ছেলেরা কেউ জিলিপির প্যাঁচ কষতে আসবে না। ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে লাঠালাঠি মারামারি করে ভাগ ভিন্ন হবে। ভজা কি আর তা জানে না। তবু খেয়ে না খেয়ে মেলায় মেলায় রোদ-জল মাথায় করে গিয়ে চালা বেঁধে কেবল জিলিপি খেলিয়ে যাচ্ছে। টাকার নেশায় পেয়েছে লোকটাকে।

বসে থাকতে থাকতে বুদ্ধিরামের পালা এসে গেল অবশেষে। ঠোঙায় আটখানা রসে মাখামাখি গরম জিলিপি। আহা, এইরকম একঠোঙা যদি আদুরির হাতেও গরমাগরম পৌঁছে দেওয়া যেত।

প্রথম জিলিপিটা দাঁতে কাটতে গিয়েই ‘টপ টপ’ করে অসাবধানে দু-ফোঁটা রস পড়ে গেল টেরিকটনের পাঞ্জাবিতে। বড়ো সাধের পাঞ্জাবি। ঘি রঙের, গলায় আর পুটে চিকনের কাজ করা। বুদ্ধিরাম রুমালে মুছে নিল রসটা। মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। এক্কেবারে নতুন পাঞ্জাবি। কাঁচি ধুতির ওপর এটা পরে আদুরির বাড়ির সামনে খুব কয়েকটা চক্কর দিয়েছিল সাইকেলে। আদুরি অবশ্য বেরোয়নি। কিন্তু বুদ্ধিরামের ধারণা যে, আদুরি তাকে আড়াল থেকে ঠিকই দেখে।

জিলিপির দাম দিয়ে বুদ্ধিরাম উঠে পড়ল। সামনেই পানের দোকান। সে পান সিগারেট খায় না। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তেড়াবেঁকা আয়নায় নিজেকে একটু দেখে নিল। না, বুদ্ধিরাম দেখতে খারাপ নয়। রংটা যা একটু ময়লা। কিন্তু মুখচোখ বেশ কাটা কাটা। নিজেকে দেখে সে একটু খুশিই হল। রুমাল দিয়ে মুখের ঘামটা মুছে নিল।

একটা দোকানে পঞ্চাশ পয়সার কড়ারে সাইকেল জমা রেখেছিল। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চারদিকে উধাও মাঠ-ঘাট, ধানখেত। আকাশটা কী বিশাল। বাঁশবনের পেছনে সূর্য একটু ঢলে গেছে। ফুরফুরে হাওয়া।

বুদ্ধিরাম ধানখেতে নেমে পড়ল। চওড়া আল। খানিকদূর গিয়ে রাস্তা।

ধানখেতের ভেতরে নেমে বুদ্ধিরামের মনটা আবার কেমন যেন হয়ে গেল। আদুরি কি ওষুধটা খাবে? এমনিতেই মেয়েরা ওষুধ খেতে চায় না, তার ওপরে বুদ্ধিরামের পাঠানো ওষুধ। আদুরি বোধ হয় ছোঁবেও না। এত পরিশ্রম বৃথাই যাবে। তা যাক। বুদ্ধিরাম করেই যাবে।

পুজোয় একটা শাড়ি পাঠিয়েছিল বুদ্ধিরাম। বুদ্ধিরামের বোন রসকলি গিয়ে দিয়ে এসেছিল। হাত বাড়িয়ে নেয়ওনি। বিরসমুখে নাকি জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কে পাঠিয়েছে রে?’

রসকলি বোকাগোছের মেয়ে। ভয়ে ভয়ে শেখানো কথা বলেছিল, মা পাঠাল।

তোর মা আমাকে শাড়ি পাঠাবে কেন?

তা জানি না। এটা পরে অষ্টমী পুজোয় অঞ্জলি দিয়ো।

শাড়িটা ভালোই। কালুতাঁতির ঘর থেকে কেনা। লালজমির ওপর ঢাকাই বুটি।

শাড়িটার দিকে তাকায়ওনি আদুরি। শুধু দয়া করে বলেছিল, ওখানে কোথাও রেখে যা।

সেই শাড়ি আজ অবধি পরেনি আদুরি। নজর রেখে দেখেছে বুদ্ধিরাম। খোঁজ খবরও নিয়েছে। শাড়িটা পরেনি। তবে নিয়েছে ফিরিয়ে দেয়নি, এটাই যা লাভ হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তারপর একদিন হঠাৎ নজরে পড়ল, সেই শাড়িটা পরে রসকলি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাড়িটা কোথায় পেলি?

ভয়ে ভয়ে রসকলি বলল, আদুরদিদি দিল।

দিল বলেই নিলি?

তা কী করব?

বুদ্ধিরাম আর কিছু বলেনি? রাগটা গিলে ফেলেছিল। মনটা বড্ড উচাটন ছিল কয়েকদিন অপমানে।

দোষঘাট মানুষের কি হয় না?

তখন বুদ্ধিরাম তো আর এই বুদ্ধিরাম ছিল না। আজকের এক গেঁয়ো স্কুলের মাস্টার বুদ্ধিরামকে দেখে কে বিশ্বাস করবে যে, ইস্কুলে সে ছিল ফার্স্ট বয়। পাশটাও করেছিল জব্বর, দু-দুটো লেটার নিয়ে। বিয়ের কথাটা তখনই ওঠে। বুদ্ধিরাম যখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেওকেটা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

বুড়ি-ঠাকুমা তখন এতটা বুড়ো হয়নি। একদিন আদুরিকে একেবারে কনে-সাজে সাজিয়ে নিয়ে এসে বলল, 'দেখ তো ভাই, পছন্দ হয়? হলে দেগে রাখি। পাশ-টাশ করে থিতু হলে মালা-বদল করিয়ে দেব।'

আদুরি অপছন্দের মেয়ে নয়। ফর্সা তো বটেই, মুখচোখ রীতিমতো ভালো।

কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে, নিত্যি দেখাশোনা হয়। যাকে বলে 'ঘর কা মুরগি', তাই বুদ্ধিরাম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, 'ফু:, এর চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো।'

কেন রে, মেয়েটা কি খারাপ? দেখ তো কেমন মুখচোখ! কেমন ফর্সা।

সাতজন্ম বিয়ে না করে থাকলেও, ও মেয়ে আমার চলবে না। যাও তো ঠাকুমা, সং বন্ধ করো।

একেবারে মুখের ওপর থাবড়া মারা যাকে বলে। আদুরির খুব অপমান হয়েছিল। তার তখন বছর বারো বয়স। একছুটে পালিয়ে গেল। আর কোনোদিন এল না। খুব নাকি গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছিল মেয়েটা। দিন তিনেক ভালো করে খায়-দায়নি।

বুদ্ধিরামের তখন এসব দিকে মাথা দেওয়ার সময় নেই। চোদ্দো মাইল দূরের মহকুমা শহরে কলেজে যেতে হয়। নতুন বন্ধুবান্ধব, নতুন রকমের জীবন। সেখানে কে একটা গেঁয়ো মেয়েকে নিয়ে ভাববার মতো মেজাজটাই তার নেই।

আরও একটা, ঘটনা ঘটেছিল। বুদ্ধিরামের সঙ্গে মেলা মেয়েও পড়ত। তাদের একজন ছিল হেনা। দেখতে শুনতে ভালো তো বটেই, তার কথাবার্তা, চাউনি-টাউনিও ছিল ভারি ভালো। কথাবার্তা বলত টকাস টকাস।

বুদ্ধিরাম ছাত্র ভালো। সুতরাং হেনা তার দিকে একটু ঢলল। বছর দেড়েক হেনার সঙ্গে বেশ মাখামাখি হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তবে সেটাকে ভাব-ভালোবাসা বলা যাবে কি না, তা নিয়ে বুদ্ধিরামের আজও সংশয় আছে।

তবে হেনা আর যা-ই করুক না করুক বুদ্ধিরামের লেখাপড়ার বারোটা বাজাল। কলেজের প্রথম ধাপটা ডিঙোতেই দম বেরিয়ে গেল বুদ্ধিরামের। ডিঙোল খোঁড়া ঘোড়ার মতো। কিন্তু হেনা দিব্যি ভালো পাশ-টাশ করে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে চলে গেল।

বুদ্ধিরামের পতনের সেই শুরু। 'বি এসসি' পাশ করল অনার্স ছাড়া। বাবা ডেকে বলল, 'পড়াশুনোয় তো দেখছি তেমন উন্নতি হল না। তা গেঁয়ো ছেলের আর এর বেশি কীই বা হওয়ার কথা!'

বুদ্ধিরাম সেই গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এল। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর হল না। পাশের গাঁ বিষ্টুপুরের মস্ত ইস্কুলে তখন সায়েন্সের মাস্টার খোঁজা হচ্ছে। বুদ্ধিরামকে তারা লুফে নিল।

বুদ্ধিরামের মনের অবস্থা তখন সাংঘাতিক। রাগে দুঃখে দিনরাত সে ভেতরে ভেতরে জ্বলে আর পোড়ে। লেখাপড়ায় একটা মারকাটারি কিছু করে বিজয়গর্বে গাঁয়ে ফিরে আসবে, এই-না, সে জানত। আর সে-

জায়গায় ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে মোটে বি এসসি! বুদ্ধিরাম কিছুদিন আপনমনে বিড়বিড় করে ঘুরে বেড়াত পাগলের মতো, দাড়ি রাখত, পোশাক-আশাকের ঠিক ছিল না। আত্মহত্যা করতে রেলরাস্তায় গিয়েছিল তিনবার। ঠিক শেষ সময়টায় কেমন যেন, সাহসে কুলোয়নি।

তারপরই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। এমনি দেখতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু তারমধ্যেই বুদ্ধিরামের জীবনটা একটা মোড় ঘুরল। আমবাগানের ভেতর দিয়ে বিশু আর বুদ্ধি জিতেন পাড়ুইয়ের বাড়ি যাচ্ছিল মিটিং করতে। জিতেন সেবার ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকশনে নেমেছে। জিতেনকে জেতানোর খুব তোড়জোড় চলছে। বুদ্ধিরাম তখন যা-হোক, একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকার জন্য ব্যস্ত। জীবনের হাহাকার আর ব্যর্থতা ভুলতে মাথাটাকে কোনো একটা ভূতের জিম্মায় না দিলেই নয়। নইলে জিতেনের ইলেকশন নিয়ে কেনই বা বুদ্ধিরামের মাথাব্যথা হবে!

আমবাগানে শরৎকালের একটা সোনালি রুপালি রোদের চিকরিকাটা আলো-ছায়া। সকালবেলাটায় ভারি পরিষ্কার বাতাস ছিল সেদিন। ঘাসের শিশির সবটা তখনও শুকোয়নি।

উল্টোদিক থেকে একটা ছিপছিপে মেয়ে হেঁটে আসছিল। একা, নতমুখী। তার চুল কিছু অগোছালো এলোখোঁপায় বাঁধা। আঁচলটা ঘুরিয়ে শরীর ঢেকেছে। দেখে কেমন যেন মনটা ভিজে গেল বুদ্ধিরামের।

কে রে মেয়েটা?

দুর শালা! চিনিস না? ও তো আদুরি।

আদুরি! বুদ্ধিরাম এত অবাক হল যে, কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল 'হাঁ' হয়ে। এক গাঁয়ে বাস হলেও আদুরির সঙ্গে তার দীর্ঘকাল দেখা হয়নি। কারো দিকে তাকায়ও না বুদ্ধিরাম। সেই আদুরি কি এই আদুরি?

আদুরি মাথা নীচু করে রেখেই তাদের পেরিয়ে চলে গেল। ভ্রূক্ষেপও করল না।

আর সেই ঘটনাটা সারাদিন বুদ্ধিরামের মগজে নতুন একটা ভূত হয়ে ঢুকে গেল।

বাড়ি ফিরেই সে ঠাকুমাকে ধরল, শোনো ঠাকুমা, একটা কথা আছে।

কী কথা?

সে-ই যে, আদুরি মনে আছে?

আদুরিকে মনে থাকবে না কেন?

ওকেই বিয়ে করব। বলে দাও।

ঠাকুমা তার মাথায়, পিঠে হাত-টাত বুলিয়ে বলল, বড্ড দেরি করে ফেললি ভাই, আদুরির তো শুনছি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। হরিপুরের চন্দ্রনাথ মল্লিকের ছেলে পরেশের সঙ্গে।

বুদ্ধিরাম এমন তাজ্জব কথা যেন জীবনে শোনেনি। আদুরির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! তাহলে তো খুব মুশকিল হবে বুদ্ধিরামের।

সেই দিনই সে গোপনে, তার দু-একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শে বসে গেল।

কেষ্ট বলল, বিয়েটা না ভাঙতে পারলে তোর আশা নেই। ভাঙতে হলে সবচেয়ে ভালো উপায় হল, চন্দ্রনাথ মল্লিককে একখানা বেনামা চিঠি লেখা।

তো তাই হল। কেষ্ট নানা ছাঁদে লিখতে পারে। তার সাইনবোর্ডের দোকান আছে। চিঠিটা সে-ই লিখে দিল।

দিন সাতেক বাদে শোনা গেল, বিয়ে ভেঙে গেছে।

বুদ্ধিরাম ভেবেছিল, জলের মতো কাজটা হয়ে যাবে। সে গিয়ে ফের ঠাকুমাকে ধরল, 'শুনছি আদুরির বিয়েটা ভেঙে গেছে। তা আমি রাজি আছি বিয়ে করতে।'

ঠাকুমা গেল প্রস্তাব নিয়ে। বুদ্ধিরাম নিশ্চিন্তে ছিল। এরকম প্রস্তাব তো মেয়ের বাড়ির পক্ষে স্বপ্নের অগোচর।

কিন্তু সন্ধেবেলা ফিরে এসে ঠাকুমা বিরসমুখে বলল, মেয়েটার মাথায় ভূত আছে।

কেন গো ঠাকুমা?

মুখের ওপর বলল, 'ও-ছেলেকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো।'

বুদ্ধিরাম এ কথায় এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল যে, বলার নয়। বলল? এত বুকের পাটা? সেই রাতে বুদ্ধিরাম ঘুমোতে পারল না। কেবল ঘরবার করল, দশবার জল খেল, ঘন ঘন পেচ্ছাব করল। মাথার চুল মুঠো করে ধরে বসে রইল। রাগে, ক্ষোভে অপমানে তার মাথাটাই গেল ঘুলিয়ে।

ভোরের দিকে সে একটু ঝিমোল। ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবল, বহোত আচ্ছা। এইরকম তেজি মেয়েই তো চাই। গেঁয়ো মেয়েগুলো যেন ভেজানো ন্যাতা। কারো 'ব্যক্তিত্ব' বলে কিছু নেই। আদুরির আছে, এটা তো খুব ভালো খবর।

সকালবেলায় সে একখানা পেল্লায় সাতপৃষ্ঠার চিঠি লিখে ফেলল আদুরিকে। মেলা ভালো ভালো শব্দ লিখল তারমধ্যে। অন্তত গোটা পাঁচেক কোটেশন ছিল। সবশেষে লিখল...''তোমাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা।''

রসকলির হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল তীব্র উত্তেজনায়। আজ অবধি সে কোনো মেয়েকে প্রেমপত্র লেখেনি। এই প্রথম।

রসকলি ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে বলল, ও দাদা, চিঠিটা যে না পড়েই ছিঁড়ে ফেললে গো।

চুপ। চ্যাঁচাস না। কিছু বলল না?

কী বলবে? শুধু জিজ্ঞেস করল চিঠিটা কে দিয়েছে? তোমার কথা বলতেই খামসুদ্ধু চিঠিটা কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

বোনের কাছে ভারি অপদস্থ হয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। তবে রসকলি হাবাগোবা বলে রক্ষে।

বুদ্ধিরাম বলল, 'কাউকে কিছু বলিস না। ভালো একটা জামা কিনে দেবখন।'

তখন অপমানে লাঞ্ছনায় বুদ্ধিরামের পায়ের তলায় মাটি নেই। সারাদিনটা তার কাটল এক ঘোরের মধ্যে। কিন্তু দুদিন বাদে সে বুঝতে পারল, আদুরি যত কঠিনই হোক তাকে জয় করতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। তবে বুদ্ধিরাম আর বোকার মতো চিঠি-চাপাটি চালাচালিতে গেল না। আদুরির ধাতটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

গাঁয়ের মেয়ে। সুতরাং তাদের বাড়ির সকলের সঙ্গেই আজন্ম চেনাজানা বুদ্ধিরামের। তবে সে দেমাকবশে কারো বাড়িতেই তেমন যেত-টেত না। ঘটনার পর দিনকয়েক আদুরিদের বাড়িতে হানা দিতে লাগল সে। আদুরির কাকা, জ্যাঠা মিলে মস্ত সংসার। বড়ো গেরস্ত তারা। তিন-চারখানা উঠোন, বিশ-পঁচিশটা ঘর। সারাদিন ক্যাঁচম্যাচ লেগেই আছে। বুদ্ধিরাম গিয়ে যে খুব সুবিধে করতে পারল তা নয়। বাইরের ঘরের দাওয়ায় বসে হয়তো কখনো আদুরির কেশোদাদুর সঙ্গে খানিক কথা কয়ে এল। না-হয় তো কোনোদিন আদুরির জ্যাঠা হারুবাবুর কিছু উপদেশ শুনে আসতে হল।

চা-বিস্কুটও যে জোটেনি তা নয়। সে গাঁয়ের ভালো ছেলে। খাতির একটু লোকে করেই। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে যাওয়া সেদিকে কিছুই এগোল না।

কিছুদিন পর সে বুঝল, এভাবে আদুরির কাছে এগোনো যাবে না। মহিলামহলে ঢুকতে হবে। তা তাতেও বাধা ছিল না। আদুরিদের অন্দরমহলেও ঢুকতে সে পারে। আদুরির এক বউদি হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, 'হ্যাঁ গো বুদ্ধি ঠাকুরপো, কোনোকালে তো তোমাকে এ-বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখিনি। তোমার মতলবখানা কী খুলে বলো তো! আমার তো বাপু, তোমার মুখচোখ ভালো ঠেকছে না।'

একথায় আর এক দফা অপমান বোধ করল বুদ্ধিরাম। সে পুরুষমানুষ কোন লজ্জায় মা-মাসী বউদি শ্রেণির মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করে?

সুতরাং বুদ্ধিরামকে জাল গোটাতে হল।

তারপরই আবার বিপদ। আদুরির ফের সম্বন্ধ এল। চেহারাখানা ভালো, কিছু লেখাপড়াও জানে, সুতরাং আদুরিকে যে দেখে, সে-ই পছন্দ করে যায়।

দ্বিতীয় পাত্রপক্ষকেও বেনামা চিঠি দিতে হল। ভেঙেও গেল বিয়ে। কিন্তু তাতে বুদ্ধিরামের যে কাজ খুব এগোল তাও নয়। বরং উলটে একটা বিপদ দেখা দিল। কেউ যে বেনামা চিঠি দিয়ে আদুরির বিয়ে ভাঙছে এটা বেশ চাউর হয়ে গেল। লোকটা কে তার খোঁজাখুঁজিও শুরু হল। তৃতীয়বার যখন আদুরিকে পছন্দ করে গেল আর এক পাত্রপক্ষ তখন আদুরির বাপ, জ্যাঠা, পাত্রপক্ষকে বলেই দিল, 'বেনামা চিঠি যেতে পারে, আমল দেবেন না। কোনো বদমাশ লোক করছে এই কাজ।'

খুবই ভয়ে ভয়ে রইল বুদ্ধিরাম। কেষ্ট ভরসা দিয়ে বলল, আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন? এমন কলঙ্কের কথা লিখে দেব যে, পাত্রপক্ষ আঁতকে উঠবে।

কিন্তু এই তৃতীয়বার বুদ্ধিরাম ধরা পড়ে গেল। আদুরির সাত-সাতটা গুণ্ডা ভাই একদিন বাদামতলায় চড়াও হল তার ওপর। সতীশটা মহাষন্ডা। সেই সাইকেল থেকে টেনে নামাল বুদ্ধিরামকে।

বলি, তোর ব্যাপারটা কী?

কীসের ব্যাপার?

ন্যাকা! আদুরির বিয়ে ভাঙতে চিঠি দেয় কে?

আমি না।

তুই ছাড়া আর কে দেবে?

আমার কী স্বার্থ?

মেজোবউদি বলছিল তুই নাকি আমাদের বাড়িতে ঘুরঘুর করতিস!

বুদ্ধিরাম বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছিল। সত্য গোপন করার অভ্যাস তার নেই। গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলা তার আসেও না। সে আমতা আমতা করতে লাগল।

সতীশ অবশ্য মারধর করল না। বলল, যদি আদুরিকে বিয়ে করতে চাস তো সেকথা বললেই হয়। গাঁয়ে তোর মতো ছেলে ক-টা? আর যদি নিতান্তই বদমাইশির জন্য করে থাকিস তাহলে...

বুদ্ধিরাম কেঁদে ফেলেছিল। একটু সামলে নিয়ে বলল, বিয়ে করতে চাই।

'শাবাশ' বলে খুব পিঠ চাপড়ে দিল সতীশ। বলল, এ-কথাটা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতো হল। আগে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যেত।

কিন্তু ব্যবস্থা হল না। পরদিনই সতীশ এসে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, মুশকিল কী হয়েছে জানিস? তোর ওপর আদুরি মহাখাপ্পা। কী করেছিলি বল তো!

সব শুনেটুনে সতীশ বলল, আচ্ছা, চুপচাপ থাক। দেখি কী করা যায়!

বলা পর্যন্তই। সতীশ কিছু করতে পারেনি। চিঁড়ে ভেজেনি।

কিন্তু এরপর থেকে আদুরির আর সম্বন্ধ আসত না। এলেও আদুরি বেঁকে বসত।

এ সবই সাত-আট বছর আগেকার কথা। এই সাত-আট বছরে বুদ্ধিরাম আড়াল থেকে আদুরির উদ্দেশে তার সব অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করেছে। প্রতিবার পুজোয় শাড়ি পাঠায়, টুকটাক উপহার পাঠায়, কোনোটাই আদুরি নেয় না। নিলেও ফেলে টেলে দেয় বা অন্য কাউকে দান করে।

কিন্তু বয়েস তো বসে নেই। আদুরির বিয়ের বয়স পার হতে চলল। বুদ্ধিরামও ত্রিশ পেরিয়েছে। কোনো দিকেই কিছু এগোল না। আদুরির কপাট বজ্রআঁটুনিতে বন্ধই রইল।

ধানখেতের ভেতর দিয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে এসব কথাই ভাবছিল বুদ্ধিরাম।

বড়ো রাস্তায় উঠে সে সাইকেলে চাপল। পাঞ্জাবির পকেটে ভারী শিশিটা ঝুল খাচ্ছে। কষ্ট করাই সার হল। কোনো মানে হয় না এর।

গাঁয়ে ঢুকবার মুখে বাসরাস্তায় কয়েকটি দোকান। আঁধার হয়ে এসেছে। টেমি জ্বলছে দোকানে দোকানে। মহীনের চায়ের দোকানে দু-চারজন বসে আছে। ষষ্ঠী হাঁক মারল, 'কে রে! বুদ্ধি নাকি?'

বুদ্ধি নেমে পড়ল। সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে বসে গেল। একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন। এক ভাঁড় চা হলে হয়।

ষষ্ঠী একটু বেশি কথা কয়। নানা কথা বকবক করে যাচ্ছিল। সে একটু তেলানো মানুষ। যাকে দেখে তাকেই একটু একটু তেল দেওয়া তার স্বভাব। পুরোনো কথার সূত্র ধরে বলল, তোর কত বড়ো হওয়ার কথা ছিল বল তো? গাঁয়ে আজ অবধি তোর মতো বেশি নম্বর পেয়ে কেউ পাশ করেছে? বসন্ত স্যার তো বলতই, বুদ্ধিরামের মতো ছেলে হয় না। যদি লেগে থাকে তো জজ ম্যাজিস্ট্রেট কিছু একটা হয়ে ছাড়বে।

এ সবই পুরোনো ব্যর্থতার কথা। বুদ্ধিরাম যা খুঁচিয়ে তুলতে চায় না। ধীরে ধীরে তার আঁচ নিবে গেছে। সে গাঁয়ের মাস্টার হয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে মাপে ছোটো করে ফেলেছে। সয়েও গেছে সব। কিন্তু কেউ খুঁচিয়ে তুললে আজও বুকটা বড়ো উথালপাতাল করে।

ষষ্ঠী, চুপ কর, ওসব কথা বলে আর কী হবে!

আমরা যে তোর কথা সব সময়েই বলাবলি করি। চোখের সামনে দেখছি কিনা। কী জিনিস ছিল তোর ভেতরে।

বুদ্ধিরাম ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে উঠল। বলল, যাই, ছাত্ররা সব এসে বসে থাকবে।

যা।

বুদ্ধিরাম সাইকেলে চেপে বড়োরাস্তা থেকে গাঁয়ের পথে ঢুকে পড়ল। অন্ধকার রাস্তায় হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে। তাদের মিটমিটে আলোয় কিছুই প্রতিভাত হয় না। অথচ জ্বলে। লাখো লাখো জ্বলে। তাহলে কী লাভ জ্বলে?

মোট দশজন ছাত্র তার বাড়িতে এসে পড়ে। মাথাপিছু কুড়ি টাকা করে মাস গেলে দুশো টাকা তার আসার কথা। কিন্তু নগদ টাকা বের করতে গাঁয়ের লোকের গায়ে জ্বর আসে। বাকি বকেয়া পড়ে যায় অনেক। তবু বুদ্ধিরাম সবাইকেই পড়ায়। বেশির ভাগই গবেট। দু-একজন একটু আধটু বোঝে সোঝে।

পড়াতে বসবার আগে পাতুকে ডেকে শিশিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ও বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আয়। তার হাতে দিস।'

রসকলির বিয়ে হয়ে গেছে। একটু বয়েসকালেই হল। এখন রসকলির জায়গা নিয়েছে বুদ্ধিরামের ভাইঝি পাতু। আদুরি আর বুদ্ধিরামের ব্যাপারটা দু-বাড়ির কারও আর অজানা নেই। সুতরাং নাহক লজ্জা পাওয়ারও কোনো মানে হয় না।

হাতমুখ ধুয়ে পড়াতে বসে গেল বুদ্ধিরাম। কিছুক্ষণ আর অন্যদিকে মনটা ছোটাছুটি করল না। ছাত্রদের মুখের দিকে চেয়ে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়।

এই ভুলে থাকাটাই এখন বুদ্ধিরামের কাছে সবচেয়ে বড়োকথা। যত ভুলে থাকা যায় ততই ভালো। জীবনটা আর কতই-বা লম্বা। একদিন আয়ু ফুরোবেই। তখন শান্তি। তখন ভারি শান্তি।

পড়িয়ে যখন উঠল বুদ্ধিরাম তখন বেশ রাত হয়েছে। ছাত্ররা যে-যার লণ্ঠন হাতে উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বুদ্ধিরাম দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দেখল। এরপর তার একা লাগবে। খুব একা।

পাতু ফিরে এসেছে। বারান্দায় ঘুরে ঘুরে কোলের ভাইকে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

হাতে দিয়েছিস তো!

হ্যাঁ গো।

কিছু বলল?

না। শিশিটার গায়ে কী লেখা আছে পড়ল। তারপর তাকে রেখে দিল।

ভাতের গন্ধ আসছে। জ্যাঠামশাইয়ের কাশির শব্দ। কে যেন কুয়ো থেকে জল তুলছে ছপাৎ ছপাৎ করে। দুটো কুকুরে ঝগড়া লেগেছে খুব। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধিরাম বাইরের কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নার দিকে আনমনে চেয়ে রইল।

না, বেঁচে থাকাটার কোনো মানেই খুঁজে পায় না সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিজের ঘরে ঢুকল। বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ঘরখানা তার। ঘরে একখানা চৌকি, একটা টেবিল আর চেয়ার আর একখানা বইয়ের আলমারি।

বুদ্ধিরাম চেয়ারে বসে লণ্ঠনের আলোয় একখানা বইয়ের পাতা খানিকক্ষণ ওলটাল। বইটা কী, কোন বিষয়ের তাও যেন বুঝতে পারছিল না। বইটা রেখে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নারও কোনো অর্থ হয় না। ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না। অথচ বেঁচে থাকতে হবে। এ কী জ্বালা রে বাপ?

বউদি এসে খেতে ডাকল বলে বেঁচে গেল বুদ্ধিরাম। খাওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। তবু সেটা একটা কাজ। কিছুক্ষণ সময় কাটে। কথাবার্তা হয়, হাসিঠাট্টা হয়। সময়টা কেটে যায়। বুদ্ধিরাম গিয়ে সাগ্রহে খেতে বসল।

খেয়ে এসে বুদ্ধিরাম ফের কিছুক্ষণ বসে রইল চেয়ারে। চেয়ারে বসে বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়ল, কে জানে।

পাতু এসে জাগাল, ওঠো সেজকা, বিছানা করে মশারি ফেলে গুঁজে দিয়েছি। শোওগে।

হাই তুলে উঠতে যাচ্ছিল বুদ্ধিরাম, পাতু ফের বলল, আজ ও-বাড়ির সকলের মন খারাপ। নিবারণদাদুর অবস্থা ভালো নয়। আদুরি পিসির চোখ লাল। খুব কাঁদছিল।

নিবারণ মানে হল আদুরির বাবা। বুদ্ধিরাম খবরটা শুনলমাত্র। মনে আর কোনো বুজকুড়ি কাটল না। কলঘর ঘুরে এসে শুয়ে পড়ল। বাপ যদি মরে তো আদুরির মাথা থেকে ছাদ উড়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমোল বুদ্ধিরাম। আজকাল নির্বোধের মতোই সে ঘুমোতে পারে। মাথাটা আস্তে আস্তে বোকা হয়ে যাচ্ছে তো। বোধবুদ্ধি কমে যাচ্ছে। আজকাল তাই গাঢ় ঘুম হয়।

মাঝরাতে আচমকা চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভাঙল। ভাঙতেই সোজা হয়ে বসল বুদ্ধিরাম। চেঁচামেচিটা অনেক দূর থেকে আসছে। আদুরির বাপের কি তবে হয়ে গেল?

উঠবে কী উঠবে না, তা ভাবছিল বুদ্ধিরাম। ও-বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীই বা আর? না গেলেও হয়। রাতে একটু শীত পড়েছে। পায়ের কাছে ভাঁজ করা কাঁথা। সেটা গায়ে টেনে নিতেই ভারি একটা ওম আর আরাম হল। বুদ্ধিরাম চোখ বুজল।

ঘুমিয়েই পড়ছিল প্রায় এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে মেজদা বলল, 'বুদ্ধি, ওঠ। নিবারণ জ্যাঠার হয়ে গেল। একবার যেতে হয়। ও বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে।

বুদ্ধিরাম উঠল। যারা বেশি রাতে মরে, তাদের আক্কেল বিবেচনার বড়ো অভাব। বলল, যাচ্ছি।

গামছাখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। গাঁসুদ্ধু জেগে গেছে। আজকাল গাঁয়ে লোকও বেড়েছে খুব। রাস্তায় নামলেই বেশ লোকজন দেখা যায়। এই মাঝরাতেও ঘুম ভেঙে অন্তত জনা ত্রিশ-চল্লিশ লোক নেমে পড়েছে রাস্তায়, আদুরিদের বাড়ি যাবে বলে।

একটা হাই তুলল বুদ্ধিরাম। শরীরটা এখনও ঘুমজলে অর্ধেক ডুবে আছে। শরীরের যেটুকু জেগে আছে সেটাকেও চালানো যাচ্ছে না।

বাইরের উঠোনেই নিবারণ জ্যাঠাকে তুলসীতলায় শোয়ানো হয়েছে। চেঁচিয়ে এ, ওর গলাকে ছাপিয়ে কান্নার কম্পিটিশন চলেছে। কোনো মানে হয় না। জন্মালেই তো মানুষের মধ্যে মৃত্যুর বীজ পোঁতা হয়ে গেল। এভাবেই যেতে হবে। সবাই যায়।

গোটাদশেক লণ্ঠন আর দু-দুটো হ্যাজাক বাতির আলোতেও এই ভিড়ের মধ্যে আদুরিকে দেখতে পেল না বুদ্ধি। আদুরি খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে। চেঁচিয়ে কাঁদবে না, জানে বুদ্ধিরাম। আর সে আসায় হয়তো ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে। মুখ দেখতেও বুঝি ঘেন্না হয় আজকাল।

মাস চারেক আগে 'প্লুরিসি' থেকে উঠেছে বুদ্ধিরাম। বুক থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে জল টেনে বের করতে হয়েছিল গামলা গামলা। তার ঠাণ্ডা লাগানো বারণ। কিন্তু সে-কথা বুদ্ধিরাম ছাড়া আর কে-ই বা মনে রেখেছে?

শ্মশানে গেলে স্নান করে আসতে হবে। শেষরাতের শীতে হিম-বাতাস লাগবে শরীরে। ডাক্তার ঠাণ্ডা লাগাতে বারণ করেছিল।

বুদ্ধিরাম একটু হাসল। সে রেলরাস্তায় গলা দিতে গিয়েছিল। মরণকে তার ভয়টয় নেই। একভাবে না একভাবে তো যেতেই হবে।

কান্নাকাটির মধ্যেই কিছু লোক বাঁশ-টাশ কাটতে লেগেছে। দড়িদড়া এসে গেছে। বুদ্ধিরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কিছুই দেখার নেই অবশ্য।

মোড়লদের মধ্যে শলা-পরামর্শ হচ্ছে। সেই দলে বুদ্ধির বাপ-জ্যাঠাও আছে। অন্যধারে গাঁয়ের অল্পবয়েসি ছেলেরা কোমরে গামছা বেঁধে তৈরি।

আচমকাই—একেবারে অপ্রত্যাশিত, আদুরিকে দেখতে পেল বুদ্ধিরাম। উত্তরে ঘরের দাওয়ায় তিন-চারজন মহিলা দাঁড়িয়েছিল, সেই দলে বুদ্ধির জ্যাঠাইমাও। আদুরি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, সোজা বুদ্ধির দিকে তাকাল। গত দশ বছরে বোধহয় প্রথম।

বুদ্ধি একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেল। না, ভুল দেখছে না। হ্যাজাকের আলো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বাপের মড়া উঠোনে শোওয়ানো। তবু আদুরি সোজা তার দিকেই চেয়ে আছে। একেবারে নিষ্পলক।

আজ বুদ্ধিরামই চোখ সরিয়ে নিল। তারপর আড়ে আড়ে চাইতে লাগল। মেয়েটার হল কী?

আদুরি তার জ্যাঠাইমার কানে কানে কী-যেন বলল। তারপর একটু সরে দাঁড়াল। আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে নরম ভঙ্গিতে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তাতে যেন ভারি ফুটে উঠল আদুরি। কী যে দেখাচ্ছে!

জ্যাঠাইমা হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছিল।

বুদ্ধিরাম অগত্যা গিয়ে বলল, কী গো জ্যাঠাইমা?

মড়া ছুঁয়েছিস নাকি?

না। তবে এবার তো ছুঁতে হবেই।

কাজ নেই বাবা। বাড়ি যা। গায়ে গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা ছিটিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়। তোকে শ্মশানে যেতে হবে না।

কেন?

কেন আবার। ক-দিন আগে কী অসুখটা থেকেই না উঠলি। ঠাণ্ডা লাগলে আর বাঁচবি নাকি?

আমার কিছু হবে না জ্যাঠাইমা, ভেবো না।

কেন, তোর-ই বা যেতে হবে কেন? শ্মশানে যাওয়ার কি লোকের অভাব? কত লোক জুটে গেছে। আদুরি মনে করিয়ে দিল, তাই। যা, বাবা, ঘরে যা।

আর একবার শুনতে ইচ্ছে করছিল। বলল, কে মনে করিয়ে দিল বললে?

আদুরি অদূরে দাঁড়িয়ে সব শুনতে পাচ্ছে। নড়ল না।

জ্যাঠাইমাও আর তাকে আমল না দিয়ে, অন্য মহিলাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল।

বুদ্ধিরাম ধীর পায়ে ছেলে-ছোকরাদের দঙ্গলটার কাছে এসে দাঁড়াল।

বুদ্ধিদা, যাবে তো!

যাব-না মানে?

তা গেল বুদ্ধিরাম। মড়া কাঁধে নেচে নেচে গেল। বহুকাল পরে তার এক ধরনের আনন্দ হচ্ছিল আজ। না, প্রতিশোধ নেওয়ার আনন্দ নয়। প্রতিশোধের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। আজ তার আনন্দ হচ্ছিল একটা অন্য কারণে। ঠিক কেন, তা সে বলতে পারবে না।

মড়া পুড়ল। বুদ্ধিরাম কষে স্নান করল নদীর পাথুরে ঠাণ্ডা জলে। দুনিয়ার একজনও অন্তত তার অসুখটার কথা মনে রেখেছে, এখন আর মরতে বাধা কী!

ভেজা গায়ে যখন উঠে এল বুদ্ধিরাম, তখন শেষরাতের হিম বাতাসে সে থরথর করে কাঁপছিল। সবাই কাঁপছে। কিন্তু তার কাঁপুনিটা আলাদা। লোকে বুঝতে পারল না। শুধু বুদ্ধিরামের নিজের ভেতরে যে নানা ভাঙচুর হচ্ছিল তা নিজেই টের পেল সে।

হোঁতকা সতীশ কাছেই দাঁড়িয়ে গামছা নিংড়োচ্ছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হতে বুদ্ধিরামের দিকে ফিরে বলল, হ্যাঁরে বুদ্ধি, তুই যে, বড়ো স্নান করলি?

করব না তো কী?

সতীশ মুখে একটা চুক চুক শব্দ করে বলল, তোর নাকি একটা অসুখ হয়েছিল ক-দিন আগে।

কে বলল তোকে?

সতীশ গামছাটা ফটাস ফটাস করে ঝেড়ে নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, বেরোবার মুখে আদুরি এসে ধরেছিল আমায়। বলল বটে, রাঙাদা, বুদ্ধিরামের কিন্তু শরীর ভালো নয়। হিমজলে স্নান করলে মরবে। ওকে দেখো।

বুদ্ধিরাম কোনো কথা বলল না। গলার কাছে একটা দলা আটকে আছে। চোখে জল আসছিল।

সতীশ গা মুছতে মুছতে বলল, তোর আক্কেল নেই? কোন বুদ্ধিতে এই সকালে স্নান করলি?

দুর শালা! আজই তো স্নানের দিন। আজ স্নান করব না তো, কবে করব?

হরণ

হ্যালো! হ্যালো!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না।

আচ্ছা, এটা কি টু ফোর সেভেন থ্রি ফোর জিরো ফোর জিরো?

এই মেরেছে, নম্বরটা তো ঠিক জানা নেই।

আচ্ছা, এটা বিজয় ঘোষের বাড়ি কি?

বিপদে ফেললেন মশাই, এই বাড়ির কর্তার নাম কি বিজয় ঘোষ নাকি?

আপনি কে বলছেন বলুন তো!

আমি এ-বাড়ির একজন গেস্ট বলতে পারেন।

গেস্ট! গেস্ট? অথচ হোস্টের নামটা বলতে পারছেন না?

আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

শিকাগো।

শিকাগো? ও বাবা, সে তো অনেক দূরের পাল্লা!

তাহলে আপনাকে সত্যি কথাটা বলাই যায়।

আপনার দিক থেকে কোনো বিপদের ভয় নেই।

কী যা তা বলছেন! পাগল নাকি?

না, ঠিক পাগল নই। আমি আসলে একজন চোর।

চোর! বলেন কী মশাই! আপনি চোর!

হ্যাঁ, অত অবাক হচ্ছেন কেন? 'চোর' কথাটা নিশ্চয়ই আপনি এই প্রথম শুনছেন না!

ইয়ার্কি মারছেন না তো!

না মশাই, না। অনেক মেহনত করে সবে ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় হঠাৎ ফোনটা বাজতে লাগল। কাজের সময় ফোনটোন বাজলে বড্ড ফ্যাসাদে পড়তে হয় মশাই, তাই ফোনটা তুলে কথা কইছি।

সর্বনাশ! আমি যে, ভীষণ নার্ভাস ফিল করছি!

আমিও। আপনার চেয়ে বরং একটু বেশিই।

দেখুন, আপনার কাছে আর্মস নেই তো! পিস্তল টিস্তল বা ছোরাছুরি?

আরে না। ওসব নিয়ে বেরোলে আরও বিপদ। ওসব কাছে থাকলেই মনে জিঘাংসা আসে, আর তা থেকে খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে। তাই আমি ওসব রাখি না।

দেখুন, আমার টেলিফোনের স্ক্রিনে ডায়াল করা যে-নম্বরটা দেখতে পাচ্ছি সেটা আমাদের বাড়ির নম্বর-ই বটে। আচ্ছা, এটা কত নম্বর বাড়ি বলুন তো! সেভেনটি ফোর ডি বাই ওয়ান...?

বিপদে ফেললেন মশাই, বাড়ির নম্বরটা তো দেখিনি!

বাইরের দরজায় আমার বাবা বিজয় ঘোষের নেমপ্লেট আছে।

সদর দিয়ে তো ঢুকিনি মশাই যে নেমপ্লেট দেখতে পাব। আমি ঢুকেছি পেছনের জানালার গ্রিল কেটে। পরিশ্রম বড়ো কম হয়নি।

দেখুন, আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি?

আহা, অত কিন্তু কিন্তু করার কী আছে? বলে ফেলুন।

আপনি যখন চোর তখন চুরি তো করবেন-ই, সে তো আর আটকাতে পারব না। কিন্তু প্লিজ, আমার মা-বাবার কোনো ক্ষতি করবেন না। আর আমার একটা ছোটোবোনও আছে। প্লিজ, প্লিজ, ওদের ওপর চড়াও হবেন না, আপনার যা খুশি নিয়ে যান।

কিন্তু কেউ যদি জেগেটেগে যায় তাহলে তো আমাকেও মাথা বাঁচাতে হবে মশাই! চোরের প্রাণ বলে কি প্রাণটার দাম নেই?

অবশ্যই আছে, অবশ্যই আছে।

তাহলে কথা দিই কী করে?

আচ্ছা, একটা কাজ করছি। লাইনটা আমি ধরে ধাকছি, আপনিও লাইনটা কাটবেন না। কেউ যদি বাইচান্স জেগে যায়, তাহলে তাকে আগে আমার সঙ্গে কথা বলে নিতে বলবেন।

এ-প্রস্তাবটা অবশ্য খারাপ নয়। বাড়িতে আর কেউ নেই তো? ধরুন, গুণ্ডা প্রকৃতির কোনো ভাই বা আহাম্মক কোনো চাকর?

না, না আর কেউ নেই। আমরা দুই ভাই-বোন আর বাবা-মা।

বা:, আপনাদের বেশ ছিমছাম ফ্যামিলি।

হ্যাঁ। আপনার ফ্যামিলি কি বড়ো?

না:। ফ্যামিলিই নেই।

ও। বিয়ে করেননি বুঝি?

নিজেরই পেট চলে না, তার বিয়ে।

সে তো ঠিকই। আমাদের গরিব দেশ, কত লোক খেতে পায় না।

খিদের কষ্টটা কি টের পান? আপনি তো একটা ঝিনচাক দেশে আছেন। শুনেছি সেখানে নাকি মানুষ বেশি খেয়ে মোটা হয়ে যাচ্ছে!

ঠিকই শুনেছেন। আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো প্রবলেম 'ওবেসিটি'। খুব জাঙ্ক ফুড খায় তো!

ওই হট ডগ, পিৎজা, হ্যামাবার্গার এইসব তো!

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি তো বেশ জানেন দেখছি!

ওসব আজকাল সবাই জানে। পড়াশুনো করতে গেছেন, না চাকরি করতে? দুটোই। আমি 'আই টি'-র ছাত্র। আবার চাকরিও করছি।

বা:, খুব ভালো। এখন তো 'আই টি'-রই যুগ! আশ্চর্য! আপনি তো সত্যিই বেশ জানেন। চোর বলেই কি আর মুখ্যু? সামান্য হলেও বিদ্যে একটু আছে। রোজ খবরের কাগজ পড়ি।

না, না, আমি আপনাকে মূর্খ বলতে চাইনি। আসলে আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে আপনি অন্য সব চোরদের মতো নন।

কী করে বুঝলেন? ক-টা চোরের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

তা নেই ঠিকই। আন্দাজ থেকে বলছি।

দিনকাল পালটে গেছে মশাই। এখন আর আগেকার মতো বোকা বোকা চোরের যুগ নেই। গেরস্তরাও যেমন চালাক-চতুর হয়েছে, চোরও হয়েছে সেয়ানা। আগে ঘরে ঘরে জানালায় শিক থাকত। সেটা বেঁকিয়ে ঘরে ঢোকা সোজা। আজকাল গ্রিল হয়েছে, সেটা বাঁকানো যায় না বলে আমাদের 'গ্যাস কাটার' ব্যবহার করতে হয়। আর আমেরিকার চোররা তো রীতিমতো ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট।

ঠিক কথা। খুব সংকোচের সঙ্গে একটা কথা বলব?

বলুন না। আমি কথা-টথা কইতে ভালোই বাসি।

কথা শুনলে জ্ঞানও বাড়ে।

বলছিলাম কী, আমাদের বাড়িতে ক্যাশ টাকা বেশি থাকে না। গয়নাগাটিও সব লকারে।

এই তো মাটি করলেন। গয়নাগাটি লকারে রাখতে গেলেন কেন? আজকাল তো ব্যাঙ্কের লকার থেকে দেদার জিনিস হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এটা কাঁচা কাজ হয়েছে মশাই।

লকারের জিনিসে ব্যাঙ্ক কোনো গ্যারান্টিও দেয় না। গেলেই গেল।

আপনি হয়তো ঠিক বলছেন। কিন্তু আমার মা-বাবার ব্যাঙ্কের ওপর অগাধ বিশ্বাস। তবে আপনাকে শুধু-হাতে ফিরে যেতে হবে না।

ক্যাশ টাকা কোথায় পাওয়া যাবে আমি বলছি। রান্নাঘরে মিটসেফের মধ্যে একটা পুরোনো গ্ল্যাকসোর কৌটো আছে। বড়োকৌটো। তাতে মুসুরির ডাল রাখা হয়। ওই ডালের মধ্যে হাত চালালেই কিছু টাকা পাওয়া যাবে।

কত হবে? বিশ-ত্রিশ নাকি?

কিছু বেশিও হতে পারে। ধরুন শতখানেক।

দুর। ওসব পেটি ক্যাশ ছুঁই না আমি।

আপনার কাছে কি টর্চ আছে?

আছে। তবে চোরেদের আলো জ্বালানো বারণ। টর্চের কথা কেন?

বলছিলাম কী, টর্চ থাকলে আপনার একটু সুবিধে হবে। দক্ষিণদিকে যে শোয়ার ঘরটা আছে সেখানে গোদরেজের আলমারির নীচের তাকে চারটে অ্যালবাম পাবেন। সবুজ মলাটঅলা অ্যালবামের ভেতরে খুঁজলেই অন্তত হাজারখানেক টাকা পেয়ে যাবেন।

আহা, শুধু ক্যাশ টাকাই তো আমার টার্গেট নয়। দামি জিনিস কিছু নেই? এরকম একটা ঘ্যামা বাড়িতে তো দামি দামি জিনিস থাকার কথা।

হ্যাঁ আছে। গোদরেজ আলমারির পাশেই আরও একটা আলমারি পাবেন। তারমধ্যে একটা ক্যামেরা, একটা হ্যাণ্ডিক্যাম আর পোর্টেবল ভি সি ডি, অডিও ভিডিয়ো প্লেয়ার পেয়ে যাবেন।

ওসব জিনিসের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেট খুব খারাপ। কারণ হচ্ছে, ওগুলো সারা পৃথিবীতে এত একসেস প্রোডাকশন হয়েছে যে, দামও কমে যাচ্ছে হু হু করে।

আপনি সত্যিই খবর রাখেন।

সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেটের খবর না রাখলে কী আমাদের চলে?

আচ্ছা এখন ওখানে ক-টা বাজছে বলুন তো?

দুটো পাঁচ। আপনি তো সাড়ে এগারো ঘণ্টা পিছনে আছেন। ওখানে বোধ হয় এখন দুপুর তিনটে পঁয়ত্রিশ শনিবার।

মাই গড। আপনি শিকাগোর সময় জানলেন কী করে?

জানা শক্ত নাকি?

না, শক্ত নয়, তবে—। যাকগে, আপনার টার্গেটটা কী, আমাকে একটু বলবেন?

না মশাই, কোনো টার্গেট ঠিক করে তো আর চুরি করতে ঢোকা যায় না। আর যা জোটে তাই নিয়ে পিটটান দেওয়ার মতো ছিঁচকে চোরও আমি নই। মেহনত করে ঢুকেছি, চারদিকে দেখে-টেখে যা পছন্দ হবে নিয়ে যাব।

অ্যান্টিক কিছু আছে?

অ্যান্টিক! না, আমাদের বাড়িতে 'অ্যান্টিক' কিছু আছে বলে তো জানি না। তবে ছিল। শুনেছি, আমাদের ঢাকার বাড়িতে ব্রিটিশ আমলের পুতুল, ঘড়ি, খেলনা, অয়েল পেন্টিং, এনগ্রেভিং, ফরাসি দেশের রুপোর চামচের সেট এইসব ছিল।

আপনাদের দেশ কি ঢাকা?

হ্যাঁ। আমাদেরও ঢাকা। তবে শহরে নয়। গাঁয়ে।

বিক্রমপুর।

বা:, শুনে খুশি হলাম।

খুশি হওয়ার কিছু নেই মশাই, ঢাকাতেও শুনেছি, আমাদের তেমন সুখের সংসার ছিল না। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনারা বেশ বনেদি বড়োলোক।

না, না, বড়োলোক নই। তবে ঢাকা শহরে আমাদের বেশ বড়ো ব্যাবসা ছিল। মিষ্টির দোকান আর মনোহারি স্টোর। দেশত্যাগ হওয়ার পর ব্যাবসা লাটে উঠল।

ঢাকায় গেছেন কখনো?

না। দেশত্যাগের সময় তো আমার বাবারই জন্ম হয়নি।

আপনার বাবার বয়েস কত?

সাতান্ন। এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?

মিলিয়ে দেখলাম। বেঁচে থাকলে আমার বাবার বয়স হত পঞ্চান্ন।

বেঁচে নেই বুঝি?

না, ইস্কুল মাস্টার ছিলেন।

তাই? তাহলে আপনি এই লাইনে এলেন কেন?

কেন, এই লাইন কি খারাপ?

না, মানে চুরি-টুরি কি আর ভালো জিনিস?

হাসালেন মশাই, যে-দেশের মন্ত্রী চোর, পুলিশ চোর, আমলা চোর, আপামর জনসাধারণের তিনজনের দুজন চোর সেই দেশে চুরি ভালো জিনিস না-হবে কেন? আমার বাবা মাস্টারি করতেন, চুরির সুযোগ ছিল না আর তেমনি কষ্ট পেয়ে অভাবের তাড়নায় ধুঁকতে ধুঁকতে অকালে চলে গেলেন।

আপনি কি বলতে চান যে, আপনার অবস্থা আপনার বাবার চেয়ে ভালো?

খারাপ কী বলুন! আমার মোটরবাইক আছে, মোবাইল ফোন আছে, ঘরে কালার টিভি, ফ্রিজ আছে। এমনকী রান্নাবান্না করে দেওয়ার জন্য একজন মাইনে করা লোকও আছে। আর হ্যাঁ, আমি সেলিমপুরে যে ফ্ল্যাটে থাকি সেটা আমার ওনারশিপ ফ্ল্যাট।

বলেন কী? তাহলে তো আপনি রীতিমতো এস্টাব্লিশড!

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। তবে 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম।'

আমার কম্বিনেশনে সংস্কৃত ছিল না। ওটার মানে কী?

আমার বাবা সংস্কৃতে মস্ত পন্ডিত ছিলেন, আমাকে সংস্কৃত শিখতে হয়েছিল। আর যেটা বললাম, সেটার মানে আপনার না জানলেও চলবে।

আচ্ছা, আপনার কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, আপনি লেখাপড়া জানেন।

ওটা বলে লজ্জা দেবেন না। যা জানি তাকে লেখাপড়া জানা বলে না। আমাকে শিক্ষিত ভাবলে ভুল করবেন।

আপনি আমাকে খুব ডাইলেমায় ফেলে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আপনি আমাদের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছেন। এ-যুগটা তো বোলচালেরই যুগ। যে যত বুকনি আওড়াতে পারে সেই তত খাতির পায়।

আমার কথা শুনে ইমপ্রেসড হবেন না যেন। ভুল করবেন, আমি সত্যিই চোর।

সেটাই তো ধাঁধায় ফেলেছে আমাকে। চোর হলেও আপনার বেশ স্ট্যাটাস আছে মনে হচ্ছে। আমাদের বাড়িতে কি আর তেমন কিছু পাবেন?

ঠিকই ধরেছেন। চোর হলেও আমি একটু উন্নাসিক।

হ্যাঁ, তাই ভাবছি আপনার মতো একজন হাইফাই বার্গলারের সম্মান রক্ষার মতো কিছুই তো আমাদের নেই।

আছে মশাই, আছে। একেবারে বিনা খবরে কি আমি সময় নষ্ট করতে এসেছি?

কী আছে বলুন তো?

উনিশ-শো আঠারো বা উনিশের একটা রোলেক্স ঘড়ি। বেশ বড়ো সাইজের। পুরোনো আমলের দম দেওয়া ঘড়ি। ঠিক কি না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে। ওটা আমার দাদুর বাবার ঘড়ি বলে শুনেছি। ওটা বাবা খুব যত্ন করে রোজ দম দেন। আশ্চর্যের বিষয়, ঘড়িটা আজও চলে। কে আপনাকে ঘড়িটার কথা বলল বলুন তো?

আমার একটা নেটওয়ার্ক আছে।

বাব্বা:, আপনি তো বেশ অর্গানাইজড ম্যান।

না হলে, এযুগে ব্যাবসা চলবে কেন বলুন? আপনার বাবা এই ঘড়িটা সম্পর্কে সব ইনফর্মেশন ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানিয়েও দিয়েছেন। আমি ইন্টারনেটেই সার্চ করে করে খবরটা পাই।

তার মানে আপনি ইন্টারনেটেই আমাদের ঠিকানা পেয়েছেন? তবে যে বললেন আপনি বাড়ির মালিকের নাম জানেন না, বাড়ির নম্বর জানেন না।

সাবধানের মার নেই মশাই, তাই একটু ন্যাকামি করতে হয়েছিল।

ঘড়িটা হলেই কি আপনার চলবে?

আপাতত ঘড়িটাই আমার টার্গেট। ওটার বাজারদর যাচাই করে দেখেছি পাঁচ থেকে সাত লাখ অবধি পাওয়া যেতে পারে।

বলেন কী? এই ঘড়িটার এত দাম কে দেবে?

কালেকটাররা দেবে, কোম্পানি নিজেও দেবে। ইন্টারনেটে রেগুলার ওদের বিজ্ঞাপন থাকে।

কালেকটারদের এজেন্টরা কলকাতাতেও আসে।

তবু আপনি নিজেকে শিক্ষিত বলতে চান না?

কেন বলুন তো! আপনি তো রীতিমতো শিক্ষিত মানুষ। ইন্টারনেট সার্ফ করেন মানে আপনি দুনিয়ার সব খবরই রাখেন।

না মশাই, বেশি খবর রেখে লাভ কী? আমার যেটুকু দরকার সেই খবরটুকু রাখি।

তার মানে আপনার কম্পিউটারও আছে।

আছে। চাঁদনি মার্কেট থেকে অ্যাসেম্বল করিয়ে কিনে এনেছি।

ল্যাপটপও আছে নাকি?

না। তবে আপনার বাবার ঘড়িটা গ্যাঁড়াতে পারলে ল্যাপটপও হয়ে যাবে।

ঠিক আছে। বাবা দোতলার দক্ষিণের ঘরে থাকেন। পাশের ঘরে মা আর বোন। বাবার ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে। তার ডানধারে টপ ড্রয়ারে ঘড়িটা পেয়ে যাবেন।

বা:, ইউ আর ভেরি কো-অপারেটিভ।

কিন্তু মুশকিল হল, দোতলায় সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া আছে। আপনি তো আমেরিকায় থাকেন। জানেন কি সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ মাগারদের একটা গাড়ির লাগেজ বুট খুলতে ক-সেকেণ্ড সময় লাগে? তিন থেকে পাঁচ সেকেণ্ড।

ভগবান! আপনি কি আমেরিকাতেও হানা দিয়েছিলেন নাকি?

এ-প্রশ্নের জবাব আপনার না জানলেও চলবে। আমি কর্ডলেস ফোনটা নিয়েই ওপরে উঠছি। আপনি আমাকে গাইড করতে থাকুন।

আর একটা কথা। আমার বাবার ঘুম খুব সজাগ। সামান্য শব্দ হলেই জেগে যাবেন। যদি জেগে যান তাহলে কী করতে হবে, তা তো আপনাকে বলেই রেখেছি।

হ্যাঁ, মনে আছে। তাঁকে ফোনটা ধরিয়ে দেব এবং আপনি তাঁকে রি-অ্যাক্ট করতে বারণ করবেন।

এগজ্যাক্টলি। আর দয়া করে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করবেন না। আমার বাবার পেসমেকার আছে। কেমিক্যাল ওষুধে রি-অ্যাকশন হতে পারে।

আপনি আপনার বাবাকে খুব ভালোবাসেন, না?

খুব।

ভালো। এই ভালোবাসাটা বজায় রাখবেন। 'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা।'

আমি এই শ্লোকটার অর্থ জানি।

তা তো জানেন। কিন্তু বিয়ের পর অর্থটা যেন ভুলে যাবেন না। 'পিতায় শ্রদ্ধা, মায়ে টান, সেই ছেলেই হয় সাম্যপ্রাণ।' এটা কার কথা বলুন তো?

একজন মহাপুরুষের। তিনি মানুষের ভালো চেয়েছিলেন।

আপনি কি দোতলা পৌঁছে গেছেন?

না। উঠছি। সিঁড়িটা খুবই অন্ধকার।

সাবধানে উঠবেন।

আচ্ছা, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে নাকি?

হ্যাঁ। সত্যিই নেই তো?

না, সত্যিই নেই, কিন্তু আপনার বাবার আবার পিস্তল বা রিভলভার আছে নাকি?

আছে।

এই রে! তাহলে তো বিপদের কথা।

না না। উনি খুব সাবধানি মানুষ। পিস্তল থাকলেও সেটা আলমারিতে তোলা থাকে। লোড করা থাকে না।

তাহলে পিস্তল রাখার মানে কী?

আমার মা পিস্তল-টিস্তল একদম পছন্দ করেন না। আগে বাবা পিস্তলটা বালিশের তলায় রেখে শুতেন। মা রাগারাগি করে ওটাকে বিছানা থেকে বিদেয় করেছেন।

খুব ভালো কাজ করেছেন। আপনাদের বাড়িতে কুকুরও নেই দেখছি।

ছিল। একটা রাগি ডোবারম্যান। সেটা আমার খুব প্রিয় কুকুর। সেটা বুড়ো হয়ে মারা যাওয়ায়, আমি কী কান্নাটাই না কেঁদেছিলাম! এখন কুকুর পোষার প্রশ্নই ওঠে না। পেডিগ্রি কুকুর রাখার অনেক ঝামেলা। আমার মা-বাবা এখন আর অত পরিশ্রমের মধ্যে যেতে চান না।

ভালোই করেছেন। কুকুর থাকলে আমাকে অন্যরকম লাইন অফ অ্যাকশনের কথা ভাবতে হত।

না, না, ওসব ভাবতে হবে না আপনাকে। আই উইশ ইউ অল সাকসেস। উঠে পড়েছেন নাকি?
হ্যাঁ। ফোনটা একটু ধরে থাকুন। তালাটা খুলে নিই।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ধরছি, আপনি খুলুন। .....হয়ে গেছে নাকি?
ইজি। তালা-ফালা কোনো ব্যাপার-ই নয়। কিন্তু অন্য একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে।
কী বলুন তো?
বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে। কেউ বোধ হয় বাথরুমে গেছে।
সর্বনাশ!
ভয় পাবেন না। আমার অসীম ধৈর্য, এখন কিছুক্ষণ অ্যাকশন বন্ধ করতে হচ্ছে। বুড়ো মানুষরা ঘুম ভাঙলে ফের সহজে ঘুমোতে পারেন না। আমি বরং এই ফাঁকে আপনাদের ছাদ থেকে একটু ঘুরে আসি।
বেশ তো। উঠে পড়ুন। তবে আমার বাবা রোজ-ই ‘ট্র্যাংকুলাইজার’ খেয়ে ঘুমোন। তাই বোধহয় ঘুমোতে অসুবিধে হবে না।
এটা তো উনি খুবই খারাপ করেন। ওসব খেয়ে শেষে অভ্যেস হয়ে গেলে স্বাভাবিক নিয়মে আর ঘুমোতেই পারবেন না। না খেলে উইথড্রয়াল সিম্পটম দেখা দেবে।
তাহলে কী করা উচিত?
‘পরিশ্রম’। পরিশ্রমই হচ্ছে ঘুমের সবচেয়ে ভালো ওষুধ।
হার্ট প্রবলেম আছে বলে, উনি পরিশ্রম করতে পারেন না।
আজকাল সফিসটিকেটেড পেসমেকার লাগালে কোনো প্রবেলেম হওয়ার কথাই নয়।
পেসমেকার নিয়ে টেনিস খেলা, সুইমিং, জিম সব কিছুই করা যায়।
পেসমেকার সম্বন্ধে এত জানলেন কী করে?
জানা শক্ত কী? আপনার বাবাকে বলবেন, সাতান্ন বছর বয়সে আজকাল কেউ বুড়ো নয়, আর ‘পেসমেকার’ মানেই জবুথবু হয়ে থাকা নয়।
বলব, নিশ্চয়ই বলব।
আপনাদের ছাদটা তো ভারি সুন্দর! টাইলস বসিয়েছেন নাকি?
হ্যাঁ।
আপনারা বেশ শৌখিন। তাই না?
তা বলতে পারেন। বাবা একটু বাবুগোছের মানুষ।
বুঝেছি।....আপনি বোধহয় কোনো মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিলেন একটু, তাই-না?
সরি, আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা ব্যাপার জিজ্ঞেস করছিল।
আপনি তাহলে এখন অফিসে?
হ্যাঁ। পিক আওয়ার। এক হাতে ফোন অন্য হাতে মাউস।
তাহলে তো মশাই, আপনার কাজের ডিসটার্ব হচ্ছে!
আরে না না, কাজে ডিসটার্ব হবে কেন? কাজ তো একটা সিস্টেমে চলে, তারজন্য অখন্ড মনোযোগের দরকার হয় না।
আচ্ছা মেয়েটা আপনাকে কি ‘হ্যালো সুইট হার্ট’ বলে ডাকল? ও তো পুরুষরা মেয়েদের বলে!
না মশাই, আজকাল সব উলটেপালটে গেছে। যে কেউ, যে কাউকে ডাকে।
মেয়েটা সত্যিই আপনার গার্লফ্রেণ্ড নয় তো?
পাগল নাকি? মেয়েটা ব্ল্যাক, মোটা আর বোকা।
আমেরিকায় প্রেম-ট্রেম হয়নি আপনার?

খেপেছেন? মেমসাহেবদের খপ্পরে পড়লে উপায় আছে? দু-দিন পর যখন ছেড়ে যাবে তখন, অ্যালিমনি দিতে দিতে ফতুর হতে হবে।

আজকাল বাঙালি ছেলেরা সেয়ানা হয়েছে। লক্ষ্মীছেলের মতো একদিন দেশে এসে টোপর পরে বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে যাবেন, তাই-না?

উপায় কী বলুন? নইলে আলুপোস্ত, বেগুনপোড়া, ইলিশ ভাপে, ধোঁকার ডালনা ভুলতে হবে যে! বউয়ের সঙ্গে বসে রবীন্দ্রসংগীত, কী ভীষ্মদেব বা শচীনকর্তার গান শোনা বা সত্যজিৎ-তপন সিংহের ছবি দেখাও বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার গার্লফ্রেণ্ড নেই?

না। তবে একজনকে টার্গেট করে কিছুদূর এগিয়েছিলাম, হল না।

কেন মশাই? সে কি ডিচ করল নাকি?

ডিচ তো অ্যাকসেপ্ট করার পর করে। সে আমাকে অ্যাকসেপ্টই করল না কখনো।

স্যাড ব্যাপার বোধহয়?

হ্যাঁ, আমার পক্ষে তো স্যাড বটেই।

বলতে আপত্তি আছে?

আরে না। আমার লুকোছাপার কিছু নেই।

দাঁড়ান, বাথরুমের আলো এখনও জ্বলছে কি না দেখে নিই।

জ্বলছে?

হ্যাঁ। বোধহয় বড়ো-বাইরে গেলেন। মুশকিল হল।

আপনার তাড়াহুড়ো নেই তো?

না। তবে কাজটা মিটে গেলে স্বস্তি পাওয়া যেত।

বাবা একটু পেটরোগা আছেন। তবে বাথরুমে বেশি সময় নেন না। ততক্ষণে আপনি গার্লফ্রেণ্ডের কথাটা বলে নিন-না। ততক্ষণে বাবার হয়ে যাবে।

কী আর শুনবেন! দুনিয়ার সব প্রেমের গল্পই একরকম।

না, না, তা কেন, প্রেম তো নানারকম আছে। ঝগড়া থেকে প্রেম, আক্রোশ থেকে প্রেম, মুগ্ধতা থেকে প্রেম, অনেক কম্বিনেশন আছে মশাই।

আমাদের ঠিক প্রেম হয়নি। ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক। আপনাকে বলে রাখা দরকার, পুরুষ হিসেবে আমি মোটেই অ্যাট্রাকটিভ নই।

কী করে বুঝলেন?

আমার চেহারাটা একটু রুক্ষ টাইপের। রাগেড বলতে পারেন। মুখশ্রী মোটামুটি কুচ্ছিত। তবে আমার হাইটটা বেশ ভালো। ছয় ফুট এক ইঞ্চি।

বা: দারুণ হাইট তো!

হ্যাঁ, ওটাই আমার একমাত্র প্লাস পয়েন্ট, এ তো গেল চেহারা। গুণের কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলতে হবে, আমি মোটামুটি খারাপ ছাত্র, কোনো বাড়তি গুণ, যেমন গানের গলা, ছবি আঁকার হাত, একস্ট্রা স্মার্টনেস এসব আমার নেই। মেয়েরা আমাকে অপছন্দ করে বলেই আমি যৌবনের একেবারে শুরু থেকে টের পেয়ে আসছি।

এগুলো কোনো বাধা নয়।

না, বাধা নয়। তবে চেহারা বা ব্যক্তিত্বে রিপালসিভ কিছু থাকলে অনেক সময়ে নিজে টের পাওয়া যায় না। আমাদের এক বন্ধু ছিল অশোক, তার চোহারা খারাপ ছিল না, মানুষও খারাপ নয়। পয়সাকড়িরও অভাব ছিল না, কিন্তু আমরা প্রায় সবাই ইউনিভার্সালি তাকে অপছন্দ করতাম। এই অপছন্দের কোনো লজিক্যাল ব্যাখ্যা কখনো খুঁজে পাইনি।

আচ্ছা, আপনি আত্মগ্লানি বন্ধ করে ঘটনাটা বলুন।

ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জানিয়ে রাখলাম তাতে আপনার বুঝতে সুবিধে হবে। কয়েক বছর আগে আমি দিল্লি থেকে 'পূর্বা' এক্সপ্রেসে ফিরছিলাম। সেকেণ্ড ক্লাস থ্রি-টায়ারে। এই মেয়েটিও তার মা-বাবা আর মামা-মামির সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরছিল। মিষ্টি চেহারা, ছোটোখাটো এবং রোগা। বেশ লাজুক ধরনের সভ্য মেয়ে।

ঠিক যে-ধরনের মেয়ে আমরা সবাই পছন্দ করি?

হ্যাঁ, অনেকটা তাই। সুন্দরী আর মিষ্টির মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। এবং এই পার্থক্যটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। সব সুন্দরীই কিন্তু মিষ্টি নন।

বটেই তো। আপনার চোখ আছে। আলাপ হল বুঝি?

না। প্রথমেই নয়। বললাম-না, সে বেশ লাজুক ধরনের! তবে বাবা, মামা এবং মামি, এরা বেশ আলাপী মানুষ। কিউবিকলে মোট ছটা বার্থের মধ্যে পাঁচটাই ওঁদের। আমি একটা আপার বার্থে। ক্লোজ প্রকসিমিটিতে কিছুক্ষণ থাকলে আলাপ হয়েই যায়। আমি গোমুখ, গঙ্গোত্রী হয়ে একটা অতিদুর্গম পথে কেদারবদরী পর্যন্ত ট্রেক করে ফিরছি শুনে মামাটি খুব ইমপ্রেসড। উনিও পাহাড় ভালোবাসেন। কাজেই আলাপ জমে গিয়েছিল। যতদূর মনে আছে, পাহাড়-পর্বতের কথাই হচ্ছিল। আশ্চর্যের বিষয় মেয়েটি আমাকে অ্যাভয়েড করার জন্যই বোধহয় প্রায় লাগাতার বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিল। সুন্দর হোক, কুচ্ছিত হোক, একটা পুরুষ তো! মেয়েরা এক-আধবার তাকাবে না?

সেটাই তো স্বাভাবিক।

সেই স্বাভাবিক ব্যাপারটাই ঘটছিল না। মেয়ের মাও দেখলাম বেশ গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁদের কিউবিকলে আমার উপস্থিতিটা, তিনি বিশেষ পছন্দ আর করছিলেন বলে মনে হল না। তবে যাইহোক, ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে তো আর বাছাবাছি চলে না। মানুষ আপনাকে অপছন্দ করলে বেশ বোঝা যায়, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

মেয়েটির মামি তাঁদের স্কট থেকে আমাকে লুচি অফার করায় মেয়েটির মা এমনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন যে, আমি লুচি রিফিউজ করতে বাধ্য হই। হাসছেন? এখন অবশ্য ব্যাপারটা আমারও হাস্যকরই লাগে। তবে তখন ভারি খারাপ লেগেছিল। লুচি আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস, আমার বেশ ইচ্ছেও হচ্ছিল মশাই, কিন্তু....

যা বলেছেন। কতকাল যে লুচি খাইনি। টোস্ট আর দুধ সিরিয়াল খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেল। বিদেশে থাকার ওইটেই তো অসুবিধে।

হ্যাঁ, লুচির কথা কী যেন, বলছিলেন?

হ্যাঁ, লুচির কথাটাই বলি। পাহাড়ে ট্রেক করতে গিয়ে খাবার-দাবার বেশি জোটেনি। পয়সাও ফুরিয়ে এসেছিল। প্রায় পঁচিশ দিনের ট্যুরে ভরপেট খাবার কদিন জুটেছে তা হাতে গুনে বলা যায়। কাজেই লুচি দেখে লোভ হওয়ারই কথা।

তা তো বটেই। লুচি শুনে আমার তো এতদূরে বসেও কেমন যেন খিদে-খিদে পাচ্ছে। এবার মেয়েটির কথায় আসুন।

হ্যাঁ। মেয়েটির নাম ইতু, বয়স বেশ কম, সতেরো-আঠারোর বেশি নয়। আমার তখন সাতাশ-আটাশ।

গুড কম্বিনেশন।

কম্বিনেশন আর হল কই, আমার ইন-বিল্ট রিপালসিভনেসটা মেয়েটাকে সিঁটিয়ে রেখেছিল।

এভাবেই হয়তো বাকি পথটা কেটে যেত। কিন্তু মাঝপথে একটা ঘটনা ঘটেছিল।

ঘটনা! সুইট সামথিং?

সুইট হওয়ারই তো কথা মশাই, কিন্তু যার কপাল খারাপ তার সকলই গরল ভেল।

আগে শুনিই না।

ব্যাপারটি হয়েছিল, ওদের পাঁচজনের টিকিটটা ছিল ইতুর কাছে। একটু আগে যখন পাটনায় টিকিট দেখতে এসেছিল তখন মেয়েটাই টিকিট বের করে দেখায়। এটুকু আমি দেখেছিলাম। তারপর মেয়েটা নাকি আনমনে টিকিটটা হাতে পাকিয়ে বেখেয়ালে একটা খালি খাবারের বাক্সের গার্ডারে গুঁজে রেখে দেয়। সেটা মনে ছিল না, তারপর হঠাৎ বাক্সটা নেড়ে সেটা খালি টের পেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। তখন ভাগ্যিস সকালবেলা আর ট্রেনটা সবে পাটনা স্টেশন ছেড়ে ধীরে চলছে। মেয়েটা হঠাৎ চমকে উঠে বলল, এ মা:, আমি টিকিটটা ফেলে দিলাম যে! শুনে সবাই তো চেঁচামেচি শুরু করে দিল। হঠাৎ বিপদ ঘটলে অনেক সময়েই বুদ্ধি স্থির থাকে না। আমি তাড়াতাড়ি উঠে চেন টেনে বললাম, ব্যস্ত হবেন না, আমি দেখছি। বলে ট্রেন ভালো করে থামবার আগেই আমি নেমে পেছন দিকে ছুটতে লাগলাম। সবে পাহাড়-পর্বতে চড়ে এসেছি, বডি খুব ফিট ছিল। কাজেই বেশ খানিকটা এবড়ো-খেবড়ো জমি পেরিয়ে গিয়ে সাদা রঙের বাক্সটা পেয়ে গেলাম। গার্ডার থেকে টিকিটটা খুলে নিয়ে ফের দৌড়ে এসে কামরায় উঠে পড়লাম। গার্ড আর অ্যাটেনড্যান্ট এসে ব্যাপার জেনে একটু সতর্ক করে দিয়ে চলে গেল।

তখন তো আপনি হিরো!

অতটা না হলেও বরফ একটু গলল। ধন্যবাদ টন্যবাদ হল, 'বাবা, তুমি বাঁচালে', গোছের সাধুবাদও পাওয়া গেল, এমনকী এতক্ষণ আমাকে দর্শনযোগ্য মনে না হলেও ইতুও ভারি কৃতজ্ঞতার চোখে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার মতো কিছু একটা বলেছিল। আর ইতুর মা খুব উদ্যমের সঙ্গে প্রচুর লুচি খাওয়ালেন। সঙ্গে তরকারি, আচার, মিষ্টি।

যাক, মশাই, লুচিটা শেষ অবধি জুটেছিল?

হ্যাঁ। আমি রিফিউজ করার চেষ্টা করেছিলুম, তবে উনি ছাড়লেন না।

তারপর?

অবশেষে পাঁচজনের সঙ্গেই আমার বেশ সহজ সম্পর্ক হয়ে গেল। এমনকী ওঁরা ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যও আন্তরিকভাবে নেমন্তন্ন করলেন।

গেলেন নাকি?

কী করব বলুন, মেয়েটাকে এতই ভালো লেগে গিয়েছিল যে, মুখখানা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। সাধারণত ট্রেনের আলাপ ট্রেনেই শেষ হয়, কিন্তু আমার ভেতরে কী-যে একটা গন্ডগোল করে দিল মেয়েটা! তবে হ্যাংলার মতো পরদিনই ছুটে যাইনি। কয়েকদিন পর এক বিকেলে ঠিকানা খুঁজে গিয়ে হাজির হলাম। তাঁরা বেশ খাতিরও করলেন। এমনকী ইতুও এসে সামনে বসল। চা-টা খেয়ে চলে এলাম। প্রথমদিন খুব বেশিক্ষণ বসলে খারাপও তো দেখায়। কিছুদিন পর আবার গেলাম। ইতুদের বাড়ি আর ওর মামার বাড়ি হরিশ মুখার্জি রোডের একটা মাল্টিস্টোরিডের পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটে। দুই পরিবারে খুব ভাব। মামার ছেলেপুলে নেই। আর ইতু তার মা-বাবার একটিই সন্তান। খুবই আদরের পাত্রী।

তখন আপনি কী করতেন?

না, তখনও আমি চোর হইনি। চাকরি-বাকরির চেষ্টা না করে, আমি একটা ব্যাবসা করার চেষ্টা করছিলাম। তার আগে টু-হুইলার সারানোর একটা দোকান দিয়েছিলাম পার্টনারশিপে। আমার লেবার, পার্টনারের ক্যাপিটাল। কিন্তু পার্টনার পার্টনারশিপ ভেঙে দিল। এরপর গুঁড়ো মশলা।

গুঁড়ো মশলা? অফ অল থিংস গুঁড়ো মশলা? কেন মশাই, টু-হুইলার ছেড়ে গুঁড়ো মশলা কেন?

আমাদের কি কোনো চয়েস আছে মশাই? এক চাক্কিওয়ালার সঙ্গে একটু ভাব ছিল। সেই আমাকে পরামর্শ দিল, সস্তার হোটেলগুলোতে প্রচুর গুঁড়ো মশলার চাহিদা। সে আমাকে সাপ্লাইয়ের লাইন ধরিয়ে দেবে। সস্তায় মশলা কিনে এনে যদি, তার চাক্কিতে পেষাই করে নিই তাহলে সে আমার ব্যাবসায়ে টাকা খাটাতেও রাজি।

ব্যাবসাটা কি চলেছিল?

হ্যাঁ। আর আশ্চর্যের বিষয় চাক্কিওয়ালা বিহারী লোকটা আমাকে সত্যিই সাহায্য করেছিল। বছর দুয়েকের মধ্যে আমার অবস্থা বেশ ভদ্রস্থ হয়ে উঠল। যে সময়ে ইতুর সঙ্গে আলাপ সেই সময়ে আমার মান্থলি ইনকাম প্রায় হাজার পনেরো টাকা নিট। ব্যাবসা ভালো চলছে, এমনকী আমি কয়েকজন এজেন্টকেও কমিশন বেসিসে কাজ দিয়েছি। আমার সংসারের হালও ফিরেছে।

আপনার ফ্যামিলি কি বড়ো?

না। সেইটেই বাঁচোয়া। বাবা মারা গেছে, ছোটোবোন আর মাকে নিয়ে আমার ফ্যামিলি ছোটোই, তবে বোনের বিয়েতে কিছু ধারকর্জ হয়ে গিয়েছিল। লাভ ম্যারেজ বলে বাঁচোয়া। নেগোশিয়েট করে বিয়ে দিতে গেলে আরও ধসে যেতাম।

এবার ইতুর কথায় ফিরুন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। দাঁড়ান, বাথরুমের আলোটা দেখে নিই।

নিভে গেছে?

হ্যাঁ। এবার ওঁকে ঘুমোনোর সময়টুকু ছাড় দিতে হবে। তবে খুব বেশি দেরি করা চলবে না, রাত প্রায় তিনটে বাজে।

অন্তত মিনিট দশেক ছাড় দিন। অবশ্য সেফগার্ড হিসেবে আমি তো আছিই। তবু হঠাৎ মাঝরাতে একটা চেঁচামেচি হওয়াটা ভালো নয়। আমাদের পাড়ায় আবার নাইট গার্ড ঘোরে।

জানি। ওসব না জেনে কি আর কাজে নামতে হয়?

এবার বলুন।

ইতুর মামি একদিন তাঁদের ফ্ল্যাটে আমাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমি ইতুর প্রতি ইন্টারেস্টেড কি না। আমি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করলাম যে, ইতুকে আমার ভীষণ পছন্দ। উনি তখন আমার বাড়িঘর, রোজগার এসবের খোঁজ-খবর নিলেন। আমি সব বলে দিলাম। উনি বিরসমুখে বললেন, দ্যাখো বাপু, ইতু বাপের এক মেয়ে। মামারও বড্ড আদরের ভাগনি। তোমার যা অবস্থা তাতে স্বাভাবিক নিয়মে ইতুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমাদের মধ্যে যদি ভাব-ভালোবাসা হয়ে থাকে, তবে গার্জিয়ানরা কেউ আপত্তি করবে না। বরং তোমারও একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

ইতুর মনোভাব কী বুঝলেন?

সেইটেই তো গল্প। আমি একদিন ওদের বাড়ির বাইরে ইস্কুলের পথে ওর সঙ্গে দেখা করলাম। যেমনটা নিয়ম আর কী। ইতু আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়াল না। এমনকী রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসতেও রাজি হল। যেন এসব তার কাছে কিছু নতুন ব্যাপার নয়।

অত তাড়াহুড়োর দরকার নেই। এ জায়গাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। একটু আস্তে ধীরে বলুন।

আপনি ভাবছেন একটা রোমান্টিক অ্যাফেয়ার? তা নয় মশাই, একেবারেই তা নয়। আমি প্রস্তাবটা উত্থাপন করতেই ইতু হঠাৎ হেসে ফেলল। তারপর একেবারে সোজা চোখে চোখ রেখে বলল, 'দেখুন, আপনি যে কেন ঘুরঘুর করেন তা আমি অনেক আগেই জানি। আরও কয়েকজন আমার সম্পর্কে আপনার মতোই দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমি ইন্টারেস্টেড নই। আমার জীবনে কিছু অ্যাম্বিশন আছে। মাত্র সাড়ে সতেরো বছর বয়সে আমি আমার অ্যাম্বিশন বিসর্জন দিতে পারব না। আপনি প্লিজ, এসব নিয়ে আর ভাববেন না। মেয়েদের নিয়ে চিন্তা করা ছাড়া কি বাঙালি ছেলেদের আর কোনো কাজ নেই?'

ইশ, বড্ড কড়া মেয়ে তো! আপনি কী করলেন?

মনের দুঃখে ব্যাবসা বন্ধ রেখে ফের হিমালয়ে চলে গেলাম।

হিমালয়ে?

হ্যাঁ। দেখলাম কিছু বিপজ্জনক মেহনত না করলে দুর্বল মনকে জব্দ করা যাবে না। প্রায় দেড় মাস ধরে আমি বিপজ্জনক সব পাহাড়ে ট্রেকিং করে বেড়ালাম। আর তখনই সিদ্ধান্ত নিই যে, মূল্যবোধ-টোধ সব

বিসর্জন দিয়ে একটা ভয়ংকর কিছু করতে হবে। বিগ মানি, বিগ সাকসেস, বিগ ব্যাং। নারী-চিন্তাকে আর প্রশ্রয় দেব না। ফিরে এসে কয়েকদিন গুম হয়ে বসে নিজের মনের ট্রানজিটারি স্টেটটাকে মোটিভেট করলাম। তারপর কাজে নামলাম।

কী কাজ?

অ্যান্টিক। হীরাভাই নামে এক গুজরাটি অ্যান্টিক মার্চেন্ট আছে। তার সঙ্গে জুটলাম। হীরাভাই লোক চেনে। আমাকে তাড়াল না। বরং তালিম দিল কিছু। আমি তার হয়ে অ্যান্টিক জোগাড় করতে শুরু করি। এ-ব্যবসায়ে জালি বা দু-নম্বরি জিনিসের হাতবদলও খুব হয়। কলকাতার অ্যান্টিকের দোকানগুলোয়জালি জিনিসেরই কারবার। হীরাভাই আসল-নকল ভালো বোঝে। তার ক্লায়েন্ট বা কালেক্টররা বোকা বা শৌখিন কাস্টমার নয়। কাজেই আমাকে জিনিসের সন্ধানে নানা জায়গায় হানা দিতে হতে লাগল, নানা অদ্ভুত লোকের সঙ্গে ভাব করতে হল, বিপদেও পড়তে হয়েছে বেশ কয়েকবার। এক বুড়ো পারসি তো তার একশো বছরের পুরোনো একটা চারনলা বন্দুক দিয়ে আমাকে গুলিও করেছিল।

মাই গড!

না, আমি তার জিনিস চুরি করতে যাইনি। গিয়েছিলাম দর করতে। তাই থেকে সামান্য অল্টারকেশন। বুড়োটা খ্যাপাটে গোছের। এই ব্যবসায়ে একটু-আধটু বিপদ আছেই।

ভেরি ইন্টারেস্টিং। আপনার কি এখনও অ্যান্টিকের-ই ব্যাবসা?

হ্যাঁ। আমার ব্যাবসাটা কিন্তু চোরাই জিনিসের নয়। বেশিরভাগ জিনিসই আমি কিনে নিই। তবে সবসময়ে কিনতে চাইলেই কেনা যায় না। যার জিনিস সে হয়তো অত্যন্ত বেশি দাম চায়, কিংবা কোনো দামেই বেচতে রাজি হয় না। তখন আমাকে একটু পরিশ্রম করতে হয়।

চুরি?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি তো সাধারণ চোর নন?

কে বলল আমি সাধারণ চোর নই? আমি অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত নীতিবোধহীন চোর। একজন কনফার্মড চোর। তবে আমি চুজি। কারো বাড়িতে তাদের সোনাদানা বা টাকাপয়সা চুরি করতে যাই না। আমার টার্গেট শুধু অ্যান্টিক এবং তাও প্রপার নেগোসিয়েশন ফেল করলে, দর কষাকষিতে রফা না হলে, তবেই। কিন্তু তা বলে আমাকে মহৎ চোর বলে ভাববার কোনো কারণ নেই।

ঘড়িটা নিয়ে কি আমার বাবার সঙ্গে আপনার নেগোসিয়েশন হয়েছিল?

হ্যাঁ, ফোনে। উনি সাত লাখ টাকার এক পয়সা কমে ওটা ছাড়বেন না। অথচ আমার কাস্টমার পাঁচের বেশি দিতে চাইলেন না। মুশকিল কী জানেন, 'অ্যান্টিক'-এর কোনো ধরাবাঁধা প্রাইস ট্যাগ নেই। মনে করুন, একটা গুপ্ত যুগের কয়েনের দাম আমরা মোটামুটি একলাখ টাকা ঠিক করে রাখলাম। হট হেডে কালেক্টর বা কাস্টমার হলে এবং সে যদি জিনিসটার জন্য খেপে ওঠে তাহলে দশগুণ দাম দিয়ে নিয়ে যাবে। আর যদি কুল কাস্টমার হয়, তাহলে অনেক নীচে দর দেবে। এই অ্যান্টিকের বাজারটা কিন্তু অদ্ভুত।

তাই দেখছি, কিন্তু এসব কথার মধ্যে যে ইতু হারিয়ে গেল!

না, হারায়নি, সে আমার মনের মধ্যে আজও আছে। প্রত্যেক দিন, রাতে শোয়ার সময় তার মুখ আমার মনে পড়বেই। ঠিক কথা, তার সঙ্গে আর আমার কোনো যোগাযোগ নেই, খবরও রাখি না। সম্ভবত তার বিয়েও হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না।

কিচ্ছু না?

না।

আপনি তার খবর রাখেন না কেন? এক-আধবার ফোনও তো করতে পারেন!

কেন? তাকে তো আমার রক্তমাংসের শরীরে আর দরকারও নেই। 'ওয়ান ওয়ে' প্রেমের তো ওইটেই সুবিধে। প্রত্যাশা থাকে না, প্রত্যাঘাত থাকে না, কিন্তু অন্যভাবে শি বিকামস দি ক্যাপটিভ লেডি। যখন মনের মধ্যে তার আর আমার খেলা শুরু হয়, তখন সে-আমি যেমন বলাই তেমনই বলে, যেমন তাকে দেখতে চাই, সে তেমনই সেজে আসে। সত্যিকারের ইতু হয়তো সেরকম নয়।

একটা কথা বলব?

বলুন-না। তবে আমার হাতে কিন্তু আর সময় নেই। এবার অ্যাকশন।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, বাবার ঘড়িটার জন্য আপনি কত দাম দিতে চান?

আমি চার লাখ বলেছিলাম।

আচ্ছা, যদি আমি ওঁকে ওই দরেই রাজি করাই?

আপনি! কেন বলুন তো? ওঁর কোনো ক্ষতি করব বলে ভয় পাচ্ছেন নাকি?

ভয় পাচ্ছি না, এমন কথা বলতে পারি না। চুরি করলে আপনি বিনা পয়সাতেই পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনার দরে কিনতে চান, তাহলে বাবাকে আমি রাজি করানোর ভার নিতে পারি। দি চয়েস ইজ ইয়োরস।

চুরি করতে আমি আগ্রহী নই। কিন্তু হাতে সময় কম এবং কাস্টমার ডেডলাইন দিয়ে রেখেছে বলেই কাজটা করতে হচ্ছে।

প্লিজ! ভেবে বলুন।

ঠিক আছে। কিন্তু গ্যারান্টি কী?

আপনি কাল সকাল দশটা নাগাদ বাবাকে ফোন করলেই বুঝতে পারবেন এভরিথিং হ্যাজ বিন টেকেন কেয়ার অফ।

বলছেন?

বলছি। ইটস আ প্রমিস।

ঠিক আছে, আপনার প্রস্তাব আমি মেনে নিলাম। আপনি সত্যিই আপনার বাবাকে ভীষণ ভালোবাসেন। কিপ ইট আপ, কিপ ইট আপ। তাহলে আমি পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছি। দাঁড়ান। আরও একটু কথা আছে।

কী কথা?

ইতু সম্পর্কে।

ইতু সম্পর্কে আপনাকে তো সবই বলেছি।

আপনি বলেছেন, কিন্তু আমারও যে কিছু বলার আছে!

আপনি ইতু সম্পর্কে বলবেন? কী আশ্চর্য!

কিছু কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা আজও ঘটে বলেই জীবনটা আনইন্টারেস্টিং হয়ে যায় না।

তাহলে বলুন।

ইতু হরিশ মুখার্জি রোডে থাকে, তাই তো?

হ্যাঁ।

বয়েস এখন উনি প্লাস বা কুড়ির কাছাকাছি?

হিসেবমতো তাই।

আমার ছকটা মিলে যায় যদি সে নিমচাঁদ বসুর মেয়ে হয়ে থাকে।

আপনি আমাকে খুব চমকে দিয়েছেন। হ্যাঁ, ইতু নিমচাঁদ বসুর-ই মেয়ে। চেনেন বুঝি?

চিনি। আপনি যেমন বলেছেন, ইতু হচ্ছে সেরকমই, নরম নরম শান্ত, স্নিগ্ধ চেহারা। স্বভাবে বা মুখশ্রীতে কোনো উগ্রতা নেই। চোখ দুটিও ভীষণ মায়াবী।

সর্বনাশ! আপনিও যে তার প্রেমে পড়েছেন মশাই।

তাতে কি দোষ হয়েছে?

আরে না, না। দোষের কথা হচ্ছে না। পছন্দ হলে আপনি তাকে বিয়ে করে ফেলুন-না। আমি আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। এত সহজে অধিকার ছেড়ে দেবেন?

অধিকার! হাসালেন মশাই, অধিকার কীসের যে ছেড়ে দেব? তার জীবনে আমি বরাবর একজন নন-এন্টিটি। এবং তাতে আমার আর কিছু যায় আসে না। আপনাকে তো বললাম, ইতু নয়, ইতুর 'ইমেজটা'ই আমাকে চমৎকার সঙ্গ দেয়। আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি নাউ।

অনেকক্ষণ কথা বলে, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগল মশাই। আপনি একজন লাভিং, কেয়ারিং, কনসিডারেট এবং ভদ্র মানুষ। আপনার মনটাও বেশ নরম। আমার মতো রাফ অ্যাণ্ড টাফ নন। আপনার সঙ্গে ইতুকে চমৎকার মানাবে।

জেনেটিক্স কিন্তু অন্য কথা বলে। 'জেনেটিক্স' বলে, সমধর্মীর মিলন ভালো হয় না।

সায়েন্স-এর নিয়মে কি আর জীবন চলে মশাই? এসব না ভেবে, ইতুকে বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে জমিয়ে সংসার করুন। আপনার মতো সজ্জনের সঙ্গে বিয়ে হলে ইতু সুখী হবে।

তাতে কি আপনি খুশি হবেন?

ভীষণ। ওরকম ভালো একটা মেয়ে কোনো গোলমেলে লোকের পাল্লায় পড়লে খুব কষ্ট পাব। আমি সত্যিই খুশি হব আপনি বিয়ে করলে।

কিন্তু ইতু খুশি হবে না।

কী করে জানলেন?

অভিজ্ঞতা থেকে।

কথাটার মানে বুঝলাম না।

বলছি। ইতুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। মোটামুটি কথা একরকম পাকাও হয়ে গিয়েছিল। গত জুলাই মাসে আমি কয়েকদিনের জন্য দেশে যাই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করার জন্য। পরস্পরকে গ্রহণযোগ্য মনে হলে সামনের ডিসেম্বরে বিয়ে হওয়ার কথা।

কার কাকে পছন্দ হল না বলুন তো!

বলছি। ইতুর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ামাত্রই আমার ওকে ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল।

হওয়ারই কথা।

তারপর আমরা কলকাতাতেই একটা রেস্তোরাঁয় দেখা করে নিজেদের সব সুবিধে আর অসুবিধের কথা পরস্পরকে জানাব বলে ঠিক হল। ফ্রি অ্যাণ্ড ফ্র্যাঙ্ক কথাবার্তা। গন্ডগোলটা ঘটল সেখানেই।

কী গন্ডগোল?

গন্ডগোলটার নাম অনিরুদ্ধ মিত্র। নামটা কি চেনা-চেনা লাগছে? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি? না না, অনিরুদ্ধ মিত্রকে আমি চিনি না। আপনার কি ধারণা আমি আপনার নাম পুলিশকে জানিয়ে দেব?

এটা আমার নাম তা আপনাকে কে বলল?

কেউ বলেনি, আমার অনুমান। ইতু আমার কাছে খুব করুণভাবে কনফেস করেছে যে, সে একজনকে ভালোবাসে, সে নাকি অভিমানবশে সম্পর্ক রাখছে না। হতেই পারে মশাই, হতেই পারে। ইতুর পাণিপ্রার্থী ও প্রেমিক তো আরও ছিল। অনিরুদ্ধ মিত্র তাদেরই কেউ হবে।

ইতুর বর্ণনা অনুযায়ী বেশ লম্বা, টাফ লুকিং এবং দুঃসাহসী মানুষ। পাহাড়ে চড়ে এবং পরোপকার করে বেড়ায়। বোধহয় খুব একটা বলিয়ে-কইয়ে ছেলে নয়। ইতু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বটে, কিন্তু সেটা একটা মেয়েলি অহংকার থেকে। সে প্রত্যাশা করেছিল, নিরস্ত না হয়ে অনিরুদ্ধ ফিরে আসবে। কিন্তু অনিরুদ্ধ যে অন্য ধাতুর মানুষ, সে তা বুঝতে পারেনি। ইতু কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছে না।

কে একজন অজ্ঞাতকুলশীল অনিরুদ্ধ মিত্রকে নিয়ে কি আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার আছে মশাই?

ও হ্যাঁ, ভালো কথা। এই অনিরুদ্ধ মিত্রের সঙ্গেও ইতুর আলাপ হয়েছিল দিল্লি থেকে ফেরার পথে, ‘পূর্বা’ এক্সপ্রেসে। এবং কী আশ্চর্য মিল যে, এই অনিরুদ্ধও ইতুর ফেলে-দেওয়া টিকিট কুড়িয়ে এনেছিল। চেনেন নাকি অনিরুদ্ধকে?

মেয়েটা একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের আহাম্মক।

কার কথা বলছেন? ইতু?

আপনার মতো ছেলে, কোয়ালিফায়েড, আমেরিকায় সেটেলড, তাকে ছেড়ে কোন ঢ্যাঙা রংবাজের পেছনে ঘুরছে। ছি: ছি:! আপনি ওকে বোঝাতে পারলেন না? এক কাজ করুন, এসব মেয়েদের মনের জোর কম হয়, আপনি ওকে জোর করে বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে যান তো। ভালোবাসা পেয়ে গেলে অনিরুদ্ধর ঘা শুকোতে দেরি হবে না।

জোর তো করাই যেত। ওর বাড়ির লোকরাও চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু আমার বড়ো মায়া হল। চোখ দুটো টস টস করছিল জলে।

কেলো। চোখের জল দেখেই ভুলে গেলেন? আপনি না পুরুষমানুষ।

পুরুষমানুষ তো আপনিও। ওই একরত্তি মেয়ের সামান্য কড়কানিতে ভড়কে গিয়ে তফাত হননি আপনি? জোর তো আপনিও করতে পারতেন।

না পারতাম না। গায়ের জোর ছাড়াও পুরুষমানুষের আরও কিছু জোরের দরকার হয়। যেমন লেখাপড়ার জোর, কেরিয়ারের জোর, টাকার জোর, ব্যক্তিত্বের জোর। এসব না থাকলে কীসের জোর ফলাব বলুন তো? যাই হোক, ওসব নিয়ে আর ভাববেন না। ওই অনিরুদ্ধ রংবাজের হাত থেকে যদি, ইতুকে বাঁচাতে চান তাহলে টক করে চলে আসুন। বেচারি নিশ্চয়ই এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

তাই কি? কালই তো ওর ই-মেল পেলাম।

তাতে অন্যান্য কথার পর লিখেছে, ‘আই ডোন্ট নো হাউ লং আই হ্যাভ টু ওয়েট ফর হিম। বাট আই অ্যাম লাভিং টু ওয়েট।’

মশাই, আমি একজন চোর। কনফার্মড চোর।

আমাকে আর প্রেমের প্রলাপ শুনিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। ভোর হয়ে আসছে। এবার আমাকে সরে পড়তেই হবে। শুধু বলে যাচ্ছি, ইতুর এইসব ছেলেমানুষিকে একদম প্রশ্রয় দেবেন না। ‘ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।’

এর মানে কী?

মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে তেড়েফুঁড়ে উঠুন। মেয়েটাকে দয়া করে বাঁচান।

ওকে বাঁচানোর লোক আছে। আমার কী গরজ, বলুন?

দাঁড়ান, ওই অনিরুদ্ধ রংবাজকে একটু কড়কে দিতে হবে।

হ্যাঁ, এটা ভালো প্রস্তাব। খুব ভালো করে কড়কে দিন তো ছোকরাকে। তাকে বুঝিয়ে দিন যে, সে একটি মেয়ের প্রতি চূড়ান্ত অবিচার করছে।

গাড্ডায় ফেলে দিলেন মশাই।

কথা দিলেন তো।

কীসের কথা?

অনিরুদ্ধকে রাজি করাবেন।

আচ্ছা জ্বালা তো! একটা ঘড়ি চুরি করতে এসে যে বড্ড চক্করে পড়ে গেলাম।

কথা দিন মশাই, কথা দিন।

ঠিক আছে। ঘড়িটার কথা যেন মনে থাকে।

চার লাখ। ক্যাশ ডাউন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর শুনুন। বাবাকে আমি একটা ল্যাপটপ কিনে দিয়ে এসেছি। সেটা বাবার কোনো কাজে লাগে না, পড়ে আছে। ওটাও বাবা আপনাকে ঘড়ির সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

ওটা আবার কেন?

আপনাদের বিয়ের যৌতুক। আগাম।

সুভাষিণী

আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?

না তো! আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।

একদম না?

আমার কি আপনাকে চেনার কথা?

হ্যাঁ।

তাহলে চিনতে পারছি না কেন?

মানুষ যদি কিছু ভুলে যেতে চায়, তাহলে সে নিজের মস্তিষ্ক থেকে ওই অনভিপ্রেত স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে।

তাই যদি হয়, তাহলে কি এটাও সম্ভব যে, মানুষ তার কিছু প্রিয় ভুলে-যাওয়া স্মৃতিকে ফের জাগিয়েও তুলতে পারে?

সেটা আমি জানি না। আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই।

নন?

না।

মানুষের মনের অনেক সমস্যা, সবটাই কি সাইকিয়াট্রিস্টরা জানে? 'মন' বা 'স্মৃতি' কোনোটাই মানুষের বশীভূত তো নয়। সাইকিয়াট্রিস্টেরও মানসিক সমস্যা হতে পারে।

সেসব আমার জানা নেই। আমি আপনাকে একটা কথা বলার জন্য এসেছি।

বলুন। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনাকে আমি যদি চিনতাম-ই, তবে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি কেন? আপনাকে ভুলতে চাইবার কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?

হয়তো আছে।

আমি সম্প্রতি একটা 'লস অফ মেমরি' থেকে ভুগছি। ডাক্তার বলেছে, 'ইট ওয়াজ এ মেন্টাল শক।' কী জানি, হতেও পারে। কিন্তু ভাইরাল অ্যাটাকে যেমন কম্পিউটারের মেমরি উড়ে যায়, আমারও ঠিক সেরকমই কিছু হয়েছে। আপনি যদি একটু খুলে বলেন, তাহলে আমি আমার হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা করতে পারি। ইনফ্যাক্ট, আমি এখন সারাদিন এই বারান্দায় বসে সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি রোজ।

আপনার চাকরিটা কি গেছে?

চাকরিটা এখনও যায়নি বটে, তবে যাবে। আমি লম্বা ছুটিতে আছি। অসুখের ছুটি। কোম্পানি কতদিন ছুটি বহাল রাখবে বলা মুশকিল। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, চেয়ার তো খালি রয়েছে। বসুন। এবং একটু ডিটেলসে বলুন, আমি আপনাকে কীভাবে চিনতাম?

তখন আমি ফ্রক পরি, স্কুলে যাই, তেরো বছর বয়স। আপনার বয়স হয়তো তখন বাইশ-তেইশ। তেজি, টগবগে, প্রাণবন্ত একজন যুবক। খুব যে হ্যাণ্ডসাম ছিলেন তা নয়, তবে ফিগারটা দারুণ ছিল। আমাদের শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আপনার বাবা। আপনাদের ট্রাকের ব্যাবসা ছিল। ষাট-সত্তরখানা ট্রাক। এসব নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি?

ঠিক ভুলে যাইনি, তবে স্মৃতি একটু আবছা। যেন পূর্বজন্মের কথা।

সেই তখন আপনাকে আমি প্রথম দেখি, দশ বছর আগে।

দশ বছর! দশ বছরও তো অনেকটা সময়!

তেরো বছর বয়সে আমার না ছিল রূপ, না কোনো গুণ।

দাঁড়ান, দাঁড়ান! কোথাও একটা গন্ডগোল হয়েছে।

কীসের গন্ডগোল?

আপনি বরং একটু ধীরে ধীরে বলুন। আমি বুঝতে পারছি না।

না বোঝার মতো কিছু বলিনি তো! রূপহীনা, গুণহীনা এক ত্রয়োদশীর কথাই তো বলছি।

আপনার গুণের কথা আমি জানি না। কিন্তু আপনাকে রূপহীনা বলে মনে হচ্ছে না তো! আপনি কি দেখতে খারাপ? আজকাল হয়তো সুন্দর কুচ্ছিতের সংজ্ঞাও আমি গুলিয়ে ফেলেছি।

আমি আমার তেরো বছর বয়েসের কথা বলছি। কালো, রোগা, গাল-বসা কোটরগত চোখের একটা মেয়ে, যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করলেও চলে। আপনি তখন আমাদের সেই শহরের বেশ একজন চোখটানা পুরুষ। ফুটবল খেলেন, পাহাড়ে চড়েন, লোকের উপকার করে বেড়ান, আবার তেমনই লাফাঙ্গা, বদমাশ, মেয়েবাজ ছেলে। মনে পড়ে?

একটু একটু মনে পড়ে। তবে বড্ড কুয়াশায় ঢাকা। আমি খুব খারাপ ছিলাম—না?

সেটা বললে অন্যায় হবে। খারাপ ছিলেন, আবার ভালো কাজও তো করেছেন। সেই ভয়ংকর বন্যার বছরে যখন শহর চার-পাঁচ ফুট জলের তলায় গিয়েছিল, তখন আপনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে কত লোককে এনে স্কুলবাড়ি আর ইনস্টিটিউটে পৌঁছে দিয়েছেন, রিলিফের জোগাড় করেছেন। এমনকী মার্চেন্টদের কাছ থেকে চাল, ডাল কেড়ে এনেছেন।

হবে হয়তো।

মফসসলে আপনার গ্রুপ থিয়েটারের খুব নাম ছিল। আপনি অভিনয়ও বেশ ভালোই করতেন। শুনেছি আপনি সিনেমায় নামবার চেষ্টা করেছেন।

তাই নাকি? কিন্তু আপনার সঙ্গে কি তখনই দেখা হয়েছিল?

আমাকে আপনি রাস্তায়-ঘাটে, ফাংশনে বা আরও অনেক জায়গায় অনেকবার দেখেছেন, কিন্তু কখনো লক্ষ করেননি। করার কথাও নয়। লক্ষ করার মতো তো ছিলাম না।

তা হবে।

আপনি দেবযানীদির সঙ্গে প্রেম করতেন। আবার রুচিরার সঙ্গেও। এবং নন্দিনীও ছিল আপনার প্রেমিকা। এই নন্দিনী ছিল আমার দিদি। আপনার মনে নেই।

বড়ো লজ্জায় ফেললেন। দেবযানীর কথা খুব সামান্য মনে পড়ছে। তার বাঁ-গালে জড়ুল বা আঁচিল গোছের কিছু একটা ছিল বোধহয়। তাই-না?

ছিলই তো।

ব্যস, ওইটুকু মনে আছে, বাকিটা নয়। আপনার দিদি—কী নাম বললেন যেন!

নন্দিনী।

তার নিশ্চয়ই এখন বিয়ে হয়ে গেছে!

দু-বার। প্রথমবারের বিয়ে ভেঙে যায়। দ্বিতীয়বার বিয়ে করে এখন জার্মানিতে আছে।

না, তাকে আমার একদমই মনে পড়ছে না।.........

.........এবং অন্যান্য জায়গায় ফাংশনের মধ্যমণি ছিল। পরে রেডিয়ো আর টিভিতে অনেক প্রোগ্রাম করেছিল।

আপনি আর বলবেন না। খুব বেশি রেফারেন্স দিলে আমার মাথার ভেতরে একটা ওলটপালট হতে থাকে। মেমরি আরও গুলিয়ে যায়। খুব হতাশ লাগে তখন।

কিন্তু আপনিই তো বললেন, কথা বললে মেমরি রিচার্জ হতে পারে।

হ্যাঁ, সেও ঠিক। তবে খুব উপর্যুপরি রেফারেন্স দিলে আমি সূত্র হারিয়ে ফেলি।

সরি, আমি বুঝতে পারিনি।

আপনার তো দোষ নেই। আমিই কীরকম যেন হয়ে গেছি।

আমি কিন্তু দিদির কথা বলতে আসিনি।

তাহলে বরং তার কথা থাক। তাকে বোধহয় আমার মনে পড়বে না। সুন্দরী বা গায়িকা যাই হোক। বরং কালো, রোগা, ইনসিগনিফিক্যান্ট যে-মেয়েটির কথা বলতে চাইছেন—অর্থাৎ আপনার কথা বলুন।

আমার কথা! না আমাকে আপনার মনে পড়ার কোনো কারণই নেই। রূপবতী, গুণবতীদেরই যখন মনে নেই, তখন আমাকে তো মনে পড়ার কথাই নয়।

কী জানেন, অনেক কথাই মনে পড়ে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে খুব তুচ্ছ, সামান্য অর্থহীন ছোটো ছোটো ছবির মতো দৃশ্য মনে পড়ে। কেন মনে পড়ে তা বুঝতে পারি না। যেমন ধরুন, একটা বৃষ্টির দিনের কথা মনে আছে। স্কুলবাড়ির গাছতলায় সবুজ জামা গায়ে একটা ছেলে একটা ছাগলকে কাঁঠালপাতা খাওয়াচ্ছে আর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করছে, এই দৃশ্যটা কেন মনে পড়ে বলুন তো। কিংবা ধরুন, সেই যে যেবার আকাশে একটা বিরল ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। আমরা ভোররাতে প্রচন্ড শীতে ছাদে সেই ধূমকেতু দেখতে উঠতাম। একটা ভোরে কে একজন পাশের ছাদে ভরাট গলায় একটা রবীন্দ্রসংগীত গাইছিল, আর আমার কেন যেন গান শুনে খুব মৃত্যুর কথা মনে হয়েছিল।

আর কিছু মনে পড়ে না?

হ্যাঁ, এইরকমই ছোটো ছোটো চৌখুপির মতো দৃশ্য বা শব্দ। ঠিক যেন, একটা অন্ধকার খামের গায়ে এলোমেলো সংগতিহীন কয়েকটা ডাকটিকিট সাঁটা। একটার সঙ্গে আর একটার কোনো পারম্পর্য নেই। তবু যে মনে পড়ে, তার কারণ হয়তো এইসব স্মৃতি বোধহয় উপেক্ষা করার মতো নয়। মনে পড়ার কারণ আছে।

সেটা বোধহয় সব মানুষেরই আছে। আমারও এমন সব কথা মনে পড়ে যার কোনো মানেই হয় না। আমাদের বাড়িতে লাঠিতে ভর দিয়ে একটা বুড়ো ভিখিরি আসত। কেন কে জানে, ওই লাঠিটার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সাধারণ বাঁশেরই লাঠি, তবে গাঁটে গাঁটে আঁকাবাঁকা। তিরিক্ষি ছিরির একটা লাঠি। সব ছেড়ে ওই লাঠিটাকেই কেন মনে পড়বে বলুন? অমন অবাক হয়ে চেয়ে আছেন কেন বলুন তো?

আমি পরের যে-ঘটনাটা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম, তা ওই লাঠিটা নিয়েই।

সে কী?

ওই বুড়ো ভিখিরিটার নাম ছিল দেলু। মা ওকে খুব ভালোবাসত। বহুদিন বসিয়ে ভাত খাইয়েছে। লোকটার ভালো একটা নামও ছিল। বোধ হয় দিলদার সিং। সেই বাঁশের বাঁকা লাঠিটার কথা আমার যখনই মনে পড়ে, তখনই দিলদারকেও যেন দেখতে পাই। কাঁচামিঠে আমগাছটার তলায়, পাশে লাঠিখানা রেখে উবু হয়ে বসে কলাইকরা থালায় ভাত খাচ্ছে।

আশ্চর্য তো! ওই লাঠিটার কথা আপনারও মনে আছে?

হ্যাঁ। খুবই অবাক কান্ড! দেলুর লাঠির কথা মনে রেখেছে এমন লোক বোধহয় পৃথিবীতে খুবই বিরল।

আর কী মনে আছে আপনার?

উমমম! দাঁড়ান, ভাবতে দিন। মুশকিল কী জানেন, চেষ্টা করলে তেমন মনে পড়ে না। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ এক একটা ছবি যেন অন্ধকারে ভেসে ওঠে। মস্তিষ্ককে বেশি তাড়না করলে একটা যন্ত্রণা হয়। ভয় হয়, গোটা মেমরি ডিস্কটাই না স্লেটের মতো মুছে যায়। কিন্তু আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন তা এখনও জানি না।

ধরুন, এমনিই। আমরা এক শহরে বাস করতাম, ছেলেবেলায় আপনি আমার কাছে খানিকটা হিরোও তো ছিলেন। মনে করুন, সেই হিরোকেই একটু দেখতে আসা।

ভালো, খুব ভালো। আজকাল কেউ বড়ো একটা আসে না। এখানে খুব হাওয়া বয়, বেশ শীত। সারাদিন এই খোলা বারান্দায় বসে থাকি। শালগাছে বাতাসের যে-শব্দটা হয় সেটা অনেকটা হাহাকারের মতো, মন খারাপ লাগে। আর এ-বাড়িটায় অনেক গাছ। এত বড়ো বড়ো গাছ থাকায়, আমি বাইরেটা খুব ভালো দেখতে পাই না।

এ-বাড়িটা বুঝি আপনারা কিনেছেন?

হ্যাঁ। বাবাকে ডাক্তার বুঝিয়েছে, নির্জন স্বাস্থ্যকর জায়গায় আমাকে রাখতে। তাই এ-বাড়িটা কেনা হয়েছে।

আপনি বেড়াতে যান না?

মর্নিং ওয়াক? না। আমার ওসব ভালো লাগে না। সন্ধেবেলা ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করি। এখানে খুব ঠাণ্ডা পড়ে। সন্ধের পর আমাদের ছাদটায় খুব হিম বাতাস বয়ে যায়। আর ভীষণ অন্ধকার। খুব কুয়াশা না হলে, আকাশভরা তারা দেখা যায়। বেশ লাগে তখন পায়চারি করতে। হাসছেন কেন?

এমনিই। ভাবছিলাম বড়োলোক হওয়ার কত সুবিধে। আপনার 'ডিমেনশিয়া' হয়েছে বলে আপনার বাবা ঝাড়গ্রামে আস্ত একটা শালবনসুদ্ধু দোতলা বাড়িই কিনে ফেললেন, আপনার দেহমন ভালো রাখার জন্য। আমাদের মতো গরিবদের এর চেয়ে অনেক বেশি শক্ত রোগ হলেও কিছু করার থাকে না।

ঝাড়গ্রাম! হ্যাঁ, ঝাড়গ্রামই তো বললেন। এই নামটা দিনের মধ্যে আমি যে কতবার ভুলে যাই! আপনার বাড়ি বুঝি এখানেই?

না। আমি কাছাকাছি একটা কলেজে পড়াই। খুব সম্প্রতি, মাত্র মাসছয়েক আগে জয়েন করেছি।

গরিব আর বড়োলোকের ব্যাপারটা আপনি ঠিকই বলেছেন। বড়োলোক হওয়ার কিছু অন্যায্য সুবিধে আছে। কিন্তু তার জন্য শুধু বড়োলোকদের দোষ দিয়ে বা মুন্ডুপাত করে লাভ নেই। বড়োলোকেরা এই সামাজিক সিস্টেমটা তৈরি করেনি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এ দেশের সিস্টেমটাই এরকম। তবে আমাদের অবস্থা কিন্তু আগের মতো ভালো নেই।

জানি। আপনার বাবার নামে অনেকগুলো মামলা ঝুলছে। ট্রাকের ব্যাবসা মার খেয়েছে। আপনার দাদা দীপঙ্কর জেল খাটছেন।

হ্যাঁ। আপনি তো সবই জানেন। চিরকাল তো কারো সমান যায় না। বেশ একটি দুঃসময় চলছে আমাদের।

এসব কথা তো, আপনার বেশ মনে আছে দেখছি।

ইমিডিয়েট পাস্ট, অর্থাৎ অনতি অতীত বেশ মনে করতে পারি, কিন্তু তার বেশি অতীতটাই কুয়াশায় ঢাকা। আবার একটু একটু করে এই অনতি অতীতও যে মুছে যাচ্ছে তাও টের পাই। তখন খুব ভয় করে। এক বছর আগে আমাদের বাড়িতে একটা গ্যাস সিলিণ্ডার লিকেজ হয়ে আগুন লেগে যায় এবং তাতে আমার বোন টিকলি ভীষণভাবে পুড়ে যায়। পরে সে মারাও গেছে। এই ঘটনাটা আমি কী করে যে ভুলে গিয়েছিলাম কে জানে। সেদিন সুবল আমাকে ঘটনাটা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

টিকলিদির জন্য আমরা সবাই খুব দুঃখ পেয়েছি। খুব ভালো ছিলেন টিকলিদি। জামাইষষ্ঠীতে বাপের বাড়িতে এসেছিলেন। ভাগ্য খারাপ থাকলে কত কী হয়। সেদিনই নতুন সিলিণ্ডার লাগানো হয়েছিল আর টিকলিদি গিয়েছিলেন রাঁধতে।

অত ডিটেলস আমার মনে নেই। টিকলির মুখটাও স্পষ্ট মনে পড়ে না।

ওঁর একটা মেয়ে আছে, না?

আছে বোধহয়। হ্যাঁ, আছে।

আপনি সুবলের কথা বললেন, সুবল কে?

আমার দেখাশোনা করে। পুরোনো লোক।

আপনি ভালো ব্যাডমিন্টন খেলতেন, মনে আছে?

ব্যাডমিন্টন! হয়তো খেলতাম।

মনে নেই আপনার?

না। খেলাটা ভালো নয়।

কেন, 'ব্যাডমিন্টন' তো বেশ একটা খেলা।

শাটল কক কী দিয়ে তৈরি হয় জানেন?

পাখির পালক।

হাজার হাজার শাটল কক তৈরি করার জন্য, এত পালক ওরা পায় কোথায়? ওরা কি পাখি মেরে পালক উপড়ে নেয়?

আমি তা জানি না।

আমার সন্দেহ, শাটল ককের জন্য পাখি মারা হয়।

হতেও পারে।

'পাখির' মতো এমন সুন্দর আর আশ্চর্য প্রাণী আর হয় না, না? আমি আজকাল চারদিকে অনেক পাখি দেখতে পাই। তাদের ডাক শুনি। আজকাল আমার কাকের ডাকও ভালো লাগে। হাসছেন যে?

ভাবছি আপনি মুরগি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন কি না। আপনার মা খুব শুদ্ধাচারী মহিলা ছিলেন বলে, হেঁসেলে মুরগি ঢুকতে দিতেন না। আপনি আর আপনার বন্ধুরা বাড়ির পেছনের উঠোনে মুরগি কেটে রান্না করে খেতেন, মনে নেই? ও কী! অমন সাদা হয়ে গেলেন কেন?

না, না, ও কিছু নয়। আমার মনে হয় অস্বচ্ছ অতীতে আমি এমন সব কাজ করেছি যা মনে না পড়াই বোধহয় ভালো। না, এখন আমি মুরগি খাই না। মাছ, মাংস কিছুই খাই না।

বৈরাগ্য এল বুঝি?

ঠাট্টা করছেন! বৈরাগ্য তো সহজ ব্যাপার নয়! তবে 'সহনশীলতা' বলে একটা কথা আছে না? বোধহয় সেইটে এসেছে। নাকি, কে জানে, আমি হয়তো ধীরে ধীরে কাঠ বা পাথরের মতো হয়ে যাচ্ছি।

ও-কথা বলছেন কেন?

কিছুদিন আগে আমাকে একটা কাঁকড়াবিছে হুল দিয়েছিল। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা, মনে হচ্ছিল হার্টফেল হয়ে মরে যাব। সুবল একটা হাতুড়ি নিয়ে বিছেটাকে মারতে এসেছিল। ও নাকি তুক জানে, কাঁকড়াবিছের রস লাগালে ব্যথা কমে যায়। আমি ওকে মারতে দিইনি। মেরে কী হবে বলুন? বেচারা তো নিজেই জানে না যে, ওর বিষ এতটা মারাত্মক। মানুষের কত অস্ত্রশস্ত্র আছে, ওদের তো ওই হুল বা দাঁত বা নখ বা শিং-ই ভরসা।

গাঁধিবাদী হতে বারণ করছি না। তবে 'পেস্ট কন্ট্রোল' এজেন্সিকে খবর দিয়ে বাড়ি থেকে পোকামাকড় তাড়িয়ে দেওয়াই ভালো। দাঁত, নখ, হুলের সঙ্গে সহাবস্থান মোটেই নিরাপদ নয়। আমি জুলজিস্ট, পোকামাকড় সম্পর্কে আপনার চেয়ে একটু বেশি জানি। কাঁকড়াবিছের বিষে মানুষ মারাও যায়। আপনি ডাক্তার ডাকেননি?

না।

খুব অন্যায় করেছেন।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল যে।

কী হল?

খবর পেয়ে একটা লম্বাপানা লোক এল। এ-পাড়াতেই থাকে। সেই লোকটা আমাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে মাথায় মগের পর মগ জল ঢালতে লাগল। বিড়বিড় করে কী-একটা মন্ত্রও পড়ছিল। জল ঢালতে আমার সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জল ঢালার পর আমার ব্যথাও একদম কমে গেল।

যা:, ওই বিষে ব্যথা উইদাউট মেডিকেশন চব্বিশ ঘণ্টা থাকার কথা। শুধু জল ঢাললে ব্যথা কমার কথাই নয়।

কিন্তু কমল যে!

আপনি এখানে থাকতে থাকতে অন্ধবিশ্বাস বা বুজরুকিও মানতে শুরু করেছেন।

তাই হয়তো হবে, কিন্তু ব্যথাটা সত্যিই ছিল না আর।

ঠিক আছে, আপনার কথাই মানছি।

আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। ঠোঁটে একটু চাপা হাসি, চোখে একটু বিদ্রূপের চাউনি। আজকাল আমি অবশ্য কাউকেই কিছু বোঝাতে পারি না। এমনকী, সুবল অবধি আমার অনেক কথা সিরিয়াসলি নেয় না।

আমি ভাবছি মানুষ অনেক সময়ে যা বিশ্বাস করতে চায় সেটাই ঘটে যায়। আপনি হয়তো খুব জোরের সঙ্গে লোকটার অলৌকিক ক্ষমতাকে বিশ্বাস করেছিলেন, আর সেই জোরেই হয়তো ব্যথাও কমেছে। মানুষ মন দিয়ে কত কী করতে পারে! কিংবা লোকটা হয়তো আপনাকে হিপনোটাইজ করেছিল।

আপনি পারেন?

কী?

হিপনোটাইজ করতে?

না। আমার পারার কথাও নয়।

কেউ যদি আমাকে বাকি জীবনটা হিপনোটাইজ করে রেখে দিত, তাহলে বড্ড ভালো হত।

বাস্তব থেকে পালাতে চান তো! আমরা সবাই কমবেশি পালাতেই তো চাই। কিন্তু পালিয়ে লাভ হয় না, ফের বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়। নিস্তার নেই। একটা সময় ছিল যখন আপনি পালানোর মানুষ ছিলেন না। হাসপাতালের মোড়ে সেই যে ভীষণ হাঙ্গামাটা হয়েছিল, তারকথা আপনার মনে আছে? বাবুপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মেছোবাজারের গুণ্ডাদের কী ভয়ংকর মারপিট! কত বোমা পড়েছিল, গুলি চলেছিল, পুলিশ অবধি এগোতে সাহস পায়নি। একটা মোটরবাইক নিয়ে আপনি সেই হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। খুব পপুলার ছিলেন বলেই বোধহয় সেই হাঙ্গামা থামাতে পেরেছিলেন আপনি। আমি অবশ্য ডিটেলস জানি না, তবে তখন লোকের মুখে মুখে আপনার নাম ফিরত। মনে আছে?

না। কিছু মনে নেই।

কিংবা রুচিরা আর পল্লুর সেই ভালোবাসার বিয়ে! মনে আছে?

নাম দুটো প্রথম শুনছি।

বদমাশ, জুয়াড়ি, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী বলে পল্লুকে সবাই চিনত। তবু রুচিরা যে কী করে ওর প্রেমে পড়ল কে জানে! শান্ত, শিষ্ট, ভারি ভালো মেয়ে। ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। তবু পল্লুর প্রেমে পাগল হয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ল। কেলেঙ্কারির একশেষ। পল্লু দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছিল। রুচিরার বাবা পল্লুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়ে এলেন। পুলিশ অবধি পল্লুকে আড়াল করেছিল, কারণ ওর মামা ছিল ডি এস পি। রুচিরাকে আত্মহত্যা করতে হত আপনি না থাকলে।

পল্লু! রুচিরা! এসব শব্দ শুনছি আর আমার মাথার ভেতর গভীর কালো জল টুপটাপ করে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে। কোনো ঝংকারও নেই, টংকারও নেই। পল্লুকে কি আমি মেরেছিলাম?

না। বরং তাকে প্রবল মারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। রুচিরা যখন বিষ খেয়ে হাসপাতালে, তখন ওদের পাড়ার লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এসে পল্লুকে পাকড়াও করে। সেদিন আপনি গিয়ে আড়াল না করলে ও মরেই যেত। শুনেছিলাম, কিছুদিন আপনি ওকে বন-বাংলোয় নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার জন্য পুলিশ ওকে খুঁজছিল। খুব গন্ডগোল চলেছিল কিছুদিন। আপনাকেও পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। কিছুদিন পরে অবশ্য রুচিরা আর পল্লুর বেশ মিলমিশ হয়ে যায়। পল্লু কিন্তু আর আগের মতো ছিল না, পালটে গিয়েছিল। কী করে সেটা হয়েছিল তা আজও জানি না।

আচ্ছা এই ঘটনাটা শুনে আমাকে তো বেশ ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছে, তাই-না?

খারাপ তো বলতে চাইছি না।

কিন্তু একটু আগে আপনিই না বলেছিলেন যে, আমি ছিলাম লাফাঙ্গা, বদমাশ, মেয়েবাজ! একইসঙ্গে একটা লোক ভালো আর খারাপ কী করে হতে পারে?

সেইজন্যই তো আপনাকে একদম বুঝতে পারতাম না। কখনো মনে হত ভীষণ ভালো, ডাকাবুকো, সাদা মনের মানুষ। আবার কখনো মনে হত, ভীষণ পাজি, ভীষণ দুষ্টু, ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ।

খুব মুশকিলে ফেলেছেন আমাকে।

মুশকিল শুধু আপনার নয়, আমারও। মনে মনে আপনার যে-পোর্ট্রেটটা আঁকার চেষ্টা করেছি, সেটা বার বার বদলে গেছে। কখনো আপনাকে মনে হয় ইভান দি টেরিবল, কখনো বা সন্ত জন। আপনি এমন অদ্ভুত ছিলেন বলেই আমার কিশোরী বয়সে আপনাকে নিয়ে আমি মনে মনে ভারি জ্বালাতন হতাম।

আমাকে নিয়ে আপনার প্রবলেমটা কী ছিল বলবেন?

অনেক সময়ে কেউ কেউ নিজের অজান্তেই অন্য কারো প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে, আপনি আমার দিদিকে বিয়ে করবেন এবং একদিন আপনাকে 'জামাইবাবু' বলে ডাকতে হবে।

ও হ্যাঁ, এ-কথাটা বলেছিলেন বটে। আপনার দিদির সঙ্গে আমার—

ঠিক তাই।

গানের কথায় একটা মেঘলা দিনের কথা মনে পড়ল। বলব?

কী জানি কেন, আজ এই শীতের সকালে আপনার কথা শুনতে আমার বেশ ভালো লাগছে। আপনি আমার সেই ছোট্ট শহরের মেয়ে। কত ছোটো ছোটো কথা মনে আছে আপনার। শুনে ফের সেই ছেলেবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে?

হ্যাঁ। ভীষণ।

আপনার ইচ্ছের আরও জোর হোক।

সেই যে মেঘলা দিনের কথা বলবেন বলছিলেন। বলুন।

হ্যাঁ, সেটা এক আশ্চর্য দিন। আমাদের শহরের এক পলিটিক্যাল লিডার তার আগের দিন কদমতলার মোড়ে খুন হয়েছিলেন। বিমলাংশু সেন। পরদিন সকাল থেকেই দোকানপাট বাজার সব বন্ধ। গাড়িঘোড়া কিছু চলছে না। অথচ সেদিন জেলা শহরে আমার গানের কম্পিটিশনের ফাইনাল পরীক্ষা। না গেলেই নয়। শহর প্রায় পঁচিশ মাইল দূর। সকালে এসব খবর পেয়ে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। রাগ-অভিমান-হতাশায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বিছানায় পড়ে পড়ে কেবল কাঁদছি, তখন দিদি এসে বলল, 'কাঁদিস না। ঠিক একটা উপায় হবে, দেখিস।' কিন্তু ওসব যে ছেলেভোলানো কথা তা জানা ছিল বলে একটুও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু উপায় সত্যিই হয়েছিল। দিদি আপনাকে খবর দিয়েছিল।

আমাকে! কেন?

সেটাই তো গল্প। আপনি আমাকে জেলা শহরে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছিলেন। ছ-টায় পরীক্ষা, আপনি ঠিক সাড়ে চারটেয় একটা বিরাট মোটরবাইক নিয়ে এসে হাজির। একমুখ হাসি নিয়ে বললেন, 'চলো খুকি,

তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'

দাঁড়ান, দাঁড়ান! কী নাম যেন, বললেন। বিমলাংশু সেন?

হ্যাঁ তো।

লম্বা, ফর্সা, কোঁকড়া চুল, চোখে ভারী চশমা?

হ্যাঁ।

বিমলাংশু সেনকে পেটে আর বুকে ছুরি মারা হয়েছিল, তাই-না?

হ্যাঁ।

তাকে আমার বেশ মনে পড়ে যাচ্ছে।

সত্যি?

তারপর বলুন।

আমি তৈরি হয়েই ছিলাম। আপনি আমাকে কীভাবে মোটরবাইকের ক্যারিয়ারে বসতে হবে তা শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনার কাঁধ বা কোমর জড়িয়ে ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। জীবনে সেই প্রথম মোটরবাইকে চড়া আমার। যা-ভয় করছিল! আর সেইসঙ্গে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম।

লজ্জা কীসের?

ওমা! লজ্জা নয়! তখন যে মনে মনে আপনাকে নিয়ে সারাক্ষণ গবেষণা করি! তখন, বালিকা বয়সে আপনার চেয়ে রহস্যময় পুরুষ আর কেউ ছিল না আমার।

রহস্যময়! রহস্যময় ছিলাম বুঝি আমি?

ভীষণ। আপনার কাঁধে হাত রেখে পেছনের সিটে আমি কাঁটা হয়ে বসেছিলাম। সারাশরীর বার বার শিউরে শিউরে উঠেছিল। আপনি অবশ্য পাত্তা দেননি আমাকে আর তেরো বছরের কালো, রোগা একটা পেতনি মেয়েকে কেনই বা পাত্তা দেবেন আপনি?

সেটা ছিল বুলেট।

তার মানে?

মোটরবাইকটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

আপনার মোটরবাইকটা ছিল ভীষণ বিচ্ছিরি। একে তো দৈত্যের মতো চেহারা, তার ওপর যা জোরে ছুটত। শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়।

আপনার অভিজ্ঞতা নেই বলে বলছেন। নইলে 'বুলেট' একটি চমৎকার বাইক। যেকোনো রাস্তায় চলতে পারে, এমনকী পাহাড়ি রাস্তায়ও।

আপনি এমন উদাসীনভাবে চালাচ্ছিলেন যে, আপনার পেছনে যে একটা তেরো বছরের ভীতু মেয়ে বসে আছে, সেটা আপনার খেয়ালই ছিল না।

না, না, ভুল ভেবেছেন। নিশ্চয়ই খেয়াল ছিল, কাউকে ক্যারি করার সময় আমি তো সাবধানেই চালাতাম।

সেটা বুঝি মনে আছে আপনার?

অ্যাঁ! তাই তো, মনে আছে দেখছি! ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার!

সেদিন কিন্তু মোটেই সাবধানে চালাননি। ভয়ে আমি বার বার দু-হাতে আপনাকে আঁকড়ে ধরেছি আর লজ্জায় মরে গেছি।

আপনি খুব লাজুক ছিলেন তো?

হ্যাঁ। এখনও তাই। খুব আনস্মার্ট, ঘরকুনো। ভীতুও।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক মেয়েদের যেমন হওয়া উচিত।

তার মানে? মেয়েদের আনস্মার্ট, ঘরকুনো আর ভীতু হওয়া ভালো বুঝি?

ভালো নয়? তাহলে কি অন্যরকম হওয়া উচিত?

যদি তাই হবে, তাহলে আপনি আমাকে পাত্তা দেননি কেন?

তেরো বছর বয়সের মেয়েরা তো ইজের পরে!

আমি সেদিন সালোয়ার-কামিজ পরেছিলাম। অ্যাণ্ড ফর ইয়োর ইনফরমেশন, যথেষ্ট সেজেওছিলাম।

হা: হা:! তাই বুঝি! তাহলে তো আপনাকে আমার সমীহ করাই উচিত ছিল! কিন্তু ঠিক কীরকম ব্যবহার করেছিলাম আপনার সঙ্গে, একটু বলবেন?

একটু নাক সিঁটকানোর ভাব তো ছিলই। আর ছিল অ্যান অ্যাটিটিউড অফ রিজেকশন। ভাবটা যেন, তুমি যতই সাজো, কিচ্ছু যায় আসে না আমার।

আজ আমি সেদিনের ব্যবহারের জন্য যদি ক্ষমা চাই?

যা:, ঠাট্টা করছিলাম। আমার ওই বয়েসে কি কারো কাছে পাত্তা পাওয়ার কথা?

দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটা গন্ধ পাচ্ছেন?

পাচ্ছি তো। পাতাপোড়ার গন্ধ। কেউ কাছেপিঠে শুকনো শালপাতা জড়ো করে আগুন দিয়েছে বোধহয়।

না, না, সে গন্ধ নয়।

তবে?

ক্যা-ক্যালিফোর্নিয়ান পপি!

ক্যালিফোর্নিয়ান পপি?

ক্যালিফোর্নিয়ান পপির গন্ধ!

আমি তো পাচ্ছি না, তবে আমরা একসময়ে ওই নামের একটা তেল চুলে মাখতাম। কিন্তু সে তো ছেলেবেলায়!

কিন্তু আমি গন্ধটা পাচ্ছি যে! আর একটা বাসন্তী রঙের ওড়না—হ্যাঁ, বাসন্তী রঙের ওড়না ঝোড়ো বাতাসে খুব উড়ছে, রিয়ার ভিউ মিররে আমি যেন এখনও দেখতে পাই। ভয় করছিল আমার।

উঃ!

কী হল?

সেটা তো বাসন্তী রঙেরই ওড়না ছিল! আমিই ভুলে গিয়েছিলাম! আপনি বাইক থামিয়ে আমাকে বললেন ওড়নাটা কোমরে জড়িয়ে নিতে। নইলে নাকি চাকায় ওড়না জড়িয়ে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। এটা কী করে মনে পড়ল আপনার?

না, মনে পড়েনি। একটা নিরেট নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একটা-দুটো বিচ্ছিন্ন তারা ফুটে উঠছে মাত্র। পূর্বাপর সম্পর্ক নেই। ওই বাসন্তী রঙের ওড়না আর ক্যালিফোর্নিয়ান পপির গন্ধ। কিন্তু দুটোকে মেলাতে পারি না যে? কোথা থেকে এক একটা স্মৃতি, পাখি, প্রজাপতি বা মৌমাছির মতো উড়ে আসে, তারপর আবার উড়ে কোথায় হারিয়ে যায়। সারাদিন আমার মাথায় এইসব দৃশ্য, গন্ধ, শব্দের পারম্পর্যহীন যাতায়াত। আপনি কী বলছিলেন যেন?

ভাবছি, বলে লাভ আছে কি না।

কিন্তু শুনতে আমার ভালোই লাগছে। আপনার কথাগুলো যেন আমার বন্ধ দরজায় মৃদু টোকার শব্দ। দরজাটা আমি খুলে দিতে চাই, কিন্তু ইচ্ছে করলেও যেন পারি না। তবু শব্দটাও তো একটা সংকেত! কে জানে দরজাটা ওই সংকেতে আপনা থেকেই খুলে যাবে কি না। প্লিজ, থামবেন না, বলুন।

শুনতে আপনার ভালো লাগছে কি? বোর হচ্ছেন না তো?

না, বরং আমার ভেতরে যেন শুকনো মাটিতে বৃষ্টির ফোঁটার মতো কিছু পড়ছে। বলুন, প্লিজ!

বলছি। সেই পঁচিশ মাইলের ভয়, লজ্জা, শিহরন সব এখনও পুরোনো বইয়ের মতো সাজিয়ে রেখেছি মনের মধ্যে। কিন্তু পথ তো একসময়ে শেষ হয়। আপনি আমাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার ফাংশন হয়ে গেলে আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব। চিন্তা কোরো না। সেদিন আমি কোকিলকে হার

মানিয়ে গান গেয়েছিলাম। ফেরার সময় আমার হাতে একগাদা প্রাইজ দেখে আপনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, ‘ও বাবা, তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে! সব প্রাইজ লুট করে এনেছ দেখছি! বাইকে সেইসব প্রাইজ নিয়ে আসা কত শক্ত ছিল বলুন! আপনিই গিয়ে একটা বিগ ‘শপার’ ব্যাগ কিনে আনলেন, তারপর সেটা যত্ন করে ক্যারিয়ারে বাঁধা হয়েছিল।

কত মনে আছে আপনার! আপনি ভাগ্যবতী। আমার যে কেন কিছুই মনে পড়ে না। কী জানি কেন, এখন হঠাৎ আমার একটা ভাঙা কাচের বোল-এর কথা মনে পড়ছে। সবুজ রং ছিল বোলটার, ভারি সুন্দর দেখতে।

আপনি একটা বিচ্ছু।

কেন ও-কথা বলছেন?

আপনার সব মনে আছে, কিছুই ভোলেননি।

আমার চেয়েও বেশি মনে আছে আপনার। কারণ প্রাইজে আমি এক সেট বোলও পেয়েছিলাম। মোটরবাইকের ঝাঁকুনিতেই বোধহয় একটা বোল ভেঙে গিয়েছিল। বোলগুলো ছিল সবুজ রঙের। আমিই ভুলে গিয়েছিলাম, আপনার কী করে মনে আছে?

না, না, কিছু মনে নেই। কিছুই মনে নেই। কীসের একটা আড়াল বলুন তো? কে আমার অতীতকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে?

কেউ নয়। ওটা আপনার অটো সাজেশন।

আপনিই-না একটু আগে বলেছিলেন, আমি কিছু একটা ভুলতে চাইছি বলে ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু কী ভুলতে চাইছি সেটাই তো আর মনে নেই আমার।

মনে পড়লে হয়তো আপনার ভালো লাগবে না।

তা হোক, তবু তো এই আধখানা হয়ে বেঁচে থাকার হাত থেকে রেহাই পাব। আপনি জানেন?

না তো?

কিন্তু আপনার মুখ দেখে আমার কেন মনে হচ্ছে যে, আপনি জানেন?

অনুমানটা ভুল।

তাই হবে হয়তো।

আজ আমি আসি!

যাবেন! তাই তো, আপনার তো চলে যাওয়ারই কথা! আবার আসবেন।

বলতে পারি না।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। না, নড়বেন না, ওই রোদ আর ছায়ার ঠিক মাঝখানে যেমনটি দাঁড়িয়ে আছেন, তেমনই থাকুন তো! আপনার ডানদিকে রোদ, বাঁ-দিকে ছায়া...

দাঁড়ালাম তো!

সুভাষিণী...সুভাষিণী...আশ্চর্য! কেন এ নামটা মনে পড়ল।

মনে পড়ল তাহলে!

পড়ল, কিন্তু আপনি কে বলুন তো?

আমাকে ভুলতে গিয়ে কত কী ভুলতে হল আপনাকে!

একটু দাঁড়ান। আশ্চর্য, আমার আদিগন্ত সব মনে পড়ে যাচ্ছে যে! উঃ, ভীষণ মনে পড়ে যাচ্ছে সব!...রেপ চার্জ, পাবলিকের মার, মামলা, কয়েদখানা, নাবালিকা ধর্ষণের জন্য...ওঃ!

সব ঠিক। কিন্তু আপনি বোকা, ভীষণ বোকা। যদি সব উপেক্ষা করে জোর করে এসে আমার হাত ধরতেন, তাহলে আমিও ভয় ঝেড়ে ফেলে, সবাইকে মুখের ওপর বলতে পারতাম, উনি আমাকে রেপ করেননি, আমিই ওঁকে বাধ্য করেছিলাম।

কিন্তু কেন করেছিলে? কেন বাধ্য করেছিলেন আমায়?

তখন আমার পনেরো বছর বয়স। গুটিপোকার খোলস ছেড়ে একটি প্রজাপতি বেরিয়ে এসেছে। কেউ ফিরেও দেখত না যাকে তার দিকে সকলেরই অবাক চোখের চাউনি। অহংকারে মক মক করে বুকের ভেতরটা। তখন আমার ট্রফি চাই, মুগ্ধতা চাই, স্তাবকতা চাই, পুরুষদের হাঁটু গেড়ে বসা দেখতে চাই। কিন্তু একচোখো, অন্ধ আবেগ একটা পুরুষকেই শুধু খুঁজে বেড়ায় তখনও। ওই একটা পুরুষের সিলমোহর না হলে, তার জীবন-যৌবন বৃথা। বুঝেছেন? ওই পঁচিশ মাইলের উজান-ভাঁটায় মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে রেখেছিলেন আপনি। কিন্তু সবাই যখন আমাকে লক্ষ করে, আপনি ফিরেও তাকান না। নাবালিকা বলেই হয়তো, সুন্দরী প্রেমিকার একফোঁটা একটা রোগা প্যাংলা বোন বলেই হয়তো। কী দিয়ে আপনাকে আমার দিকে ফেরাই? আমার পাগলিনি-মন তখন ওই একটা পথই খুঁজে পেয়েছিল। এক নিরালা দুপুরে সেজেগুজে আপনার নির্জন একটেরে ঘরটায় হানা দিয়েছিলাম। মাথার ঠিক ছিল না। বশে ছিলাম না। নিজের শ্বাসেই আগুনের হলকা টের পেয়েছিলাম। আপনি অবাক হয়েছিলেন, ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মানুষ কি পারে নিজের শরীর মনকে রাশ টেনে রাখতে। ভেসে গিয়েছিলেন, ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। দুই মাতাল আর পাগলের খেয়ালই ছিল না কিছু। বীরু নামে সেই মিস্তিরি ছেলেটা আপনাদের বাইরের দেওয়ালে রং করছিল, যে লোক ডেকে এনেছিল...উঃ, তারপর পৃথিবীটা উলটেপালটে গেল একেবারে। কোন অন্ধকারে ঠেলে দিলাম আপনাকে, আর এক অন্ধকারে ডুবে গেলাম আমিও। সত্যি কথাটা যতবার বলতে গেছি, আমার মুখ চেপে ধরা হয়েছিল। অঝোরে চোখের জল ঝরে গিয়েছিল শুধু। কত কষ্ট পেতে হল আপনাকে!

কী চাই সুভাষিণী? আজ আমার কাছে আর কী চাও?

আপনি কি ভেবেছিলেন সেইদিনের সেই কিশোরী সুভাষিণী ওইদিনের গন্ডগোলে ভয় পেয়ে বোবা হয়ে থাকবে চিরকাল? দুই বাড়ির মধ্যে সম্পর্ক তেতো হয়ে গেল, যাতায়াত বন্ধ, আপনাকে নিয়ে কী বিচ্ছিরি টানাহ্যাঁচড়া—মামলা-মোকদ্দমা! ভয় হয়েছিল ঠিকই, তবু মন স্থির ছিল। কত কষ্ট করে, কত কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছি জানেন?

সুভাষিণী, আমাকে বরং আবার সব ভুলিয়ে দাও। বিস্মৃতিই তো ভালো ছিল এর চেয়ে। এত যন্ত্রণা ছিল না! আধখানা হয়েই থেকে যাই না কেন সুভাষিণী!

বাকি আধখানা খুঁজে দিতেই তো এত কষ্ট করে এতদূর আসা।

বাকি আধখানা! ও!

এখন আসুন তো, আমার হাতখানা ধরুন। চলুন, ওই শালবনের ছায়ায় ছায়ায় দুজন একটু হাঁটি।

চলো সুভাষিণী।

মশা, ভূত ও সুরবালা

আমার বাথরুমে একটি লোনলি মশা আছে। বুঝলেন মশাই, এরকম বুদ্ধিমান মশক আমি জীবনে আর দেখিনি। ধূর্ত, ফিজিক্যালি ফিট এবং ক্যারাটে বা কুংফুর ওস্তাদের মতো কূটকৌশলী। গত পনেরো দিনের চেষ্টায় আমি তাকে মারতে পারিনি। অথচ মশা মারায় আমার বেশ হাতযশ আছে।

ওই একটা ব্যাপারে অবশ্য আমি খুবই কাঁচা। কত চড়-চাপড় দিয়েও এ-যাবৎ যে-কয়টি মশা মারতে পেরেছি তা হাতে গোনা যায়। দু-হাতে তালি বাজিয়েই হয়তো মারলুম, মশাটা পড়লও তার মধ্যে, কিন্তু মরল না।

কেন মরল না মশাই? মরার-ই তো কথা।

কপাল, আমার হাতের তেলো তো ফাঁপা। ওই ফাঁপার মধ্যে পড়ে দিব্যি গা বাঁচিয়ে উড়ে চলে যায়। তবে আমার গিন্নি এ-ব্যাপারে খুবই নমস্যা মহিলা। মশার একেবারে যম। যেটাকে টার্গেট করবেন সেটারই কপাল পুড়ল।

আপনার স্ত্রীকে আমার নমস্কার জানাবেন। কৃতী মহিলাদের শ্রদ্ধা জানাতে আমি খুবই ভালোবাসি।

তা না-হয় জানালুম। কিন্তু মশাই আপনার বাথরুমে কি ওই একটিই মাত্র মশা? আর মশা নেই?

আজ্ঞে না। আমার সারাবাড়িতে একটিও মশা খুঁজে পাবেন না।

সে কী? এ কি ভূতুড়ে কান্ড নাকি মশাই? যতদূর শুনেছিলাম, আপনি একটা পুরোনো বাড়ি কিনেছেন। পুরোনো বাড়ির আনাচে-কানাচে তো প্রচুর মশা থাকার কথা!

বাড়ি নয় মশাই, বাড়ি নয়। আমি একাবোকো মানুষ, বাড়ি দিয়ে কী করব? একটা পুরোনো বাড়ির তিনতলায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। দুখানা শোয়ার ঘর, একখানা বেশ বড়োসড়ো খাওয়া আর বসার জায়গা। আমার তো বেশি জায়গা লাগে না। আসবাবপত্রও যৎসামান্য। বুড়ো বয়েসে কেউ হুড়ো না দেয়, সেইজন্যই কেনা। নইলে সম্পত্তি দিয়ে আমি কী করব বলুন?

আহা, বুড়ো বয়েসের চিন্তা এই কাঁচা বয়েসেই কেন? এখনও তো ওসব ভাববার বয়েস সামনে পড়ে আছে!

একটা আগাম প্ল্যানিং থাকা ভালো, বুঝলেন। ফ্ল্যাটটা কিনতে যে-লোনটা নিতে হয়েছে, সেটা শোধ করতে এখন বেশি গায়ে লাগছে না। কিন্তু বেশি বয়েসে লোন নিলে চাপে পড়ে যেতে হয়।

তা মশার কথাটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। তিনতলায় কি মশার উৎপাত কিছু কম?

তা হতে পারে। কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে ওই একটিই মশা। তার কোনো সঙ্গী-সাথিও নেই। সারাদিন সে আমার জন্যই অপেক্ষা করে। আমি যেই বাথরুমে ঢুকি অমনি শুরু হয় তার খেল। ওপরে উঠে, নীচুতে নেমে, শূন্যে পাকদন্ডী তৈরি করে কত কায়দায় সে যে আমাকে অ্যাটাক করতে থাকে তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না আপনার। তাকে মারবার সবরকম চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। মশা মারবার ওষুধ স্প্রে করলে নিশ্চয়ই মরবে। তবে তার ধূর্তামি দেখে আমারও জেদ চেপেছে তাকে আমি হাত দিয়েই মারব।

আচ্ছা, আপনার মশাটা কি ব্যাচেলার বলে আপনার মনে হয়?

আসলে মশাদের তো বিয়ে হয় না, অনেক গার্লফ্রেন্ড থাকতে পারে। সেই অর্থে সব মশাই ব্যাচেলার। যদিও ছেলেপুলে হতে বাধা নেই।

হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ঠিক কথা। পশুপাখিরা তো লিভ টুগেদারই করে।

মশা কিন্তু পশুপাখির মধ্যে পড়ে না।

তাহলে?

মশা কীটপতঙ্গের গ্রূপে।

তাই তো! ঠিক কথাই তো! তাহলে মশাটা বেশ প্রবলেম ক্রিয়েট করছে বলুন।

তা বলতে পারেন। তবে আজকাল মাঝে-মধ্যে মনে হচ্ছে মশার সঙ্গে আমার যে-লড়াইটা চলছে সেটা অনেকটা খেলাধুলোর মতোই ব্যাপার। সময়টাও কাটছে ভালোই। আজকাল বাথরুমে মশাটার সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি করতে গিয়ে বেশ অনেকটা সময় কেটে যায়। বাথরুমটা বলতে নেই, বেশ বড়োই। পালিয়ে যাওয়ার অনেক জায়গা।

আহা, শুনেও ভালো লাগে। আমাদের মোটে একখানা, তা সেটাও এমন ছোটো যে মাজা ঘোরানোর জায়গা নেই। বাথরুম জিনিসটা পুরুষদের কাছে, বিশেষ করে চিন্তাশীল পুরুষদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আর্কিমিডিস তো ওই বাথরুমেই কী যেন একটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন! তা ছাড়া অনেক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ তাঁরা সব ওই বাথরুমেই চিন্তাটিন্তা করেন বলে শুনেছি। তাই ভাবি, একখানা ভালো বাথরুম থাকলে হয়তো আমার মাথাটাও ভালো খেলত। কিন্তু সে আর হওয়ার জো নেই। পাঁচটা মিনিট বাথরুম বন্ধ থাকলেই বাড়িতে হইচই পড়ে যায়। আপনার বাথরুম ক-টা?

দুটো।

আহা, কান জুড়িয়ে গেল। আপনি একা মানুষ, দু-দুটো বাথরুম। আর আমরা পাঁচজন, বাথরুম মোটে একখানা। বড়ো একটেরে একখানা বাথরুম পেলে আমি তো মশাই গলাও সেধে ফেলতুম। আমার বন্ধু বঙ্কা তো বাথরুমে গলা সেধেই নামকরা গায়ক হয়ে গেল। বাথরুম জিনিসটার গুরুত্ব যে কী সাংঘাতিক তা বলে বোঝানো যায় না।

তা বটে। বাথরুম সম্পর্কে আমিও কিছু ভালো ভালো কথা শুনেছি বটে। ভালো বাথরুম পেলে নাকি সুপ্ত প্রতিভা জেগে ওঠে।

অতি সত্য কথা। ছেলেবেলায় মশাই, আমার অঙ্কে বেশ মাথা ছিল। গানের গলা ছিল। দু-চার লাইন কবিতাও লিখে ফেলতুম। ওই বাথরুমের জন্যই বেগ চেপে চেপে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে গেল। আর তাইতেই প্রতিভাটাও গেল ঘোলাটে হয়ে।

খুবই দুঃখের কথা।

তার ওপর আবার মশাহীন বাথরুম! ভাবাই যায় না।

মশাহীন! না মশাহীন হতে যাবে কেন ওই যে বললুম একটা লোনলি মশা আছে।

আহা, মশাদের আর কতদিন আয়ু বলুন। ঠিক জানা নেই বটে, তবে মাসছয়েকের বেশি কী আর হবে? না হয় বছরখানেকই ধরে নিচ্ছি। ততদিনে তার ন্যাচারাল ডেথ হয়ে গেলেই তা আপনি নিষ্কণ্টক।

মুশকিল কী জানেন? কয়েকদিন আগে অবধি মশাটাকে আমি শত্রু বলে ভাবতাম বটে, কিন্তু হঠাৎ দিনকয়েক হল আমার মনে হচ্ছে, বজ্জাত হোক যাই হোক, মশাটা তো আমাকে সঙ্গও দিচ্ছে। এই যে আমি বাথরুমে গেলেই সে তার খেল শুরু করে, এতে আমার একাকিত্ব ভাবটা কেটেও তো যায় এবং বেশ একটা ফুর্তির ভাব আসে।

কথাটা কিন্তু মন্দ বলেননি। কুকুর, বেড়াল, পাখি পুষলেও কিন্তু ওরকমধারা হয়। মশা অবশ্য পোষ মানার পাত্র নয়।

পোষ মানলে মজাটাও থাকবে না।

আপনি বেশ বিজ্ঞ মানুষ। হবে-না? যার দু-দুটো বাথরুম তার 'বিজ্ঞ' না হয়ে উপায় নেই কিনা। আচ্ছা মশাই, আপনার দ্বিতীয় বাথরুমটার কথা তো কিছুই বললেন না!

ওঃ! ওটা সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততই ভালো।

কেন মশাই, কেন? সেটা কি ব্যবহারযোগ্য নয়?

না, এমনিতে সেটা খুবই ভালো বাথরুম। বিশাল বড়ো। সেটাতে আবার শ্বেতপাথরের একটা পেল্লায় বাথটাব আছে, বিরাট আয়না, রাজকীয় কমোড এবং বেশ দামি দামি সব ফিটিংস।

তা হলে সেটা ব্যবহার করেন না কেন?

একটু অসুবিধে আছে।

কী অসুবিধে মশাই?

আজ্ঞে, বললে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না।

কেন মশাই, বিশ্বাস করব না কেন?

ওই বাথরুমটা আর একজন ব্যবহার করেন।

ও, তা বিশ্বাস না করার কী আছেন বলুন? আর একজন তো ব্যবহার করতেই পারে।

তা, তো বটেই! কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে আমি ছাড়া দৃশ্যত আর কেউ থাকে না।

অ্যাঁ। তা হলে এই আর একজনটা এল কোত্থেকে?

সেটাই তো আমারও প্রশ্ন। ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে না, অথচ ওই বাথরুমটা আর কেউ ব্যবহার করছে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

বাইরে থেকে কেউ আসে না তো?

আজ্ঞে না।

তবে কি ভূতটুত কিছু?

আমি ভূতে বিশ্বাস করতাম না, এখনও করতে চাইছি না, তবে ব্যাপারটা ওরকমই।

একটু খুলে বলুন-না মশাই, শুনে শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে যে!

বলার তেমন কিছু নেই। আমি ওই বাথরুমে গেলেই বাথরুমটা যেন খুশি হয় না।

আহা, বাথরুমের আবার খুশি-অখুশি কী?

আছে মশাই, আছে। বাথরুমটা আমাকে তার যোগ্য ব্যবহারকারী বলে মনেই করে না। প্রথম দিন গিয়ে কমোডে বসতে না বসতেহ, ফ্লাশটা আপনা থেকেই অন হয়ে হুড়মুড় করে জল নেমে এল সিস্টার্ন থেকে। শাওয়ার থেকে জল পড়তে লাগল অকারণে। বাথটাবের কলটা কে খুলে দিল। দরজাটা দুম করে খুলে গেল। আমি তো পালিয়ে বাঁচি না।

এ তো পরিষ্কার ভূতুড়ে কান্ড মশাই।

তা বলতে পারেন। অন্যের কাছে ব্যাপারটা ভূতুড়ে বলেই মনে হবে হয়তো। আমার ব্যাখ্যাটা অন্যরকম।

কীরকম মশাই?

কোনো নাক-উঁচু লোক ওটা ব্যবহার করত। খুব শৌখিন লোক। আর বাথরুমটাও সেইজন্য একটু উন্নাসিক। এলেবেলে লোক তাকে ব্যবহার করুক এটা সে চায় না। তাই আমি ঢুকলেই বাথরুমটা নানা কায়দায় তার প্রতিবাদ জানায়।

কিন্তু আপনি যে বললেন, ওটা আর কেউ ব্যবহার করে।

হ্যাঁ, তাও করে। নিশুত রাতে বাথরুম থেকে খুব সুরেলা শিস শুনতে পাই, কখনো গুনগুন করে গান। দামি ওডিকোলোনের গন্ধ আসে, শাওয়ার খুলে কেউ স্নান করে টের পাই।

আপনার ভয় করে না?

না। ভূতে বিশ্বাস করি না বলেই ভয়ও পাই না।

কিন্তু অকাট্য প্রমাণ পেয়েও ভূতে বিশ্বাস করেন না কেন?

'বিশ্বাস' জিনিসটাই যে ওরকম। বিরুদ্ধ প্রমাণ পেলেও বিশ্বাস শেকড় গেড়ে বসে থাকে, টলতে চায় না।

আশ্চর্য। ভূত সামনে এসে যদি দাঁড়ায় তখনও বিশ্বাস করবেন না?

আজ্ঞে না। পরিষ্কার বলে দেব, 'ফোটো হে বাপু, তোমাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

না মশাই, এটা কিন্তু আপনার অন্যায়। ভূতকে পাত্তা না দেওয়াটা ঠিক নয়।

পাত্তা না দিলেও, ব্যাপারটা আমার খারাপ লাগে না। শিসটা বেশ সুরেলা। গানের গলাও খারাপ নয়। আর সুগন্ধিগুলো খুবই চমৎকার।

আপনি বেশ সাহসী লোক।

না মশাই, আমার ধারণা ঠিক উলটো। বরং আমি বেশ ভীতু লোক। ও-বাড়িতে আর যারা আছে তারাও বলে, আমি নাকি খুব সাহসী লোক। কিন্তু আমি তো আমার মধ্যে সাহসের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাই না।

ভূতুড়ে ফ্ল্যাটে থাকা কি সাহসের কাজ নয়?

আজ্ঞে, ভূতুড়ে ফ্ল্যাট বলছেন কেন? আপনাদের কথামতো যদি ভূত থেকেই থাকে, সে তো ফ্ল্যাটের আর কোথাও কোনো উৎপাত করে না। তার একমাত্র লক্ষ্য হল ফ্ল্যাটের ভালো বাথরুমটা। আমার কী মনে হয় জানেন?

কী মশাই?

মনে হয়, ভূত-টুত নয়, বাথরুমটাই একটু অ্যানিমেটেড হয়ে গেছে। বাথরুমটা উন্নাসিক হওয়াতেই এসব হচ্ছে। আমাকে পছন্দ করছে না। তাই আমি ওই বাথরুমটাকে অ্যাভয়েড করে চলি। ফলে কোনো ঝামেলা হয় না।

তা হলে আপনার একটা বাথরুমে একটা লোনলি মশা এবং অন্যটায় একটা শৌখিন ভূত। বেশ আছেন মশাই।

হ্যাঁ। আছি বেশ ভালোই। দিব্যি খোলামেলা ফ্ল্যাট, আলো-হাওয়া আছে।

তা কত বড়ো হবে ফ্ল্যাটখানা?

মন্দ নয়। ফ্ল্যাটের মালিক তো বিক্রির সময় বলেছিল ষোলোশো বর্গফুট। দলিলেও তাই লেখা আছে।

ষোলোশো? ও বাবা, সে তো পেল্লায় ব্যাপার! আমার কপালটা দেখুন, ধারেকর্জে তল হয়ে, গিন্নির তাড়নায় অতিকষ্টে মাত্র পাঁচশো পঁয়ত্রিশ বর্গফুটের একখানা ফ্ল্যাট কিনতে পেরেছি। তাইতেই গাদাগাদি করে থাকা। বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকার ড্রব্যাকটা কী জানেন? পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে যায়। প্রাইভেসি বলে বস্তুটাই থাকে না কিনা। এ-ঘর, ও-ঘর করতে গিয়ে গায়ে গা ঠেকে যায়। গুঁতোগুঁতি করে থাকা আর কী। আর সেইজন্যই তো যতক্ষণ পারি বাড়ির বাইরে কাটিয়ে যাই। আর আপনি রাজা-বাদশার মতো থাকেন। শুনতেও কত ভালো লাগে। কিন্তু একা মানুষ, অতবড়ো ফ্ল্যাটটা কেনার দরকারটা কী ছিল?

আজ্ঞে না, আপনাকে তো বলেইছি, অত জায়গা আমার লাগে না। তবে লোকটা ভারি সস্তায় দিল বলে নেওয়া। ফ্ল্যাটটায় বেশ হাত-পা খেলিয়ে থাকা যায় বটে।

তা কত পড়ল?

লাখ বিশেকের মধ্যেই হয়ে গেল।

বিশ লাখ। তা টাকাটা লোন করলেন বুঝি?

না, লোন নিতে হয়নি। কুড়িয়ে বাড়িয়ে হয়ে গেল।

তাহলে তো আপনি শাঁসালো লোক মশাই। গত দু-মাস ধরে আলাপ, কিন্তু আপনি যে, একজন পয়সাওয়ালা লোক তা টেরটিও পেতে দেননি তো।

টাকার কীই বা মূল্য আছে বলুন!

তা অবিশ্যি ঠিক। টাকা এখন পয়সার স্তরে নেমে গেছে। দশ পয়সা বিশ পয়সার কয়েনগুলো পর্যন্ত আজকাল কেউ নিতে চায় না। আমার কাছে গাদাগুচ্ছের পড়ে আছে। শুনছি এক টাকা দু-টাকার নোটও আর ছাপা হচ্ছে না। শুধু কয়েনগুলো চলছে। না মশাই, টাকার আর ইজ্জত রইল না। আচ্ছা মশাই, তাহলে এই উঠতি বয়সে সংসারী হচ্ছেন না কেন বলুন তো? একটা বিয়ে করে ফেলুন। মশা আর ভূত নিয়ে তো জীবন কাটানো যাবে না।

নিজের বিয়ের চেয়ে আমি পরের বিয়ে দিতেই বেশি ভালোবাসি।

সেটা কীরকম ব্যাপার মশাই?

খুব সোজা, বাংলার ঘরে ঘরে তো বিবাহযোগ্যা অরক্ষণীয়ার অভাব নেই। টাকা-পয়সার অভাবে সেইসব মেয়ের বাপ বিয়ে দিতেও পারছেন না। আমি সাধ্যমতো দু-চারটে বিয়েতে কিছু সাহায্য করতে পেরেছি। সেটাতেই আমার বেশি আনন্দ।

বা: মশাই, শুনে বড্ড খুশি হলাম। আপনার চরিত্রের এই মহৎ দিকটার কথা আমার জানা ছিল না। উঃ, কতদিন কোনো মহৎ মানুষের দেখা পাইনি। মানুষ যে এই কলিযুগেও মহৎ হতে পারে—এই ধারণাটাই করা কঠিন হয়ে পড়ছিল ক্রমশ। না মশাই, আজ আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন।

আহা, অতটা বাড়িয়ে বলার কিছু নেই। আসলে যখনই কোনো মেয়ে বা মেয়ের বাপ আমাকে এসে বিয়ে করার জন্য ধরে তখনই আমি টাকা-পয়সা দিয়ে বিয়ের বন্দোবস্ত করে নিজের গর্দান বাঁচাই। মহত্ত্ব নয়, ওটা আমার আত্মরক্ষার কৌশল বলতে পারেন।

ও-কথায় ভুলছি না মশাই, আপনি নিজের মহত্ত্বকে আড়াল করতে চাইছেন। মহৎ লোকের লক্ষণই তো তাই। নিজের মহত্ত্ব স্বীকার করলে, আর তার মূল্য কী থাকে বলুন? আপনার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। বয়সে ছোটো না-হলে আমি আপনার পায়ের ধুলো নিতুম।

ছি: ছি:, কী যে বলেন! শুনলেও পাপ হয়।

না, মশাই, না, গুণীর 'গুণ'-এর মর্যাদা দেওয়া তো বাঙালির ধাতে নেই। কিন্তু আমি সেরকম লোক নই। গুণী মানুষ দেখলে মাথা নোয়াতে জানি।

আপনি অতি উদারহৃদয় মানুষ।

না মশাই না। উদার আর হতে পারলাম কই? মাসকাবারে হাতে মোটে দশটি হাজার টাকা পাই। তাই দিয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হয়। ধারকর্জও হয়ে যায়। পাঁচটি হুমদো হুমদো প্রাণী, এসোজন, বোসোজন, অভদ্রতা, ভদ্রতা, ব্যাঙ্কের লোন শোধ দেওয়া, এল আই সি-র প্রিমিয়াম, ঠিকে ঝি-র মাইনে সব মিটিয়ে উদার হওয়ার সুযোগ কোথায় বলুন? নইলে আমারও কি ইচ্ছে করে না অরক্ষণীয়াদের বিয়ে দিই, বন্যাত্রাণে সাহায্য করি, গরিবের চিকিৎসার খরচ জোগাই? করে, খুবই ইচ্ছে করে, কিন্তু উপায় কী বলুন!

অতি ঠিক কথা। মানুষের মধ্যে মহত্ত্ব আছেই, তবে সেটা—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা ফোড়ার মতো টনটন করে, বদ্ধজীবের মতো ডানা ঝাপটায়, পাথরচাপা ঘাসের মতো চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে থাকে। তাই-না?

আপনার ‘উপমা-জ্ঞান’ অতি চমৎকার। হ্যাঁ, ওরকমই হয় বটে। তবে টাকা থাকলেই যে সবাই দানধ্যান করে তা কিন্তু নয়। এই আমার কথাই ধরুন। ভাবি বটে, অনেক টাকা থাকলে মেলা দানধ্যান করতুম, কিন্তু যদি কোনোদিন সত্যিই ছপ্পড় ফুঁড়ে টাকা আসে, তখন হয়তো মানসিক পরিবর্তন হয়ে যাবে। টাকা হলে নাকি টাকার নেশা বাড়ে। আরও টাকা, আরও টাকা করে মানুষ হেদিয়ে মরে।

আপনি বিজ্ঞ মানুষ। ঠিকই ধরেছেন। দানধ্যান করার জন্য টাকা ছারখারের চেয়েও মানসিকতার প্রয়োজন বেশি। তবে দানধ্যান বা লোকের সেবা সাহায্য করে বেড়ানোর নেশার বাড়াবাড়িও ভালো নয়। ওর মধ্যে আবার অহং প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। দানধ্যানের অহংকার অর্জিত পুণ্যের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে। কখনো-কখনো সাধ্যমতো লোককে একটু আধটু সাহায্য করলেও হয়। টাকাপয়সার চেয়ে সহানুভূতি, সাহচর্য, পাশে দাঁড়ানো এসবেরও মূল্য আছে।

আপনার কাছে বসলেই কতকিছু শেখা যায়। আচ্ছা, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি একটু অস্বস্তি এবং উদবেগের মধ্যে আছেন। কেমন যেন একটু আনমনাও। তাই না? ঠিক যেন প্রফুল্ল দেখছি-না আপনাকে?

ঠিকই ধরেছেন। সম্প্রতি আমি একটু অশান্তিতে আছি।

সে কী কথা! আপনার মতো মহৎ মানুষ যদি অশান্তিতে থাকেন তাহলে তো আমাদের-ই উদবেগের কথা। কী হয়েছে বলুন তো?

ঠিক বলবার মতো নয়।

খুব প্রাইভেট প্রবলেম কি?

হ্যাঁ, তাও বলতে পারেন। তবে আপনি সহানুভূতিশীল মানুষ। আপনাকে বলাই যায়। বিশেষ করে আমার যখন পরামর্শ দেওয়ার মতো বিচক্ষণ মানুষ কেউ তেমন নেই।

আহা, শুনে বড়ো প্রীত হলুম। আমার বউ তো আমাকে দিনরাত ‘বোকা’, ‘হাঁদা’, ‘ভ্যাবাগঙ্গারাম’, ‘আহাম্মক’ বলে গঞ্জনা দেয়। শুনতে শুনতে আমিও কেন যে ক্যাবলা হয়ে যাচ্ছি! কিন্তু একসময়ে আমারও কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল মশাই।

আছে। এখনও আছে। নিজেকে বোকা ভাবতে নেই। আমি তো আপনার কথাবার্তায় বিচক্ষণতার লক্ষণই দেখতে পাই।

ধন্যবাদ মশাই, অজস্র ধন্যবাদ। আপনি আমার হারানো আত্মবিশ্বাসটা ফিরিয়ে দিলেন। তা ব্যাপারটা কী?

আমি ব্যাচেলর বলে এবং রোজগারপাতি ভালো করি বলে, আমার কাছে কিছু মানুষ সাহায্যের আশায় আসে।

তা তো বটেই, পাকা কাঁঠাল ভাঙলে মাছি তো আসবেই। তা রোজগারপাতি আপনার কেমন হয়?

ভালোই, আমি ইঞ্জিনিয়ার, এম বি এ। কনসালটেন্সি আছে। ফলে—বুঝতেই পারছেন।

খুব পারছি, খুব পারছি, তারপর বলুন।

এই সম্প্রতি আমার গ্রাম-সম্পর্কে এক খুড়োমশাই এসে হাজির হয়েছেন।

গ্রামটা কোথায়?

নৈহাটির কাছে, গ্রাম নামেই। আসলে এখন পুরোদস্তুর শহর হয়ে গেছে। তা এই খুড়োমশাই এসে অবধি আমি কিছু অশান্তিতে আছি।

খুব টেঁটিয়া লোক নাকি?

না, না। অতি সজ্জন মানুষ, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলেছেন কি না সন্দেহ। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক, জপতপ করেন। তা ছাড়া ভারি অমায়িক ব্যবহার।

বলেন কী? এমন মানুষকে নিয়ে তাহলে আপনার অশান্তি হচ্ছে কেন?

মানুষটা এরকম বলেই অশান্তি। তিনি কলকাতায় এসে আমার বাড়িতেই উঠেছেন। তারপরই আমার আচরণ দেখে অন্নজল ত্যাগ করার উপক্রম।

বলেন কী? কী করেছেন আপনি?

বামুন হয়েও পইতে রাখি না, আহ্নিক করি না, বাসি কাপড়ে চা খাই, সদাচারের অভাব। তিনি তেজস্বী মানুষ। এসব অনাচার দেখে ভারি রেগে গিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন। আমি ক্ষমাটমা চাওয়ায় তিনি আমাকে গোবর জলটল দিয়ে শুদ্ধ করে গঙ্গাস্নান করিয়ে একদিন হবিষ্যি ভক্ষণ করিয়ে গলায় পইতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, নিয়মিত আহ্নিক করাচ্ছেন, বাসি কাপড় না ছেড়ে কোথাও কাজ করার উপায় নেই।

আহা, এসব করা তো ভালোই। প্রাচীনকাল থেকে ওসব চলে আসছে, ওর মধ্যে ভালো ব্যাপারও থাকতে পারে তো!

কিন্তু এসব করতে গিয়ে আমার মানসিক শান্তি খুবই বিঘ্নিত। ওঁর ব্রাহ্মণী অবশ্য রান্নাবান্না খুবই ভালো করেন। এতদিন আমিই যা হোক কিছু রান্না করে খাচ্ছিলাম। ওঁরা আসার পর আমার হেঁসেলে ঢোকা বারণ। আরও আশ্চর্যের কথা, খুড়ো আসার পর বাথরুমের বেয়াদবিও বন্ধ হয়েছে।

ওই দেখুন, ওকেই বলে ব্রহ্মতেজ। ভূতপ্রেত পালানোর পথ পায় না। বা:, এ তো বেশ ভালোই হয়েছে মশাই। পুজো-আচ্চা চালিয়ে যান, ভূত আর কাছে ঘেঁষবে না।

আহা, ভূতপ্রেত যাই হোক, ব্যাপারটা তো আমি উপভোগই করতাম। কিন্তু আরও একটা মুশকিল হয়েছে।

কী বলুন তো?

খুড়োর সঙ্গে খুড়িমা যেমন এসেছেন তেমনি তাঁদের একমাত্র মেয়ে সুরবালাও এসেছে কিনা।

বা:, বেশ নামটি তো। সুরবালা, এ-ধরনের পুরোনো নাম তো আজকাল রাখাই হয় না। তা তাতে মুশকিলটা কীসের?

সুরবালাই মূর্তিমতী মুশকিল।

কেন মশাই, কেন?

সুরবালার বয়স সতেরো-আঠেরো। খুবই চালাক, চতুর, একটু ফাজিল, আর....আর.....

আর? থাকগে সেসব কথা, আসল ব্যাপারটা হল, খুড়োমশাই এবং তাঁর পরিবার পেঁয়াজ-রসুন, বলির পাঁঠা ছাড়া অন্য মাংস, ডিম ইত্যাদি খান না। আমাকেও সেইসব নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছে। আর একটু-আধটু যে অনিয়ম করব তারও উপায় নেই। সুরবালা আমার ওপর রীতিমতো গোয়েন্দাগিরি করে যাচ্ছে। সেদিন ভাত খাওয়ার সময় বাঁ-হাতে জল খেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে নালিশ। বাইরে থেকে হয়তো ওমলেট খেয়ে এসেছি। ঘরে ঢুকতেই সুরবালা ঘোষণা করল, 'উনি পেঁয়াজ খেয়ে এসেছেন।' বুঝুন কান্ড।

হ্যাঁ, তা বটে, একটু-আধটু অসুবিধে তো হতেই পারে। পুরোনো অভ্যেস তো। তা ওঁরা থাকবেন ক-দিন?

আসলে ওঁরা এসেছেন সুরবালার জন্য একটি সচ্চরিত্র পাত্রের খোঁজ পেয়ে। পাত্রটি নাকি সংস্কৃতে এম এ, কোন কলেজের অধ্যাপক, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করে, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সদবংশজাত। বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। দু-পক্ষের কথাবার্তাও মোটামুটি পাকা।

বা:, তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই যাচ্ছে।

না, যাচ্ছে না।

কেন মশাই? সুরবালার বিয়ে ঠিক হয়ে গেলেই তো ওঁরা ফিরে যাবেন?

হ্যাঁ।

তাহলে?

সুরবালাকে আপনি দেখেননি।

তা তো বটেই।

দেখলেই বুঝতেন সমস্যাটা কোথায়?

দেখতে কদাকার নাকি?

না, বরং উলটো, সুরবালা ভীষণ সুন্দরী, আর...

আর?

তাকে দেখলেই আমার বুকটা ধক করে ওঠে।

এ তো ভালো লক্ষণ নয় মশাই!

না। আর বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সুরবালার দুটো চোখ সবসময়ে লাল আর ভেজা ভেজা। সেদিন আড়াল থেকে শুনলাম, খুড়িমা ওকে বকছেন, 'কাঁদছিস কেন মুখপুড়ি? এত ভালো পাত্র আর জুটবে?' জবাবে সুরবালা বলছিল, 'তোমরা কী বুঝবে কেন কাঁদছি? ও বিয়ে ভেঙে দাও।' মায়ে-মেয়েতে বেশ লেগে গেল।

তারপর?

ওইখানেই ঝুলে আছে। শুধু গতকাল যখন অফিসে বেরোচ্ছি, তখন সুরবালা দরজা দিতে এসে চাপা গলায় বলল, 'অনেক পাষাণ দেখেছি, আপনার মতো দেখিনি।'

বলেন কী মশাই? এ তো সাংঘাতিক কথা!

হ্যাঁ। সেই থেকে বড়ো উচাটন হয়ে আছি। মনে শান্তি নেই।

আহা, এতে উচাটন হওয়ার কী আছে? আরে আপনি ভূতকে ভয় পান না, দানশীল লোক, মহৎ প্রাণ, আপনার ভয়টা কীসের?

ভয়ের ব্যাপার তো নয়। এ হল ব্যাখ্যার অতীত একটা সিচুয়েশন। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা।

কেন, আমি তো বেশ বুঝতে পারছি।

পারছেন?

বিলক্ষণ।

কী বুঝলেন?

সেটা হাঁটতে হাঁটতেই বলবখন। এখন উঠুন তো, উঠে পড়ুন। খুড়োমশাই বাড়িতে আছেন তো?

আছেন, কিন্তু...

আর কিন্তু নয়, দেরি করলে কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাবে। খুড়োমশাইয়ের সঙ্গে আমার এক্ষুনি কথা বলা দরকার।

ইয়ে, তা নয় যাচ্ছি। কিন্তু....

তিন নম্বর বেঞ্চ

আচ্ছা, এটাই তো পূর্ব দিক থেকে তিন নম্বর বেঞ্চ? তাই-না?

হ্যাঁ। এটাই তিন নম্বর বেঞ্চ।

আর আপনিই কি মধু রায়?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি ঠিক জায়গাতেই এসেছি। আমার নাম নব চৌধুরী।

আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। তবে আসাটা উচিত হয়নি।

কেন বলুন তো? আমি আজ সকালেই আপনার 'এস এম এস' পেয়েছি। আপনি আমাকে এই জায়গায় দেখা করতে বলেছেন।

আপনি কি আমাকে চেনেন?

না।

তাহলে? কোন সাহসে একজন অচেনা লোকের এস এম এস পেয়ে আপনি বিনা দ্বিধায় তার কথামতো চলে এলেন?

বিনা দ্বিধায় এসেছি, এ-কথা বলা যায় না। এস এম এস-টা পেয়ে আমি অনেক দুশ্চিন্তা করেছি। অজানা নানারকম আশঙ্কাও হয়েছে। এবং তারপর বেশ ভয়ে ভয়েই এসেছি।

এ যুগে ভয় পাওয়াটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যত ভয় পাবেন ততই সুরক্ষিত থাকবেন। আসল কথা হল, আপনি একজন অবিমৃশ্যকারী এবং হঠকারী মানুষ।

আপনি কি আমাকে বকাঝকা করছেন?

করাই তো উচিত। একজন অজ্ঞাতকুলশীলের রহস্যময় বার্তা পেয়ে লেকের ধারে এই শীতের রাতে সাড়ে ন-টায় দেখা করতে আসাটা কি অবিমৃশ্যকারিতা নয়? আমি একজন গুণ্ডা, অপহরণকারী, ব্ল্যাকমেলার বা খুনিও তো হতে পারি।

তা তো বটেই। তবে কিনা কৌতূহল বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। চেনা ছকের বাইরে এই যে একটা বেশ অ্যাডভেঞ্চার বা রহস্যময় অ্যাপয়েন্টমেন্টের থ্রিলটাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আপনি কি সত্যিই গুণ্ডা বা অপহরণকারী বা ব্ল্যাকমেলার বা খুনির কোনো একটা?

হলে কী করবেন? পালাবেন, না লড়বেন?

অবস্থা বুঝে ভাবতে হবে।

বসুন।

বসলাম। কিন্তু শুনেছি রাতের দিকে পুলিশ লেকে খোঁজ নেয়। আমাদের এত রাতে বসে থাকতে দেখলে ধরে নিয়ে যেতে পারে।

আপনার চেয়ে পুলিশকে আমি একটু বেশি চিনি। আমি অনেকদিন জেল খেটেছি।

ও বাবা। আপনার অপরাধটা কী?

সেটা বলতে গেলে মহাভারত। তবে ভয় নেই, পুলিশ আসবে না। আপনি কি পুলিশকে ভয় পান?

কে না পায়?

আপনার ভয়ডর কিছু কম বলেই আমার ধারণা।

না, না, কী যে, বলেন। আমি তো ভীতুই।

কথাটা প্রশংসাসূচকভাবে বলিনি। আমি মিন করেছি, আপনি একজন আহাম্মক। আহাম্মকদের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা থাকে না। সময়মতো, পরিস্থিতি বুঝে 'ভয়' পাওয়াটাও বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণের লক্ষণ। শুধু বুক ফুলিয়ে যেখানে-সেখানে হাজির হয়ে যাওয়া কাজের কথা নয়।

কী মুশকিল! আপনিই তো আসতে বলেছেন, এলাম বলে উলটে রাগারাগিও করছেন। তাহলে কি আমি চলে যাব?

না। এসে যখন পড়েছেন তখন বসুন। তবে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে কখনো কোনো অচেনা লোকের 'এস এম এস' পেয়ে বোকার মতো কোনো অজানা ফাঁদে পা দেবেন না! বুঝেছেন? আমি উগ্রবাদী বা ভাড়াটে খুনি হলে কী করতেন শুনি?

ভেবে দেখিনি।

তার মানে এই নয় যে, আমি ভালো লোক বা আমার উদ্দেশ্য মহৎ।

বুঝলাম। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কী?

উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্যটা যে ঠিক কী তা আমিও গুছিয়ে ভেবে আসিনি। বোধহয় আপনাকে একটু মেপে নেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

আমাকে মেপে নেবেন? কিন্তু কেন? মেপে নেওয়া তো মস্তানদের ধর্ম।

তা তো বটেই। আমি তো বলিনি যে, আমি মস্তান নই।

তা বলেননি। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেকটি মানুষেরই অস্তিত্বের একটা তরঙ্গ আছে?

আছে নাকি?

অবশ্যই আছে। লোকটা বদরাগি, মারমুখো, খ্যাপাটে, কিংবা খুব নরম-সরম, ভীতু, ম্যাদাটেমারা কি না তা কাছাকাছি এলে একটু-আধটু টের পাওয়া যায়। মস্তানদের একটা ওইরকম কিছু আছে, কাছাকাছি হলে টের পাওয়ার কথা। কিন্তু আপনার পাশে বসে সেরকম কিছু পাচ্ছি না।

নিজের বোধ-বিবেচনা আর অনুভূতির ওপর আপনি বেশ আস্থাশীল। কিন্তু আমি কোমর থেকে এখন একটা ভোজালি বা পিস্তল বের করলেই আপনার আস্থা ভেঙে যাবে।

তা হয়তো যাবে। কিন্তু আমার অনুমান, আপনার কাছে ওসব নেই।

না থাকলেই বা কী? নিজের স্ত্রীকে খুন করার দায়ে আমি যে, এক বছর জেল খেটেছি সেটা ভুলে যাবেন না।

ভোলার কথা উঠছে কেন? আপনি যে স্ত্রীকে খুন করেছেন তা তো আমি জানিই না। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে এই তো আমার প্রথম দেখা হল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে। আসলে আমার সব সময়ে মনে হয় আমি যে একজন খুনি এবং নিজের বউকে মেরেছি এটা বোধহয় বিশ্বসংসারের কারো অবিদিত নেই।

নিজের স্ত্রীকে খুন করেছিলেন নাকি?

লোকে তো তাই বলে। আদালতের রায়েও তাই বলা হয়েছিল।

সেক্ষেত্রে যতদূর জানি, আপনার যাবজ্জীবন বা ফাঁসিটাসি হওয়ার কথা। মাত্র এক বছরের জেল হওয়ার তো কথা নয়।

যাবজ্জীবনই হয়েছিল।

তাহলে কি আপনি জেল থেকে পালিয়ে এসেছেন?

না। তবে চেষ্টা করেছিলাম। খুব চেষ্টা করেছিলাম জেল ভেঙে পালানোর। দু-বারই ধরা পড়ে যাই। আমার 'ক্লস্ট্রোফোবিয়া' আছে। বন্ধ জায়গায় থাকতে পারি না। দমবন্ধ হয়ে আসে, মাথা পাগল-পাগল লাগে। দ্বিতীয় কথা, আমার মেয়েটা আন-অ্যাটেণ্ডেড ছিল, তার জন্যও জেল থেকে পালিয়ে আসা খুব জরুরি ছিল আমার।

আপনাকে কি সরকার-বাহাদুর দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে?

হাসালেন মশাই। দুনিয়ার কোনো দেশে কি দয়ালু সরকার বলে কিছু আছে? সব দেশেরই সরকার হল অন্ধ, কালা, বোবা এবং হৃদয়হীন। মানুষের জন্য তারা আজ অবধি কিছুই করেনি। 'সরকার' মানেই হচ্ছে একটা সিস্টেম। আর সেই সিস্টেমটা যারা চালায় তাদের অধিকাংশ হল, এই সিস্টেমের যন্ত্রাংশের মতো। সিস্টেমটা যা বলায় এবং করায়, তারাও তাই বলে এবং করে। কিন্তু এসব কথা একটু কচকচির মতো হয়ে যাচ্ছে।

বুঝেছি। আপনি বরং জেল থেকে কী করে মাত্র এক বছর পর ছাড়া পেলেন সেইটে বলুন।

আমি জেলে যাওয়ার ছয়মাস বাদে আমার মেয়েটা কথা কয়ে উঠল যে!

সে কী? আপনার মেয়ে কি তার আগে বোবা ছিল?

না। কিন্তু নিজের চোখের সামনে মাকে খুন হতে দেখেই সম্ভবত মানসিক ধাক্কায় তার সাময়িক বিকার ঘটে। ফলে সে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সাড়াশব্দহীন, বিভ্রান্ত এবং বোবা। চোখের চাউনিও ভ্যাকান্ট। ছয়মাস সে চুপ করে বসে থাকত। চলাফেরা ছিল অসংলগ্ন, আচরণ ছন্নছাড়া, আলো দেখলে ভয় পেত, জোরালো শব্দ শুনলে চমকে উঠত।

কে তাকে দেখে রাখত?

আমি একটু একা মানুষ। মা-বাপের একমাত্র সন্তান। মা-বাবা দুজনেই একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। মা বুকে আগলে রেখেছিলেন বলেই শিশু আমি বেঁচে যাই। তারপর বিপত্নীক দাদু পেলেপুষে খানিক বড়ো করে দিয়ে গত হলেন। এক জ্যাঠা ছিলেন। তিনি পাঁড়মাতাল, জেঠিমা চিররুগণা। তাঁদের ঘাড়ে ভর করে কিছুদিন কাটে। কিন্তু জ্যাঠতুতো তিন দাদাই ছিল ষন্ডা-গুণ্ডা এবং বখা ছেলে। সেখানে টিকতে পারিনি বেশিদিন। মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই আমি টিউশনি করে পেট চালাতে থাকি। বাবার চাকরির সুবাদে কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছিল। কষ্টেসৃষ্টে 'সিএ' পাশ করে যাই।

সি এ? ওরে বাবা! আপনি তো রীতিমতো—

দুনিয়ায় কয়েক লক্ষ সি এ আছে। উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। এটা দারিদ্র্য বা দারিদ্র্যমোচনের গল্প নয়।

তাহলে বললেন যে!

আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার জেল খাটার সময় আমার মেয়েকে কে দেখে রাখত! সেটা বলার জন্য এই পটভূমি দরকার ছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাকগ্রাউণ্ড বলেও একটা ব্যাপার আছে।

আমি জানতে চাই, আমি কি আমার অটোবায়োগ্রাফিটা যথেষ্ট সংক্ষেপে বলতে পেরেছি?

হ্যাঁ। মাত্র তিন মিনিট বত্রিশ সেকেণ্ড লেগেছে।

আপনি বেশ ফাজিল এবং তরলমতি।

আসলে কী জানেন? আমি দুঃখের কথা বেশিক্ষণ শুনতে পারি না। একটু হাঁফ ধরে যায়।

অল্প বয়সের ধর্মই তাই। তবে দুনিয়ায় দুঃখের গল্প, সংখ্যায় সুখের গল্পের চেয়ে অনেক বেশি।

তা বটে। কিন্তু সি এ পাশ করার পর আর তো দুঃখ থাকার কথা নয়। কারণ, আমাদের বেশির ভাগ দুঃখের গল্পই তো অর্থনীতি রিলেটেড। তাই-না?

হ্যাঁ, কিছু কিছু প্রচলিত মতবাদ সে কথাই বলে। এটা ঠিকই যে, আর্থিক অভাব ঘুচলে পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখই অন্তর্হিত হয়। তারপর যেগুলো থাকে সেগুলোকে টাকাপয়সার প্রাচুর্য দিয়ে তাড়ানো যায় না। আর সেই কারণেই সেগুলো ভয়ংকর।

তার মানে কি, এরপর আরও কোনো ভয়ংকর দুঃখের গল্প আসছে?

না, ভয় পাবেন না। আমি শুধু বলতে চাইছি, টাকাপয়সা ছাড়াও আর একটা ব্যাপার থেকে দুঃখ বা প্রবলেম উপজাত হয়, সেটা হল 'রিলেশন'।

রাইট। রিলেশনের কথাটা আমি ঠিক ভেবে দেখিনি।

রিলেশনগুলোর মধ্যে আবার সবচেয়ে সেনসিটিভ হল স্বামী-স্ত্রী রিলেশন।

আমি এটাই এক্সপেক্ট করছিলাম। আফটার অল এটা তো বধূহত্যারই গল্প।

হ্যাঁ, এটা বধূহত্যারই গল্প। খুনের উপকরণ বা হাতিয়ার হিসেবে ফ্লিভার জিনিসটাকে আপনার কেমন মনে হয়?

'ফ্লিভারটা' কী জিনিস বলুন তো?

কসাইখানায় দেখেননি, হাতল লাগানো চৌকোমতো একটা ইস্পাতের ভারী চপার গোছের, যা দিয়ে হাড়টাড় কাটে।

প্লিজ, আপনি আর ডিটেলসে যাবেন না, ওসব রক্তমাংস আমার একদম সহ্য হয় না।

তাহলেই বুঝে দেখুন, শুনেই আপনার যদি রি-অ্যাকশন হয় তাহলে চোখে দেখে আমার চোদ্দো বছরের মেয়েটার কী অবস্থা হয়েছিল। তার ওপর নিজের মা।

বোঝা একটুও শক্ত নয়, খুব বুঝতে পারছি। তবে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমি শুনতে চাই না।

চিন্তিত হবেন না, সে-ঘটনা বলার জন্য আপনাকে ডাকিনি। আসলে বলতে চাইছি, আমি একজন জেল-খাটা লোক।

ছয়মাস বোবা থাকার পর আপনার মেয়ে হঠাৎ কি একদিন কথা বলে উঠল?

হ্যাঁ।

এখানে আমার একটা প্রশ্ন।

করুন।

আপনি কি আমাকে চেনেন?

না।

তাহলে এ-কথাগুলো আমাকেই কেন বলা দরকার?

আপনি শুনতে না চাইলে না-ও শুনতে পারেন। শুভরাত্রি।

আরে না, না। রাগ করলেন নাকি? একটু কৌতূহল হচ্ছে। আর কিছু নয়। গল্পটা ইন্টারেস্টিং, বলুন।

কোথা থেকে বলব?

মনে হচ্ছে সবটাই শোনা ভালো। তবে বীভৎস রস যতটা সম্ভব বর্জন করে।

আপনি কোমলহৃদয় মানুষ।

তা বলতে পারেন।

আমার অফিসটা আমার বাড়ির কাছেই। আমি রোজ লাঞ্চ করতে বাড়ি আসতাম। কিন্তু যেদিন দুপুরে আমার স্ত্রী খুন হন, সেদিন আমি বাড়ি আসিনি। কারণ তার আগের দিন মুম্বাই থেকে একটা বড়ো কোম্পানির এক বড়োকর্তা আমাকে ফোনে একটা খুব বড়ো অফার দেন। এবং পরদিন আমাকে পার্কস্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেন। সেখানেই কথাবার্তা পাকা হওয়ার কথা। আমি স্ত্রীকে সেটা জানিয়ে

রেখেছিলাম। লাঞ্চে আমি ট্যাক্সি নিয়ে পার্কস্ট্রিটে যাই। কিন্তু সেই রেস্টুরেন্টে আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে ছিল না নির্দিষ্ট টেবিলে। আমি একটু বোকা বনে ফিরে আসি।

সেই সময়েই খুনটা হয়ে গিয়েছিল তো!

হ্যাঁ। আই ওয়াজ ফ্রেমড, ভেরি টাইটলি ফ্রেমড। প্রথম কথা আমার কোনো অ্যালিবাই ছিল না। দ্বিতীয় কথা, আমি ছাড়া অন্য খুনি হলে একমাত্র সাক্ষী হিসেবে আমার মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখত না। তাকেও মারত, আর সেটাই স্বাভাবিক। তৃতীয় কথা, খুনের একমাত্র সাক্ষী আমার মেয়ে আমার সপক্ষে কোনো কথা বলতে পারেনি। যদিও মোটিভের অভাব, আমার অতীতের জীবনযাপনের রেকর্ড ইত্যাদি মোটামুটি ফেভারে ছিল। কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এটিকে বধূনির্যাতন, অনাদায়ী পণ এবং অন্যান্য নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আর তাতে তারা সফলও হয়। আমার উকিল বাঁচানোর চেষ্টা করেও হেরে যায়।

খুনটা তাহলে কে করেছিল?

সেটা এ-গল্পে অপ্রাসঙ্গিক। এটা ক্রাইম অ্যান্ড ডিটেকশনের কাহিনি নয়। মোটকথা, আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, আজও অনেকে করে না।

আপনার সম্পর্কে আপনার শ্বশুরবাড়ির ধারণা এখন কীরকম?

জানি না। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে গেছে।

তাহলে আপনার মেয়ে? আপনি জেলে যাওয়ার পর তার কী হয়েছিল?

আমি আদালতে আর্জি জানিয়েছিলাম, আমার মেয়েকেও আমার সঙ্গে জেলে রাখা হোক। আদালত তা নাকচ করে ওর দাদু-দিদিমাকেই কাস্টডিয়ান করে দিয়েছিল।

বুঝলাম, আপনার বেশ খারাপ সময় গেছে।

খুব খারাপ। তবে একটা ভালো ব্যাপারও হয়েছিল, বলা যায় মন্দের ভালো। আমার মেয়ে যখন তার মামাবাড়িতে আশ্রয় পেল, তখন সেখানে দিনরাত আমার নিন্দেমন্দ হত। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল খুনটা আমারই হাতের কাজ। আমার মেয়ে সেগুলো শুনতে পেত। তারা মাথা তখন বিভ্রান্ত, তবু সেই কথাগুলো তার মাথায় কোনো-না-কোনোভাবে ধাক্কা দিতে থাকে। খুব আবছাভাবে সে বুঝেছিল, তার বাবা বিপন্ন। কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। ছয়মাস বাদে, একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই সে হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পায় এবং চিৎকার করতে থাকে। চিৎকার করে সে শুধু একনাগাড়ে একটা কথাই বলে যাচ্ছিল, 'আমার বাবা খুন করেনি। আমার বাবা খুন করেনি...'

ভেরি ইন্টারেস্টিং!

হ্যাঁ। তাতে অবশ্য আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বিব্রত হয়ে পড়ে এবং তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টাও হয়। শুনেছি তার মেজোমামা তাকে মারধরও করেছিল। কিন্তু আমার মেয়েটা খুব স্টাবোর্ন। সে ওই কথা থেকে নড়েনি। আর তার চেঁচামেচিতেই পাড়াপ্রতিবেশীরা এসে জড়ো হয় এবং একটা জনমতও তৈরি হতে থাকে। শেষ অবধি জনমতের চাপেই কেস রি-ওপেন হয়। নতুন করে সাক্ষী নেওয়া হয়, আমার মেয়ে পুলিশের কাছে এবং আদালতে খুনটার নিখুঁত বিবরণ দিয়েছিল।

আর তার সাক্ষ্যতেই আপনি ছাড়া পেলেন তো?

হ্যাঁ। বেকসুর খালাস।

কিন্তু খুনটা! সেটা কী করে হয়েছিল?

আমি আপনাকে আমার স্ত্রীর হত্যাকান্ড বা তজ্জনিত কল-আউট শোনাব বলে ডাকিনি। কিন্তু কথাটা কেন যে সেদিকেই গড়িয়ে গেল কে জানে! আপনি কি এতে কোনো ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন? চারদিকে নানাভাবে মানুষ খুন হচ্ছে, কোনো-না-কোনো কারণে। ব্যাপারটা বড্ড জলভাত হয়ে গেছে, তাই-না?

কোনো কোনো ঘটনা আছে যা ম্যাগনেটের মতো কথাকে টেনে নেয়। আপনি অন্য প্রসঙ্গে গেলেও, কথার গতি খুব অদ্ভুতভাবে সেইদিকেই মুখ ফেরায়।

তার মানে কি ব্যাপারটা খানিকটা ভৌতিক?

আমি ভূতে বিশ্বাসী নই।

আমিও নই। তবে কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। কথার একটা নিজস্ব ইনার্সিয়া আছে। হ্যাঁ, আপনাকে যেন কী বলছিলাম?

আপনার স্ত্রীর খুনের ঘটনাটা। আমরা এক জায়গায় থেমে আছি। আপনি একটা চৌকাঠে ঠেকে গেছেন। আর এগোতে চাইছেন না। অবশ্য গোপন করার মতো কিছু থাকলে আমিও আর জানতে চাইব না।

যে-ঘটনা সবাই জানে, যা নিয়ে খবরের কাগজ এবং টিভিতে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা হয়েছে তার আবার গোপনীয়তা কীসের? এখন অবশ্য সবাই ভুলেও গেছে। ঘটনাটা পাঁচ বছর আগেকার। মাস মেমরি পুরোনো কথা মনে রাখতে পারে না।

তা তো ঠিকই। গোপন করার মতো কিছু না থাকলে আমি এর শেষটা জানতে চাই।

খুনি কে, তা তো?

হ্যাঁ।

আমার মেয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়ে যা বলেছিল তা হল এই যে, সেদিন সে স্কুলে যায়নি। প্রাক্তন হেডমিস্ট্রেস মারা যাওয়ায় স্কুল বন্ধ ছিল। দুপুর একটা নাগাদ কলিংবেলের আওয়াজ পেয়ে সে গিয়ে দরজা খোলে। যে-লোকটা ঘরে ঢোকে সে বেশ লম্বা-চওড়া, সবুজ শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা, চাপ-দাড়ি আছে, ডান হাতে বালা। লোকটা তার এবং আমাদেরও চেনা। নাম সংগ্রাম সিংহ। মাঝে মাঝে লোকটা তাদের বাড়িতে আসত। তার বাড়ি কোথায় তা সে জানে না। তবে সে তাকে ‘কাকু’ বলে ডাকত। মায়ের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব ছিল বেশি। সেদিন বাড়িতে এসে সংগ্রাম সিংহ নাকি তার মাকে সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। মা যেতে চায়নি। এ-নিয়ে দুজনের মধ্যে একটু মান-অভিমান-মতো হয়। অবশ্য তখন সে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল। দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিল, সংগ্রামের সঙ্গে তার মায়ের কথাবার্তা ক্রমে ঝগড়ার পর্যায়ে যাচ্ছে। আর তারপরেই তার মায়ের আর্তনাদ। সে ছুটে এসে দেখে সংগ্রাম সিংহ সদর দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তার মা পড়ে আছে মেঝের ওপর।

এই সংগ্রাম সিংহ লোকটা কে?

আমি জানি না।

তাহলে আপনার চেনা লোক হল কী করে?

আমি আমার মেয়ের জবানিটা বলছি. কথাগুলো আমার নয়, আমার মেয়ের।

বুঝতে পারলাম না। সংগ্রাম সিংহ কি তাহলে—?

আমার স্ত্রীর গোপন প্রেমিক কি না? বোধহয় না। আমার স্ত্রীর কোনো প্রেমিক ছিল বলে আমার জানা নেই।

সংগ্রাম সিংহকে জেরা করে কিছু জানা যায়নি?

পুলিশ তাকে খুঁজে পায়নি।

অ্যাবসকণ্ডি?

হবে হয়তো, আমি জানি না।

কী করত লোকটা?

আমার মেয়ের ভার্সন অনুযায়ী সংগ্রাম সিংহ একজন ব্যবসায়ী। বড়োবাজারের দিকে কোথাও তার বাবার আড়ত আছে।

তাহলে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না কেন?

কয়েকজনকে সন্দেহবশত ধরা হয়েছিল। তবে আমার মেয়ে তাদের আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। ডাক্তার বলেছিল, ওর মেমরি এখনও অর্ডারে নেই।

আপনাকেও নিশ্চয়ই সংগ্রাম সিংহ সম্পর্কে জেরা করা হয়?

হ্যাঁ। আমি আমার মেয়ের কথারই পুনরাবৃত্তি করে যাই। একথাও বলি যে, আমি তাকে আমার স্ত্রীর বন্ধু হিসেবেই একটু-আধটু চিনতাম। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই।

ফোন নম্বর-টম্বর?

হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর ফোনবুকে সংগ্রাম সিংহের মোবাইল নম্বর পাওয়া যায়। কিন্তু সেই নম্বরের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

ধরা গেল না তাহলে?

পুলিশ ধরতে না পারলেও আমি ধরেছি।

আপনি! কীরকম?

ছাড়া পাওয়ার পর আমি একদিন আমার মেয়ে স্কুলে যাওয়ার পর তার ঘরে একটা বই খুঁজে পাই। ইংরিজি গোয়েন্দা গল্প। বইটায় একটা বিশেষ পেজমার্ক দেখে সন্দেহ হয়েছিল। সেই জায়গাটা খুলে দেখি, সেখানেও একটি চোদ্দো বছরের মেয়েকে তার মায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে জেরা করা হচ্ছে আর মেয়েটা একটা কাল্পনিক আততায়ীর বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে। এবং সেখানেও সে তার বাবাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল।

তার মানে সংগ্রাম একটা ফিকটিশাস ব্যাপার?

হতে পারে।

তাহলে খুনটা কে করল?

আবার বলছি, আমার স্ত্রীর মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাই, আমার মেয়ের কথা। আমার মেয়ে অত্যন্ত ইনোভেটিভ, স্টাবোর্ন এবং যাকে ভালোবাসে তাকে রক্ষা করার জন্য সব কিছু করতে পারে। তার বয়স এখন উনিশ, সে বুদ্ধিমতী, সুলক্ষণা।

ও।

তার নাম পূর্ণা। পূর্ণা রায়।

মাই গড। আপনি পূর্ণার বাবা?

হ্যাঁ, পূর্ণা আমাকে বলেছিল, 'আমি ওকে আমার কথা কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু আমি চাই তুমি ওকে বলো। আমি আপনাকে বললাম।'

বুঝতে পারছি। পূর্ণা দুষ্টু আছে।

ধন্যবাদ। আপনি অনুমতি দিলে আমি এবার উঠব।

শুনুন, দয়া করে 'আপনি-আজ্ঞে' করবেন না। সেটা ভালো শোনাবে না।

তথাস্তু।

পাত্রী

কে ও? শিবাই নাকি রে?

যে আজ্ঞে। শিবাই-ই বটি।

তা পাত্রী পছন্দ হল?

না জামাইদা, এটাও লাগসই নয়। দাঁত উঁচু।

দাঁত উঁচু? তা কত উঁচু? মুখ বন্ধ হয় না?

তা হয়।

আজকাল তো শুনি উঁচু দাঁতের বেশ কদর হয়েছে নাকি? ফিলম আর সিরিয়ালে নাকি উঁচু দাঁতের বেশ কদর।

আপনি তো ওসব দেখেন টেখেন না, তবে জানলেন কীভাবে?

দেখার সময় কোথায় যে দেখব? তবে ভচ্চার্য ঠাকুরমশাই বলেছিলেন বটে, অঘোর হে, আজকাল উঁচু দাঁতের ছড়াছড়ি।

ঠাকুরমশাই? নিমুবাবুর বাড়িতে ঠাকুরমশাইকে দেখেছি বটে বারকয়েক, টিভির সামনে বসে ঘাড় কাত করে রোজ সন্ধেবেলা তোফা ঘুম দেন।

ফাঁকে ফাঁকে দেখেন আর কী। তার ঘরদোর কেমন দেখলি?

আজ্ঞে ওসব ভালো, পাকা একতলা। বাড়িতে টিউবওয়েল। গুনে দেখলাম, বাড়ির হাতায় অন্তত শ-দেড়েক সুপুরি গাছ। দুটো পুকুর। আমবাগান। জমি-জিরেত।

লাগিয়ে দিলে পারতি।

দাঁতে আটকায় যে! না-হলে লাগিয়েই দিতাম।

মেয়ের যেমন দাঁত উঁচু, তেমনি তোর আবার নাক উঁচু। বলি দামড়া, বয়েসটা খেয়াল আছে? ছত্রিশ পেরোলি কিন্তু!

আমার আর বিয়ে হওয়ার নয়। বিয়ে না হয় না হোক, যেমন তেমন একটা ধরে আনলে আমার হবে না।

ভাবিয়ে তুললি। আয় বারান্দার চৌকিতে বসে একটু ভাবি। জ্যোৎস্নাটা খুব ফিনকি দিয়েছে আজ। তোর সঙ্গে গিয়েছিল কে?

গদাই, পবন আর মেসোমশাই।

তারা কী বলে?

মেসোমশাইয়ের কথা আর কবেন না। যাকে দেখে তাকেই পছন্দ। পবন আর গদাই বলল, চলবে না।

তাহলে এগারো নম্বরেরটাও আউট।

যে-আজ্ঞে।

দশ নম্বরটার যে কী দোষ ছিল?

সেটা তো আপনিই বাতিল করলেন, মনে নাই?

নাকি? ওঃ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পাত্রীর ভৌম দোষ ছিল। বড়ো মুশকিলেই পড়া গেল রে! তোর মা, বাপ, দিদি সবাই যে তোর বিয়ের জন্য বড়ো পাগল হয়ে পড়েছে। জুতসই পাত্রীই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ পথে-ঘাটে কত সুন্দরী মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী ব্যাপার বল তো?

দেখেন জামাইদাদা, আমার মেয়েছেলে দেখার চোখও নাই, রোখও নাই। আমি কাজ-কারবার নিয়ে ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে আছি। আপনারা সবাই ধরে-পাকড়ে পড়লেন বলে, ঘাড় কাত করতে হয়েছে। বলি কী, এবার আমাকে রেহাই দেন।

কস কীরে ডাকাত, তোর বিয়ে দিতে না পারলে যে, আমার অন্নজল বন্ধ হবে।

'ললাটের লিখন' বলেও তো একটা কথা আছে। আমি ভেবে দেখলাম এইভাবে মেয়ে দেখে বেড়ানোটাও ঠিক হচ্ছে না। মেয়েগুলোরও তো একরকম অপমানই হচ্ছে। এটাও ঠিক না। আর এই 'বিয়ে-বিয়ে' হুল্লোড়ে আমার কাজ-কারবারেও লোকসান হচ্ছে। বিষাণগড়ের ইটভাঁটিতে গন্ডগোল, ন্যাজাতের কারখানার ওভারহল করা দরকার, বৈদ্যপুরের বিস্তর পাওনা উশুল করা পড়ে আছে।

তা বললে কী হয় রে পাগল? তোর বুড়ো বাপ-মা যে তোর ভরসাতেই বেঁচে আছে। কাজ-কারবারের জন্য ভয় নেই। ও দু-দিনেই সামলে নিতে পারবি। আর ক-টা দিন থেকে যা। শনিবারে বিষ্ণুপুরের মেয়েটাকে দেখে নিলেই হয়।

ও আপনারা দেখেন।

শুনেছি এ-মেয়েটা বড়োই ভালো। দেখতে শুনতে সুন্দর, লেখাপড়া জানে, তার ওপর নাকি ভারি বুদ্ধিমতী। বুদ্ধিমতী মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

আমাকে ছেড়ে দেন। কাজ-কারবার লাটে উঠবে এরকম চলতে থাকলে।

একটা কথা কবি?

কী কথা?

চন্ডীপুরের মেয়েটাকে তোর পছন্দ হল না কেন?

সে তো বলেই দিয়েছি।

তেমন ভেঙে বলিসনি। আরও একটা কথা।

বলেন।

তোর মেসোমশাই দিনকয়েক আগে আমাকে বলেন, 'শিবাই মেয়ে পছন্দ করবে কী, ও তো কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়েই দেখে না। হয় মাথা নীচু করে বসে থাকে, নইলে জানলার বাইরে তাকিয়ে মাটঘাট, গাছপালা আর গোরু-ছাগল দেখে।'

তাই নাকি?

কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়।

বলিস কী? পাত্রী ফেলে গোরু দেখিস, এ তোর কেমন স্বভাব?

মায়া-মতিভ্রমকে যে বড়ো ভয় পাই দাদা।

বুঝিয়ে বল।

খাজিরগঞ্জের লালকমলকে মনে পড়ে? ওই যার কবিরাজি ওষুধের কারবার।

তা মনে থাকবে না কেন? লালকমলের বাতের মালিশের খুব নাম।

সে-ই। লালকমল হরিশ্চন্দ্রপুরে নিজের জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে প্রথম দর্শনেই কাত হয়ে পড়ল। তেমন মেয়ে নাকি ভূ-ভারতে নেই। বিয়ের পর রংটং উঠে যাওয়ার পর বউয়ের চেহারা যা বেরোল তা কহতব্য

নয়। সে নয় চেহারা ভগবানের দান বলে সে-কথা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু মেয়েটার চোখে নাকি মায়াদয়া ঝরে পড়ছিল, আর ঠোঁটে করুণার হাসি। বিয়ের পর আর সেসব খুঁজে পাওয়া গেল না। বজ্জাত মেয়েছেলেটা এখন লালকমলের ঘাড়ে মুষলের মতো চেপে বসে তার প্রাণ ছিবড়ে করে ছাড়ছে। দেখা হলেই লালু বড়ো কান্নাকাটি করে। ওইটেই বড়ো ভয় পাই। কার দিকে তাকিয়ে মতিভ্রম হয় বলা তো যায় না। তাই তাকানোর বখেরায় আর নেই।

এ তো বড়ো গন্ডগোলের কথা রে শিবাই, না তাকিয়ে বুঝবি কী করে কার দাঁত উঁচু, কে ট্যারা, কে কালো বা কুচ্ছিত।

তাকানোর দরকার কী? আর সবাই তো ড্যাব ড্যাব করে দেখছে। তাই তো বলছি, আমার দেখা না-দেখা সমান। আপনারা ধরেবেঁধে জুতে দিলে কিছু করার থাকবে না। কিন্তু বউ যদি বাড়িতে অশান্তি করে তবে আপনাদের দায়িত্ব।

হুঁ। বড়ো ভাবনায় ফেললি দেখছি। মনে হচ্ছে তোর বিয়ের মতলব নেই।

সে কথা তো কেউ কানেই তুলছে না। আমি তো বলেই আসছি যে, সংসারধর্ম আমার জন্য না।

তাই বললে কী হয় রে পাগলা? তোর বাবা-মা, দিদিরা যে আমাকে উস্তম-পুস্তম করে ছাড়ছে বয়েসের ছেলে, বিয়ে না দিলে যে বুড়ো বয়েসে আধপাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। তা বিয়েতেই বা তোর এত আপত্তি হচ্ছে কেন? ফকির-বৈরাগী-কাঙাল—কে না বিয়ে বসেছে বল তো? 'বয়োধর্ম' বলেও তো কথা আছে? তার ওপর রোজগারপাতি ঠাকুরের ইচ্ছায় তো মন্দ করছিস না। কয়েক লাখ টাকার কারবার। তা এ-সবেরই বা কী বিলিব্যবস্থা হবে বল তো? তোরটা খাবে কে?

দশ ভূতে লুটে খাবে। তাই-বা মন্দ কী? আমার কাজটুকু আমি করে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে কী হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কী আছে?

আমার সঙ্গে যখন তোর দিদির বিয়ে হয় তখন তুই কতটুকুন ছিলিস মনে আছে? মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখন তোর। সেই থেকে তোকে এত বড়োটি হতে দেখলাম। কিন্তু তোর মতিগতি যে ভালো বুঝতে পারি, তা নয়। সব কথা খোলসা করে বলিসও না। স্বভাব চাপা হলে অন্য সকলের মুশকিল হয়।

আমার মতিগতি কিন্তু জটিল-কুটিল না। আসলে আমি 'বিয়ে' ব্যাপারটায় তেমন আগ্রহ বোধ করি না। কাজ-কারবার নিয়ে মেতে থাকতে ভালোবাসি।

দাঁড়া। একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

কী কথা?

শীতলকুচিতে তোর একটা ঠেক ছিল-না?

ছিল। পানের বরজ করে বড়োলোক হওয়ার বাই চেপেছিল মাথায়।

হ্যাঁ। বছর দুই চেষ্টাও করলি।

ওসব পুরোনো কথা তুলে কী হবে?

তখন কানাঘুসো শুনেছিলাম, মহীতোষ রায় নামে এক ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে তোর নাকি একটা খটামটি লেগেছিল।

ঠিকই শুনেছিলেন।

ব্যাপারটা কী খুলে বলবি?

হঠাৎ সেই বৃত্তান্ত শুনতে চান কেন?

সেই মেয়েটার সঙ্গে তোর ঝগড়াটা কীসের?

ও বাদ দেন। মেয়েমানুষদের সঙ্গে ঝগড়ায় গেলে মুশকিল। আমি তেমন রোখাচোখা মানুষও তো না।

ঝগড়াটা কী নিয়ে?

সে তো চুকেবুকে গেছে।

মনে করে দেখ তো, মেয়েটার নাম কি মাধবী রায়?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে কে বলল? মাধবীর নাম তো আপনার জানার কথাই নয়।

শীতলকুচির লক্ষ্মীভান্ডার তো আমার কাছ থেকেই মাল নেয়।

তাই নাকি?

আমাকে মাসে একবার-দুবার যেতেই হয়। গোরাচাঁদ সিংহ রায় শীতলকুচির মস্ত মহাজন। 'লক্ষ্মীভান্ডার'-এর মালিক।

চিনি। আমি যার কাছ থেকে পানের বরজ কিনেছিলাম সেই মহেশ রায়ের ভায়রাভাই হল গোরাচাঁদ। লক্ষ্মীভান্ডারের তখন এমন ফলাও অবস্থা ছিল না।

তা কথায় কথায় গোরাচাঁদকে বলেছিলাম তোর কথা। তখন গোরাই বলল তুই মাধবীর সঙ্গে কী একটা গন্ডগোলে শীতলকুচি ছেড়ে চলে এসেছিলি। গন্ডগোলটা কীসের তা অবশ্য সে বলতে পারল না।

বলার মতো কিছু নয়। তখন খুব বোকা ছিলাম তো, অভিজ্ঞতাও হয়নি। তাই অপমানটা হজম করে চলে আসতে হয়। তবে ওসব আমি তো আর মনে রাখিনি। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কী হবে বলুন?

ঝগড়াটা কী নিয়ে?

শুনলে হাসবেন।

বলেই দেখ না।

বলতে বাধো বাধো ঠেকে। শত হলেও আপনি গুরুজন। ওসব কথা বলতে গেলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।

তোকে আমি সাঁতার কাটতে শিখিয়েছি, সাইকেলে চড়তে শিখিয়েছি, আমার কাঁধেও চড়েছিস অনেক। আমার কাছে তোর লজ্জা কীসের? বয়েসকালে যদি কিছু করেও ফেলে থাকিস সেটা বয়েসের ধর্ম। সকলেরই একটু-আধটু বেপরোয়া ঘটনা ঘটে।

শীতলকুচিতে আমি একটু কুসঙ্গে পড়ে যাই। সন্ন্যাসীচরণ প্রতিহারের বাড়িতে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। প্রথম চোটেই পানের বরজ থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকা নাফা হয়েছিল। বয়েস কম, হাতে খোলামকুচির মতো টাকা, বুঝতেই পারেন।

তা পারি।

কয়েকজন মোসাহেব বন্ধু জুটে গেল। তারা আমাকে মদটদ খাওয়াত। আমারও ফিকে মতো নেশার রং ধরে গেল। রোজই সন্ধের পর আমার ঘরে পাঁচ-সাতজন জুটে যেত। তাদের মধ্যে একজন ছিল অবনী ঘোষ। অবনীর চেহারা ভালো ছিল, পেটে বিদ্যেও ছিল, আবার উড়নচন্ডীও ছিল। তবে সে একটু আলাদা রকমের ছিল, অন্যদের মতো আমার মোসাহেবি করত না। কিন্তু আমার পয়সায় নিয়মিত মদ খেত, কারণ তার বিশেষ পয়সা ছিল না। গন্ডগোলটা এই অবনীকে নিয়েই।

তাই নাকি?

মাধবীর সঙ্গে নাকি অবনীর বিয়ের সব ঠিকঠাক। সেসব আমার জানার কথাও তো নয়। কিন্তু একদিন সকালবেলায় বরজে রওনা হচ্ছি, হঠাৎ ফর্সা, চোখে চশমাঅলা একটা মেয়ে হাজির। সঙ্গে গাঁয়ের কয়েকজন মাতব্বর।

তাদের মধ্যে কি গোরাচাঁদও ছিল?

না। তবে তার বাবা প্রতাপচাঁদও ছিল। তারা এসেই আমাকে মাতাল, বদমাশ, দুশ্চরিত্র, আরও অনেক কথা বলে প্রচন্ড চেঁচামেচি বাঁধিয়ে দিল।

মাধবীও কি গালাগাল করছিল?

তা তো বটেই। কী রাগ মেয়েটার। বলল, আমি নাকি গাঁয়ের ছেলেদের নেশাভাং ধরাচ্ছি, ছেলেদের মরালিটি নষ্ট করে দিচ্ছি। আরও কত কী! ভগবান জানেন, আমার মাতাল বন্ধুরা সবাই অভ্যস্ত মাতাল, আর

তারাই আমাকে মদটদ খেতে শিখিয়ে নিয়ে তারপর আমার ঘাড় ভেঙে মদ খেত। কিন্তু আমার কথা কে আর কানে তোলে বলুন? ফটিক দাস নামে একটা গুণ্ডাগোছের লোক তো আমাকে কয়েকটা চড়চাপড়ও মেরেছিল। ভয়ে আমি তখন জবুথবু।

তারপর কী হল?

কী আর হবে? চারদিকে ভিড় জমে গেল। সবাই ছিছিক্কার করছে। একমাত্র সন্ন্যাসী প্রতিহারই আমার পক্ষ নিয়ে দু-চার কথা বলেছিল। সে মাধবীকেই বলল, অবনীকে শিববাবু মদ ধরিয়েছে এ-কথা গাঁয়ের গাছও বিশ্বাস করবে না। অবনী তো চোদ্দো বছর বয়স থেকে মদ খায়, সবাই জানে। কিন্তু তার কথা কেউ কানেই তুলল না। আমার ওপর হুকুম জারি হল, গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

তুই কবুল করলি?

না করে উপায়? আমি ভাইয়ের লোক, উড়ে গিয়ে জুড়ে বসেছি, সহায়-সম্বল তো কিছু নেই। তবে ঘটনায় একটা উপকার কিন্তু হল জামাইদা। সেদিন থেকে আজ অবধি আর মদ ছুঁইনি।

সব ঘটনারই ভালো-মন্দ দুটো দিক থাকে। বরজটা কি বিক্রি করলি নাকি?

না, ওখানেই তো আসল প্যাঁচ।

তার মানে?

খেটেখুটে ব্যাবসাটা দাঁড় করানোয় সকলেরই চোখ টাটাচ্ছিল। বরজটার দিকে তখন অনেকের নজর। ঘটনার পর মাসখানেক থেকে চেষ্টা করছিলাম বিক্রির। কেউ কিনল না। বরং মাসখানেকের মাথায় আমাকে একরকম প্রাণের ভয় দেখিয়েই তাড়ানো হল। বরজটা, শুনেছি, মহীতোষ রায় দখল করেছিল। আমি তারপর আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

শেষ অবধি অবনী ঘোষের সঙ্গে মাধবী রায়ের বিয়ে হয়েছিল কি না খবর নিসনি?

সে খবরে আর আমার দরকার কী বলুন? অবনী ঘোষ আমার জীবন থেকে মুছে গেছে। শীতলকুচিও। ঘেন্নায় আর ও-মুখো কখনো হইনি।

মাধবীর তখন বয়স কত?

ষোলো-সতেরো হবে বোধ হয়। মেয়েদের বয়সের কোনো আন্দাজ আমার নেই। সাত-আট বছর আগেকার কথা।

তোর কি মনে হয় ওই গন্ডগোলটা আসলে ষড়যন্ত্র?

তা তো বটেই। যে-একমাস ছিলাম তারপরেও, তখন আর অবনী ঘোষ বা অন্য মোসাহেবরা আমার ছায়াও মাড়ায়নি।

গোরাচাঁদ অবশ্য আমাকে এত ভেঙে কিছু বলেনি। তবে এটা ঠিক যে, শীতলকুচিতে মহীতোষ রায়ের প্রবল প্রতাপ। বিষয়-সম্পত্তিও মেলা।

হ্যাঁ। আমার কিছু করার ছিল না দাদা, লাখ দুই-তিন টাকা জলে গেল, এই যা।

তোর কাছে দলিলপত্র আছে?

বরজের দলিল? তা আছে। তবে দলিল দিয়ে কিছু হওয়ার নয়। মামলা করলে সেই মামলা গড়াতে থাকবে, টাকা খরচ হবে জলের মতো, কাজের কাজ কিছুই হবে না। তাই আমি মামলা-মোকদ্দমায় যাইনি। লোকসানটা সয়ে নিয়ে নতুন রোখ নিয়ে আবার ব্যাবসা করেছি।

তোর ব্যাবসার মাথা আছে সবাই জানে। কিন্তু তবু বরজটা এত সহজে বেহাত হতে না দিলেও পারতিস। ও-বরজের এখন অনেক দাম।

কী করতে পারতাম বলুন? লাঠিবাজি করে তো সুবিধে হত না। বরং তাতে নিজেই হয়তো খুন হয়ে যেতাম।

তা বটে। তবে নবকেষ্ট অন্য কথা বলে।

কে নবকেষ্ট?

সন্ন্যাসী প্রতিহারের ছেলে।

আপনি তাকে পেলেন কোথায়?

কেন, সে তো এখন শীতলকুচির লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ম্যানেজার। তাকে চিনব না কেন?

সে আপনাকে কী বলেছে?

তেমন গুহ্য কথা কিছু নয়। এই কথা বলছিল যে, মাধবীর সঙ্গে অবনী ঘোষের একটা বিয়ের কথা হয়েছিল বটে, তবে পাকা কোনো কথা নয়। অবনী ঘোষ যে খুব ভালো ছেলে নয়, এটা সবাই জানে। তবে তার বাবা কেতন ঘোষের কাছে মহীতোষের একটু দায় ছিল। কেতন ঘোষ এক সময়ে মহীতোষের দুঃসময়ে তাকে খুব সাহায্য করেছিল। একরকম তার দয়াতেই মহীতোষ ফের নিজের পায়ে দাঁড়ায়। সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই এই বিয়ের কথা হয়। ধরেবেঁধে মেয়েটাকে হয়তো অবনীর সঙ্গেই বিয়ে দিতে হত। মেয়েটা কিন্তু রাজি ছিল না।

সে-সব তো আমার জানার কথা নয়। তবে অবনী ঘোষ কিন্তু লোক খারাপ ছিল না। মদ-টদ খেত বটে, কিন্তু আর তেমন কোনো দোষ দেখিনি। কুঁড়ে আর ভীতু ছিল, তা সে তো আমাদের অনেকেই।

শেষ অবধি মাধবী কিন্তু অবনীকে বিয়ে করেনি। অবনীর বিয়ে হয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের সাধন দাসের মেয়ে বৈষ্ণবীর সঙ্গে।

ও বাবা, আপনি অনেক খবর রাখেন দেখছি।

উড়ো কথা কানে এলে কী করব বল, তবে তুই যে দেখছি অবনী ঘোষের বড়ো সাউকার হয়েছিস, তোর বিপদের সময় তো অবনী ঘোষ তোর পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তবে তাকে ভালো লোক বলে মনে করছিস কেন?

ওই তো বললাম, লোকটা ভীতু, কিন্তু খারাপ বললে অন্যায় হবে।

কেতন ঘোষ ছিল দাপুটে লোক। কিন্তু চরিত্র ভালো ছিল না। ছেলেরও সেরকমই হওয়ার কথা। কেতন নিজের বিষয়-সম্পত্তি ফুর্তি করে প্রায় উড়িয়েই দিয়েছিল। যা খুদকুঁড়ো ছিল তা ফুঁকে দিয়েছে অবনী। তবে পেটে বিদ্যে ছিল বলে, বরাতজোরে একটা চাকরি পেয়ে গেছে। সরকারি কেরানি।

আপনি অনেক খবর রাখেন। আমিই এতসব জানতাম না।

জানবার চেষ্টা করিসনি বলে জানিস না।

কিন্তু আপনিই বা এতসব খতেন নিয়েছেন কেন? শীতলকুচির বৃত্তান্ত তো তামাদি হয়ে গেছে।

তাই নাকি? কিন্তু আমার তো তা মনে হচ্ছে না রে শিবাই।

তবে আপনার মনে হচ্ছেটা কী?

এই যে তোর বিয়ের অনিচ্ছে, পাত্রী দেখতে গিয়ে জানলা দিয়ে গোরু-ছাগল দেখা, নানারকম খুঁতখুঁতুনি তুলে সম্বন্ধ নাকচ করে দেওয়া, এইসব দেখেই মনে একটু ধন্ধ এসেছিল। কিছু মনে করিস না বাপু, শীতলকুচিতে গিয়ে একটু খোঁড়াখুঁড়ি করতেই কিছু ঘটনা বেরিয়ে পড়ল। এত সব কোনোদিন ভেঙে তো বলিসনি। আমার মনে টিকটিক হচ্ছিলই।

দূর কী যে বলেন!

ঠিকই বলি রে শিবাই। যতই ঢাকাচাপা দিস না কেন, আসল কথা বুঝতে আমার বাকি নেই।

রাত হতে চলল জামাইদা, এবার উঠি।

তাড়া কীসের? ভটভটিয়া আছে, তিন মাইল রাস্তা লহমায় পেরিয়ে যাবি। সবে ঝাঁপি খুলছি, সাপ বেরোক, তার আগেই পালালে কী চলে?

ঠিক আছে, বলেন।

তুই ভাবিস না যে, শুধু উড়ো খবরের ভরসায় তোকে এতকথা বলছি। কারো সঙ্গে কথা কইতে বাকি রাখিনি।

সর্বনাশ কার, কার সঙ্গে কথা কইলেন?

অবনী ঘোষ, মহীতোষ, এমনকী মাধবীকেও বাদ রাখিনি।

আমাকে ডোবালেন যে।

অন্ধকার বলে বুঝতে পারছি না যে, তোর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল কি না।

এসব না করলেই ভালো করতেন। যা উড়েপুড়ে গেছে তাকে আর কুড়িয়ে এনে কী হবে?

উড়েপুড়েই যদি গিয়ে থাকে তাহলে গাঁয়ের একটা সুন্দরী মেয়ে তেইশ বছর বয়েস অবধি বিয়ে না করে বসে আছে কেন বলবি?

বিয়ে করেনি সে তার ইচ্ছে। কাজটা ভালো করেনি সে। অবনী ঘোষের বাগদত্তা ছিল, তার উচিত ছিল তাকেই বিয়ে করা।

মনের সায় না থাকলেও? আর বাগদত্তাই বা কোন হিসেবে? মাধবীর তো মতামতই নেয়নি ওর বাপ। দুজনের ভাবসাবও ছিল না।

না থাকলে অবনী ঘোষের হয়ে ঝগড়া করতে এসেছিল কেন?

মোটেই অবনীর হয়ে ঝগড়া করেনি। সে চেয়েছিল যাতে তুই হুড়ো খেয়ে মদ ছাড়িস। তার মনের কথা তুই টের পাসনি, এত বোকা তুই নোস। ঝগড়া করতে এসেছিল তোর ভালোর জন্যই। তবে সিচুয়েশনটা যে, ওরকম বিচ্ছিরি দাঁড়াবে তা বুঝতে পারেনি। সেইজন্য পরে কান্নাকাটি করেছিল খুব। এখনও কাঁদে।

তাতে আমার আর কিছু যায় আসে না দাদা।

যায় আসে বলেই না, আজ অবধি তোর আর কোনো মেয়ে পছন্দ হল না। সত্যি কথা বল তো, মাধবী তোর সঙ্গে ঝগড়া করার আগে কতবার ভাব করতে চেয়েছিল? তুই তাকে পাত্তাই দিলি না।

পাত্তা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে কেন? সে তো আমার চোখে পরস্ত্রী।

তোর মাথা। কোনো হিসেবেই মাধবী পরস্ত্রী ছিল না। আজও নয়।

মাধবীর কথা তুলছেন কেন জামাইদা? আপনার মতলবখানা কী?

গত রোববার তোর দিদিকে নিয়ে আমি শীতলকুচিতে গিয়েছিলাম।

সর্বনাশ!

সর্বনাশের জন্যই এইবার তৈরি হ। তোর দিদির মাধবীকে ভারি পছন্দ হয়েছে। তার ওপর যখন শুনল, এত বয়স অবধি মেয়েটা বিয়ে না করে একজনের জন্য অপেক্ষা করে আছে, তখন তো কেঁদেই ফেলল। মহীতোষ এখন পারলে আমাদের হাতে-পায়ে ধরে। বলছিল, 'মেয়েটা বিয়ে করবে না বলে ধনুকভাঙা পণ করে বসে আছে, আমি মরেও শান্তি পাব না।

কাজটা ভালো করেননি জামাইদা। আমাকে বড়ো লজ্জায় ফেললেন।

দামড়া কোথাকার। শুধু একটা ভুল ধারণার ওপর একটা মেয়েকে এত কষ্ট দিতে হয়? অবনী ঘোষ তো কবেই বিয়ে করে সংসার পেতে বসে গেছে। তোর অঙ্ক তো মেলেনি।

সব অঙ্ক কি মেলে দাদা?

এই অঙ্কটা মিলিয়ে দে ভাই। আর পাত্রী দেখার নামে আমাদের মিছে হয়রান করে মারিস না।

আজ উঠি জামাইদা।

না। উঠলে হবে না। মুচলেকা দিয়ে যা। কোনোদিন তো আমার সঙ্গে অবাধ্যতা করিসনি। আজ কী করবি?

জ্বালালেন। দিদি যখন আসরে নেমে পড়েছে তখন আমার জীবন অতিষ্ঠ করে মারবে।

মত দিলি তো!

না দিয়ে উপায় কী বলুন?